বিশ্বের সেরা
প্রেমের গল্প

ভাষান্তর

ডাঃ অভিজিৎ দত্ত

পরিবেশক :

র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন

৪৩, বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
মার্চ, ১৯৬২

প্রকাশক :
নমিতা মিত্র
ময়নাডাঙ্গা'
পোঃ—চুঁচুড়া রেলস্টেশন

মুদ্রক ঃ
মাতৃ মুদ্রণ
ফটকগোড়া, চন্দননগর

প্রচ্ছদ :
নিমাই দাসগুপ্ত

বিশ্বের সেরা প্রেমের গল্প

জিওভ্যান্নি বোকাচিও

ক্লাসিক্যাল—মানবতাবাদী চিন্তাধারা, মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা ছেড়ে পার্থিব জীবনের বৈচিত্র্য ও রমনীয়তার কাছে ফিরে আসা এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের মধ্যে প্রেরণার উৎস খুঁজে পাওয়া—এই ছিল ইতালীর রেনেসাঁর মৌল চরিত্র। চর্তুদশ শতকের ইতালীর সাহিত্যিক বোকাচিও ইতালীয় রেনেসাঁর প্রানপুরুষ। জন্ম ১৩১৩য় প্যারীতে। ফরাসী মাতা ও ইতালীয় পিতার জারজ সন্তান, কবি পেত্রার্কের অন্তরঙ্গ বন্ধু। শ্রেষ্ঠ রচনা ঃ ‘ডেকামেরণ’ এবং ‘দান্তের জীবনকাহিনী।’ মৃত্যু ১৩৩৫ এ। মৃত্যুর আগে এপিট্যাফ লিখেছিলেন ঃ “কবিতার অনুশীলন ছিল তার জীবন।”



ভালোবাসার বিষ

বোকাচিও

স্যালার্ণোর রাজা ত্যানক্রেদি খুবই দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু তিনিই তাঁর বৃদ্ধ বয়সে এক প্রেমিকের রক্তে নিজের হাত রাঙালেন। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে ছিল। ওকে তিনি এতো ভালোবাসতেন যে বিয়ের পরে মেয়ে কাছ ছাড়া হবে বলে তিনি ওর বিয়েই দিতে চাইতেন না। শেষে মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলে পাদুয়ার ডিউকের সঙ্গে ওর বিয়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এলো মেয়ে। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী এবং অন্য মেয়েদের তুলনায় বুদ্ধিমতী। ওর বাবা ওকে কাছে রাখতে চান বলে মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়ার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করলেন না। মেয়ে লজ্জায় বিয়ের কথা বলতে না পেরে গোপনে প্রেমিক যোগাড় করলো। প্রেমিক রাজসভাররই এক যুবক সভাসদ। নাম গিসকার্দো। জন্মসূত্রে অভিজাত না হলেও অনেক মহৎ গুণ ছিল তার। ওকেই ভালোবেসে ফেলেছিল বিধবা রাজকন্যা। বারবার ওর সঙ্গে দেখা করে এবং ওর ব্যবহারের প্রশংসা করে সে গিসকার্দোকে ভালোবাসার কথা বোঝাতে পারলো। গিসকার্দো এখন রাজকন্যার মন জোগাতেই ব্যস্ত। প্রেমিককে কাছে পেতে চায় রাজকুমারী। কিন্তু গোপন ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। কিভাবে প্রেমিক তাকে কাছে পাবে, সেকথা ওকে জানানোর জন্যে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিল রাজকুমারী। পরের দিন কি করলে প্রেমিক তার কাছে আসতে পারবে, সেটা চিঠিতে লিখে চিঠিটা সে একটা ফাঁপা ছড়ির মধ্যে ভরে হাসতে হাসতে ওর হাতে তুলে দিয়ে বললোঃ 'এটা দিয়ে এক জোড়া নল ও হাফর তৈরী করা যাবে, তোমার চাকর সন্ধ্যাবেলা এতে ফুঁ দিয়ে আগুন উসকে দেবে।' প্রেমিক বুঝলো, এবার কোন একটা তাৎপর্য আছে। সে বাড়ী গিয়ে দেখলো, ছড়িটা ফাঁপা এবং ভেতরে চিঠি। চিঠি

পড়ে তার মনে হল, সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পুরুষ। রাজকুমারীর নির্দেশ মত সে পরের দিন কাজ করলো।

রাজপ্রসাদের এক ধারে পাহাড়ের নীচে একটা গুহা। অনাদি কাল থেকে ওখানে আছে। ওর মধ্যে আলো ঢোকেনা। পাহাড় খুঁড়ে ছোট্ট একটা দরজা তৈরী করা হয়েছে এককালে। এখন সেটা কাঁটাঝোপ আর লতায়পাতায় ঢাকা। প্রাসাদের একটা ঘর থেকে এই গুহার সিঁড়ি নেমে এসেছে। ঘরটা রাজকন্যার। গুহাটির দরজাটা খুব শক্ত। এই সুড়ঙ্গপথ বহুকাল কেউ ব্যবহার করেনি বলে সবাই ওটার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু প্রেমের চোখে সব কিছুই ধরা পড়ে। তাই প্রেমমুগ্ধা সেই রাজকন্যার ওই সিঁড়িটার কথা মনে পড়ে গেল। তাই প্রেমমুগ্ধা রমনী ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখবে বলে কয়েকদিনের পরিশ্রমে দরজাটা খুলে ফেললো। তারপর গুহার ভেতরে নেমে গুহা মুখ থেকে গুহার মেঝে কতোটা নীচুতে, সেটা মেপে সে প্রেমিককে জানালো। গীসকার্দো তখন একটা দড়ির তৈরী একটা মই জোগাড় করে চামড়ার বসে শরীর ঢাকলো, যেন কাঁটাঝোপের কাঁটায় তার চামড়া ছিঁড়ে না যায়। মইয়ের একটা দিক সে কাছের একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধলো, তারপর মই বেয়ে নীচে নেমে সে গুহার মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলো, রাজকন্যা কখন আসে। পরিচারিকাদের নানা কাজে পাঠিয়ে ঘুমুবার ভান করলো রাজকন্যা, তারপর এক সময় সে সিড়ি বেয়ে গুহায় ঢুকলো। ওখানে গিয়ে সে প্রেমিককে তার প্রাসাদকক্ষে আসার পথটা দেখিয়ে দিলো। দিনের অধিকাংশ সময় ঘরে কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গুহায় নেমে গেল গীসকার্দো। পরের রাত্রেও তাই ঘটলো এবং তারপর অনেকদিন ধরে একই ঘটনা ঘটতে লাগলো। নিয়তি প্রেমিক-প্রেমিকার সুখকে ঈর্ষা করছিল বলেই যেন এরপর ওদের হাসি খুশী জীবনে দুঃখ নেমে এল। ত্যানক্রেদি তার মেয়ের ঘরে মাঝে মাঝে একা সময় কাটায়। রাজকন্যা ঘিসমন্ডা তার সহচরীদের সঙ্গে বাগানে ছিল। মেয়ের ঘরে কেউ নেই, জানলা বন্ধ দেখে ঘরের এক কোনে চেয়ারে বসে সামনের পর্দাটা টেনে দেয় রাজা। ইতিমধ্যে রাজকুমারী ঘিসমন্ডা তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করবে বলে সহচরীদের বাগানে রেখে নিজের দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে গুহায় নেমে গেল। ঘরে আর কেউ আছে, সে খেয়ালই করেনি। যখন তার বাবা জেগে উঠলো, সে নিজের চোখে তার মেয়ে ও মেয়ের প্রেমিকের দেহমিলনের দৃশ্য দেখলো। দৃশ্যটা তার এতোই খারাপ লাগছিলো যে রাজা আর একটু হলে চেঁচিয়ে উঠতো। কিন্তু দ্বিতীয়বার ভাবনাচিন্তা করে সে চুপচাপ রইলো। যাতে কোন কেলেংকারী না করে সে ভবিষ্যতে নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। কারণ সে কি করবে, সে ততক্ষনে ঠিক করে ফেলেছে। প্রেমিক-প্রেমিকারা যথারীতি সময় কাটালো। রাজা ত্যানক্রেদি ঘরে আছে, তারা জানলোনা! জানালা দিয়ে বাগানে

নেমে গেল ত্যানক্রেদি। কেউ তাকে দেখতে পেলো না। সে দুঃখিত মনে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

পরের দিন রাজার আদেশে গুহা থেকে বের হবার সময় দু'জন রাজপুরুষ গীসকার্দোকে গ্রেপ্তার করে আনলো। গীসকার্দোর পরণে চামড়ার বর্ম, ত্যানক্রেদির চোখে জল। রাজা ত্যানক্রেদি বললো।

'গীসকার্দো, তোমাকে আমি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছি তাব বিনিময়ে তুমি আমার দিলে চূড়ান্ত লজ্জা ও অপমান। আমি নিজের চোখে সব দেখেছি।'

'রাজা, প্রেমের শক্তি তোমার বা আমার চেয়ে অনেক বেশী।'

ত্যানক্রেদি তখন একজন প্রহরীকে বন্দীর ওপর নজর রাখতে নির্দেশ দিল। পরের দিন সে মেয়ের ঘরে গেল। রাজকন্যা কিছুই জানেনা। প্রেমিকের সংগে থাকবে বলে যে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। রাজা কাঁদতে কাঁদতে বললো—

"তোমাকে আমি ভালো মেয়ে জানতাম। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না, তুমি স্বপ্নের মধ্যেও তোমার লজ্জা ও সম্মান বিসর্জন দিয়েছো এবং অপরিচিত পুরুষের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছো। আমার জীবনের যে কটা দিন বাকী, সেই দিনটা তুমি দুঃখে ভরে দিলে। তুমি যদি এই কাজই করবে, নিজের সমান মর্যাদার কোন পুরুষকে বেছে নিলেনা কেন। এই গীসকার্দো, এ তো সভার হীনতম মানুষদের একজন। আমি এতো দুর্ভানান্যস্ত যে কি করবো ঠিক করতে পারি না। গীসকার্দো বন্দী হয়েছে তার শাস্তি আমি ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু তোমার ব্যাপারে দুটো পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্য আমার মনে আছে। একদিকে, মেয়ের জন্যে বাবার ভালোবাসা। অন্যদিকে, তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রাপ্য শাস্তি। একটা তোমার স্বপক্ষে, অন্যটা আমার প্রকৃতিবিরোধী কিছু করতে আমাকে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু কিছু ফয়সালা করার আগে তোমার বক্তব্য আমি শুনতে চাই।'

এবং রাজা মাথা নীচু করে এমনভাবে কাঁদতে লাগলো যেন ছোট্ট একটা ছেলে চাবুক খেয়ে কাঁদছে।

বাবার কথা শুনে রাজকন্যা বুঝলো যে তার অবৈধ প্রণয় ধরা পড়ে গেছে এবং তার কারারুদ্ধ প্রেমিক মৃত্যুর দিন গুনছে। মেয়েরা দুঃখ পেল যেমন করে, রাজকুমারীর তেমনি চেঁচিয়ে কাঁদতে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজের দুর্বলতাকে সামলে নিল। সে মুখের ভাব বদলাতে দিলেনা এবং মনে মনে ধরে নিলো, গীসকার্দো আর নেই, সে নিজেও থাকবে না, তাই সে ঠাণ্ডা গলায় বললো—।

'আমি যা করেছি তা অস্বীকার করা কিম্বা আপনার ক্ষমাভিক্ষা করা এই মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্য নয়। কেননা প্রথমটার কোন লাভ নেই এবং দ্বিতীয়বার কাজ হবে না। আমি আপনার স্নেহ ভালোবাসার সুযোগ নিতে চাইনা। আমি সবকিছু

খোলাখুলি স্বীকার করে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাই তাই তারপর আমার আত্মা আমাকে যা করতে বলবে, আমি তাই করবো। এটা সত্যি যে আমি গীসকার্দোকে ভালোবেসেছিলাম, এখনও ভালোবাসি এবং যতোদিন বাঁচি, ভালোবাসবো। যদি প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী হয়, মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে আমার ভালোবাসা। মেয়েমানুষের স্বাভাবিক নৈতিক দুর্বলতার চেয়ে গীসকার্দোর আকর্ষণই এর জন্যে দায়ী। তাছাড়া আপনি আমার দ্বিতীয়বার বিয়ে দেবার কোন চেষ্টা করেননি। বাবা, আপনি তো জানেন, আপনার মেয়ে রক্তমাংসের মেয়েমানুষ, পাথরের মূর্তি নয়। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, যৌবনজ্বালা কতো তীব্র। যদিও আপনি সৈনিকোচিত ব্যায়ামে শৈথিল্য দেখান না, সম্পদ ও আরামের প্রভাব আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন। আমি মেয়েমানুষ, বয়সে এখনও যুবতী, আমার কামনাবাসনার মৃত্যু হয়নি। আমার স্বামী বেঁচে থাকতে আমি যে দেহজ সুখের স্বাদ পেয়েছি, এখন তা আমার প্রয়োজনে দাঁড়িয়েছে। দেহজ-বাসনা মেটাবাব তাগিদে আমি এমন কিছু করতে চাইনি, যাতে আমার বা আপনার বদনাম হয়। সৌভাগ্যবশতঃ আমি কামনা মেটাবার একটা গোপন পথ খুঁজে পেয়েছিলাম। আপনি যা দেখেছেন বা শুনেছেন, কিছুই আমি অস্বীকার করছি না। গীসকার্দোকে আমি ভেবেচিন্তে বেছে নিয়েছি, অন্য মেয়েদের মতো আকস্মিক খেয়ালে নয়। বাস্তবতার চাইতে প্রচলিত হীন-প্রথাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে আপনি বলছেন যে ও অভিজাত ভদ্রলোক হলে আপনি আমায় ক্ষমা করতেন। এক্ষেত্রে দোষটা আমার নয়, দোষটা নিয়তির। যে নিয়তি যোগ্য মানুষকে উন্নতির সোপানে উঠতে দেয়না কিন্তু অযোগ্যকে উন্নতির চূড়ান্তে নিয়ে যায়। আমরা সব মানুষই এক ধাতুতে এক ঈশ্বরের হাতে গড়া। মানুষে মানুষে একমাত্র তফাৎ হল গুণগত পার্থক্য। যারা গুণী, তাদের মহৎ বলা হয়।

অন্যদের অন্যরকম বলা হয়। যদিও এই ন্যায়নীতি এখন প্রচলিত প্রথার আড়ালে ঢাকা পড়েছে, প্রকৃতি এবং সুসমাজের রীতি একে অস্বীকার করে না। যদি গুণের দিক থেকে আপনি আপনার সভাসদদের বিচার করেন, গীসকার্দোকে মহৎ বলতে হবে, অন্যেরা নীচ। তার গুণ এবং তাঁর বীরত্বের কথা আপনি জানেন। যদি আপনি বলেন, আমি অতি সাধারণ হীন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করেছি, আপনার অভিযোগ আমি অস্বীকার করবো। আর যদি বলেন, একজন গরীব মানুষকে ভালো বেসেছি, সেটা আপনার পক্ষে লজ্জার কথা, কারণ আপনি এই গুণী পুরুষকে তার যোগ্য পুরস্কার দেননি। দারিদ্র্য মানুষকে ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত করে কিন্তু মানুষের মর্য্যাদা সে হরণ করত পারে না। কিন্তু গীসকার্দোকে আপনি যে শাস্তি দেবেন, সেই একই শাস্তি আমায় না দিলে আমি সেই শাস্তি নিজের হাতে দেবো। যদি আপনি নিষ্ঠুরতা দেখাতে চান, আমি বাধা দেবোনা। যদি কঠোরতা দেখাতে চান, আপনি

দুজনকে শাস্তি দিন।'

রাজা তাঁর মেয়ের হৃদয়ের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলেও তিনি ভাবলেন, মুখে সে যে ভয় দেখাচ্ছে, কাজে অতোদূর দূরে সরিয়ে তাকে ব্যাপারটার কথা ভুলিয়ে দেবেন ভেবে তিনি প্রহরীদের সে রাতে গীসকার্দোর গলা টিপে মেরে ফেলতে আদেশ দিলেন। হুকুম দিলেন, হৃৎপিণ্ডটা মৃতের শরীর থেকে ছিঁড়ে ফেলে তাঁর কাছে আনতে। তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ হলো। পরের দিন তিনি একটা সোনার পাত্রে হৃৎপিণ্ডটা রেখে বিশ্বস্ত চাকরকে বললেন, এটা মেয়ের কাছে নিয়ে যেতে। ওর হাতে চিঠি দিয়ে চিঠিতে রাজা মেয়েকে লিখলেন— 'যা তোমাব সবচেয়ে দামী, তাই দিয়ে তুমি প্রেমিকাকে সুখ দিযেছো। ওর যা সবচেযে দামী, তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে তাই তোমাকে পাঠালাম।'

বাবার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সঙ্কল্পে স্থির ছিল রাজকন্যা। কয়েকটা বিষাক্ত গাছের রস জলে মিলিয়ে সে হাতের কাছে রেখেছিল। তার সবচেযে বড়ো ভয় সত্যি হলে সে ওটা ব্যবহার করবে। চাকর উপহারটা তাকে দিলে সে মুখের ভাব না বদলে একবার হৃৎপিণ্ডটা দেখে নিয়ে চাকবেব দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—

'আমার বাবা বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করেছেন। সোনার শবাধারই এই হৃদয়ের যোগ্য।'

তারপর সে পাত্রটা তুলে ধরে মৃত প্রেমিকের ঠোটে চুমু খেয়ে বলে—

'আমার সারা জীবন, শেষের এই মুহূর্তগুলো পর্যন্ত আমার বাবার অপর্য্যাপ্ত স্নেহ-ভালোবাসা আমি পেয়েছি। কিন্তু আজ তিনি আমাকে যা দিলেন, তার তুলনা নেই। আমার নাম করে এই উপহারের জন্যে তাঁকে আমার শেষ ধন্যবাদ জানিও।'

তারপর সে সোনার কাপ সমেত হৃৎপিণ্ডটা শক্ত করে হাতে ধরে বলে। 'হায়! আমার সব কামনার কেন্দ্র, আমার সব বাসনার শেষ! যার নিষ্ঠুরতার ফলে এই চোখদুটো এখন তোমায় দেখছে, তাকে আমি অভিশাপ দিই। আমার মনের আঁখিতে আমি দীর্ঘদিন তোমাকে চিনেছি, জেনেছি। আজ তুমি পথের সীমা পেরিয়েছো, নিয়তি তোমার যে পরিণতি স্থির করেছিল, তাই হয়েছে। দুঃখে ভরা আমাদের পৃথিবী তুমি পেছনে ফেলে গেছো। তোমার শত্রুও তোমার হৃদয়কে দিয়েছে সোনার শবাধার। আমি তোমায় আর কি দিতে পারি? তুমি যাকে ভালবাসতে, তার কান্না ছাড়া। আমি কাঁদবো। যদিও ভেবেছিলাম, মৃত্যু মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমি অবিচল থাকবো, কান্না ঝরাবোনা। আমার আত্মা তোমার আত্মার সঙ্গে যুক্ত হবে। মৃত্যুর পরপারের অচেনা জগতে যেতে তোমার চেয়ে ভালো সঙ্গী কোথায় পাবো? তোমার আত্মা হয়তো এখন আমাদের পার্থিব আনন্দ-নিকেতনের কাছে ঘুরছে, আমাকে প্রত্যাশা

করছে।'

কথা শেষ হতে তার চোখে কান্নার প্লাবন আসে, সে মৃত প্রেমিকের হৃৎপিণ্ডে সহস্র চুম্বন এঁকে দেয়। সহচরীরা জানে না, ওটা কার হৃৎপিণ্ড, রাজকন্যা কি বলতে চাইছে। তবু করুণায় অভিভূত হয়ে তারা রাজকুমারীর দুঃখের কারণ জানতে চায়, তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে।

শোকের পালা শেষ করে সে মাথা তুলে চোখ মুছে বলে—

'হে আমার প্রিয়তম হৃদয়, তোমার কাছে আমার কর্তব্য শেষ। এখন আমার আত্মা তোমার আত্মার কাছে যাবে।'

আগের দিন যে পাত্রে বিষ মেশানো জল রেখেছে এখন সে সখীদের জলটা সেই সোনার কাপে ঢালতে বলে, যেখানে রয়েছে তার মৃত প্রেমিকের হৃদপিণ্ড। ভালোবাসার বিষে চোখের জল মেশে। এতটুকু ভয় না পেয়ে জলটা খেয়ে নেয় রাজকন্যা। তারপর কাপটা হাতে নিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে বিছানায় শুয়ে সে মৃত প্রেমিকের হৃৎপিণ্ড নিজের বুকে চেপে ধরে।

সখীরা ত্যানক্রেদিকে খবর দেয়। কি ঘটেছে অনুমান করে রাজা ছুটে আসেন। কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে শোক প্রকাশ করছিলেন রাজা।

রাজকন্যা বলে—

'যারা আমার চেয়েও দুর্ভাগা, তাদের জন্যে কাঁদবেন। আপনি ছাড়া আপনার নিজের কৃতকাজের জন্যে কেউ শোক করে না। একদিন আপনি আমাকে ভ্যালোবাসবেন। আজ যদি সেই ভালোবাসার কিছু অবশেষ থাকে, আমার শেষ অনুরোধটা রাখুন। জীবনে আমরা দুজন আপনার জন্যে সুখী হতে পারলাম না। মৃত্যুর পর আমাদের একসঙ্গে কবর দেবেন।'

শোকাহত রাজা কথা বলতে পারে না। মৃত্যু কাছে আসতে মৃত প্রেমিকের হৃদয় বুকে চেপে রাজকন্যা বলে—

'হে স্বর্গ, আমাদের গ্রহণ করো! আমি মরে যাচ্ছি।'

তার চোখ বন্ধ হয়। সে জ্ঞান হারায়। তার বিষন্ন জীবনের এখানেই সমাপ্তি।

এভাবেই শেষ হয়েছিল গীসকার্দো ও ঘিসমনডার প্রেম। যে কাহিনী তোমরা শুনলে। রাজা তার নিষ্ঠুরতার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল। যদি তখন বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে। রাজা জনসমক্ষে রাজকন্যা ও তার প্রেমিককে একসঙ্গে কবরস্থ করার ব্যবস্থা করলো। স্যালার্ণো-র সব মানুষ প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে সেদিন দুঃখ করেছিল।

মূল গল্প □ থিয়ামেথাজ স্টোরি ঃ ডেকামেরন

নিজামী

জন্ম ১১৪০, মৃত্যু ১২০২। এই বিশ্ববিখ্যাত রোম্যান্টিক কবির পুরো নাম নিজামুদ্দিন আবু মহম্মদ ইলিয়াস্ বিন্ ইউসুফ। জন্মভূমি ঃ পারস্য। শ্রেষ্ঠ রচনা ঃ 'খুসরু ও শিরিন্' এবং বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'লায়লা ও মজনু'। রোম্যান্টিক কাব্যকাহিনী লিখে রাজসভায় ঠাঁই পেয়েছেন নিজামী এবং দুটি গ্রামের রাজস্ববাবদ পাওয়া অর্থ তাঁকে দেওয়া হত—এছাড়া তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারেননি পাশ্চাত্যের সাহিত্যরসিক অভিযাত্রী 'লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া'—লোয়েল টমাস লরেন্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বর্তমান অনুবাদে মূলের শব্দঝংকার ও ছন্দলালিত্য অনুকরণের বৃথা চেষ্টার বদলে চিরায়ত রোম্যান্টিক কাহিনীটি যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায় পরিবেশনের চেষ্টা করা হল।



লায়লা ও মজনু

নিজামী

লায়লা, রাত্রির বুকে যে জ্বলজ্বল করতো মুক্তোর মতো। সে দিগন্তের পূর্ণচাঁদের মত সুন্দরী। রাত্রির বাতাসে দুলে যে সাইপ্রেস তরু লক্ষ-কোটি তারার আলোয় ঝলমল করে, তারই মতো কমনীয় ও রমনীয় ছিল লায়লা। তার কালো চুলে গহন আঁধারের আলো। তার চোখ দুটো আলোর আতিশয্যে কালো এবং আলোর আতিশয্যের জন্যেই তার চোখের দৃষ্টি ছায়াঘন, রহস্যময়। সে হাসলে, তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হলে প্রথম প্রভাতের গোলাপী রং ফুটে উঠতো। যখন প্রেম এসেছিল তার জীবনে—যেমন করে প্রেম তার ঝুলিতে লুকোনো দুঃখের ভার তুলে নেয়—স্বর্গের নন্দনকানন থেকে তুলে আনা গোলাপের মত প্রেমিকের বুকে মিশে গেল রূপসী লায়লা। আহ্-রিমানের হাত থেকে ওরমাজ্দ গোলাপ কেড়ে নিলে গোলাপ যেমন শুকিয়ে যায়, ঝরে যায়, মরে যায়।

রাতের গহন থেকে এসেছিল লায়লা। রাতের বিস্ময়ে জাগানো সৌন্দর্যের আবরনে ঢাকা। আঁধারের আলোয় ফিরে গেছে লায়লা। আজ তার কবরের ওপরে ভেসে যায় রাত্রির বাতাস, সাইপ্রেস গাছের কানে কানে বাতাস বলে যায় লায়লার প্রেমের কাহিনী। আকাশের তারাগুলো আরোও উজ্জ্বল হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে যেন বলে—"লায়লা হারিয়ে যায়নি, সে আমাদের সন্তান; সে আমাদের কাছেই ফিরে এসেছে। আকাশে চোখ মেলে দেখো, রাতের আকাশে আলো জ্বেলে লায়লা আজ রাতের তারা হয়ে জেগে আছে।"

চাঁদ কতো বিচিত্র নীহারে তার মুখ ঢেকে; কিন্তু নব-নবীন বুকে প্রতিফলিত হয় একটি চাঁদ। তেমনি লায়লার সৌন্দর্য অনেক পুরুষের বুকে ভালোবাসার দীপ জ্বেলে দিয়েছে। লায়লার বাবা ছিল সেই এলাকার ক্ষমতাশালী কুলপতি। অন্য গোত্রের

সব থেকে ধনী যুব-রাজেরাও তার কাছে আসতো। ওরা আসতো লায়লার রূপের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে। কিন্তু লায়লার হৃদয় কেউ জয় করতে পারেনি। ধনসম্পদ ও রাজকীয় জাঁকজমক তার হৃদয়কে জয় করেনি। কেননা সে হৃদয় দিয়েছিল ইয়েমেনের শক্তিমান্ দলপতির ছেলে যুবক কায়াস্‌কে।

লায়লার বাবার সঙ্গে ইয়েমেনের দলপতির বন্ধুত্ব ছিলনা। একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগের একমাত্র পথ ছিল যুদ্ধের পথ। কেননা অনেকদিন আগে ওদের পূর্বপুরুষেরে মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধেছিল। এবং যদিও ক্বচিৎ কখনও কোন বড় উৎসবে দেখা হলে দুই এলাকার অধিবাসীরা ক্ষণিকের জন্য সংঘাত ভুলে মেলামেশা করতো, সচরাচর দেখা যেতো, পরস্পরকে অভিবাদন করার সময় ওদের চোখে ঘৃণার আগুন জ্বলে ওঠে। সচরাচর, কিন্তু সবসময় নয়। অন্ততঃ একজনের ক্ষেত্রে নয়। কেননা এমনি এক উৎসবে কায়াস্ প্রথম দেখেছিল লায়লাকে। যদিও ওরা কথা বলেনি, প্রথম দর্শনেই জেগে উঠেছিল ভালোবাসা। সেই মুহূর্ত থেকেই বদলে গিয়েছিল কায়াস্। শিকারে সে আর আনন্দ পায়না। ভোজসভায় ও মন্ত্রণাসভায় সে নীরব থাকে। সে একলা বসে থাকে। তার চোখে অন্য এক আলো। তার উপজাতির কোন যুবক তাকে খেলাধূলোর আসরে নিয়ে যেতে পারেনা। তার উপজাতির কোন যুবতী তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। তার হৃদয় এখন অন্য ঘরে, যে গৃহ তার পিতৃপুরুষের নয়।

এবং লায়লা সখীদের মধ্যে বসে থাকে। তার চোখ মাটির দিকে। একবার একজন সখী লায়লার মনের অবস্থা অনুমানে সঠিক জেনে তার বাঁশী বাজিয়েছিল ও গান গেয়েছিল। গানের বিষয় ঃ অরণ্যের আড়ালে সেই ঝর্ণা, যেখানে রূপসী চাঁদের আলোয় প্রেমিকপ্রেমিকার মিলন হয়। গান শেষ হতে মাথা তুলেছিল লায়লা। সখীকে বলেছিল, গানটা আবার গাও।

এর পর থেকে সন্ধ্যায় সূর্য ডুবে গেলে বাবার প্রাসাদের চারপাশের বাগানে একা ঘুরতে ঘুরতে, প্রতিদিন ক্রমশঃ দূরে যেতে যেতে এক রাতে চাঁদ যখন সবথেকে উজ্জ্বল, তখন বাগানের শেষপ্রান্তে, যেখানে গভীর অরণ্যের সূচনা, সেখানে এসে দাঁড়ালো লায়লা।

চারপাশে ছিল চাঁদের আলো। মহীরুহের আড়ালে দেখা যাচ্ছিল খোলা জায়গা। যেখানে চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছিল ঝর্ণার জল। লায়লা বুঝলো, বাঁশীর সুরে মিষ্টি গানে যে ঝর্ণাকে অমর করে রেখেছিল তার সখী, এই সেই ঝর্ণা। স্মরণাতীত কাল থেকে এই ঝর্ণার ধারে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হয়, তারা পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দেয়। ঘুরতে ঘুরতে সে কখন এই ঝর্ণার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন এই ঝর্ণাই খুঁজেছে লায়লা। কথাটা ভাবতেই তার গাল দুটো লাল হয়ে ওঠে, বুক

ধুকধুক করে। লজ্জা পেয়ে সে এক ছুটে প্রাসাদে ফিরে যায়।

প্রাসাদের যে ঘরে লায়লা শুয়ে থাকে, তা কোনো সুলতানের ঘরের মতই আশ্চর্য্য সুন্দর। জানলার গা এলিয়ে কৃষ্ণচূড়ার দিকে চেয়ে থাকে লায়লা। সেখানে সুন্দর একজোড়া সাদা পায়রা। দীর্ঘদিন ধরে ওরা লায়লার সঙ্গী। ওরা তার কাঁধে বসে তার গালে মৃদু ঠোঁট বুলিয়ে বলে—'কু, কু, কু'। লায়লার কাঁধে ওড়াউড়ি করে ওরা বলে, 'কু, কু, কু'। লায়লা ডাকলে ওর হাত থেকে পায়রারা খেয়ে যায় ফসলের দানা। যখন একটা পায়রা বুকে চেপে ধরে অন্যটাকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দেয় লায়লা, ছাড়া-পাওয়া পাখীটা জানে, সে এখন দূরের কোন বৃক্ষে উড়ে যেতে পারে। সেখানে পৌঁছে সে সঙ্গিনীকে ডাকে—'কু, কু, কু'। ওর সঙ্গিনীকে একটু সময় বুকের কাছে ধরে রেখে ছেড়ে দেয় লায়লা। তারপর পাখীকে তার সঙ্গীর কাছে উড়ে যেতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—

'হায়, ভালোবাসার যদি থাকতো পাখীর মত ডানা! কিন্তু আমার তো নেই ডানা।'

অথচ পাখীর ডানাই বয়ে এনেছিল লায়লার প্রেমিকের আবেগভরা চিঠি, যে চিঠি তার বুকে জাগিয়েছিল ভয় ও আনন্দ, যে চিঠি তাকে দেখিয়েছিল প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের পথ।

নিঃসঙ্গ, একা বসে থাকে কায়াস্। লায়লাকে দুটো সাদা পায়রার কথা লোকে বলে, তার মনে পড়ে। কনুইয়ে ভর দিয়ে সে কৌচ থেকে ওঠে, আপন মনে বলে—'আমি যদি লায়লার বাবাকে গিয়ে বলি, তোমার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই, প্রস্তাবটা সে কিভাবে নেবে? প্রস্তাব যে নিয়ে যাবে, সেই বা কেমন ব্যবহার পাবে? কিন্তু লোকে যা বলে, তা যদি সত্যি হয়, এই পায়রা দুটো ওর জানালা দিয়ে উড়ে ভেতরে যাবে, লায়লার বুকের কাছে আশ্রয় পাবে।'

পায়রা দুটোর কথার ভাবতে ভাবতে কায়াস তার প্রিয় ও অনুরাগী ভৃত্য জেয়িদ-কে কাছে ডেকে বলে—

'তুমি তো জানো বসরা-র দলপতির প্রাসাদে আছে একজোড়া সাদা পায়রা। দলপতির মেয়ে একটাকে উড়িয়ে দেয়। যতোক্ষণ না সঙ্গিনী ছাড়া পায়, পায়রা ডাকে, কু, কু, কু......।'

'আমি জানি, প্রভু। ওরা পাখী, লায়লার হাতে এসে বসে।'

'ওরা কি তোমার হাতেও বসবে?'

'প্রভু, আপনি পায়রা দুটো চান? আমার বাবা ছিল আরণ্যক, আমিও অরণ্যের আড়ালেই বড় হয়েছি। পায়রার থেকে অনেক বেশী বন্য পাখীও আমি গাছে জাল পেতে ধরি। আমি হাত পেতে পাখী ধরার গোপন কৌশলও জানি।'

'তবে একটা পায়রা আমায় এনে দাও। ওকে আঘাত দিওনা যেন। একটা পালকও যেন না ছেঁড়ে।'

কথায় যেমন, কাজেও তেমনি চতুর জেয়িদ। দুদিন পরেই সন্ধ্যাবেলা সে লায়লার সাদা পায়রা দুটোর একটাকে এনে দেয়। আস্তে আস্তে টোকা মেরে পাখীর ভয় ভাঙে প্রেমিক। জেয়িদ পাখীটা ধরে থাকে, সাবধানে ওর পায়ে নরম ছোট্ট এক টুকরো পার্চমেণ্ট বেঁধে দেয় লায়লার প্রেমিক। সেখানে লেখা আছে কবিতার অক্ষরে প্রেমিকের ভাবনা—।

"তোমার হৃদয় এক শ্বেতশুভ্র পায়রার মতো
দূরের তরুর ছায়া থেকে উড়ে এসে
এনেছে তোমার প্রেম হৃদয়ে আমার।

* * *

তোমার হৃদয় তুমি ফিরে পাবেনাকো আর
সে হৃদয় এখন আমার..
তবুও তোমার কানে যাবে
আমার মনের ব্যথা, দূরের তরু ছায়ে রোদনের ধ্বনি।

* * *

যেখানে ঝর্ণার ধারে প্রিয় ও দয়িতা দেখা করে
আজ রাতে সেইখানে প্রতীক্ষা আমার.. ...
পাখীর ডানায় ভর করে উড়ে এসো প্রেম
যেমন দূরের তরুছায়ে আপন প্রিয়কে দেখে
ডানা মেলে উড়ে যায় পাখীর সঙ্গিনী.....।"

এদিকে লায়লা গ্রীষ্মের রাতে পায়রাকে উড়িয়ে তার সঙ্গিনীকে বুকে চেপে ধরে প্রতীক্ষা করে, কখন পায়রা তার সঙ্গিনীকে ডাকবে—'কু, কু, কু'। কিন্তু দূরের তরুছায়া থেকে পায়রা ডাকেনা। তার সঙ্গিনী পাখা ঝাপটায়, ওকে বুকে টেনে ধরে জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে পাখীর কূজনের শব্দ শুনতে না পেয়ে লায়লা বলে—'কি হল? পায়রা কোথায় উড়ে গেল? কখনো তো এমন হয়না। ও কি গাছের ডালে ঘুমিয়ে পড়েছে?'

তারপর কৃষ্ণচূড়া ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে ওঠে চাঁদ। চারদিক আলো হয়ে ওঠে। লায়লা প্রতীক্ষা করে। তবু দূরের তরুশাখা থেকে পাখীর কূজন ভেসে আসে না। অবশেষে, কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে পাখী সঙ্গিনীকে বুক থেকে সরিয়ে টোকা মেরে লায়লা, যেন পাখীর কথা বলে, আলতোভাবে একে হাওয়ায় ছেড়ে দেয়, যেন ও হারানো সঙ্গীকে খুঁজে আনে।

পাখী সোজা পরিচিত তরুশাখাব দিকে উড়ে যায়। সঙ্গীকে ডাকে—কু, কু, কু। সঙ্গীব ডাক ভেসে আসেনা। গাছ থেকে উড়ে গিয়ে প্রাসাদের চারপাশে উড়তে থাকে পাখী। লাযলা দেখে, পাখীর ডানার ঝিলিক। লায়লা শোনে, পাখীর ডানার শব্দ। জানলা দিয়ে ফিবে আসে পাখী। পাখীটাকে বুকে চেপে ধরে লায়লা বুঝতে পারে, পাখীটা কাঁপছে। ওকে বুকে চেপে ধরে লায়লা বলে—'হায পাখী! সঙ্গীকে হারানোব দুঃখ অনেক, খুঁজে না পাওয়ার দুঃখ আরো অনেক বেশী।'

কিন্তু, পাখীর সঙ্গিনীকে যখন আদর করছে লায়লা তখন ডানা ঝটপট কবে ফিরে আসে পাখী এবং লায়লা কাঁধে বসে। খুসীতে চেঁচিয়ে ওঠে লায়লা, পাখীকে দুহাতে ধরে, আদব কবতে গিয়ে পাখীব পায়ে খসখসে কি একটা তার হাতে লাগে। তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলে সে চিঠি পড়ে। প্রেমিকের চিঠি। তার বুক ধুকপুক করে। কি করবে, লাযলা ভাবে? সে কি সেই ঝর্ণার ধারে যাবে, যেখানে চাঁদের আলোয় প্রেমিক-প্রেমিকা দেখা কবে। তাব মনে সংশয জাগে। পাযরা দুটোকে চুমু খেয়ে সে ওদেব বেখে উঠে দাঁড়ায় লম্বা ঝল মিলে পোষাক পরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেযে নেমে পাশের একটা দবজা দিযে প্রাসাদের বাইরে যায়।

অবণ্যেব পথ ধবে হেঁটে যায প্রেম। সেই ঝর্ণার দিকে, যার ধারে প্রেমিক-প্রেমিকেব মিলন হয়। অবণ্যেব আড়ালে চাঁদেব আলোর ফালি এসে পড়েছে। ছাযার মতো সামান্য মত হেঁটে যাচ্ছে লায়লা। অবশেষে সে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পৌঁছোয, যেখানে খেলা করছে ঝর্ণার জল, যেখানে ঝকঝকে উজ্জ্বল রূপালী জলধারা অনেক উঁচু থেকে রত্নখচিত রূপোর মত নীচে পরছে, অজস্র জলকণা হয়ে ঝরে যাচ্ছে ঝকমকে শ্যাওলার বুকে।

ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে লায়লা। সে মনস্থির করতে পারেনা। এতোদূব ছুটে এসে তার বুক ধুকপুক করছে। কে সেই পুরুষ, যে তাব পায়রা চুরি করে পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে ফেরত দিয়েছে?

সে যেই হোক, তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ছাযার মধ্যে লায়লাকে দেখতে পেযে সে দ্রুত পা ফেলে ঝর্ণার ধার দিয়ে এগিয়ে আসে।

চাঁদের আলোয় ছুটে আসে লায়লা।

'কে তুমি?'

সে বলে।

ওদের চোখে চোখে মিলন হয়। কেউ কোন কথা বলেনা। কেননা ওরা প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে চিনতে পারে।

'লায়লা! তুমি এসেছো? আমি তোমায় ভালোবাসি।'

'আমিও তোমায় ভালবাসি।'

এবং বুড়ী চাঁদ, যে আগেও এমন দৃশ্য দেখেছে, সে ছাড়া প্রেমিক-প্রেমিকার আকস্মিক আলিঙ্গনের দৃশ্য আর কেউ দেখতে পেলোনা।

এবং ঝর্ণার অন্তরালে যে অস্তিত্ব জলের প্রথম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিক-প্রেমিকার কথা শুনেছে ও মনে রেখেছে, সে ছাড়া কেউ শুনলোনা, ওরা তবে অন্যকে কি বললো।

এবং ঝর্ণার ধারে আরও অনেকবার ওদের দেখা হল। বনের আড়ালে উচ্চারিত হল ওদের প্রতিশ্রুতি। একদিন, বিদায় জানাতে ওদের দেরী হচ্ছিল, প্রেমিক বললো—

'লায়লা, প্রিয়া আমার, যদি এই মরুভূমি আমার গৃহ হত, যদি তুমি ও আমি স্বাধীন হতাম, মরুদ্যানে যেসব ওষধিগুল্ম আছে, তাদের শাকপাতা খেয়ে কিম্বা বুনো ফসলের দানা থেকে তৈরী রুটি খেয়ে, নদীর জল খেয়ে, গাছের ছায়ায় শুয়ে আমরা জীবন কাটাতাম। আমি বিশ্বভূবন চাইনা, আমি তোমায় আত্মীয়স্বজনদের ঘৃণাও করিনা, আমি শুধু তোমার সঙ্গে বাঁচতে চাই, তোমাকে চিরদিন ভালোবাসতে চাই।'

'আমিও তোমায় চিরদিন ভালোবাসতে চাই, প্রিয়তম।'

'তাহলে, চলো, সবকিছু ছেড়ে আমরা পালিয়ে যাই।'

'এখনই?'

'না, এখন নয়। প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। প্রিয়া আমার, কাল ঠিক এই সময় ঝর্ণর ধারে দ্রুতগামী দুটো ঘোড়া নিয়ে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। ঘোড়ার পায়ের ঘায়ে ধুলো যেমন উড়ে যায়, তেমনি আমি ও তুমি বিশ্বভূবনকে প্রত্যাখান করে দূরে যাবো।'

সে রাতে লায়লা স্বপ্ন দেখলো যে সে প্রেমিকের পাশে অরণ্যে বসে আছে, মাথার ওপর গাছের ছায়া, নদীর জল তাদের পানীয়, বুনো ফসলের রুটি সেঁকে খায় ওরা, প্রেমিক কাছে আছে বলে ও প্রাসাদের ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলে থাকে।

কিন্তু, হায়! স্বপ্ন সত্যি হলো না।

প্রাসাদেরই একজন—যার দুটোর বেশী কান, যার মাথার পেছনেও দুটো চোখ— যে লায়লাকে বিয়ে করতে উৎসুক এক সুদর্শন যুবকদলপতি ইবন্ সালাম-এর কাছে থেকে টাকা খায়—সে কথাটা জানিয়ে দিল লায়লার বাবার কানে।

পরের দিন প্রাসাদে খালি করে বৃদ্ধ দলপতি, লায়লা এবং উপজাতির আর সবাই চললো পাহাড়ী এলাকার আবাসে। আশা করা হলো যে পাহাড়ী এলাকার বিশুদ্ধ বাতাসে লায়লার স্বাস্থ্য ভালো হবে। ওর বাবা তাই বললো। যদিও আর সবাই দেখলো, লায়লাকে এতো স্বাস্থ্যবতী আগে কখনও মনে হয়নি।

প্রেমিক জানলোনা, প্রেমিকা কোথায় গেছে। ঠিক সময়ে ঝর্ণার ধারে আসে সে।

একদিন সে জানতে পারলো (ইবন্ সালাম কৌশলে তাকে জানালো) যে লায়লা স্বেচ্ছায় তার পিতৃপরিবারের লোকজনের সঙ্গে পাহাড়ী এলাকায় গেছে এবং তার সঙ্গে গেছে তার নতুন প্রেমিক ইবন্ সালাম।

কথাটা বিশ্বাস করলো সে। কারণ প্রেমিক যা ভয় করে, তাই বিশ্বাস করতে চায়। উন্মাদের মত ছুটে বের হল সে। চূড়ান্ত নৈরাশ্যে সে শুধু তার লায়লাকে খুঁজে পাবার কথা ভাবছিল। দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে মরুভূমির মধ্যে ছুটতে ছুটতে সে চীৎকার করে বলছিল—'লায়লা! লায়লা!'

রাত ভোর হলে ক্লান্ত অবসন্ন প্রেমিক রুক্ষ বালির ওপর বসে পড়ে। তার বন্ধুরা এবং তার অনুগত পুরাতন ভৃত্য জেয়িদ তাকে খুঁজে পায়, তখন সূর্য্য উঠছে। প্রেমিক এখন উদ্‌ভ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। মরুভূমির ভেতর সে যেমন এলোমেলো ছুটেছে, তেমনি এলোমেলো ছুটে চলেছে তার মন। ওরা তাকে বাবার প্রাসাদের ভেতরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও সে সব সময় তার হারানো প্রেমিকাকে ডাকে—'লায়লা! লায়লা! লায়লা!'

সবাই ভাবে, সে পাগল হয়ে গেছে।

ওরা তার নাম দিলো 'মজনু'। কথাটার মানে 'প্রেম পাগল'। এই নামেই সবাই তাকে চিরদিন ডাকবে।

তার বাবা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, শত্রুপক্ষের দলপতির মেয়েকে ভালোবেসে লাভ নেই। ও যেন ভুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রেম ছাড়া আর সব ব্যাপারে ছেলে যুক্তি মেনে চলছে দেখে ওর বাবা বললো—'ওর এই রোগ সারালেই ও ভালো হয়ে উঠবে।'

ইয়েমেনের দলপতি বসরার দলপতির কাছে গেল ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ী আবাসে শত্রু দলপতির সঙ্গে দেখা করতে গেল সে। জেয়িদের কাছে রইলো বেচারা মজনু।

অনেক দিনের পথ হেঁটে লায়লার বাবার পাহাড়ী আবাসে এসে হাজির হয় ইয়েমেনের দলপতি। উদ্ধত ভঙ্গীতে বসরার দলপতির সামনে দাঁড়িয়ে সে লায়লার সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ের প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবে রাজী না হলে যুদ্ধ হবে, তার কথার ভঙ্গীতেই বোঝা যায়। উদ্ধতভাবেই তার প্রস্তাবে অসম্মতি জানায় বসরার দলপতি—

'সংবাদ দ্রুতগামী। তোমার ছেলে পাগল হয়ে গেছে। আগে ওর পাগলামী সেরে যাক। তারপর আমার সম্মতি চেয়ো।'

ইয়েমেনের দলপতি সিদ অহঙ্কারী ও উদ্ধত স্বভাবের পুরুষ। এই উত্তর তার সহ্য হল না। সে বন্ধুত্বের বন্ধন গড়তে এসেছিল। তার বদলে সে পেলো যুদ্ধের

খরসান তীর। বসরার দলপতির কাছে থেকে যখন সে ফিরে এল, তার চোখে আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিত। সে যুদ্ধ করবে, অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

কিন্তু পরিকল্পনাটা আপাতত স্থগিত রইলো। কেননা প্রতি বছরের মতো মক্কায় গেছে জেয়িদ। পবিত্র তীর্থে হাঁটু গেড়ে বসবে ও কাবার পবিত্র কূপের জল পান করবে মজনুও। কেননা মজনুকে সঙ্গে নিয়ে গেছে জেয়িদ।

মজনুর বাবা ভাবে—

'রুক্ষ মরুর বুক থেকে জেগে উঠে যে পবিত্র জলধারা হাগার ও তার সন্তানদের প্রাণ রক্ষা করেছিল, সেই পবিত্র জল আমার সন্তানের মনের সুস্থতা ফিরিয়ে দেবে। আমিও মক্কায় যাবো, পবিত্র কূপের জল পান করবো, তাহলে হয়তো আমার সন্তানকে আমি ফিরে পাবো।'

কিন্তু ভাগ্য এমনই, মজনুর বাবা যখন সঙ্গীসাথীদের নিয়ে মক্কার দিকে চলেছে, মক্কা আর দু'দিনের পথ, হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে বন্ধুভাবে ওর সঙ্গে দেখা করতে এলো নৌফাল, মরু এলাকার আর এক সর্দার। সঙ্গে তারা অল্প কয়েকজন যোদ্ধা।

'আমি তোমায় চিনি।'

নৌফাল এতো আকস্মিকভাবে ঘোড়ার লাগাম টানলো যে বালি ও নুড়িপাথর চারপাশে ছড়ালো।

'তুমি ইয়েমেনের সর্দার, মজনুর বাবা। মজনুর সঙ্গে মরুভূমিতে আমার দেখা হয়েছে। আমি তার প্রাণ বাঁচিয়েছি। তার সব কথা আমি শুনেছি। আমি তাকে সাহায্য করবো। ইয়েমেনের সর্দার, তুমি যদি চাও, আমি তোমায় সাহায্য করবো।'

'ও নৌফাল, আমি তোমায় অভিবাদন জানাই। তোমার নাম আমি শুনেছি। তুমি মরুর বুকে ঘুড়ে বেড়াও। তোমার বীরত্ব ও উদারতার অনেক গল্প আমি শুনেছি। আমার ছেলে তোমার কাছে আছে? কিন্তু ওর তো মক্কায় যাবার কথা ছিল, আমিও তীর্থে যাব বলে ওকে অনুসরণ করে চলেছি।'

'আমার সহযোদ্ধাদের দেখে হঠাৎ রাস্তার ধারে পড়ে যায় তোমার ছেলে। সে চীৎকার করে বলছিল—লায়লা! লায়লা! লায়লা! ওরা মজনুকে আমার কাছে নিয়ে আসে। ওর ভাঙ-ভাঙা গল্প শুনেও 'লায়লা!'—এই চীৎকার শুনে আমি বুঝতে পারি, ও তোমার ছেলে মজনু। কেননা, ইয়েমেনের সর্দার, নিঃশব্দ এই মরুভূমিতে সৌন্দর্য ও ভালোবাসার গল্প মানুষের মুখে মুখে দ্রুত ছড়ায়।'

'এখন তুমি কি করবে, নৌফাল?'

'তুমি ও আমি এখন বসরার সর্দারের কাছে যাবো এবং দাবী করবো যে মজনুর সঙ্গে লায়লার বিয়ে দিতে হবে। যদি সে রাজী না হয় এবং যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী

হই, তোমার ও আমার স্বার্থ এক হবে এবং মরু অঞ্চলে ও অন্যত্র আমি তোমার স্বার্থরক্ষা করবো। যদি ও আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়, ওর, আমার ও তোমার মধ্যে চিরদিনের জন্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'তুমি ঠিক বলেছো, নৌফাল। আমি তোমায় বিশ্বাস করি। তুমি বসরার দলপতির কাছে যাও এবং আমার হয়ে দাবী করো যে লায়লার সঙ্গে মজনুর বিয়ে দিতে হবে। আমি তোমাকে অনুসরণ করবো। যদি তুমি লায়লাকে নিয়ে আসো, সব ভালোই হবে। যদি না আনতে পারো, আমরা দুজনেই বসরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।'

নৌফাল ঘোড়ার মুখ ঘোরায়, তার নির্দেশে দুজন অশ্বারোহী দুদিকে ছুটিয়ে দিগন্তের দিকে যায়। তারা মরু অঞ্চলের যোদ্ধাদের পাহাড়ের নীচে বিশেষ একটা জায়গায় জড়ো হতে নির্দেশ দেয়। ইতিমধ্যে ইয়েমেনের দলপতির কাছ থেকে একই নির্দেশ নিয়ে সংবাদবাহকেরা ছুটেছে ইয়েমেনে। নৌফাল ও তার সঙ্গীরা বসরার সর্দারের-শৈলাবাসের দিকে যায়। ইয়েমেনের সর্দার তাদের প্রতীক্ষায় রইলো।

ইতিমধ্যে লায়লা শৈলাবাসে চূড়ান্ত মানসিক কষ্টের মধ্যে রয়েছে। তার বাবা ইবন্ সালামকে কন্যাদান করতে চায়। যুবক দলপতি ইবন সালাম প্রায়ই লায়লার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে। কিন্তু লায়লার অগতি ও কান্নাকাটি দেখে তার বাবা সুদর্শন ও ধনবান ইবন সালামকে বলে—

'মেয়ের এখনো বিয়ের বয়স হয়নি। তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।' কেননা বসরার সর্দার হিসেবী চোখে এই যুবক দলপতির দিকে নজর রেখেছে। ওর টাকা-পয়সা অনেক, এর অধীনে অনেক সৈন্যও আছে। লায়লা কিন্তু সারাদিন নিজেকে সবার দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখে। রাত নামলে সে রাতের তারাদের সঙ্গে কথা বলে।

'মজনু ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করার চাইতে কুমারী অবস্থায় মরে যাওয়া ভালো। হায়, মজনু পাগল হয়ে গেছে, আমারই মত।'

পায়রা দুটো গাছের ডালে বাসা বেঁধেছে বলে প্রাসাদের পরিচারিকাদের ওপর ওদের ভার দিয়ে ওই শৈলাবাসে এসেছে লায়লা। পাখী দুটো কাছে থাকলে তার ভালো লাগতো। কেননা দুটোর মধ্যে একটা পাখী তো প্রেমের দূত। এখন সেটুকুও শান্তিও সে পায়না। এখানে পোষা ছোট্ট একটা বাঘের বাচ্চা আছে। ইথিওপিয়ান দাস ছাড়া অন্য কারো কথা শোনেনা বাঘের বাচ্চা। বাঘের বাচ্চা প্রেমিক পায়রার বিকল্প নয়।

একদিন এক দাসরমনী তাকে একটা পাখী এনে দিয়ে বলল—'আমার ছেলে পাহাড়ী জঙ্গলে এই পাখী ধরেছে। তুমি আমায় অনেক করুণা করেছো, বিনিময়ে

এই পাখীটা তুমি নাও।'

এখন এই নির্জনতার মাঝখানে লায়লার একমাত্র সঙ্গী ওই পাখী। অল্পদিনেই লায়লা বুঝলো, পাখী তার গলার স্বর নকল করতে পারে। পাখীটাকে একটা মাত্র কথা শেখালো লায়লা। মজনু! বারবার পাখী তার কানে কানে বলে একটাই কথা, পৃথিবীর মধুরতম নাম—মজনু, মজনু, মজনু।' লায়লার হৃদয়ে কেন বুকের খাঁচা ছেড়ে মরুর নির্জ্জণ ঘোরে, বার বার ডাকে—'মজনু, মজনু, মজনু।'

এরই মধ্যে একদিন ভোরে একদল সৈন্য নিয়ে এসে হাজির হল নৌফাল। গেটে তরোয়াল রেখে সে বসরার সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলো।

প্রথমেই নৌফাল ও বসরার মধ্যে তীক্ষ্ণ ও স্বল্পস্থায়ী কথা কাটাকাটি হলো। তখন সূর্যকিরণও ক্রমশঃ চওড়ার-হয়ে-ওঠা একটা ফাঁলি পাহাড়ের পটভূমির দিকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। যখন ওটা গেটে এসে পড়ে এবং সূর্য দিগন্ত ছাপিয়ে ওঠে তখন নৌফাল ও বসরার কথা শেষ হয়েছে। ঘোড়া ছুটিয়ে মরুর দিকে ফিরে যায় নৌফাল ও তার সৈনিকেরা। সেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ইয়েমেনের দলপতি ও তার সৈন্যবাহিনী। বসরার সর্দার দেখে তার ও প্রভাতী সুখের মধ্যে ঘোড়ার-খুড়ে-খুড়ে-উঠে আসা ধুলোর ঝড়, ওই ধুলোর মধ্যে সে আগামী যুদ্ধের ইঙ্গিত দেখে। বসরার সর্দারের শৈলাবাসের পাশেই সুদর্শন যুবক দলপতি ইবন সালাম-এর এলাকা। সে যখন শুনলো, তাকে কন্যাদান করতে চায় বলে মজনুর সঙ্গে লায়লার বিয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করছে বসরার সর্দার এবং বাতাসে যুদ্ধের বজ্রবিদ্যুৎ ঘনঘটার ইঙ্গিত, সে এক হাজার সৈনিক নিয়ে বসরার সর্দারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তার সাহায্য আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে বসরার সর্দার। আসলে কিন্তু নিজের অধীন সৈন্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম বসরার সেনাবাহিনীর সাহায্যে পাঠায়নি ইবন্ সালাম।

যুদ্ধের পথ সাফ হয়েছে। দুপুরের আগেই ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসে ইবন সালামের বাহিনী। জানলা থেকে সাহসী যোদ্ধাদের দেখে লায়লা দূরে আক্রমনকারী বাহিনীর ঘোড়ার খুরে ধুলোর ঝড় এগিয়ে আসে।

'হায়।'

লায়লা কাঁদে।

'আমার বুকের আড়ালে যে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন, সেই হৃদয়ের জন্যেই এই সব। আমি আমার বাবাকে ভালোবাসি। আমি মজনুকে ভালোবাসি। এখন নিয়তির নির্দেশে বাবা ও মজনুর মধ্যে আমায় বেছে নিতে হবে।'

নিয়তির অদ্ভুত খেলা। তরোয়ালের ঝনঝনা, যুদ্ধের নির্ঘোষ সন্ধ্যা অবধি লায়লার কানে বাজে। তারপর আশা ও ভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান হৃদয় নিয়ে লায়লা

দেখে, ইবনের বাহিনী শত্রুপক্ষের কাছে হেরে পিছু হটছে। গেট ভেঙে পড়ছে। এবার হার কিম্বা জিত, নৌফাল ও ইয়েমেনের পক্ষে একজন দূত এগিয়ে এসে সন্ধিশর্ত জানায়। জানলা থেকে ঝুঁকে শোনে লায়লা, তার বাবা পরাজয়ের মধ্যেও সমান উদ্ধতভাবে চড়া গলায় বলছে—

'আমি যদি আমার মেয়েকে না দিই, তোমরা জোর করে ওকেনিয়ে যাবে? কিন্তু জীবিত লায়লাকে তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না। আমি নির্দেশ দিলেই ওকেই খুন করা হবে। আমি সব হারিয়েছি। কিন্তু আমার ভৃত্যেরা এখনও আমার বশংবদ। আমি নির্দেশ দিলেই ওর মৃতদেহটা তোমরা পাবে।'

ইয়েমেনের দলপতি হাত তুলে ওই ভয়ংকর কাজটা করতে তাকে নিষেধ করে—

'বসরার দলপতি, একদিন ভেবে দেখো। সমস্যাটার দুটো দিক আছে। তুমি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিলে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হবে। না দিলে তোমার সার্বভৌমতার সমাপ্তি হবে, মেয়ে তোমার থাকবে, কিন্তু তুমি আমার অধীনে তোমার এলাকাগুলো শাসন করতে বাধ্য হবে।'

এই বলে ইয়েমেনের সর্দার ও তার বন্ধু নৌফাল বিদায় নেয়। পরের দিন সকাল অবধি মনস্থির করার সময় পেলো বসরার সর্দার।

ইবন সালামের সংবাদবাহকদের মধ্যে একজনকে বলা ছিল, যে মজনু রাত্রিবেলা পরিচারকদের নজর এড়িয়ে মরুভূমিতে পালিয়ে যায় এবং সেখানে মজনুর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কথাটা সত্যি নয়। তবে ইবন সালামের আশা, কথাটা শীঘ্রই সত্য হবে। কেননা সে মজনুকে খুন করার জন্যে পেশাদার খুনীদের পাঠিয়েছে। মিথ্যে খবরটা তাড়াতাড়ি পৌঁছলে নিজের বিশাল সেনাবাহিনী বসরার সর্দারের কাজে লাগাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে লায়লার সম্মতি আদায় করতে পারবে এবং বসরার সর্দারও তাকে হত্যা করার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারবে।

ইয়েমেন ও নৌফালের বিজয়ী বাহিনী যেমনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেল, দেখা গেল ঘোড়ায় চেপে ছুটে আসছে সংবাদবাহক। বিজয়ী ও বিজিত—দুপক্ষই সংবাদটা শুনলো। সন্তানের মৃত্যুসংবাদে কাঁদলো ইয়েমেনের সর্দার। নৌফাল বললো—'এখন লায়লার আমাদের কাছে কোন মূল্য নেই। কাল আমরা অন্য সন্ধিশর্ত জানাবো।' মজনুর মৃত্যুসংবাদ শুনে দুঃখ পায়না ইবন সালাম বা বসরার সর্দার। ইবন তখন লায়লার বাবাকে বললো—'এখন আর আমার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে তোমার মেয়ের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কেননা ও মেয়েমানুষ এবং ও জানে, জীবিতেরা মৃতদেহের চেয়ে বেশী বাঞ্ছিত। সর্দার, আমি তোমার আগেই সাহায্য করেছি এবং আমরা ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু তোমার মেয়ে যদি একবার

কথা দেয় যে সে আমায় বিয়ে করবে, আজকের তিনগুণ সৈন্য মরু-এলাকা থেকে এসে তোমায় মদৎ দেবে। অর্ধেক সৈনিক প্রতিরক্ষায় আমাদের সাহায্য করবে। বাকী অর্ধেক মরুভূমির দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ করবে। তৃষ যেমন হাওয়ায় উড়ে যায়, তেমনি উড়ে যাবে তোমার শত্রুরা। সর্দার, তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলো। তাকে বোঝাও যে তার একটা কথা তোমায় ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।'

বসরার সর্দার তার মেয়ের সঙ্গে দেখা করলো। ইবন যখন শুনতে পেলো, মেয়েলী গলার কান্নার শব্দ, সে বুঝলো যে মজনুর মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করেছে লায়লা। দীর্ঘ সময় ধরে বাপ মেয়েকে বোঝালো, মজনুর জন্যে কেঁদে লাভ নেই, ইবনের সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে লায়লার বসরার সর্দার ও নিজের পিতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারে এবং শক্তিশালী এক রাজ্যের পত্তন করতে পারে। এই ভয়ংকর বিপদে বাবাকে বাঁচাতে পারে লায়লা। বাবার প্রতি কর্তব্যের কথা যখন লায়লাকে মনে করিয়ে দিল, লায়লা বুঝলো, কর্তব্যের খাতিরে তাকে আত্মত্যাগ করতে হবে, ভালোবেসে নয় কর্তব্যের খাতিরেই ইবনের সংগে বিয়েতে রাজী হল লায়লা।

ইবন খবরটা পেয়েই তার সহযোগী যোদ্ধাদের ডেকে জানতে চাইলো, 'আরও কতো সৈনিক জড়ো করা যাবে?

...তর উত্তর শুনে সে বললো -'চার হাজার? শত্রুর বাহিনীর সংখ্যা তিন হাজার। আমাদের সংখ্যা এক হাজারের কিছু বেশী।'

সে সংবাদবাহকদের বললো, তারা যেন গোপনে সেনানায়কদের খবর দেয়। দু'হাজার সৈনিক রাতের আঁধারের আড়ালে পাহাড়ের নীচে জড়ো হবে। রাতে তারা লুকিয়ে থাকবে। সূর্য উঠলে যুদ্ধে নামবে। বাকী দুহাজার মরুভূমি ঘুরে শত্রুবাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করে যুদ্ধের চরম মুহূর্তে। এই রণকৌশলে জয়ের আশা করছিল ইবন।

সে ভুল করেনি।

যখন মরুর বুকে ভোরের আলো ফোটে, পাহাড়চূড়ো যখন রোদের আলোয় ঝলমল, তখন পাহাড়ের নীচে দুহাজার যোদ্ধার ছায়া। শত্রু তাদের দেখতে পেলো না। ইয়েমেনের পক্ষ থেকে সংবাদবাহক এলো বসরার সর্দারের গেটে, সন্ধির শর্ত জানালো। এবার শর্তে লায়লার নাম ছিল না।

বসরার সর্দার বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে—

'ইয়েমেনের সর্দার ও তার মরুদস্যু বন্ধুকে বলো, আমার এলাকার দখল নিতে হলে যুদ্ধ করে জয় করতে হবে। বসরা কখনও আত্মসমর্পণ করে না। সে যুদ্ধে জেতে বা লড়াই করতে করতে মরে যায়।'

এই উদ্ধত জবাব নিয়ে গেল দূত। ইয়েমেনের সর্দার অবাক হয়ে কিছু খোঁজখবর

নিতে যাচ্ছিল কিন্তু মরু এলাকার মানুষ নৌফাল মেজাজী ও চঞ্চল, সে বললো— এখুনি আক্রমণ করা যাক।

তাই হলো। যুদ্ধ সুরু হল। প্রথম বিস্ময়ের পালা এল, যখন হঠাৎ পাহাড়ের চূড়ো থেকে ছুটে এলো দুহাজার যোদ্ধা। আক্রমণকারী পিছু হঠতে বাধ্য হল, কিন্তু আবার একজোট হয়ে তারা আক্রমণ করলো। সংখ্যায় সমান, যুদ্ধে কখনও একপক্ষ কখনও অন্যপক্ষ জেতে—জানলা দিয়ে দেখেছিল লায়লা। কিন্তু দূরে মরুভূমির বুকে ও কী? ধূলোর প্রকাণ্ড এক মেঘ ছুটে আসছে। কাছে আসতে দেখা গেল, অশ্বারোহী সেনাদের ঘোড়ার খুরের ঘায়ে মাটি কাঁপছে। ওরা কাছে আসে ঘূর্ণিঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণকারীদের ওপরে। ওদের পায়ের নীচে পিশে যায় আক্রমণকারীরা। পলাতক কিছু সৈনিক তুষের মত হাওয়ায় উড়ে যায়।

যুদ্ধে নিহত হয় ইয়েমেনের সর্দার। দ্রুত অশ্বারোহীদের সামনে পিছু হটতে হটতে মরুএলাকার সর্দার নৌফাল হাসতে হাসতে আত্মহত্যা করে।

যুদ্ধে জেতে বসরার সর্দার। সে রাতে লায়লার সঙ্গে ইবন সালামের বিয়ে দেয় তার বাবা। এবং সে রাতেই যুদ্ধে আহত সর্দার মারা যায়।

বসরা, ইয়েমেন ও মরু অঞ্চল—তিন এলাকার রাজা হলো ইবন্ সালাম। এবং তার রাণী হল লায়লা।

*   *   *

অনেক বছর কেটে যায়। শান্তিতে রাজত্ব করে ইবন ও লায়লা। লায়লার বাবার প্রাসাদে সে থাকে। কথা-কওয়া পাখীটা ও পায়রা দুটো তখন লায়লার সঙ্গী, তারা লায়লাকে মনে করিয়ে সেই প্রেমের কথা, যা হারিয়ে গেছে, কিন্তু যার কথা ভোলা যায় না। বিশ্বস্ত জেয়িদ মরুভূমি খুঁজে তার প্রভু মজনুর দেখা পায়নি, এখন সে লায়লার দাসী।

একদিন জেয়িদের কাছেই খবর আসে, যে মজনুকে ওরা মৃত বলে জেনেছিল, সে দূর প্রবাস থেকে বাণিজ্য করে ফিরে এসেছে এবং সে মরুর আড়ালে বিশেষ একটা জায়গায় সূর্যাস্তের সময় অপেক্ষা করবে। লায়লাকে কিছু বলে না জেয়িদ। কিন্তু একটা পায়রাকে যে গোপনে ধরে নিয়ে যায়। তার ধারণা, যা একবার ঘটেছিল আবার তাই ঘটবে। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। মরুর প্রত্যন্তদেশে প্রভুভৃত্যের দেখা হয়। দুজনেরই আনন্দ ধরে না।

লায়লা নিজের ঘরে ঢুকে একটা পায়রাকে না দেখে অবাক হয়। অন্য পায়রাকে সে ছেড়ে দেয়, অন্বেষণ করে ও সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু পায়রাটা একা ফিরে আসে। জানলার ধারে বসে তিন বছর আগের ঘটনার কথা ভাবছে লায়লা। সেদিন মজনুর কাছ থেকে প্রেমের চিঠি নিয়ে ফিরে এসেছিল সাদা পায়রা। সেদিন

বনের আড়ালে ঝর্ণার ধারে প্রেমিকের সংগে দেখা করছিল লায়লা। কিন্তু আজ মজনু মৃত, লায়লা অন্যের স্ত্রী। লায়লার চোখ জলে ভরে যায়। হাতে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে বাঁচে লায়লা।

অনেকক্ষণ পরে পাখীর কূজনের শব্দে তার ঘোর কাটে। 'কু, কু, কু', হারানো সেই পায়রা ফিরে এসে গাছের ডালে বসে ডাকে। তার সঙ্গিনী লায়লাব মাথার চুল ছুঁয়ে উড়ে যায় সঙ্গীর কাছে। পাখীর মত ডানা থাকল হয়তো লায়লাও তার হারানো প্রেমিককে ফিরে পেতো।

দুটো পাখীই জানলা দিয়ে ভেতরে ঢোকে! এ কী? আমার মতই আজও ওদের স্বজনের পায়ে বাঁধা নরম পার্চমেন্টের টুকরো। কাঁপা কাঁপা হাতে বাঁধন খোলে লায়লা। মজনুর চিঠি। সে বেঁচে আছে, ভালো আছে। সে তাকে চাঁদ ওঠবার সময় ঝর্ণার ধারে দেখা করতে বলেছে।

প্রেমিক বেঁচে আছে, কাছে এসেছে শুনে লায়লা প্রথমে সবকিছু ভুলে গিয়েছিল। চাঁদ যখন দিগন্তে ছুঁটেছে, লায়লা তখন ঢিলে লম্বাঝুল পোষাক পরে প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে, পাশের গেট খুলে বাইরে যায়। তার হৃদয় শরীরের আগে যেতে চায় দয়িতের কাছে। কিন্তু হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়, তাব হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসে, সে গাছের ডাল ধরে। তার স্বামী! তার কর্ত্তব্য! একদিন কর্তব্যের খাতিরে সে সবকিছু দিয়েছে। আজ কি সব তাই ভেবে ফিরিয়ে নেবে? তার কি মানে হবে? মজনু তাকে আলিঙ্গনের বাঁধলে সে সমাজ-সংসার, স্বামী, কর্তব্য সব ভুলে যাবে। একবার বাইরে পা রাখলে আর ভেতরে ফেরা যাবে না। এই কি রাণীর কর্তব্য? গাছের ডাল ধরে আছে লায়লা, তার শরীর দুলছে। সে সুখের বদলে দুঃখকেই বেছে নেয়। আস্তে আস্তে শরীর শক্ত করে দাঁড়ায় লায়লা। যেন স্বপ্নের ভেতরে সে আসে প্রাসাদে। সে কাঁদে না, ঘুমোয় না, তার চোখে জল নেই। রাত যখন ভোর হয়, তখন তার চোখে জল আসে, নইলে সে পাগল হয়ে যেতো।

লায়লার জন্যে ঝর্ণার ধারে অপেক্ষা করে মজনু। যখন জেয়িদ খবর আনে, লায়লা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে আবার প্রাসাদে ফিরে গেছে, মজনু ফিরে যায়। তার হৃদয়ে সেই ভালোবাসা যা প্রেয়সীর একটি দৃষ্টির জন্যে বিশ্বভুবন এনে দিতে পারে। লায়লা যেমন নিঃশব্দে প্রাসাদে ফিরে যায়, মজনু তেমনি দূরের নগরীর দিকে মুখ ফেরায়, প্রার্থনা করে, লায়লার সঙ্গে মিলনের সুখ যদি জীবনে না আসে, বিচ্ছেদের বেদনা যেন ভুলতে পারে।

দুবছর কেটে যায়। নিয়তি তার আপন কাজ করে। জ্বর হয় ইবন সালামের, সেই অসুখেই সে মারা যায়। খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। দূরের এক নগরীতে মজনু শোনে, ইয়েমেন ও বসরার রাণী লায়লার স্বামী মারা গেছে। ইচ্ছে করলে লায়লা

আবার বিয়ে করতে পারে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যতো দ্রুত যাওয়া যায়, ইয়েমেনে ফিরে আসে মজনু। একা, অচেনা মানুষ—এমন একটা বাসায় ওঠে মজনু, যেখান থেকে লায়লার প্রাসাদের আলো দেখা যায়। আগে দুবার কর্তব্যের খাতিরে আত্মত্যাগ করেছে লায়লা। তাই এবার বৈধব্যের নির্ধারিত সময় সাড়ে চার চান্দ্রমাস অতিক্রান্ত হওয়ার আসে লায়লাব মুখোমুখি হতে চায়না মজনু, প্রতীক্ষা মজনুর হৃদয়কে কুড়ে কুড়ে খায়। তার আগের পাগলামির চেয়েও অসহ্য একটা পরিস্থিতি। আগেরবার প্রেমপাগল বলে তার নাম হয়েছিল মজনু। কিন্তু তখন যেন সে স্বর্গের নন্দনকাননের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

জেয়িদ লায়লার ঘরে মজনুকে পৌঁছে দেয়, কিন্তু মজনুর কোন সংবাদ লায়লার কাছে পৌঁছোয় না। বৈধব্যের নির্ধারিত সময় পার হলে লায়লাকে খবর দেয় জেয়িদ। মজনু হয় দুপুরে প্রাসাদে ও সূর্য্যাস্তের পর ঝর্ণার ধারে লায়লার সংগে দেখা করবে। লায়লার যেমন অভিরুচি।

দেরীতে খবর আনে জেয়িদ—

'মধ্যদিন চলে গেছে, কিন্তু মধ্যরাত আসবে, সন্ধ্যার পরে।'

এরকম উত্তরই আশা করেছিস মজনু।

সূর্য্যাস্তের দুঘণ্টা পর ঝর্ণার ধারে আসে মজনু। আজ আর চাঁদ নেই, শুধু তারাদের নরম আলো। তরুছায়ার ভেতর দিয়ে হেঁটে যায় লায়লা। আর নিঃশ্বাস দ্রুত, হৃৎস্পন্দন দ্রততর। যেন তার সারা জীবন দুপায়ে বাঁধা। যেন দ্রুত ছুটে যাওয়ার ও নির্ভর করছে সবকিছু। বনের প্রান্তে সে থমকে দাঁড়ায়। না, মজনু যেন বুঝতে না পারে, সে ছুটে এসেছে। কিন্তু অজান্তেই আবার ছুটে চলে লায়লা। সামনে সেই ঝর্ণা, যার ধারে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলনপুর। তারার আলোয় ঝকঝক করছে ঝর্ণার জল। খোলা জায়াগার ধারে দাঁড়ায় লায়লা। তার বহিরাবণ শিথিল হয়। মাথার কালো চুল আজ বাঁধনহারা। তার বুকের ওঠানামা দেখা যাচ্ছে। ঝর্ণার ধার থেকে এগিয়ে আসে পুরুষ। লায়লা টলমল করে এগিয়ে যায়। সে মৃদু চীৎকার করে ওঠে। তাকে আলিঙ্গনে বাঁধে মজনু।

এক মুহূর্ত? না একহাজার বছর? প্রেম সময় মানে না। কিন্তু সূর্য্যাস্তের দুঘণ্টা পরের সেই মুহূর্ত ডেকে আনলো ওদের দুজনেরই সর্বনাশ।

লায়লার ঠোঁট মজনুর ঠোঁট ছুঁয়ে যেতেই মজনুর মনের আড়ালে মুক্তির বাঁধন ছিড়ে গেল। সে পাগল হয়ে গেল। তার আলিঙ্গণে মূর্ছিতা হয়ে আছে লায়লা। প্রেমিকার নিথর শরীর ফেলে দিয়ে মরুভূমির দিকে ছুটে যায় মজনু।

ডাকে—'লায়লা! লায়লা! লায়লা!

সেই উন্মাদ চীৎকার আশাহীন মরুর বুকে প্রতিধ্বনিত হয়। ক্লান্ত হয়ে পড়ে

মজনু। তার কণ্ঠস্বর শুনে তাকে অনুসরণ করেছে বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য জেইদ। প্রভুকে সে খুঁজে পায়, দিবারাত্রি সেবা করে। কিন্তু কোন লাভ নেই। মজনু সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে।

'লায়লা! লায়লা। লায়লা।

জ্ঞান ফিরে মরুর দূরদূরান্তে আর্ত চীৎকার শুনে লায়লা বোঝে, কি ঘটেছে। আস্তে আস্তে সে প্রসাদে ফিরে আসে। মাঝে মাঝে মজনুর খবর আনে জেইদ।

দিনে দিনে লায়লার চোখ দুটো হয়ে ওঠে আরও উজ্জ্বল, গাল দুটো আরও ফ্যাকাশে। তার জীর্ণ [illegible] পৃথিবী ছেড়ে যায় লায়লা। যাওয়ার আগে সে মজনুকে [illegible] বলে যায় তার শেষ নিবেদন —

প্রেম মরে না, শুধু মৃন্ময় শরীরের এই আবাস ছেড়ে যায়, তারই শেষ নিবেদন—

'ওকে বোলো, যেখানে ঝর্ণার ধারে প্রথম আমায় আলিঙ্গনে বেঁধেছিল মজনু, সেখানেই সমাধিস্থ হল আমার নশ্বর শরীর। ওকে বোলো, মজনু, চোখ তোলো, দূরে অসীম আলোর অন্য ভুবন, সেখানে রোদের আলোয় ঝরছে এক অনন্ত প্রপাতের বারিধারা। যার ধারে প্রেমিক-প্রেমিকাদের দেখা হয়। সেখানে আমাদেরও দেখা হবে।'

মরুভূমিতে যখন ভোরের আলো ফুটছে, ছুটে আসে দুজন পুরুষ। ওরা হাত ধরাধরি করে ছুটছে। ওদের একজন প্রেমে উন্মাদ মজনু। জেইদকে পেছনে আসতে বলে বনের মধ্যে ছুটে যায় মজনু। খোলা জায়গায় ঝরে পড়ছে ঝর্ণার জল। যেখানে প্রথম সে লায়লাকে আলিঙ্গনে বেঁধেছিল।

আজ সেখানে সদ্য-খোঁড়া একটা কবর।

ক্লান্ত, ছুটে নয়, প্রেম, উন্মাদনা ও হতাশায় ক্লান্ত সে। কবরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মজনু।

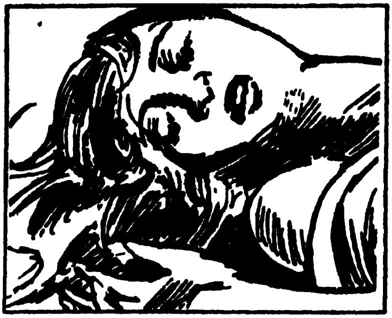
'লায়লা, লায়লা। আমি এখনি আসছি। রাত্রির কাফনে শরীর আড়াল করে রাখো তুমি। আলোয় ভরা অন্য ভুবনে নিজেকে লুকিয়ে রাখো। যতোক্ষণ না আমি সেখানে যেতে পারি।'

এবং সূর্য ওঠে।.....এবং কবরের ধারে দাঁড়িয়ে জলভরা চোখে প্রভুকে দেখে পুরাতন ভৃত্য জেইদ। বিষাদের তিক্ত অশ্রুর ভেতর দিয়ে সে মৃত প্রেমিক-প্রেমিকাকে দেখে। ■

মূল কাহিনী □ লায়লা-মজনু

আইভান তুর্গেনেভ

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম আইভান তুর্গেনেভের। তার উপন্যাসগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার অসাধারণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। তার সেরা উপ্যানাসগুলির মধ্যে 'ফাদার অ্যাণ্ড সন', 'রুদিন', স্পোর্টসম্যান নোটবুক' ও 'স্মোক' বিখ্যাত। ছোট গল্প নাটক ও গদ্যকবিতাও তিনি লিখেছিলেন। পঞ্চান্ন বছর বয়সে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান।



প্রথম প্রেম

আইভান তুর্গেনেভ

অতিথিরা সবাই চলে গেছে। ঘড়িতে তখন রাত্রি সাড়ে বারোটা, গৃহস্বামী ছাড়া আর দুজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন সার্গেই নিকোলাইচ আর ভ্লাদমির পেত্রোভিচ। গৃহস্বামী আরাম করে তাঁর আরামকেদারায় বসে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, তাহলে আমরা সবাই একমত যে আমাদের প্রত্যেকে তার প্রথম প্রেমের কাহিনী শোনাবে। এখন সার্গেই নিকোলাইচ, তুমি শুরু করো।

নিকোলাইচ বললেন, আমার প্রথম প্রেম বলে কিছু নেই। আমি ছ' বছর বয়সে আমার ধাত্রীকে প্রথম ভালবাসি। তারপর আঠারো বছর বয়সে একটি নারীকে সরাসরি প্রেম নিবেদন করি। সুতরাং প্রথম প্রেমের কোন প্রশ্নই ওঠে না এ ক্ষেত্রে।

গৃহস্বামী তখন বললেন, তাহলে কি করব আমরা ? আমারও ত ঐ অবস্থা। আমি আমার বর্তমান স্ত্রী এ্যানা ইভানোভাকে দেখার আগে কাউকে ভালবাসিনি। তার প্রেমে পড়ার পর তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়। সুতরাং এটাই হলো প্রথম এবং শেষ প্রেম আমার জীবনে। এখন ভ্লাদমির পেত্রোভিচ, আশাকরি তুমি কিছু বলবে এ বিষয়ে। আমি যখন প্রথম প্রেমের কথাটা তুলি তখন তোমার মত যৌবনোত্তীর্ণ একজন অকৃতদার লোকের উপরেই বেশী নির্ভর করেছিলাম।

পেত্রোভিচের বয়স প্রায় চল্লিশ। মাথায় কালো কুচকুচে চুল। তিনি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, আমার প্রথম প্রেমের কাহিনী সত্যিই কিছুটা অস্বাভাবিক।

গৃহস্বামী ও নিকোলাইচ দুজনেই তখন সমস্বরে বলে উঠলেন, খুব ভাল কথা, আমরা তা শুনব।

পেত্রোভিচ বললেন, আমি কিন্তু মুখে কিছু বলব না। কারণ আমার বর্ণনাশক্তি নেই। বলতে গিয়ে কাহিনীটা হয় নীরস না হয় অযথা সংক্ষিপ্ত করে তুলব। তার

থেকে আমার নোট বইয়ে যা লেখা আছে তা বরং একদিন তোমাদের পড়ে শোনাব।

একপক্ষকাল পরে একদিন পেত্রোভিচ তাঁর নোটবই থেকে তাঁর প্রথম প্রেমের কাহিনী তার বন্ধু দুজনকে শোনাতে লাগলেন। কাহিনীটা হলো এই :

আমার বয়স তখন ষোল। আমি যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি সে ঘটনাটি ঘটে ১৮৩৩ সালের গ্রীষ্মকালে। আমি তখন মস্কোতে আমার বাবা মার কাছে থাকতাম। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য তৈরি হচ্ছি। কিন্তু পড়াশুনোয় খুব একটা মন ছিল না আমার।

আমার ছিল অবাধ স্বাধীনতা। আমি যা খুশি তাই করে বেড়াতাম। আমার বাবা ছিলেন আমার প্রতি অতিমাত্রায় উদাসীন। আমার মার অন্য কোন সন্তান না থাকলেও অন্যান্য সব সময় ব্যস্ত থাকার জন্য আমার দিকে নজর দিতেন না। আমার বাবার দেহে তখনো যৌবন ছিল এবং দেখতে সুদর্শন ছিলেন তিনি। আমার মার বয়স ছিল বাবার বয়সের থেকে দশ বছর বেশি। বাবা মাকে তাঁর সম্পত্তির জন্য বিয়ে করেন। মাকে দেখে মনে হত তিনি এক বিষাদগ্রস্ত জীবন যাপন করে চলেছেন। তবে বাবার কাছে তাঁর সেই বিষণ্ণ ভাবটা দেখাতেন না। কারণ তিনি বাবাকে ভয় করে চলতেন। হিমশীতল এক কঠোর ঔদাসিন্যের সঙ্গে মাকে সব সময় এড়িয়ে চলতেন বাবা। আমার বাবার পোশাক আশাক, হাবভাব ও চালচলনের মধ্যে এক মার্জিত ও উদ্ধত আত্ম-প্রত্যয়ের ভাব লক্ষ্য করতাম। এমন লোক আমি জীবনে দেখিনি বললেই চলে।

নগরপ্রান্তে আমাদের সেই নতুন বাসাটায় যাওয়ার পর কাছাকাছি একটা বাগানে একটা বই নিয়ে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতাম আমি। কিন্তু বইটা খুলে পড়তাম না কখনো। আমার স্মৃতিশক্তি ভাল ছিল বলে মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করতাম। এক অদ্ভুত অব্যক্ত বেদনার আঘাতে রক্তরাঙা হয়ে উঠত আমার কণ্ঠস্বর। ব্যথাহত হয়ে উঠত আমার অন্তর। এক অজানিতভয়ে কেমন যেন সংকুচিত হয়ে থাকত আমার মনটা। আমার কল্পনা কতকগুলো এলোমেলো ভাবধারায় চারদিকে ঘুরপাক খেত বৃথা। মাঝে মাঝে এক বিষণ্ণ দিবাস্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকতাম আমি। নীরবে জল ঝরে পড়ত আমার চোখ থেকে। কিন্তু এই সব বিষাদ আর অশ্রুর মাঝেও সান্ধ্য প্রকৃতির শান্ত সুন্দর পরিবেশে যৌবনসুলভ মত্ততাজনিত এক আনন্দময় উত্তেজনা অনুভব করতাম আমি অন্তরে, যেমন বসন্তকালীন কচি সবুজ তৃণগুল্মের স্পর্শে রোমাঞ্চিত না হয়ে পারে না পৃথিবীর মাটি।

আমার ব্যবহারের জন্য একটা ছোট ঘোড়া ছিল আমার। সে ঘোড়ায় জিন দিয়ে একাই অনেক দূর দিয়ে চলে যেতাম। যেতে যেতে নিজেকে একজন [illegible] বীর যোদ্ধা ভাবতাম। নির্জন পথ দিয়ে আমি যখন ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে [illegible]

তখন আমার কানের পাশ দিয়ে বাতাস শিস দিয়ে যেত। আমি আকাশের পানে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতাম। আকাশ থেকে ঝরে পড়া নীলাভ উজ্জ্বল আলোর পশরাগুলোকে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন শোষণ করে নিতে চাইতে।

আমার মনে পড়ে ঠিক সেই সময় ভালবাসার কুয়াশাঘেরা এক অস্পষ্ট নারীমূর্তি ধীরে ধীরে এক স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে আমার মনে। অফুরন্ত মাধুর্যে ভরা অভিনব কিছু একটা শঙ্কিত প্রত্যাশা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতাম আমি। শঙ্কাবিহ্বল সেই প্রত্যাশা আমার দেহের প্রতিটি শিরায় মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে রক্তে কাঁপন জাগাত।

অস্পষ্ট অজানিত সেই ভয়ের বস্তুটাই সত্য হয়ে উঠল একদিন।

গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত আমাদের সেই বাসাবাড়িটা ছিল কাঠের তৈরি। ঘরের ছাদগুলো নিচু আর সামনে ছিল কাঠের বড় বড় খুঁটি। দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল অস্ত্র। কাগজ তৈরির একটা ছোট্ট কারখানা ছিল আমাদের বাড়ির বাঁদিকে। ডানদিকে ভাড়া দেওয়ার জন্য কতকগুলো খালি ঘর ছিল।

একদিন সেই সব ঘরগুলোতে একদল ভাড়াটে এল। খোলা জানালাগুলোর সামনে কতকগুলো নারীমুখ দেখা গেল। সেদিন খাবার সময় আমার মা আমাদের বাড়ির চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কারা আমাদের প্রতিবেশী হয়ে এল?

প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রিন্সেস জাসের্কিনার নাম শুনে মা প্রথমে কিছুটা আগ্রহ দেখালেন। পরে বললেন, তাঁর এখন হয়ত অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে।

চাকর বলল, ওদের কোন গাড়ি নেই, ঘরের আসবাবপত্র খুবই সস্তা।

আমার মা বললেন, তা হোক। তবু তিনি আমার প্রতিবেশিনী হয়ে আসায় আমি খুশী।

আমার বাবা নীরবে আমার মার দিকে একবার কড়াভাবে তাকালেন। এই সব আলোচনায় আমার কোন আগ্রহ ছিল না।

রোজ বিকালে বন্দুক নিয়ে কাক মারতে যাওয়ায় সখ ছিল আমার। আমি কাক একেবারেই দেখতে পারতাম না এবং দারুণ ঘৃণা করতাম বলে রোজ কাক খুঁজে বেড়াতাম। সেদিন বিকালে কোন কাক না পেয়ে একটা বাগানের বেড়ার ধারে এসে পড়লাম। আমি মাথা নত করে কিছুটা এগিয়ে যেতেই কাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম জামগাছের ঝোপে ঘেরা একটা ফাঁকা জায়গায় গোলাপী পোশাক পরা ছিপছিপে চেহারার একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় ছিল একটা সাদা রুমাল। তাকে ঘিরে ছিল চারজন যুবক। তারা পালাক্রমে একজন করে তার কপালটা এগিয়ে দিচ্ছিল এবং

মেয়েটি ফুল হাতে তাদের সেই কপালগুলো চাপড়ে দিচ্ছিল।

তা দেখে আমি বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মনে হলো আলুলায়িত কুন্তলা ঐ সুন্দরী মেয়েটির ফুলের কলির মত হাতের চাপড় খাবার জন্য আমার কপালটাও বাড়িয়ে দিই। আমার হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেল ঘাসের উপর। সব ভুলে তাকিয়ে রইলাম মেয়েটির দিকে।

এমন সময় একজন যুবক চীৎকার করে আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, কি হে ছোকরা, এইভাবে কি মেয়েদেব দিকে তাকিয়ে থাকতে আছে?

যুবকটি যখন আমাকে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে একথা বলল, তখন মেয়েটি তাকাল আমার দিকে। তার আনন্দোচ্ছল মুখ আর ধূসর রঙের বড় বড় চোখগুলোর উপর দৃষ্টি পড়ল আমার। হঠাৎ মেয়েটি জোরে হেসে উঠতে আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমি বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে বাড়ি চলে গেলাম। আমার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভাবতে লাগলাম। লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে এক অনুভূতপূর্ব সুখানুভূতিতে চঞ্চল হয়ে উঠল আমার মন। এমন উত্তেজনা আর কখনো অনুভব করিনি আমি।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করার পর মাথায় চুল আঁচড়ে কোট ঝেড়ে নিচে খেতে গেলাম। সেই উত্তেজনা বা চঞ্চলতাটা তখন না থাকলেও মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা অনুভব করছিলাম আমি।

চা খাবার সময় আমার বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? কাক মারতে পেরেছ?

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল বাবাকে সব কথা বলতে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম আমি। তারপর শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠেই আমার একমাত্র চিন্তা হলো কি করে তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি। প্রাতরাশের আগেই আমি একবার নেস্কুচনিদের বাগান দিয়ে ঘুরে এলাম। একবার মনে হলো একটি ঘরের জানালায় মেয়েটির মুখখানা দেখতে পেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমি লজ্জায় পিছিয়ে এলাম। কিন্তু তার সঙ্গে কি করে আলাপ পরিচয় করব সেকথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগলাম আমি।

আমি বাড়ি ফিরে এলেই মা আমাকে ডাকলেন। দেখলাম একটা ব্যাপারে চিন্তায় পড়েছেন মা। পাশের বাড়ির রাজকুমারী অর্থাৎ যে মেয়েটি গতকাল আমাকে দেখে হাসিতে ফেটে পড়েছিল তার মা আমার মাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তিনি কোন একটা ব্যাপারে আমার মার সাহায্য চান এবং সেইজন্য আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করতে চান মার সঙ্গে। বাড়িতে বাবা নেই বলে কি করা উচিত এ বিষয়ে তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাছাড়া তিনি ফরাসী বা রুশ ভাষায় চিঠিও লিখতে

পারতেন না। মা তাই আমাকে পাশের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে বললেন রাজকুমারীর সঙ্গে। ·

আমি আমার ঘরে গিয়ে পোশাক পাল্টে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। পাশের বাড়ির সদর দরজার কাছে যেতেই একজন বৃদ্ধ দারোয়ান আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি কি চাই। আমি বললাম, রাজকুমারী জাসেকিনা বাড়ি আছেন?

দারোয়ান গিয়ে খবর দিতেই রাজকুমারী ডেকে পাঠালেন আমাকে। দারোয়ান এসে আমাকে বসার ঘরে যেতে বলল।

আমি সে ঘরে গিয়ে দেখলাম ঘরখানা পরিচ্ছন্ন নয়। আসবাবপত্রও তেমন নেই। রাজকুমারীর সামনে গিয়ে নত হয়ে বললাম, আপনিই রাজকুমারী জাসেকিনা? আমার মা একটা খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন আমাকে।

তিনি আমাকে বসতে বললেন। আমি তাকে বললাম, আমার মা যে-কোনভাবে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত এবং আপনি বেলা বারোটা থেকে একটার মধ্যে গিয়ে মার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

উনি বললেন, খুব ভাল কথা। তোমার বয়স কত?

আমি বললাম, ষোল।

রাজকুমারী বললেন, এই বয়সটা খুবই ভাল। তুমি কিন্তু আমাদের বাড়িতেআসতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। আমরা খুব সাদাসিধেভাবে থাকি।

এমন সময় অন্য দিকের একটি দরজা খুলে গতকালকার দেখা সেই মেয়েটি ঘরে ঢুকল হঠাৎ।

রাজকুমারী আমাকে বলল, আমার মেয়ে জিনা। জিনা, এ আমাদের প্রতিবেশী, পাশের বাড়ির ছেলে।

—ভ্‌লাদমির।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললাম, ভাল নাম পেত্রোভিচ।

মেয়েটি বলল, আমি মঁসিয়ে ভ্‌লাদমিরকে আগেই দেখেছি।

রাজকুমারী তাঁর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় দেখা হয়েছে?

মেয়েটি তার উত্তর দিল না। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার হাতে এখন কোন কাজ আছে?

না, কোন কাজ নেই।

তাহলে আমার সঙ্গে ওঘরে গিয়ে পশমগুলো একবার ঠিক করে দিয়ে আসবে?

আমি তার পিছু পিছু গিয়ে অন্য একটি ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। এক স্বপ্নের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম আমি। এক পরম আনন্দের অনুভূতিতে অবশ হয়ে পড়েছিল আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি।

মেয়েটি নিজে একটি চেয়ারে বসে তার উল্টো দিকের অন্য একটি চেয়ারে বসতে বলল আমাকে। তারপর একতাল পশমের সুতোয় একটা প্রান্ত ধরতে বলল এবং নীরবে সেটা গোটাতে লাগল। এক শান্ত স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে দিল তার মুখে। একটা কাগজের কার্ডের উপর জড়াচ্ছিল সুতোগুলো নীরবে।

সহসা দুটো চোখ মেলে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকাল মেয়েটি যে আমি লজ্জায় মুখটা নামিয়ে নিলাম। সে বলল, গতকাল আমার ব্যবহার নিশ্চয় খুব খারাপ লেগেছে তোমার। তুমি কি ভেবেছ তা জানিনা।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, আমি....আমিত কিছুই ভাবিনি।

মেয়েটি বলল, দেখ, তুমি এখনো আমাকে জান না। আমি এক অদ্ভুত প্রাণী। আমি চাই সবাই সত্য কথা বলবে আমার কাছে। তোমার বয়স ষোল, আমার বয়স একুশ। তুমি সব সময় সত্য কথা বলবে আমার কাছে। আমার কথা মেনে চলবে। আমার দিকে ভাল করে তাকাতে পারছ না কেন?

আমার অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল। তবু মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বলল, হ্যাঁ, তুমি তাকাও, আমি কিছু মনে করব না। তোমার মুখখানা ভাল লাগে। আমরা বন্ধুত্ব গড়ে তুলব পরস্পরের মধ্যে। তুমি আমাকে পছন্দ করো ত? তুমি আমাকে জিনাইদা আলেকজান্দ্রানোভা বলে ডাকবে। দ্বিতীয় কথা, কোন কিছু গোপন করবে না অন্য সব যুবকদের মত।

যদিও তার সরলতায় আমি আনন্দ পেলাম তথাপি আমার কেবলি মনে হচ্ছিল আমি তাকে দেখিয়ে দিই সে যতখানি আমাকে ছেলেমানুষ ভাবে আমি ততখানি ছেলেমানুষ নই।

আমি বললাম, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে জিনাইদা আলেকজান্দ্রানোভা। তোমার কাছে কোন কথা গোপন করার ইচ্ছা আমার নেই।

মাথা নেড়ে আমাকে সমর্থন করে সে বলল, তোমার গৃহশিক্ষক আছেন?

যদিও মাত্র একমাস আগে আমার ফরাসী গৃহশিক্ষকের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তথাপি আমি মিথ্যা করে বললাম, অনেকদিন হলো আমার গৃহশিক্ষক নেই।

তাহলে ত দেখছি তুমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছ।

এরপর সুতোটা গোটাতে লাগল। আমি এবার তার চেহারাটাকে খুঁটিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলাম। প্রথমে লুকিয়ে, তারপর সাহসের সঙ্গে। আগের দিনের থেকে তার মুখটা আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার ছিপছিপে সুন্দর চেহারার উপর বুদ্ধিমত্তার একটা ছাপ ছিল। তার মুখটা ছিল খুব মিষ্টি। সাদা পর্দাঢাকা জানালার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল সে। একফালি সূর্যরশ্মি পর্দার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছিল

তার চেহারার উপর। তার সোনালী চুল, অনাবৃত গ্রীবা, ঢালু কাঁধ ও শান্ত বুকের উপর সেই আলো পড়ায় তার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। তার কালো পুরনো পোশাকের উপর একটা শেমিজ ছিল। আমি তার দিকে তাকালাম। আমার মনে হলো আমি যেন যুগ যুগ ধরে তাকে জানি, মনে হলো তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রাণে যেন মরে ছিলাম আমি। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল তার প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধার ভারে অবনত হয়ে তার পায়ের জুতোর উপর পড়ে যাই। তার সামনে বসে আমি ভাবতে লাগলাম আমার আকাঙ্খিত নারীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি আমি, এটা কি কম কথা। এ কি কম আনন্দের কথা। আবেগের বশবর্তী হয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠছিলাম। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আমি যেন চিরকাল এই ঘরে বসে থাকি।

তার অবনত চক্ষুপল্লবগুলি তুলে আমার দিকে তার উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকাল। তারপর আমার সামনে তার আঙুলগুলো নাড়িয়ে বলল, এমন করে তাকাচ্ছ কেন?

লজ্জায় আমার মুখটা রাঙা হয়ে উঠল। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, সে তাহলে সব বোঝে।

পাশের ঘরে কি একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী 'জিনা' বলে ডাক দিলেন। বেলেভজোরাত তোমার জন্য একটা বিড়ালছানা এনেছেন।

'বিড়ালছানা। এই বলে লাফ দিয়ে উঠে জিনাইদা পশমের সুতোর তালটা আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমিও তার পিছু পিছু বসার ঘরে গেলাম। দরজার কাছ থেকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি। দেখলাম ঘরের মাঝখানে পা ছড়িয়ে একটা বিড়ালছানা বসেছিল আর জিনাইদা তার মাথাটায় হাত বোলাচ্ছিল নতজানু হয়ে বসে। জানালার কাছে একটা লাল মুখ, কোঁকড়ানো চুল আর উজ্জ্বল চোখওয়ালা এক সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়েছিল।

জিনাইদা বলল, কি সুন্দর দেখতে, এর চোখগুলো সবুজ, কানগুলো কেমন বড় বড় দেখ। ধন্যবাদ ভিক্টর ইমেগোরিখ।

আমি দেখলাম গতকাল বাগানে যে চারজন যুবককে দেখেছিলাম এই যুবক তাদের মধ্যে একজন।

যুবকটি বলল, গতকাল তুমি একটা বিড়ালছানার কথা বলেছিলে। তাই নিয়ে এলাম। তোমার কথাই আমার কাছে আইন।

জিনাইদা বলল, ওর খিদে পেয়েছে। বনিকেট, একটু দুধ নিয়ে এস।

ঝি দুধ নিয়ে এলে বিড়ালছানাটা তা পান করে আনন্দে পাগুলো নাচাতে লাগল। যুবকটি জিনাইদাকে বলল, বিড়ালছানা এনে দেওয়ার জন্য তোমার হাতটা দাও।

জিনাইদা তার দুটো হাত বাড়িতে দিলে যুবকটি তা চুম্বন করল। এই সময় জিনাইদা হঠাৎ পিছন ফিরে আমার দিকে তাকাল। আমি তখন স্তব্ধ হয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি তখন হাসব, না কিছু মন্তব্য করব তা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

এমন সময় আমাদের বাড়ির চাকর এসে আমাকে ডেকে বলল, আপনার মা আপনাকে ডাকছেন। একঘন্টার বেশী হয়ে গেছে। অথচ রাজকুমারীর কাছ থেকে উত্তর নিয়ে যাননি।.

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এক ঘন্টারও বেশী!

আমি যাবার জন্য পা বাড়তেই জিনাইদা বলল, কোথায় যাচ্ছ?

আমি বললাম, বাড়ি যাচ্ছি, মাকে খবরটা দিতে হবে।

আমি এরপর রাজকুমারীকে বললাম, তাহলে বেলা একটার পর আপনি মার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ সেই কথাই তাঁকে বলবে।

জিনাইদা হাসতে হাসতে বলল, মনে থাকে যেন, আবার এসে দেখা করবে আমার সঙ্গে।

সে কেন হাসতে লাগল আমি শুধু এই কথাই ভাবতে লাগলাম। আমি বাড়ি যেতেই আমার দেরী হওয়ার জন্য মা আমাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। বললেন, রাজকুমারীর কাছে এতক্ষণ ধরে কি করছিলে? আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার ঘরে চলে গেলাম। এক নিবিড় বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল আমার সমস্ত মন। কোন রকমে অশ্রু সংবরণ করে রাখলাম। হুসার নামে সেই যুবকটির প্রতি দারুণ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলাম আমি।

রাজকুমারী তাঁর কথামত ঠিক সময়ে এসেছিলেন মার সঙ্গে দেখা করতে। আমি সেই সাক্ষাৎকারের সময় ছিলাম না। পরে আমি শুনলাম মা বাবাকে বলছিলেন, রাজকুমারী খুব একটা ভাল মেয়ে নয়। উনি মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন, তাই প্রিন্স সার্গেইকে তাঁর কথা বলতে বলছিলেন। মা আরও বললেন, তিনি পরদিন রাজকুমারী ও তার মেয়েকে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন।

আমার বাবা মার কথা শুনে বললেন, তিনি প্রিন্স জাশকিনকে চিনতেন। জুয়ো খেলে সব টাকা উড়িয়ে দেন। পরে তিনি এক সামান্য সরকারী চাকুরের মেয়েকে বিয়ে করেন। কিন্তু আবার তিনি সর্বস্বান্ত হন। তবে রাজকুমারীর মেয়েটি সুন্দরী এবং শিক্ষিতা।

সেদিন খাওয়ার পর আমি জিনাইদাদের বাগানের কাছে যেতেই দেখলাম জিনাইদা একা একাই বই হাতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে বাগানের পথে। আমাকে দেখে

একটুখানি ক্ষীণ হাসি হেসে আবার বইটা পড়তে লাগল।

আমার প্রতি জিনাইদার ঔদাসিন্য দেখে আমার অন্তরটা ভারী হয়ে উঠল। আমি পিছন ফিরে বাড়ি যাবার জন্য এগোতেই দেখলাম আমার বাবা সেই পথেই আসছেন। আমার বাবা আমাকে জিজ্ঞসা করলেন, ঐ মেয়েটিই কি রাজকুমারীর মেয়ে?

আমি বলবলা, হ্যাঁ, আমি আজ সকালে রাজকুমারীর বাড়িতে গিয়ে ওকে দেখেছি।

আমার বাবা জিনাইদার পাশ দিয়ে যাবার সময় মাথা নত করলেন। জিনাইদাও একবার মাথাটা নত করে আবার বইটা তুলে নিল। আমি লক্ষ্য করলাম, জিনাইদা আমার বাবার পথপানে তাকিয়ে আছে। আমার বাবার সাজপোশাক সব সময় ভালই থাকত। কিন্তু তাঁকে তখন সবচেয়ে ভাল দেখাচ্ছিল।

আমি এবার জিনাইদার দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলাম। কিন্তু জিনাইদা আমার পানে ভাল করে না তাকিয়েই চলে গেল।

সেদিন সারা সন্ধ্যা আর পরদিন সারা সকাল আমি দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে রইলাম। তারপর ভোজসভার আগে আমি চুলে ক্রীম দিয়ে চুল বিন্যস্ত করে ও পোশাক পরে তৈরি হয়ে রইলাম। আমার মা আমাকে এই সাজপোশাকের কাবণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, আমাদের বাড়িতে অতিথি আসবে না?

মা বললেন, তাতে কি হয়েছে! তার জন্য এত সাজপোশাকের কি আছে?

বাধ্য হয়ে আমি তখন জামাটা ছেড়ে আগের জামাটা পরলাম। কিন্তু গলবন্ধটা আমার গলায় রয়ে গেল।

যথাসময়ে রাজকুমারী তাঁর মেয়ে জিনাইদাকে নিয়ে এসে গেল। রাজকুমারী তার সবুজ পোশাকের উপর হলুদ রঙের শাল চাপিয়ে এসেছিলেন। এসে থেকে তিনি অনর্গলভাবে শুধু নিজের স্বার্থের কথা বলে আসছিলেন। অথচ তাঁর মেয়ে জিনাইদা গম্ভীরভাবে বসে ছিল চুপ করে। তার চুলের দুটো বেণী দুদিকে ঘাড়ের উপর ঝোলানো ছিল। আমার বাবার পাশেই জিনাইদা বসেছিল। বুঝতে পারলাম মার কাছে একেবারে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে রাজকুমারী। আমার বাবা অবশ্য তাঁর প্রতিবেশী অতিথিদের উপরে খুব সৌজন্যমূলক আচরণ করছিলেন। পরের দিন মা বলেছিলেন, জিনাইদা বড় অহঙ্কারী।

আমার বাবা বললেন, আমি জোর করে বলতে পারি এমন মেয়ে তুমি কখনো কোথাও দেখনি। যাই হোক, জিনাইদা আমাদের বাড়ি থেকে যাবার সময় আমাকে চুপি চুপি বলে গেল, আজ রাত আটটার সময় আমাদের বাড়ি যাবে।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় আমি জিনাইদাদের বাড়ি যেতেই আনন্দোচ্ছল কয়েকটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি বসার ঘরের দরজাটা খুলতেই দেখলাম জিনাইদা একটা টুপি হাতে ধরে নাড়াচ্ছে আর পাঁচজন লোক সেই চেয়ারটাকেঘিরে দাঁড়িয়ে টুপিটার

ভিতরে হাত ঢোকাবার জন্য চেষ্টা করছে।

আমি যেতেই জিনাইদা আমাকে একটা টিকিট দেওয়া করালো। পাঁচজনের মধ্যে লুশিন নামে একজন আমাকে খেলার নিয়ম কানুন বলে দিল। বলল, আমরা ফরফিট খেলছি। জিনাইদার হাতের টুপির মধ্যে অনেকগুলো টিকিট আছে। তার মধ্যে 'চুম্বন' কথা লেখা একটা লাকী টিকিট আছে। সেই টিকিট যে তুলতে পারবে সে জিনাইদার হাতটা চুম্বন করবে।

অবশেষে আমার হাতেই লাকী টিকিটটা উঠল। জিনাইদা চীৎকার করে উঠল, কি মজা জিতে গেছে! বেলেভজোরাভ নামে হুসর-বংশীয় যুবকটি আমাকে বলল, টিকিটটা আমাকে বিক্রী করে দাও, আমি তোমাকে একশো রুবল দেব।

কিন্তু আমি তা দিলাম না। জিনাইদা আমার সামনে হাতটা বাড়িয়ে গম্ভীরভাবে দাঁড়াল। আমাকে নিয়মমত একটা পায়ের উপর ভর দিয়ে বসতে হবে নতজানু হয়ে। কিন্তু দু পা দিয়ে নতজানু হয়ে বসে জিনাইদার হাতটা নিয়ে এমনভাবে চুম্বন করলাম তাড়াহুড়ো করে যে তার একটা আঙ্গুলের নখে আমার নাকের ডগার কাছটায় কেটে গেল।

এরপর যারা হেরে গেছে তাদের এবার শাস্তি দেবে জিনাইদা। একজন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল আর জিনাইদা তার উপর দাঁড়িয়ে তার মাথাটা ঘোরাতে লাগল। সবাই জোর হাসিতে ফেটে পড়ল। সেদিন কত রাত পর্যন্ত কত রকমের খেলা ও নাচগান চলতে লাগল। নির্মতাস্কিকে ভালুক সাজানো হলো। মেলেভাস্কি তাসের ম্যাজিক দেখালো। আমি এক সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের ছেলে হয়েও এই সব ক্রিয়াকাণ্ড কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমি বাড়িতে একা একা গম্ভীর পরিবেশে থাকি। তাই জিনাইদাদের বাড়িতে রাত পর্যন্ত অবাধে চলতে থাকা এই সব হৈ হুল্লোড়, নাচগান, উচ্ছৃঙ্খল আনন্দোচ্ছলতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। মদ খেয়ে নেশার ঘোরে মাতাল হয়ে উঠেছি আমি যেন।

সেদিন বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল আমার। আমি পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকে সোজা গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম কাউকে কিছু না বলে। তারপর গভীর রাতে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি নামল। আমার জীবনে সেদিন আমি প্রেম কি জিনিস তা প্রথম অনুভব করলাম। আমি বুঝলাম আমি জিনাইদাকে ভালবাসি। তার শান্ত সুন্দর মুখখানা ভাসতে লাগল আমার সামনে। তার ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসছিল এক রহস্যময় হাসি। সেই উজ্জ্বল প্রেমাবেগের আঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠছিল আমার সমস্ত অন্তর। বাইরের বিদ্যুতের এই মুহুর্মুহু চমকানি সেই আবেগের প্রতীকী প্রকাশ মাত্র।

পরদিন সকালে আমি চা খেতে নেমে এলে মা আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

কেন এত দেরী হয়েছে তা বলতে বললেন বারবার। আমি সংক্ষেপে এমনভাবে কৌশলে সব কথা বললাম যাতে আমার কোন দোষ ধরা না পড়ে।

আমি কিন্তু আমার বাবাকে গতকাল জাশকিনদের বাড়িতে সন্ধ্যার সময় যা যা ঘটেছিল সব খুলে বললাম। তিনি কিছুটা মনোযোগ সহকারে, কিছুটা অন্যমনস্কভাবে আমার কথা সব শুনলেন। দু একটা প্রশ্ন করলেন। আমি জিনাইদার নাম উল্লেখ করে তার জয়গান করতে লাগলাম।

শুনতে শুনতে বাবা হঠাৎ ঘোড়া বার করতে বলে ঘোড়ায় চেপে কোথায় চলে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলে তিনি বললেন তুমি একা একা যেতে পারো তোমার ঘোড়ায় করে।

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম আমার বাবা জাশকিনদের ঘরে ঢুকে আধ ঘন্টা থাকার পর বেরিয়ে এলেন। তারপর শহরের দিকে চলে গেলেন।

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর আমি নিজে জাশকিনদের বাড়ি গেলাম। বাইরের ঘরে রাজকুমারী একা বসেছিলেন। তিনি আমাকে একটা দরখাস্ত লিখে দেবার অনুরোধ করলে আমি তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এমন সময় পাশের ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হতে জিনাইদার বিষণ্ণম্লান মুখখানা দেখেতে পেলাম। তার মাথার চুলগুলো অযত্নের সঙ্গে আঁচড়ানো ছিল। সে তার বড় বড় চোখের হিমশীতল দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কোন কথা বলল না। রাজকুমারী তাকে ডাকলেন কয়েকবার। কিন্তু তাতেও কোন উত্তর দিল না। কথা বলল না।

সেদিন থেকে প্রেমানুভূতির আনন্দ আর বেদনার এক তীব্র অলোড়ণ শুরু হলো আমার মনে। আমি যতক্ষণ জিনাইদার কাছে থাকতাম প্রচুর আনন্দ পেতাম। কিন্তু যখন দূরে থাকতাম তার কাছ থেকে বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠত আমার মন। কোন কাজে মন বসাতে পারতাম না আমি। শুধু তার কথাই ভাবতাম।

ক্রমে জিনাইদাও জানতে পারল কথাটা। আমার এই ভালবাসার কথাটা কিছুমাত্র গোপন করলাম না আমি। তার প্রতি আমার প্রেমাতিশয্য দেখে সে মজা পেত, ঠাট্টা বিদ্রুপ করত এবং এক এক সম পীড়ন করত। জিনাইদা যেন আমাকে হাতের পুতুলের মত নাচাতে চাইত। একজন মানুষের পরম সুখ আর গভীরতম দুঃখের একমাত্র উৎস এবং অমোঘ অপরিবর্তনীয় কারণ আমিই শুধু ভালবাসতাম না জিনাইদাকে। তার কাছে যারা আসত, তারা সবাই প্রেম নিবেদন করত তার চরণে। সকলের প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি খেলত সে যেন। তাদের মধ্যে একই সঙ্গে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব জাগিয়ে আনন্দ পেত সে। তার কৃত্রিমতা আর সরলতা, প্রশান্তি আর প্রাণচঞ্চলতা, তার প্রতিটি কথাবার্তা আর গতিভঙ্গি সব মিলিয়ে দ্বন্দ্ববিধুর আবেগের আলোছায়ার এক ক্রীড়া চঞ্চলতা সৃষ্টি করত তার মুখচোখের উপর। বেভেজোরভ, কবি ময়সানভ, ডাক্তার

লুশিন, কাউন্ট মেলেভস্কি প্রভৃতি প্রতিটি গুণমুগ্ধ ভক্তকে প্রয়োজন ছিল তার।

এদের মধ্যে কেউ যদি জিনাইদার বেশী অনুগ্রহ লাভের চেষ্টায় তার পাশে ঘোরাঘুরি করত অথবা তার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তার কানে কানে কোন কথা ফিস ফিস করে বলত তাহলে তা দেখে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠত। একদিন কাউন্ট মেলেভস্কি এইরকম করলে আমি জিনাইদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কাউন্টকে অত পাত্তা দাও কেন?

জিনাইদা তার উত্তরে ঠাট্টা করে বলল, ওর ছোট গোঁফটা বড় ভাল।

একদিন জিনাইদার কাছ থেকে একটা কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। তার হাতে মুখ ঢেকে বলল সে, এই সব কিছু আর সহ্য করতে পারছি না আমি। আমি এই সব কিছু ছেড়ে পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে চলে যেতে চাই। আমার ভাগ্যে কি আছে কে জানে? আমার মত অসুখী আর কেউ নেই।

আমি কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু কেন?

জিনাইদা কোন উত্তর দিল না।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। যতই দিন যেতে লাগল ততই যে যেন অপরিচিত হয়ে উঠতে লাগল আমার কাছে। ততই সে দুর্বোধ্য হতে উঠতে লাগল।

একদিন তার ঘরে গিয়ে দেখলাম সে একটা চেয়ারে বসে আছে। সে সোজা হয়ে উঠে বসলে দেখলাম তার গালদুটো চোখের জলে ভিজে গেছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই কাছে ডাকল আমাকে।

আমি কাছে যেতেই আমার মাথায় হাত দিয়ে একগোছা চুল ধরে ফেলল। আমি বললাম, আমার মাথায় লাগছে।

এরপর সে একটা চুল ছিঁড়ে তার আঙ্গুলে পড়িয়ে নিল।

সে বলল, আমি তোমার এই চুলটা আমার লকেটে ভরে রেখে সেই লকেটটা পরব। তাহলে তোমার তুমি কিছুটা হয়ত সান্ত্বনা পাবে।

তার চোখে জল চকচক করছিল।

সেদিন আমি বাড়ি ফিরে দেখলাম, কি একটা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল বাবা মার মধ্যে। মা আমার বাবাকে কি একটা বিষয়ে তিরস্কার করছিলেন এবং আমার বাবা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত কণ্ঠে মাকে বুঝিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবা চলে গেলেন।

বাবা চলে গেলে মা আমাকে বারবার রাজকুমারীদের বাড়ি যাওয়ার জন্য তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। আমি নীরবে তাঁর সব কথা মেনে নিলাম।

জিনাইদার চোখের জল দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই। আমি বুঝতে পারলাম এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে জিনাইদার জীবনে। সে আজকাল প্রায়ই একা একা

বেরোয়। এক একদিন অতিথিদের সামনে বার হয় না। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে।

একদিন আমি রাস্তার ধারে একটি পাঁচিলের উপর বসেছিলাম। এমন সময় সেই পথে জিনাইদা কোথায় যাচ্ছিল।

জিনাইদা আমাকে দেখেই বলল, ওখানে কি করছ। তুমি ত বল তুমি আমাকে ভালবাস। আমাকে যদি সত্যিই ভালবাস তাহলে পাঁচিল থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়।

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতে আমি লাফ দিলাম পথে। পাঁচিলটা ছিল চোদ্দ ফুট উঁচু। হঠাৎ লাফ দেওয়ায় যে আঘাত লাগল তাতে আমি অচেতন হয়ে শুয়ে পড়লাম মাটিতে।

স্নেহশীল কণ্ঠে আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল জিনাইদা। বলল, কেন তুমি এ কাজ করলে? কেন তুমি আমার কথা শুনলে পাগল কোথাকার?

এই বলে সে আমার মুখের উপর বার বার চুম্বন করতে লাগল। তার ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করল।

আমার চেতনা তখন সম্পূর্ণ হারায়নি। সে বলল, উঠে পড়। এ ধরনের বোকামি আর কারো না।

এই সময় আমার মা আমাদের দেশের বাড়ি ছেড়ে শহরের বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য জেদ ধরেন। আমাদের যাওয়ার সব কিছু ঠিক হয়ে যায়।

আমাদের শহরে চলে যাওয়ার কথাটা জানাবার জন্য আমি একদিন জিনাইদাদের বাড়িতে গেলাম। রাজকুমারী বাইরের ঘরে বসেছিলেন। উদাসীনভাবে অভ্যর্থনা জানালেন আমায়। আমার গলার আওয়াজে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল জিনাইদা। এসে বলল, তোমরা কত নিষ্ঠুর পুরুষ, আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

আমি বললাম, শুনেছ হয়ত আমরা শহরে চলে যাচ্ছি চিরদিনের মত।

তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে আমার মুখপানে তাকাল জিনাইদা। বলল, হ্যাঁ শুনেছি। তবু একবার এসেছ বলে তোমায় ধন্যবাদ। যতটা সম্ভব সহানুভূতির সঙ্গে আমার কথা মনে করো। আমি তোমাকে অনেক সময় অনেক কষ্ট দিয়েছি। তবে তোমরা আমাকে যা ভাব আমি তা নই। আমার সম্বন্ধে তোমার একটা ভুল ধারণা আছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আমার ! কি বলছ? তুমি আমাকে যত কষ্টই দাও, আমি তোমাকে চিরদিন ভালবেসে যাব, চিরদিন শ্রদ্ধা করে যাব।

সহসা সে দুহাত বাড়িয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে আবেগের সঙ্গে চুম্বন করতে লাগল। আমাদের বিদায়কালে এই দীর্ঘনিবিড় চুম্বনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু না বুঝলেও সে চুম্বনের সব মাধুর্যটুকু উপভোগ করতে লাগলাম আমি। মনে হলো, এ মাধুর্যের আস্বাদ না পেলে জীবনের বড় রকমের একটা জিনিস

হারাতাম আমি।

এই দীর্ঘ চুম্বন ও আলিঙ্গন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বেঁরিয়ে গেল জিনাইদা। আমিও বাড়ি ফিরে এলাম।

আমরা শহরের বাড়িতে চলে গেলাম। কিন্তু অসংখ্য স্মৃতিবিজড়িত আমার অতীত জীবনকে আমি মুছে ফেলতে পারলাম না সহজে।

রোজ বাবা একবার তাঁর বড় ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাওয়ার একটা অভ্যাস ছিল।

সেদিন বাবা ঘোড়ায় চড়ে বার হবার সময় আমি বললাম, আমিও সঙ্গে যাব।

তিনি বললেন, তোমার ছোট ঘোড়াটা আমার ঘোড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না।

তবু আমি ছাড়লাম না। আমরা একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁর ঘোড়াটার নাম ছিল ইলেক্‌ট্রিক। বিদ্যুতের মতই গতিবেগ ছিল তার।

সহসা স্তূপীকৃত কাঠের এক গাদার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে আমাকেও নামতে বললেন। তিনি তাঁর ঘোড়ার লাগামটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, এইখানে অপেক্ষা করো। আমি এক জায়গা থেকে আসছি।

এই বলে তিনি পাশের একটা গলিপথ দিয়ে চলে গেলেন। তিনি কোথায় যান তা দেখার জন্য কৌতুহলবশে ঘোড়াদুটোয় লাগাম ধরে এগিয়ে গেলাম কিছুটা। আমি দেখলাম, আমার থেকে কিছুদূরে একটা কাঠের বাড়ির জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পড়লেন বাবা। আমার দিকে পিছন ফিরেছিলেন তিনি। তিনি জানালার গরাদের উপর ঝুঁকে ছিলেন আর জানালার ভিতর দিকে পর্দার আড়ালে কালো পোশাক পরা একটি মেয়ে কথা বলছিল বাবার সঙ্গে। পরক্ষণেই বুঝলাম মেয়েটি হলো জিনাইদা।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে হতবাক ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম আমি। ভাবলাম আমি ফিরে যাব। কিন্তু কৌতুহলের থেকে বড়, ঈর্ষার থেকে বড়, সমস্ত ভয়ের থেকে বড় এক অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে রাখল এমনভাবে যে আমি স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। পাদুটো তুলে যেতে পারলাম না কোথাও।

আমার বাবার কথাগুলো শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি। কিন্তু কথাগুলো ঠিক শুনতে পেলাম না। তবে বুঝলাম কি ব্যাপারে তিনি জেদ ধরেছিলেন, কিন্তু তাতে সম্মত হচ্ছে না জিনাইদা। আমি দেখলাম, জিনাইদার বিষন্ন সুন্দর মুখখানার উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, দুঃখ, বিষাদ ও হতাশার মিশ্রণে গড়া এক বিচিত্র অনুভূতির ভাব ফুটে উঠেছিল। তার কথার মধ্যে বিনয় এবং দৃঢ়তা দুটোই ছিল।

একসময় জিনাইদা জানালা দিয়ে তার একটা অনাবৃত হাত বাড়াতেই বাবা চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন তাতে।

জিনাইদা কোন কথা বলল না। নীরবে সে তার হাতটা তুলে আঘাতের জায়গাটা চুম্বন করল। আমার বাবা তখন হাত থেকে চাবুকটা ফেলে দিয়ে সেই বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন। জিনাইদা জানালা থেকে সরে গিয়ে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল আমার বাবার দিকে।

এবার পিছিয়ে এলাম আমি। এক বেদনার্ত বিস্ময়ের আঘাতে অভিভূত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে উঠলাম আমি। আমার সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেল। আমার কেবলি মনে হতে লাগল জিনাইদার আজ যে নতুন রূপ দেখলাম, তার সুন্দর মুখের বিষণ্ণ হাসি আমি কখনো ভুলতে পারব না।

নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। আমার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছিল। বাইরের জগতের কোন চেতনাই যেন ছিল না আমার। আমার মুখ থেকে শুধু একটা কথাই বেরিয়ে আসছিল, বাবা তাকে মারল....তাকে মেরেছে।

এমন সময় বাবা ফিরে এসে তাঁর ঘোড়ার উপর চড়লেন। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। সেদিন তিনি ঘরে ফেরার কিছুক্ষণ পর আমি বাড়ি ফিরি।

দেখতে দেখতে বছর তিন চার কেটে গেল। আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। একদিন বিকালের দিকে একটা থিয়েটারে গিয়ে কবি ময়সানভের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। তার বিয়ে হয়ে গেছে এবং যে একটা সরকারী অফিসে কাজ করে।

হঠাৎ সে বলে উঠল, জান মাদাম ভলস্কায়া এখানে আছে?

আমি বললাম, মাদাম ভলস্কায়া কে?

সেকি, তুমি রাজকুমারীর মেয়ে জিনাইদার কথা ভুলে গেছ—তুমি সমেত আমরা সবাই একদিন যার প্রেমে পড়েছিলাম?

ভলস্কায়া নামে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার?

হ্যাঁ।

সে কি এই থিয়েটারে এসেছে?

না, এই পিটার্সবার্গে এসেছে। এখান থেকে বিদেশে কোথাও যাবে। তার সঙ্গে একবার দেখা করো। খুব খুশী হবে।

ময়সানভের কাছ থেকে ঠিকানা পেলাম জিনাইদার। দেখুখ হোটেলে ছিল সে। ঠিকানা হাতে নিয়ে হোটেলে গিয়ে শুনলাম মাদাম ভলস্কায়া সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যান।

কম্পিত পায়ে হোটেল থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। 'মৃত' এই কথাটা বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আমার কানের মধ্যে। আমার সমগ্র অতীত অসংখ্য

স্মৃতির চাবুক হয়ে আঘাত করতে লাগল আমায় বারবার।

আমার বাবাও তার আগেই মারা গেছেন। হয়ত আমার বাবার সমাধি থেকে কিছু দূরে সমাহিত হয়ে আছে জিনাইদা।

আমি তখন জিনাইদার উদ্দেশ্যে স্বপ্নাবিষ্টের মত বলতে লাগলাম, হে উদ্ধত যৌবন, এক অপরিসীম ঔদ্ধত্যে বিশ্বের সব সম্পদ লাভ করতে চাও তুমি, অথচ তাতে ব্যর্থ হলেও সে ব্যর্থতার কোন দুঃখকেই গ্রাহ্য করো না তুমি। হে আত্মবিশ্বাসী, আত্মম্ভরী যৌবন! দেখ, আমি এখনো বেঁচে আছি। অথচ তুমি অভিশপ্ত মোমের পুতুলের মত সূর্যালোকতপ্ত বরফের মত গলে গেছ, তোমার অতীত সুখের পাখিগুলি আজ সব উড়ে গেছে একে একে। হে যৌবন, তোমার সকল সৌন্দর্য, তোমার ইচ্ছামত সব কিছু লাভ করার বা জয় করার সামর্থ্যের মধ্যে নিহিত নেই, নিজস্ব এমন কিছু নেই যা তুমি লাভ করতে বা জয় করতে পার না—এই বিশ্বাসের মধ্যেই তোমার সকল সৌন্দর্যের সার।

মূল গল্প □ ফার্স্ট লাভ

এডগার অ্যালান পো

জন্ম ১৮০৯, মৃত্যু ১৮৪৯। শার্ল বোদলেয়ার পোর গল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন—'তাঁর প্রত্যেকটি গল্পের প্রথম প্যারাগ্রাফ ঘূর্ণির মত পাঠককে আকর্ষণ করে, গভীরে টেনে নিয়ে যায় এবং একটা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে পাঠক লেখককে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। এই কল্পনার জগতে দৃষ্টিভ্রম একান্তই স্বাভাবিক মনে হয়, অবাস্তবতা ভয়ংকর ও নিখুঁত যুক্তিতে মনকে নিয়ন্ত্রন করে এবং গল্পে আতঙ্কিত ও বিষণ্ন মানুষকে দেখানো হয় বেগুনী বা সবুজ পটভূমিতে, যেখানে অবক্ষয়ের ফসফরাস শীতল আলো জ্বলে ও ঝোড়ো হাওয়ার ঘ্রাণ ভেসে আসে। এইভাবে পোর গল্পে প্রকৃতিও জীবন্ত হয়ে ওঠেএবং অতি প্রাকৃতিক আতঙ্কে কাঁপে।' কবি পল ভ্যালেরী ১৮৯৯-এ আঁদ্রে জিদকে লেখা এক চিঠিতে লিখেছেন—'পো এমনই একজন অসাধারণ লেখক, যে কখনও ভুল করেনি।' পো'র কবরে যে প্রস্তরফলক ঠাঁই পায় তাঁর মৃত্যুর ২৬ বৎসর পরে, সেখানে উৎকীর্ণ হয় কবি মালার্মের কবিতা। বস্তুতঃ ফরাসী সাহিত্যে উত্তরকালের সিম্বলিজম্ ও সুর-রীয়েলিজমের এক প্রধান প্রেরণা ছিল পোর গল্প কবিতা এবং বোদলেয়ার, মালার্মে ও ভ্যালেরীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। যখন কবি টি, এস, এলিয়ট মারফৎ অ্যামেরিকান সাহিত্যে পাঠক ও সমালোচকের কাছে এসে পৌঁছোয়, তখন পো'র মৃত্যুর অনেক পরে অ্যামেরিকা তার শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যিককে চিনতে পারে। বিষণ্ণ এক দুঃস্বপ্নের মত ছিল তাঁর জীবন, মূর্খ সমকাল তাঁকে চেনেনি, তবু আজ তিনি কালজয়ী।



প্রেমিক যখন শিল্পী

এডগার অ্যালান পো

রাতটা খোলা হাওয়ায় কাটাতে হবে দেখে আমার পরিচারক সম্ভ্রান্ত ও পরিত্যক্ত এক পল্লীনিবাসে জোর করে ঢুকলো। আমার আঘাত গুরুতর ছিল, তাই আমি খোলা হাওয়ায় রাত কাটাই, আমার পরিচালক তা চায়নি। শ্রীমতি অ্যান র‍্যাডক্লিফের ইতালিয়ান পটভূমির গথিক উপন্যাসে যেমন, এই সম্ভ্রান্ত প্রাচীন পল্লীনিবাসের ভেতরেও তেমনি বিষাদ ও সমৃদ্ধির আশ্চর্য্য মিলন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কেউ যেন খুব সম্প্রতি এবং অল্পদিনের জন্যে এই পল্লীনিবাস ছেড়ে গেছে। পল্লীনিবাসের এক কোনে ছোট্ট বুরুজের ভেতরে অপেক্ষাকৃত জাঁকজমকহীন একটা ঘরে আমরা আশ্রয় নিলাম। গৃহসজ্জা দামী, তবে পুরোনো ও ছোঁড়াখোঁড়া। দেয়ালে ঝুলছে বুটিদার পর্দা, নানা ধরণের নানা আকারের বংশমর্য্যাদাজ্ঞাপক চিহ্ন এবং অপ্রত্যাশিত সংখ্যায় অনেক সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো অতি আধুনিক পেইন্টিং। শুধু দেওয়ালে নয়, পুরোনো ধরণের স্থাপর্ত্যের দরুণ দেয়ালের যে অগণিত আনাচকানাচ, সেখানেও পেইন্টিং ঝুলছে। হয়তো আমি অসুস্থতাজনিত মানসিক বিভ্রমে ভুগছিলাম হয়তো সেই কারণেই অতি আধুনিক চিত্রকলার এইসব নিদর্শন আমায় উৎসাহ জাগালো। তাই আমি আমার পরিচারক পেড্রোকে বললাম, জানলার ভারী শাটারগুলো বন্ধ করে দাও (কেননা রাত নেমেছে), আমার খাটের মাথার কাছে লম্বা বাতিদানের আলোগুলো জ্বালো এবং বিছানার চারপাশের কালো মখমলের ভারী পর্দাগুলো সরিয়ে দাও। আমার উদ্দেশ্য ছিল, খাটে শোয়া, ঘুমোনো সম্ভব না হলে ওই ছবিগুলো দেখা এবং বিছানার বালিসের পাশে ওই পেইন্টিংগুলোর বর্ণনা ও সমালোচনা-সংক্রান্ত যে ছোট্ট বইটা পেয়েছি, সেটা পড়া। অনেক রাত অবধি বই পড়লাম। নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে ছবিগুলো দেখলাম। দ্রুত ছুটে যাচ্ছে সুন্দর সময়। গভীর মধ্যরাত আসে। আলোর জন্যে অসুবিধে হচ্ছিল।

ঘুমন্ত পরিচারককে না জাগিয়ে. কোনমতে হাত বাড়িয়ে বাতিদানটার জায়গা বদল করলাম, যেন আলোয় বই পড়তে সুবিধে হয়।

ফলটা হল অপ্রত্যাশিত। বাতিদানের অজস্র মোমবাতির আলো ঘরের এমন এটা কোণে পড়লো যা বেডপোষ্টের ছায়ার দরুণ এতোক্ষণ দৃষ্টির আড়ালে ছিল। এখন সৃষ্ট আলোয় দেখা গেল একটা পেইন্টিং এতোক্ষণ যা আমার চোখের আড়ালে ছিল। দেখলাম, একটা পোট্রেট। এক তরুণী, যে সদ্য যৌবনে পা দিয়েছে, তার ছবি। এক লহমা ছবিটা দেখেই আমি চোখ বন্ধ করলাম। কেন বন্ধ করলাম, তাই ভাবছিলাম। যেন কিছু ভাববার সময় পাওয়ার জন্য, এখন আমার দৃষ্টি যে আমার সঙ্গে বঞ্চনা করেনি সে বিষয়ে মন নিশ্চিন্ত হবার জন্যে এবং আমার উত্তেজিত কল্পনাকে শান্ত করার জন্যে, যেন ঠাণ্ডা মেজাজে ও শান্ত চোখে ছবিটা দেখতে পাই—এসবের জন্যেই হঠাৎ আমি চোখ বন্ধ করেছিলাম। একটু পরে আমি স্থির চোখে পেইন্টিংটা দেখি।

এবার আমি যা দেখছি, তাতে কোন ভুল নেই। ক্যানভাসে প্রথম আলো পড়তে মনে হয়েছিল, আমার স্নায়ুর ওপরে যে স্বপ্নের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে, তা কেটে গিয়ে আমি জাগতিক জীবনের বাস্তবতার মাঝখানে চমকে উঠেছি।

পোট্রেটটা এক সদ্যযুবতীর। শুধু মাথা আর কাঁধ। অ্যামেরিকান শিল্পী টমাস সালী যে ষ্টাইলে পোট্রেট আঁকেন, টেকনিকের দিক থেকে তার সঙ্গে মিল আছে। হাত, বুক এবং ঝকমকে চুলের প্রান্ত যেন প্রায় অদৃশ্যভাবে মিশে যাচ্ছে পটভূমির অনির্দেশ অথচ গভীর ছায়ায়। ফ্রেমের আকার ডিমের মত, ঠিক গোল নয়, কিছুটা চ্যাপ্টা। গিল্টিও ফিলিগ্রি করা দামী ফ্রেম। শিল্পকলার নিদর্শন হিসেবে পেইন্টিংটা অতুলনীয়। কিন্তু শিল্পকলার নৈপুণ্য বা রমনীর মুখের কালজয়ী সৌন্দর্য্য এতো আকস্মিকভাবে এতো প্রচণ্ডভাবে আমার মনের মধ্যে আলোড়ন জাগায়নি। আধোঘুমের ভেতর থেকে জেগে উঠে আমার কল্পনা ভেবেছিল, সে যেন জীবন্ত মানুষের মুখ দেখেছে। অথচ অদ্ভুদ ধরণ এবং ফ্রেমের আকারের দরুণ এক লহমার জন্যেও এরকম ভুল হওয়ার কথা নয়।প্রায় এক ঘন্টা আধবসা আধশোয়া অবস্থা পেইন্টিংটা দেখতে দেখতে এসব কথাই ভাবলাম। তারপর শ্রদ্ধা-মেশানো আতঙ্ক জড়ানো অনুভূতি নিয়ে আমি বাতিদানটা আগের জায়গায় সরিয়ে রাখলাম। আমি বুঝেছি, পেইন্টিংটা সম্মোহন জাগায়, কারণ পেইন্টিং-এর রমনীর মুখভঙ্গী জীবিত রমনীর মত—প্রথমে বিস্ময় জাগায়, তারপর অভিভূত ও স্তম্ভিত করে।

এখন পেইন্টিংটা আমার দৃষ্টিপথের বাইরে। যে বইটাতে বিভিন্ন পেইন্টিং ও তাদের ইতিহাস লেখা আছে, সেটার পাতা উল্টে ডিমের আকারের পোট্রেট-সংক্রান্ত পাতা বার করে এই অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য কথাগুলো আমি পড়ি—

অপরূপ রূপসী ছিল সেই কুমারী। সৌন্দর্য্যের চেয়েও বেশী ছিল তার আনন্দের উচ্ছ্বাস। অশুভ সেই মুহূর্তে, যখন এই রূপসী শিল্পীকে দেখলো, ভালবাসলো ও

বিয়ে করলো। কেননা সেই পুরুষ উগ্র, কঠোর, উত্তেজিত, চিন্তাশীল। কেননা সেই পুরুষের আর এক প্রেয়সী তার শিল্পকলা।

এবং সেই যুবতী রূপে অপরূপা, সৌন্দর্য্যের চেয়েও বেশী ছিল তার আনন্দের উচ্ছ্বাস। শুধু আলো আর হাসি আর তরুণী হরিণীর মত চঞ্চলতা। শুধু ভালোবাসা, সব কিছুকে প্রিয় ভেবে হৃদয়ে ঠাঁই দেওয়া। শুধু সেই শিল্পকলাকে ঘৃণা করা, যে তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। শুধু চিত্রকরের রংদানি ও তুলিকে ভয় পাওয়া, যারা তার প্রেমিকের মুখকে আড়াল করে রাখে।

সুতরাং শিল্পী যখন বললো, সে তার নববিবাহিত বধূর পোর্ট্রেট আঁকবে, সে ভয় পেলো। কিন্তু সে ছিল বিনীত ও স্বামীর বশীভূত। সুতরাং স্বামীর কথামত সে ছোট্ট বুরুচের ভেতরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সিটিং দিয়েছে। সেখানে মাথার ওপর থেকে ম্লান অলো এসে পড়ে ক্যানভাসের ওপর। ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন ছবিটা আঁকে শিল্পী। সে শুধু নিজের শিল্পকলার কথাই ভাবে। সে স্বভাবে উগ্র, বন্য ও খেয়ালী। সে স্বপ্নের দুনিয়ায় বাস করে। সে দেখেনা, দেখতে পায়না যে নিঃসঙ্গ বুরুজের ভেতরে ম্লান অলোয় শুকিয়ে যাচ্ছে তার নববিবাহিতা বধূর দেহমন। যে বধূ তার বরণে একান্ত আপন করে পেতে চায়।

তবু বধূ হাসে। কোন অভিযোগ করে না। কেননা সে দেখছে যে খ্যাতনামা সেই শিল্পী তার কাজে তীব্র ও চূড়ান্ত এক আনন্দের স্পর্শ খুঁজে পায়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সে ক্যানভাসের বুকে ফুটিয়ে তোলে সেই প্রেয়সীর ছবি, যে রমনী দিনের পর দিন দুর্বল ও নিরানন্দ হয়ে পড়েছে।

এবং পোর্ট্রেটটা দেখলে নীচু গলায় দর্শক বলতো, ছবিটা জীবনের মত, বিস্ময়কর, শিল্পীর ক্ষমতা ও প্রেয়সীর জন্যে তার ভালোবাসার প্রমাণ। কিন্তু ছবি আঁকা যখন প্রায় শেষ হয়ে এলো তখন আর কাউকে বুরুজের ঘরে ঢুকতে দেওয়া হতো না। কারণ কাজের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে শিল্পী। সে আর ক্যানভাস থেকে মুখ ফিরিয়ে স্ত্রীর মুখও দেখে না। সে দেখে না, দেখতে পায়না যে ক্যানভাসে সে রঙ আঁকছে, অন্যদিকে তার বধূর মুখ থেকে সব রঙ ঝরে যাচ্ছে, যেন বধূর মুখের রঙেই আঁকা হয় ক্যানভাসের ছবি। ...অনেক সপ্তাহ কেটে যায়। ছবিটা প্রায় শেষ। শুধু মুখ আর চোখ আঁকার জন্যে তুলির দুটো টান বাকী। শেষবার নিভে যাওয়ার আগে বাড়ির আলো যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি শেষবার জ্বলে ওঠে রমণীর জীবনের শিখা। তুলি তার কাজ করে। রঙ আঁকা হয়। এবং মুহূর্তের জন্যে শিল্পী তার সৃষ্টির সামনে দাঁড়ায়। পরমুহূর্তে সে কেঁপে ওঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ভয়ে বিহ্বল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—

'এই তো জীবন!'

তারপর সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তার প্রেয়সীর দিকে তাকায়। তার প্রেয়সী...

মরে গেছে!

মূল গল্প □ দ্য ওভ্যাল্ পোর্ট্রেট

আলবার্তো মোরাভিয়া

আধুনিক ইতালীর সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার পটভূমি রোম এবং রোম্যান্ প্রলেতারিয়েতের জীবনের ছবি—ঈর্ষা, ঘৃণা, অবিশ্বাস, ভালোবাসা—ভিত্তোরিও দি সিকার ফিল্মে যেমন, মোরাভিয়ার রচনাতেও তেমনি একটি শিল্পসম্মত রূপ নিয়েছে। রঙ্গ-রসিকতা ও জীবনের হাল্কা দিকটা সম্বন্ধে সচেতনতা, কলমের স্বল্প দু'একটি আঁচড়ে কোন ঘটনা বা কোন মনোভাব বর্ণনা করার দুরূহ ক্ষমতা এবং মানুষের হীনতা ও ঈর্ষাপরায়নতার বাস্তবসম্মত ছবি আঁকার সাহস—এসবই মোরাভিয়ার রচনার বৈশিষ্ট্য। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসঃ 'এ গোষ্ট অ্যাট নুন', 'দ্য এম্‌টি ক্যানভ্যাস', 'দ্য উওম্যান অফ রোম।' শ্রেষ্ঠ বড় গল্পঃ 'বিটার হনিমুন।' ও 'ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি'। ছোট গল্পের সংকলনঃ 'রোম্যান টেলস্' এবং 'মোর রোম্যান টেলস'। বর্তমান গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯-এ। ন্যুইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ-এর সমালাচনামতে, এটি মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প।



কখনো প্রেয়সী কখনো জননী

আলবার্তো মোরাভিয়া

বেশ কয়েক বছর ধরে ঠিক হয়ে আছে, আমার ও পিয়ার বিয়ে হবে। বিয়েটা এতোদিন হয়নি। তার কারণ, আমি আমার বাবার হার্ডওয়েরের দোকানে কাজ করলেও আমার পকেটে পয়সা নেই। এবং আমার বাগদত্তা বান্ধবী পিয়া ওর মায়ের মত নার্স হবে বলে পড়াশোন করছে বটে, তবে নার্সের ইউনিফর্ম ছাড়া আর কিছুই ও পায়নি। দু'বছর ধরে এনগেজমেন্ট চলেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, দু'বছর ধরে চলেছে কথা কাটাকাটি আর ঝগড়াঝাঁটি।

প্রশ্ন হলো, বিয়ের পর আমরা থাকবো কোথায়? ইচ্ছে করলে আমরা আমাদের মা-বাবার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে থাকতে পারি। মা-বাবার তাতে আপত্তি নেই। আপত্তি পিয়ার। সে আমার মাকে পছন্দ করে না।

পিয়ার মায়ের বাড়ীটাও বেশ বড়। অনায়াসে আমরা ওখানে থাকতে পারি। কিন্তু পিয়ার মায়ের বয়স বেশী না, সে নিজের মত করে বাঁচতে চায় এবং সে জামাইয়ের সংসার নিয়ে বিব্রত হতে চায়না। একদিন বোরঘীজ গার্ডেনে পিয়াকে আমি একটা যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব দিলাম—

'শোনো, তুমি আমার মাকে সহ্য করতে পারো না। কিন্তু আমি তো সারা জীবন আমার মায়ের সঙ্গে থাকতে বলছি না। আগে বিয়ে করে ফেলা যাক এবং আপাততঃ তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাকো। তারপর কিসের থেকে কি হয়—'

'কিসের থেকে কি হয়?'

পিয়া লাফিয়ে ওঠে।

'নিশ্চয়ই হয়। তোমার এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হলো।'

এই বলে আমার হাত থেকে নিজের হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে পিনসিও-র টেরাসের দিকে ছোটে পিয়া।

আমি ওর পেছন পেছন ছুটি।

বলি—'পিয়া, দাঁড়াও, করছো কী?'

পিয়াকে আর একটু হলে ধরে ফেলতাম। হঠাৎ পিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পুলিশম্যানের দিকে চেঁচিয়ে ওঠে, ঠিক যেন একটা কেউটে সাপ—

'এই লোকটাকে বলো, ও যেন আমাকে একা থাকতে দেয়। সারা সকাল ও আমার পেছনে ধাওয়া করছে।'

আমি তো অবাক। পুলিশ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—

'তোমার কাগজপত্র দেখি, ছোকরা।

আমি পকেট থেকে আইডেনটি কার্ড বার করি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বাধ্য হয়ে। এদিকে পিয়া ছুটে পালায়।

সেইদিনই আমি পিয়ার বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলাম। পিয়া বাড়ী নেই। টেলিফোন করলাম। পিয়া কোনো কথা বললো না। এক্সপ্রেস পোষ্টে চিঠি দিলাম। পিয়া জবাব দিল না। পিয়ার সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিঁড়ে যাওয়ায় হঠাৎ আমার মনে হল, আমার অস্তিত্বের একটা অংশ যেন হারিয়ে গেছে, যে অংশটা আমার নিঃশ্বাস নিতে, খেতে, ঘুমোতে, কাজ করতে, বেঁচে থাকতে দেয়, সেই অংশটাই হারিয়ে ফেলেছি আমি। আমার এতো কষ্ট হচ্ছিল যা ভাষায় বলা যায়না। কিছুতেই দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিলাম না। আমার শরীরের প্রত্যেকটা পেশীতে প্রতিটি স্নায়ুতে যন্ত্রণা হচ্ছিল। মাঝেমাঝে ঘরে একা বসে টেবিলে দুহাতে মাথা গুঁজে আমি অকারণে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম। বাইরে বেরোলে নীল আকাশ আমার চোখে কালো দেখায়, সূর্য্যও যেন কালো, হলদে সাদা বাড়ীগুলো এবং বসন্তের নতুন সবুজ পাতায় ঢাকা গাছগুলোও কালো দেখাচ্ছে! খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মুখের প্রথম গ্রাস গলায় আটকে যায় আমার! ঘুমুতেও পারি না। একটু ঝিম ধরলেই হঠাৎ চমকে জেগে উঠি, চোখ খুলে পিয়ার কথা ভাবি।

একদিন বড্ড খারাপ লাগছিল। রোজকার থেকেও খারাপ। আমার শরীরের মাংসপেশীগুলো ভাওলিনের তারের মত বাজছিল। ভায়া অস্‌টিয়েনসেতে, পিয়া যেখানে থাকে, তারই কাছাকাছি একটা বারে ঢুকলাম আমি। তখন সকালবেলা। বারে একজন মহিলা ছাড়া কেউ নেই, দরজার দিকে পিঠ করে কাউন্টারে কনুই রেখে সে কফি খাচ্ছে। তাকে দেখেই আমি ভাবি, এই তো পিয়া। কেন না তার মাথার চকচকে কালো চুল ছোট করে ছাটা এবং ঘাড়ের পেছনে দু-একটা উঁচিয়ে আছে। পিয়ার মাথার

চুল ঠিক এইরকম। এইতো পিয়া, কথাটা ভাবতেই আমার শরীর শিথিল হয়ে যায় এবং সন্ত্রস্ত কোন জন্তুর মত আমার নিঃশ্বাস এতোক্ষণ ফুসফুসের প্রান্তে লুকিয়ে থাকলেও হঠাৎ শান্ত ও সহজ হয়ে যায়, আমার বুক হাওয়ার ভরে যায়।

'পিযা!'—আমি বলি।

মেয়েটি ফিরে তাকায়। আমি আমার ভুল বুঝতে পারি। পিযা নয়, পিয়ার মা, যে পিযার ষ্টাইলেই মাথার চুল ছাঁটে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ওকে পিয়া বলে যখন ভুল করছিলাম, তখনকারই মত স্বস্তি আমার মনে, আমার পেশীতে ব্যথা নেই, নিঃশ্বাস সহজ ও হাল্কা। আমায় চিনতে পাবে পিয়ার মা, বলে—

'না, না, বেচারা গিউসটিনো, আমি পিয়া নই, পিয়ার মা।'

আমি ওকে অভিবাদন জানাই, নানা কথা হয়, তারপর আমি ওর দিকে এমন মনোযোগের সঙ্গে তাকাই যেভাবে আমি ওকে কখনও দেখিনি।

পিযার মাকে দেখতে ঠিক পিয়ার মত। সেই একরকম কালো চুল ছোট করে ছাটা। তেমনি উজ্জ্বল, বড় বড় চোখ। চোখের ভুরুদুটো তেমনি উঁচু ও পাতলা, ছোট্ট নাকের ডগাটা হুকের মত, মুখের কোনটা পিয়ার মতই সামান্য ঢেউ খেলানো। তফাতের মধ্যে, পিয়ার বয়স কুড়ি, ওর মায়ের চল্লিশ। আমি যেন পিয়ার মায়ের মুখের মধ্যে খুঁজে পাই মেয়ের মুখ আরও বড়, শিথিল, একটু ফোলাফোলা, মুখের রেখাগুলো অস্পষ্ট। তবু পিয়ার মায়ের দিকে তাকালে মনে হয় যেন আমি পিয়াকেই দেখছি। আমার ভালো লাগে। মনে হয় যেন পিয়াই আমার সামনে, যেন আমার প্রতীক্ষার শেষ হয়েছে।

মেয়েরা এসব ব্যাপারে বড্ড সচেতন। পিয়ার মা বুঝতে পারে, আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। সে হেসে বলে—'গিউসটিনো, তোমার কাজ আছে নাকি?' পিয়ার মায়েব গলার স্বরও পিয়ার মত, তবে আরও নরম।

'কিছু না। কিচ্ছু করছিনা?'

সহানুভূতিমেশানো গলায় ও বলে—

'তোমার শরীরটা ভেঙে পড়ছে।'

কফি শেষ করে আমার সঙ্গে বার থেকে বেরিয়ে এসে ও বলে—'গিউসটিনো, পিয়াকে তুমি বরং ছেড়ে দাও। ও ঘর চায়, তুমি তা দিতে পারবেনা। তোমার বাড়ীতে ও যেতে চায় না। সত্যি কথা বলতে কি, তোমরা দুজন বিয়ে করে আমার বাড়ী ওঠো, তাও আমি চাই না। আরও অনেক কারণ আছে। তাই বলছি, পিয়াকে তুমি ছেড়ে দাও।'

আমি বলি—'হ্যাঁ, ওকে আমি ছেড়েই দিয়েছি', তারপর হঠাৎ, প্রস্তাবটা অদ্ভুত লাগবে বলে একটু ইতস্তত করে বলি, 'আজ সন্ধ্যায় আমরা ডিনার খেলে কেমন

হয়?'

ও একটু অবাক হয়ে বলে— 'আমি আনন্দের সঙ্গে রাজী হব। কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি, যদি পিয়ার ব্যাপারে কথা বলার জন্যে সুযোগ চাও, তাতে লাভ নেই। কি লাভ বলো? তুমি একজন মানুষ, আমি আর একজন। আমাদের আলাদা জীবন আছে।'

আমি সততার সঙ্গে বলি—

'না, পিয়ার সম্বন্ধে কথা বলবো বলে নয়। তোমার সঙ্গ পাবো বলে।'

আবার অবাক হয়ে আমার দিকে চায় পিয়ার মা। তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়। সন্ধ্যাবেলা ভিয়া অসটিয়েনসের যেখানে এর বাড়ী, তার উল্টোদিকের একটা রেস্তোরাঁয় আমাদের দেখা হবে রাত নটার সময়। আমরা আমরা বিদায় নিলাম।

কাঁটায় কাঁটায় রাত নটায় এলো পিয়ার মা। দেখলাম, ও বেশ একটু সেজেগুজে এসেছে। আগেই তো বলেছি, ওর বয়স বেশী না, এখনো পুরুষের মন ভোলাতে, পুরুষের সঙ্গে ভাব জমাতে এবং পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ও ভালোবাসে। শরীর-আঁটো লাল জার্সী, চকচকে কালো চামড়ার সুন্দর বেল্টে ধাতুর তৈরী ঝকঝকে বকলস; সরু কালো স্কার্ট, সত্যি কথা বলতে কি একটু বেশী আঁটসাঁট এবং টানটান স্কার্ট থেকে ভারী নিতম্ব দুটো ফেটে পড়ার জোগাড়।

আমরা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। ঢোকার পথ রাস্তার দিকে। পেছনে পারগোলা ও বাগান। সেখান থেকে নদী দেখা যায়। খোলা হাওয়ায় মস্ত বড় টেবিলের সামনে বসলাম আমরা দুজন। এখন মে মাস। আবহাওয়া গরম। সামনে অন্ধকার অদৃশ্য নদী। নদীর ওপারে আলো, গ্যাসোমীটার, লম্বা চিমনি থেকে লাল আগুনের শিখা উঠছে। মুরগীর মাংসের 'ডেবিল'-এর অর্ডার দিলাম। ওরা মদ আনে। আমি পিয়ার মায়ের জন্যে গেলাস-ভর্তি মদ ঢালি। আমি জানি, ও মদ খেতে ভালোবাসে। দু গ্লাস মদ খাবার পর ওর খেয়াল হয়, আমি মদ খাচ্ছি কথা বলছি না, শুধু ওর দিকে তাকিয়ে আছি। ছেনালিভরা গলায় ও বলে—'তুমি আমার দিকে ওরকমভাবে তাকিয়ে আছো কেন?'

আমি জবাব দিলাম—

'তোমায় পছন্দ করি বলেই তোমার দিকে তাকিয়ে আছি।'

আসলে নিজের মনে বললাম—

'তোমার মধ্যে পিয়াকে দেখছি বলে বলে তোমার দিকে তাকিয়ে আছি।'

কিন্তু আমার কথা শুনে পিয়ার মা খুশী হল ও লজ্জার বালাই না করে বললো—

'আমার মধ্যে এমন কি আছে, যা তুমি সব থেকে পছন্দ কর?'

আমি তখন আন্তরিকতার সঙ্গে বলে যাই, তার কি কি আমার ভালো লাগে।

আসলে আমি বলতে চাই, তার মেয়ের সঙ্গ তার কোন্ সাদৃশ্যগুলো আমার ভালো লাগে।

এই সব কথা বলতে আমার ভালো লাগছিল, আমার শরীর শান্ত ও শিথিল, নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কিন্তু পিয়ার মা বেচারা আমার ভেতরের কথা না বুঝে শেষ অবধি বললো—

'আমার থেকে তোমার বয়স যদি এতো কম না হত, তোমার সঙ্গে যদি উপরন্তু আবার আমার মেয়ে পিয়ার এনগেজমেন্ট না হত, তোমাকে আমার বলা উচিৎ ছিল যে তোমার আকর্ষণ আমিও অনুভব করছি। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না, সুতরাং কিছু করার নেই।'

কথাগুলো বলার সময় পিয়ার মায়ের মুখে সেই ভাব ফুটে উঠেছিল, যা পিয়ার মুখেও জাগে, যখন সে লজ্জার ভান করে প্রশংসার জন্যে অপেক্ষা করে। এবং আমি, সব কিছু ভুলে, পিয়ার মায়ের হাতে হাত রেখে বলি—

'তাতে কি আসে যায়? বয়সের কোনো গুরুত্ব নেই। একজন আর একজনকে পছন্দ করে, এটাই বড়ো কথা।'

আমি পিয়ার মায়ের হাতে হাত রেখেছিলাম। কেননা পিয়ার মায়ের হাতটা ঠিক পিয়ার মত। সাদা, একটু শক্ত ও রুক্ষ, লাল নখগুলো সামান্য বাঁকা। এতোক্ষণে যেন উত্তেজিত হয় উঠেছে পিয়ার মা। তার নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে। সে হাত সরিয়ে নেয় না। ভাগ্য ভালো, ঠিক তখনই মুরগীর মাংস নিয়ে আসে ওয়েটার। আমি পিয়ার মায়ের হাত ছেড়ে দিই। আমরা খেতে শুরু করি।

আমার খুব খিদে পেয়েছিল। অবাক হওয়ায় কথা। কেননা পিয়া আমায় ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে এই প্রথম আমার খেতে ভালো লাগছে। অন্যদিকে পিয়ার মা খাচ্ছেনা। সে তৃষ্ণার্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মদের নেশায় উজ্জ্বল চোখে। সে খাবার প্রায় ছোঁয়নি। ঠিক এই সময়, কিভাবে কি জানি, অদ্ভুদ একটা ব্যাপার ঘটলো, যা অনেকেই বিশ্বাস করবে না। ঠাট্টার ছলে আমি একটা কথা বললাম। পিয়ার মা হাসলো। পিয়ার ভালোবাসা মনে ছিল বলে এবং পিয়ার মার মুখে পিয়ার মুখের ছবি দেখছিলাম বলে আমি বললাম—

'আমি সব থেকে ভালোবাসি তোমার মুখের হাসি। হাসলে তোমার বাঁ গালে টোল পড়ে। আমার চোখে ওইটাই সবচেয়ে ভালো লাগে।' আমি ও পিয়ার মা উজ্জ্বল আলোর মধ্যে বসেছিলাম। সুতরাং অন্ধকারে ভুল করেছি এই যুক্তি দেখানোরও সুযোগ ছিল না।

কথাটা বলেই আমার মনে হল, তাই তো, পিয়ার মায়ের হাসি-মুখে টোল পড়ে না। পিয়া হাসলে তার গালে টোল পড়ে। অন্ধ আমার ভালোবাসা পিয়ার মায়ের

মুখেও টোল এঁকে দিয়েছে এবং দৃষ্টিবিভ্রমের প্রভাবে আমি পিয়ার মায়ের গালে টোল দেখেছি। এক লহমার জন্যে আমি আশা করেছিলাম; কথাটা খেয়াল করবে না পিয়ার মা। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে মেয়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। তাছাড়া কামনা ও বাসনার ইঙ্গিতে ভরা আমার কণ্ঠস্বরের দরুণও আমি ধরা পড়ে গেছি।

পিয়ার মায়ের মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেল। সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। অবশেষে সে বলে—

'তুমি কি বলছো? হাসলে আমার গালে টোল পড়ে, আমি তো কোনোদিন খেয়াল করিনি।' লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে আমার মুখ।

আমি ঘাবড়ে গেছি, ও বুঝতে পারে। ওর মুখভঙ্গী কঠিন হয়ে ওঠে। ব্যাগ থেকে আয়না বার করে জোর করে মুখে হাসি ফোটায় পিয়ার মা। হাসিটা যন্ত্রণার মত মনে হয়। খানিক সময় পরে আবার গম্ভীর হয়ে ও আয়নাটা ব্যাগে রাখে, তারপর আস্তে আস্তে নির্জীব গলায় বলে—

'তাহলে তুমি আমার দিকে শুধু এই জন্যেই তাকিয়েছিলে যেহেতু আমাকে দেখতে আমার মেয়ে পিয়ার মত। আমাদের দেখতে একরকম, অনেকে আমাকে ওর দিদি বলে ভুল করে। এবার সত্যি কথাটা বলোতো। তুমি আজ সন্ধ্যায় আমায় এখনো নিমন্ত্রণ করেছো, শুধু আমার মুখে পিয়ার মুখের আদল দেখতে পাবে বলে। তাই না?'

আমি ঘাড় নাড়ি। অস্বীকার করার আর উপায় নেই।

তারপর নৈঃশব্দ। মনে হয়, পিয়ার মায়ের মন ভেঙে গেছে। টেবিলে কনুইদুটো রেখে দুহাতে মুখ গুঁজে সে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকে। যখন সে মুখ তোলে, তার চোখে জল। অপমানের দরুণ না অন্য কোন কারণে, আমি জানি না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে পিয়ার মা—

'তুমি পিয়াকে খুব ভালোবাসো, না? ওকে ছাড়া তুমি বাঁচতে পারবে না?'

'না, পারবো না!'

দুহাতে নিজের মাথার চুলের মধ্যে বিলি কাটছে পিয়ার মা। যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যেন কি করবে ঠিক করতে পারছে না। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলে—

'একটু বসো। আমি এখুনি আসছি।'

সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যায় পিয়ার মা। আমি হতভম্বের মতন একা বসে থাকি।

অনেকক্ষণ একা বসে থাকি। আমার সামনে প্লেটে মুরগীর হাড়।

পিয়ার মায়ের প্লেটে মুরগীর মাংস ছোয়াই হয়নি। প্রায় আধঘন্টা কেটে যায়। পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি, পারসোলার প্রান্তে দেখা দিয়েছে পিয়ার মা। পিয়াকে

সে হাত ধরে টেনে আনছে। টেবিলের কাছে এসে পিয়ার মা সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকায়। পিয়া নিথর, মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। পিয়ার মা বলে—

'সব ঠিক আছে। পিয়াকে আমি বলেছি, যতোদিন না নিজেদের ঘর ভাড়া নেবার মত যথেষ্ট পয়সা তোমরা কামাতে পারো, তোমরা আমার বাড়ীতেই থাকবে। আমার বয়স হয়েছে। আমার যৌবন ফুরিয়েছে, এখন তোমরা যুবক-যুবতীরা জীবন উপভোগ করবে, এটাই ঠিক। পিয়া রাজী হচ্ছিল না। আমি ওকে বুঝিয়ে রাজী করে এখানে এনেছি। সুতরাং এখন তুমি সোজাসুজি ওকে দেখতে পারবে। আর আমার দিকে তাকিয়ে ওর কথা ভাবতে হবে না। বিদায়।'

কথা শেষ করে শান্ত পায়ে হেঁটে সে পারসোলা পেরিয়ে রাস্তার দিকে চলে যায়।

.....এখন পিয়ার মায়ের জায়গায় আমার সামনে বসে আছে পিয়া। আমি তার দিকে চেয়ে আছি। এবং রক্তমাংসের শরীরে পিয়াকে আমার সামনে দেখে আমার সামনে সেই অনুভূতি জাগে, একমাস রোদ ঝলমল সমুদ্রসৈকতে কিম্বা পাহাড়ী হাওয়ায় কাটালে অন্য মানুষের যেমন লাগে।

পিয়াই আমার সমুদ্রসৈকত। পিয়াই আমার পাহাড়ী হাওয়া।

এখন পিয়া আমার সামনে। আমাকে আর পিয়ার মায়ের মুখে পিয়ার মুখ খুঁজতে হবে না।

আমি হাত বাড়িয়ে পিয়ার হাত ধরি, বলি—

'তুমি জানো, তোমাকে দেখে আমার কতো ভালো লাগছে?'

নীচু গলায় পিয়া বলে—

'আমারও'।

....মদ ফুরিয়ে গেছে। আমি পারসোলার দিকে ঘুরে তাকিয়ে আর এক লিটার মদের অর্ডার দিলাম।

মূল গল্প □ দ্য ডিম্‌পল্‌



রাজকুমারীর পার্টি

আলবার্তো মোরাভিয়া

❑ এক ❑

মহাসমুদ্রের অপর এক দিকের কোনো দেশের ভাগ্য, যার জনসংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল, বলতে গেলে এরকম দীর্ঘ দশ বছরের ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যাস্ত হয় শেষ পর্যন্ত জেনারেল টেরেসো আরাঙ্গোর হাতে।

টেরেসো একজন অতি সাবধানী লোক, সেই সঙ্গে সাহসীও বটে, কম করেও আধ ডজন জেনারেলদের, যাঁরা ক্ষমতার লোভে দীর্ঘ দশ বছর ধরে নিজেদের মধ্যে শত্রুতা করে গেছেন, টেক্কা দিয়ে আজও তিনি টিকে আছেন; তাঁর উপলব্ধি অতি সহজ, সরল, সৈনিকসুলভ, অপরিণত বলা যায় না। কেবলমাত্র স্বদেশবাসীর মঙ্গল সাধনের জন্য কোনো উৎসবে কিংবা সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনের সময় ছাড়া তার রাজধানীর সোসাইটি তাঁর সংস্পর্শে এসেছে বলে আদৌ দাবী করতে পারে না।

তাঁর এই সহজ ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, বহু বছর ধরে কেন টেরেসো রাণী গোরিনার আমন্ত্রণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে এসেছিলেন। আর দেশে গোরিনা ছিলেন অতি বিশিষ্ট, বিত্তবান, অতিথি সেবাপরায়ণ মহিলা। কিন্তু রাণী শপথ নিয়েছিলেন, তিনি ঠিক জয়ী হবেন। তিনি দেখলেন আনুগত্য দেখিয়ে কিংবা তোষামোদ করে টেরেসোকে টলানো যাবে না, তাই তিনি তখন জেনারেলদের মর্মে আঘাত করার মতো সুযোগ খুঁজে দেখার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। টেরেসো যতো তেজস্বী ও সাহসী হোন না কেন, গোরিনা নিজেকেই

যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন, হাজার হোক তিনি তো রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ, অতএব তাঁর একজন নারীর সঙ্গ, সাহচার্য পাওয়া উচিত। রাজকুমারী শপথ নিয়েছিলেন। যুদ্ধে টেরেসো যতোই সাহাসী হোন না কেন, কোনো আকর্ষণীয়া মহিলাকে একবার মাত্র দেখেই তিনিই যে অস্ত্র ত্যাগ করতে পারেন, এ তথ্যটা আবিস্কার করতে তাঁর খুব বেশী সময় লাগলো না। শুধু তাই নয়, বিশেষ করে এই মুহূর্তে 'ফয়স্তা সানচেজ' নামে একজন অত্যন্ত অল্পবয়সী যুবতীর প্রেমে মুগ্ধ তিনি, হাই সোসাইটিতে অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা তিনি। একদিন ফয়েস্তাকে তিনি তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত ঘরে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা করলেন তাঁর সঙ্গে। আর তাঁদের সেই আলোচনার ফসল ফলতে দেখা গেলো কয়েকদিন পরে, কূটনীতিক অভ্যর্থনা সভায় টেরেসো দেখলেন, তিনি আর একবার গোরিনার বাড়িতে আমন্ত্রিত।

রাজকুমারীকে ঘৃণা করেন টেরেসো। তিনি তাঁকে দেশের প্রাচীন মহত্ত্বের গর্ব, অজ্ঞতা, দুর্নীতি এবং অসার দম্ভের মূর্ত প্রতীক বলে গণ্য করেন। অতএব তিনি তার অভ্যাস মতো উত্তর দিলেন। দুঃখিত তিনি, রাজকুমারীর প্রস্তাব মতো আমোদ-প্রমোদে অংশ নিতে ব্যাপারটা তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরত করলো। রাজকুমারী কথায় কথায় মন্তব্য করলেন, তাঁর প্রত্যাখ্যান অবশ্যই কাউন্টেস সানচেজের কাছে একটা বিরাট হতাশা বটে। পার্টিতে তাঁকে দেখার জন্য বড় আশা করেছিলেন কাউন্টেস।

এই নামের উল্লেখ করাতে, মাসের পর মাস ধরে ফয়স্তাকে বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ার পর টেরেসোর মনে হলো, তাঁর হৃদয়টা বুঝি চঞ্চল হয়ে উঠলো যুবকের মতো যৌবনের উচ্ছ্বাসে, তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও। 'কে আপনাকে বললো', অবিবেচকের মতো জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আমার উপস্থিতি তাকে খুশি করবে?'

'মহামহিম, আপনার উপস্থিতিতে খুশি হয় না, এমন কে আছে?' রাজকুমারী উত্তরটা এমন ভাবে দিলেন, খুব বেশি খোশামুদি হলো না, অথচ তাঁকে স্থান দেওয়াও হলো।

ফয়স্তা যদি একান্তই তাঁকে দেখতে চান, তাহলে তাঁকে জনসাধারণের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হবে। রাজকুমারীর উত্তরটা এই রকমই, তবে এ-কথা সত্যি যে ফয়স্তা তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন বটে, কিন্তু এখনো তার এক ভাই আছে, তাই টেরেসো কি করে ভাবতে পারেন, তাঁর ভাই তাঁকে বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে আসতে দেবে, এ ঘটনা ইতিমধ্যেই অনেক মহিলার সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছে। অবশ্য রাজকুমারী এও বলেছেন, মহিলাদের ব্যাপারে টেরেসোর সাফল্যের কথা ভালোই জানা আছে ফয়স্তার ভাইয়ের, তাই এ ব্যাপারে

ঝুঁকি নিতে তার কোনো আপত্তি নেই। 'বুঝেছি', ভাবলেন টেরেসো, 'প্রথমে ফয়স্তার মূল্যায়ন হবে পার্টিতে আমার উপস্থিতিতে।' তাই তিনি রাজকুমারীকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছেন। কাছেই এ্যাণ্টিগুয়াতে তাকে যেতেই হচ্ছে, এক ফাঁকে পার্টিতে ঘুরে আসবেন। টেরেসো ভাবলেন, রাজকুমারীকে বেশ কায়দা করে প্রতারণা করা গেলো, ফয়স্তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পিছনে তাঁর আসল উদ্দেশ্যের কথা তিনি জানতে পারলেন না। ওদিকে রাজকুমারী নিজের মনে বলেন, অবশেষে বঁড়শিতে মাছ গাঁথা সম্ভব হলো।

আসলে ফয়স্তা তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে চুক্তি করে টেরেসোর মিস্ট্রেস হওয়ার জন্য ইতিমধ্যে মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। যাইহোক, তিনি জানেন, পুরুষরা, বিশেষ করে টেরেসোর মতো সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যাঁরা, তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা চাহিদা মেটানো কতোই না বাধা বিপত্তি আসতে পারে। প্যালেস কিংবা কোনো হান্টিং লজে টেরেসোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অর্থই হলো একেবারে শুরু থেকেই তাঁদের স্থূল ও সস্তা সম্পর্কে গড়ে তোলা। রাজকুমারীর পরামর্শ মেনে নিতে প্রস্তুত ফয়স্তা। রাজকুমারী তাঁকে বলেছেন, প্রতি বছরের মতো তাঁর কান্ট্রি ভিলায় পার্টি দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতো ফয়স্তা, পার্টিতে টেরেসোকে বোঝাবেন তাঁর কাছে তিনি একবারে বেমানান নন। তারপর দুজন মহিলা তাঁদের হাতের তাস এমন ভাবে খেলবেন যাতে করে টোরেসোকে অনন্তকাল ধরে উৎকণ্ঠা এবং অতৃপ্ত রাখতে পারেন। আর এই ভাবেই যতোটা সম্ভব তাঁর কাছ থেকে তাঁরা তাঁদের পাওনা আদায় করে নেবেন।

অতএব পার্টিটা তাঁদের নিজস্ব স্বার্থ হয়ে দাড়ালো। জেনারেলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে রাজকুমারীকে বেশ খুশি বলে মনে হলো। অবশেষে জেনারেলের হোস্টেস হতে পেরে তিনি তাঁর বহু দিনের অসম্পূর্ণ আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে যাচ্ছেন, এতেই তাঁর তৃপ্তি। ফয়স্তা তাঁর জাল বিস্তার করতে পারবেন। তাঁর ভাই ম্যানুয়েলের আশা, জেনারেলের কাছ থেকে কিছু অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে যা সব সময় প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছিল। টেরেসোর সাফল্য, অবশেষে ফয়স্তাকে তিনি জয় করতে পেরেছেন। আর একেবারে শেষ মুহূর্তে এই সব ষড়যন্ত্রের মধ্যে আরো একটা যোগ হলো, সেটা যেন আরো বেশী জটিল পুলিশ চীফ ওসভালডো সিঙ্কোর পক্ষে।

কুঁজো, ছোট-খাটো চেহারার মানুষ এই পুলিশ চীফ। দুর্বল, রোগাটে হলেও মুখটা তার ভারি মিষ্টি। কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছে সে, টেরেসোর উপর তার প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে, যা চোখে পড়ার মতো। তাঁর শাসনের গোড়ার দিকে টেরেসোর

কাছে সে ছিলো অত্যন্ত কার্যকর ; দেশের শান্তির জন্য হয়তো তাকে তাঁর প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে টেরেসোর জনপ্রিয়তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে ওসভালডোর শাসন পদ্ধতির গুরুত্ব কমে যায় তাঁর কাছে। সত্যি কথা বলতে কি, এ যেন তার সততার প্রতি সন্দেহেরই নামান্তর। ধীর স্থির ভাবে এক এক করে তিনি তাঁর প্রশাসনের পূর্বতন প্রতিনিধিদের পরিবর্তে নতুনদের নিয়োগ করেছেন। তাঁর সরকারের ইচ্ছা যতো বেশী সম্ভব সদয় এবং পিতৃসুলভ মনোভাব প্রদর্শন করা। দিনকাল বদলাচ্ছে, তাঁর গোড়ার দিকের সংগ্রামের সময় পুরনো, উগ্র সঙ্গ াদের প্রয়োজন এখন আর নেই। পুলিশ চীফের পদ থেকে তিনি যে এখনো তাঁকে রেহাই দেননি তার তার কারণ তাঁর উপলব্ধি হলো তাঁর সরকারের প্রতি সমস্ত ঘৃণার মধ্যে যদি একটুও অবশিষ্ট থাকে—ওসভালডোর উপর আরোপিত হবে, আর তিনি তখন দায়মুক্ত থেকে যাবেন। যাইহোক, টেরেসো এখন বুঝে গেছেন, তার আর একেবারেই প্রয়োজন নেই। তিনি এখন চিন্তা করছেন ওসভালডোকে সরিয়ে একজন নতুন লোককে নিয়োগ করবেন, সাধারণ একজন আমলা, বিশ্বাসী হওয়া চাই, দুর্বল প্রকৃতির লোক হলেও চলবে, যার রেকর্ড ভালো এবং পরিষ্কার। ওসভালডোর প্রতি তাঁর উদাসীনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই টেরেসোর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। ওসভালডোও জেনে গেছে, তার দিন ফুরিয়ে এসেছে, তাকে সরে যেতেই হবে তার অধীনস্থ লোকের হাতে কার্যভার হস্তান্তর করে।

সে এখন বেশ বুঝতে পারছে চীফের পদ থেকে তার আসন্ন অপসারণের প্রধান কারণ হলো দেশে শান্তি ফিরে আসা এবং তুলনাহীন জনপ্রিয়তা যা টেরেসো এখন উপভোগ করছেন। রাজকুমারীর পার্টিতে যাচ্ছেন টেরেসো, এ খবর এখন আর তার অজানা নয় ; আর হঠাৎ তার মাথায় একটা মতলব এসে যায়, পার্টিতে সে যদি জেনারেলকে হত্যা করার নকল অভিনয়ে সফল হতে পারে তিনি তখন ভয় পেয়ে যাবেন এবং তার অপসারণ মুলতুবি রেখে দেবেন। কিন্তু ওসভালডো এর পরিণতি দেখতে পেলো না, এ এক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক খেলা, আর এ খেলায় সে শুধু তার পদই হারাবে না প্রাণও হারাতে পারে। কিন্তু সে একজন জুয়াড়ী আর সে জানে, বেশীর ভাগ ঝুঁকিতে সাফল্যের সম্ভাবনাও আছে। টেরেসোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের অনুমতি পেয়ে কোনো ভূমিকা না করেই তাঁকে সোজাসুজি বলে সে, তার কাছে খবর আছে, রাজকুমারীর পার্টিতে তাঁর প্রাণ-নাশের একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে।

'এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।' ওসভালডো তার বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে বললো, 'আমরা কতকগুলো বেপরোয়া লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, যে কোনো গর্হিত কাজের জন্য তারা প্রস্তুত। আমার পরামর্শ আমাকে ক্ষমা করবেন

মহামহিম, পার্টিতে যাবেন না......এ কথা সত্যি যে, এই ভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের সব পরিকল্পনা আমরা বানচাল করে দিতে পারবো না কিন্তু যে কোনো মূল্যে বিপদ এড়ানো যেতে পারে।'

এতো সব কথা বলার অর্থ হলো টেরেসোর সাহস এবং ঔদ্ধত্য জাগানোর জন্য, এ ব্যাপারে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা, যা আসলে লোভী পুলিশ চীফের সুপারিশের পরিপন্থী। ফয়স্তা এবং প্রেমের ষড়যন্ত্র এই ব্যাপারটার সঙ্গে মিশে গেছে আর বিপদে টেরেসো একেবারেই অন্যরকম। আশঙ্কা, তাঁর বিপদে ফেলার পরিকল্পনা হয়তো হতাশায় পরিণত হতে পারে।

'বলুন, সব ষড়যন্ত্রকারীদের নাম আপনার জানা আছে?' দ্রুত বললেন তিনি। 'থাকলে এখুনি তাদের গ্রেপ্তার করুন। আর এ ব্যাপারে আমাকে আর কিছু শোনাতে আসবেন না।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'এ হলো তোমার অতি দম্ভের নজির। আমার জীবন নাশের চেষ্টা........ঠিক যে মুহূর্তে আমি আমার সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এসে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখনি তারা আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এ সবই তোমার ভুলের জন্য, আর তোমার পুলিশ বাহিনীর ব্যর্থতার ফলস্বরূপ, যারা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে রেহাই পেতে চাই.......আমি, তোমাকে ধ্বংস করে দেবো.....'

টেরেসোর শাসানিতে বিন্দুমাত্র ভয় পেলো না ওসভালডো। সে তার অভিজ্ঞতা থেকে জানে, তার এই হম্বিতম্বি আসলে কিছুই নায়, শুধুই ফাঁকা আওয়াজ। এই মুহূর্তে ফয়স্তার কথা চিন্তা করছেন তিনি আর ভাবছেন, এরপর তিনি কি করবেন, কি তাঁর করা উচিত। তিনি স্বীকার করেন, ওসভালডোই ঠিক। ষড়যন্ত্রকারীদের তাদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ গ্রেপ্তার করা উচিত। নচেৎ, তাঁর সেই ছোটখাটো অভিযান ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, কারণ তাদের গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে ফয়স্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের খবরটা স্বভাবতই প্রকাশ হয়ে পড়তে বাধ্য। মেয়েদের মন বড় ক্ষণভঙ্গুর, আর তাদের মনোভাব খুবই স্পর্শকাতর। তাই টেরেসো ভাবেন, তাঁকে হত্যা করার প্লটটা জানাজানি হয়ে পড়লে ফয়স্তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে না, তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। অবশেষে একটু ব্যস্ত হয়েই তিনি ওসভালডোর কাছে খোঁজ নিলেন, পার্টির মধ্যে বিরোধ না ঘটিয়ে তাঁর শত্রুদের গ্রেপ্তার করার অভিযান চালাতে পারবে কিনা সে। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে ওসভালডো জানিয়ে দেয়, হ্যাঁ তা সে করতে পারবে, কাউকে কিছু না জানিয়েই। টেরেসো এখন ভাবছেন, ওসভালডোর প্রতিশ্রুতি মতো সব ঠিক ঠিক চললে তাঁর অভিযান ব্যর্থ করার পরিবর্তে শত্রুপক্ষের প্লটটাই ভেস্তে যাবে।

নারীদের সম্পর্কে টেরেসোর বিশ্লেষণ হলো, তারা সাহসী পুরুষদেরই কেবল

ভালবাসে। এই যে ফয়স্তার কাছে তার পরিচিতি নেহাতই সরকাবের সর্বময় কর্তা হিসেবে শুধুই নয়, কিন্তু তার জীবন যে এক সময় বিপদের মধ্যে কেটেছে, আর এই বিপদ সত্ত্বেও ভালোবাসার কথা চিন্তা করার মতো সাহস তার ছিলো, এটাও একটা উল্লেখযোগ্য দিক। সত্যিই টেরেসো একজন অতি সাহসী মানুষ। তাঁর মতো অবস্থায় দশজনের মধ্যে ন'জনই ওসভালডোর আমলাতান্ত্রিক উপদেশ ভেবেছেন। কিন্তু টেরেসো বিশেষ মানসিকতায় গড়া মানুষ এবং প্রেমের জন্য পাগল।

অতএব ঠিক হলো, টেরেসো তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পার্টিতে যাবেন, আর একজন পুলিশম্যান হিসেবে ওসভালডো তার কর্তব্য পালন করে যাবে যথাযথ ভাবে। কাউকে না জানিয়ে কিংবা কাউকে না দেখিয়ে ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মোকাবিলা করবে। ওসভালডো তার স্কুলের প্রস্তুতি নিতে চলে গেলো, পার্টির আগে মাত্র কয়েকটা দিন হাতে আছে।

❑ দুই ❑

ওসভালডোর অনেক সহযোগিদের মধ্যে একমাত্র পেরোকেই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। এক অদ্ভুত চবিত্রের মানুষ এই পেরো। বাস্তবিক পেবোর গুপ্তচর হিসাবে কাজ করার থেকে অভিনেতার ভূমিকার কাজ করাটা বেশী পছন্দ ওসভালডোর। প্রয়োজনে সে তার স্বভাব বিরুদ্ধ ভূমিকায় একেবারে নিখুঁত ভাবে আবির্ভূত হতে পারে। স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশী লম্বা সে, এবং বলিষ্ঠ চেহারা। মুখটা রঙিন মোমবাতির মুখোসের মতোন। অভিনয় করার সময় তার অভিব্যক্তি অতি সহজ, সাধারণ মানুষের থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলে সে তখন। মঞ্চের আলোকসজ্জা যা তাকে উদ্ভাসিত করে রাখে, সে সব কিছুই চোখে পড়ে না তখন তার, তখন কেবলি মনে হয়, তার সামনে বুঝি এক অন্ধকার গহ্বর, সে যেন তখন অন্ধকার জগতেই মানুষ।

এ ধরণের অস্বীকৃত নাটকের অভিনয় করতে করতেই গুপ্তচরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় পেরো। সব অভিনেতারাই প্রশংসা চায়। অপরপক্ষে পেরো নিজেকে রহস্যের আবরণে ঢেকে রাখতেই ভালোবাসে। ছদ্মবেশে নিজেকে ঢেকে রাখা ছাড়াও ষড়যন্ত্রের কাজে লিপ্ত হতে তার খুব ভালো লাগে। টেরেসোর থেকে নিজেকে সে অনেক বেশী শক্তিশালী বলে মনে করে ; যাঁর হুকুমে রাইফেল কাঁধে নিয়ে যুদ্ধে যেতে পারে। পেরো যাদের প্রতারণা করে তাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন সে। পুতুল নাচের প্রহসন নাটকের শোম্যান সে।

তার কাছে তার সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি, তা সে জেলখানায় হোক কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডেই হোক, খুব বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার কর্তব্যজ্ঞানই একই ভাবে অভিনয় করে যেতে পারে সে। যাই হোক, উচ্চাভিলাষী সে, এবং তার আকুল কামনা হলো, সিন্‌কো ওসভালডো আজ যে পদে অধিষ্ঠিত, একদিন সেটা সে দখল করে নিতে চায়। মন্ত্রীরা নয়, পুলিশই দেশ শাসন করে থাকে, পেরোর ধারণা কতকটা এই রকম। পুলিশ চীফের পদের প্রতিও তার লোভ ভয়ঙ্কর—একবার সেই সর্বোচ্চ পদটা লাভ করলে হয়, তাহলে সে তখন টেরেসোর কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। টেরেসোর বয়স হচ্ছে, বয়সের ভারে স্বভাবতই তিনি ক্লান্ত হযে পড়বেন, ঠিক মতো দেশ শাসনের কাজ চালাতে পারবেন না, সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন তার উপর। আর এই সুযোগে সে তখন সারা দেশটাকে ষড়যন্ত্রের মঞ্চে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবেন। সারা দেশময় তখন কেবল ছল চাতুরী আর প্রতারণার ছবি ফুটে উঠতে দেখা যাবে। এই রকম একটা ইচ্ছাই সিঙ্কোর সঙ্গে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করা থেকে প্রতিরোধ করে রেখেছে তাকে। তাই সে এখন সিঙ্কোর গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে কিছু গোপন রাজনৈতিক সংস্থার হয়ে সে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সে যাইহোক, রাজনৈতিক দল, গোপন হোক চাই না হোক, কিছু দিন হলো দেশ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে উধাও হয়ে গেছে।

অতএব পেরোকে ডেকে পাঠিয়ে সিঙ্কো তাকে সব খুলে বললো, কি সে চায়! কিসের প্রয়োজন। প্রয়োজন একজন প্রতারিত মূর্খ, পাগল কিংবা বলা যেতে পারে বোকা লোককে, তাকে আক্রমন করাতে বাধ্য করা, মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য তাকে সব রকম রসদের যোগান দেওয়া—যেমন অস্ত্র এবং সঙ্গী ইত্যাদি দিয়ে। সেই সঙ্গে তাকে যায়গার নাম বলে দিতে হবে কি ভাবে সুযোগ পাওয়া যাবে তাও বলে দিতে হবে। ইতিমধ্যে আবিস্কার করার পর এই ষড়যন্ত্রের প্লট সঙ্কোকে এনে দেবে সম্মান, পদোন্নতি এবং পুরস্কার। এবং অন্যদেরও, যারা এতে অংশগ্রহণ করবে অবশ্য একজন ছাড়া, এতে সত্যিকারের যার বিশ্বাস আছে। এই প্রতারণরা জন্য তার নিজস্ব কারণ যে কি, পেরোকে বললো না সিঙ্কো—লজ্জায় নয়, কারণ সে জানে বলার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রথম কথা থেকেই সঙ্গে সঙ্গে পেরো বুঝে নিয়েছে, এ সবের অর্থ কি হতে পারে।

সিঙ্কোর ব্যাখ্যা শোনার পর পেরো বলে, সঠিক লোকের গায়ে হাত দিতে পারে সে।—এক ধরণের পাগল, সে। সত্যি কথা বলতে কি, বছরের পর বছর ধরে এ ধরণের একটা ব্যাপারে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিল

সে। সে এখন চায়, সব ব্যাপারটা তার উপর ছেড়ে দিক সিঙ্কো, সব কিছুই ঠিক ঠিক চলবে। পেরো তাকে তার প্ল্যানের কথা সবিস্তারে বর্ণনা দেয়। পেরোর অঙ্কের হিসেব সিঙ্কোর কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়।

আর কোনো উপদেশ না দিয়ে তাদের আলোচনা মুলতুবি রেখে তিনদিন পরে ডাচেস পার্টিতে পেরোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলো সিঙ্কো।

অতঃপর এ্যান্টিগুয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় পেরো। একদিন ও এক রাত্রের জন্য বেকার চাকরের পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করলো —কালো ট্রাউজার হাল্কা জ্যাকেট এবং শক্ত কলারের সার্ট। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় উঠে বসলো সে। একজন চাকর হিসেবে ঠিক যে রকম আচরণ এবং অন্য যাত্রীদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, পেরো তার নকল ভূমিকায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেলো। তার সহভ্রমণার্থীরা কেউ গরীব চাষী, কেউবা শ্রমিক শ্রেণীর লোক— তারা সবাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে পেরো জানতে পারে, বিখ্যাত ডাচেস গোরিনার একজন তরুণ চাপরাসী নিয়োগের প্রসঙ্গে তারা কথা বলছিল। একজন সরল সাধারণ গ্রামবাসীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে তাদের একজনের কাছে থেকে ড্যাচেস ভিলার বিবরণ জেনে নেয়। সেই লোকটি এক সময় ডাচেস ভিলার মালিক ছিলো।

'এর থেকে আমি বুঝতে পারছি,' লোকটি ডাচেস এস্টেটের সৌন্দর্যের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া শেষ করলে পেরো তাকে তার মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে বললো, 'ঠিক এই রকম একটা স্থানই আমার উপযুক্ত। এই রকম একটা চমৎকার প্রাসাদে চাকরী পাওয়ার ইচ্ছা ছিলো আমার। কম কাজ আর উপার্জন বেশী।'

'তাছাড়া', একজন সমৃদ্ধশালী চাষী মন্তব্য করলো, 'আমরা সবাই জানি, তোমাদের মতো লোক এ-রকম যায়গায় থেকে অযথা সময় নষ্ট করে না—কিছুদিন এখানে কিছুদিন ওখানে থেকে —' একটা চোখ ছোট করে এমন ভঙ্গি করলো যেন কেউ কোনো জিনিষ চুরি-চামারি করছে।

এতে অপমান বোধ করলো পেরো এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো। সে একজন সৎ এবং সজ্জন ব্যক্তি ; তাদের যদি বিশ্বাস না হয়, এমন কতকগুলো যায়গার উল্লেখ সে করতে পারে যেখানে সে কাজ করে এসেছে। সেগুলোর মধ্যে একটা হলো ভ্যালাহরমোসার কাউন্টেস, বিশেষ করে যিনি তার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই চাষী স্বীকার করলো, উপস্থিত সঙ্গীদের কটাক্ষ করতে চায়নি সে, আসলে সাধারণত যা ঘটে থাকে তাই সে বলতে চেয়েছিল। পেরো খুব সহজেই তার ডামিটা চালু করে দিতে পারলো তাদের মধ্যে। এ ছাড়া তৃতীয়

শ্রেণীর কামরায় তার ভ্রমণ করার অন্য প্রয়োজন ছিলো না। তাছাড়া কোনো কাজই সে অর্ধসমাপ্ত রাখতে চায় না। শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মিশতে পেরে খুশি সে—সেই সঙ্গে তাদের ঠাট্টা-ইয়ার্কি আর মতামতও জানতে পারলো সে।

সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় এ্যান্টিগুয়ায় এসে পৌঁছলো সে। মাথায় সাইক্লিস্ট এর সস্তা টুপি চাপিয়ে হাতে তার বিশ্রী দেখতে ফাইবার সুটকেস নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো সে। এক সময় এ্যান্টিগুয়া সমৃদ্ধশালী ছিলো, এবং জনবসতিপূর্ণ শহর ছিলো, তার চারপাশে রূপোর খনি। এখন সেই রূপোর খনিও নেই, লোক সংখ্যারও আধিক্য নেই। স্বভাবতই তার গুরুত্বও কমে গেছে।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা জীর্ণ গাড়িতে উঠে বসলো পেরো। লোকে ঠাসা ঠাসি। যাত্রী বলতে শ্রমিক এবং চাষী সম্প্রদায়। গাড়িটা মেইন স্কোয়ারের দিকে চলতে শুরু করলো। এই স্কোয়ারটার কথা সে জানে—দৈত্যের মতো বিরাট বিরাট গাছে ঘেরা ততোধিক বিরাট সমায়ত স্কোয়ার—চারপাশে শহরের অতি দাম্ভিক লোকেদের বিরাট বিরাট ইমারত ঃ গভর্নর প্যালেস, মিউনিসিপ্যাল অফিস, ব্যাঙ্ক, হোটেল, দুটি কাফে যেখানে রাজনীতির আলোচনা হয়ে থাকে, স্কোয়ারের বাইরে রাস্তাগুলো ছোট ছোট, অন্ধকার, শূন্য চার্চ, ছোট ছোট জঘন্য নোংরা বাসা।

পেরো তার বড় সুটকেসটা বহন করার কথা চিন্তাই করলো না। খালি হাতে স্কোয়ারের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে থাকলো। এর পিছনে অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য তার ছিলো বৈকি। গাছগুলোর নিচে ভ্রাম্যমান এবং বসে থাকা পথচারীদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো এখানে টেরেসের আসন্ন আগমন এবং ডাচেস পার্টিকে কেন্দ্র করে। পেরোর ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ানো সফল। দেওয়ালে দেওয়ালে জেনারেলের আগমনের ঘোষণা, আলোকসজ্জা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফুলের তোরণ, এ সব সীমিত হলেও দেখেশুনে মনে হলো সারা যায়গাটা ওলট পালট করে দিয়েছেন ডাচেস। পেরো খবর নিয়ে জানতে পারলো, এ্যান্টিগুয়ার দুটি বিরাট হোটেল সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর অসংখ্য অতিথিদের থাকার জন্য। ওদিকে দিনের পর দিন ধরে পোশাক প্রস্তুতকারকরা তাঁর জন্য ফ্যান্সি পোশাক তৈরী করতে ব্যস্ত। ব্যস্ত ক্যাটারাররা উৎসবে খাবারের আয়োজন করার জন্য, ব্যস্ত কন্ট্রাক্টররা এবং ডেকরেটাররা বাগানা সাজানোর জন্য, পার্কগুলোয় আলোসজ্জার ব্যবস্থা করার জন্য। তুলনামূলক ভাবে টেরেসো তাদের খুব একটা অসুবিধায় ফেলেননি। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য শহরে প্রস্তুতি চলছে একেবারে মিলিটারি কায়দায়, নতুনত্ব বলতে কিছুই নেই।

পেরো তার গবেষণার কাজ চালানোর জন্য পর পর দুটো কাফেতে গিয়ে

ঢুকলো। এখানেও মদের গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে একই আলোচনার বিষয়বস্তু তার কানে এলো—ডাচেস গোরিনায় পার্টির কথা। ফ্যান্সি ড্রেসে একশো নয়, হাজার হাজার অতিথি, অর্কেষ্ট্রা, ভালো ভালো খাবারের সমারোহ। তাদের মন্তব্য লক্ষণীয়—বিরূপ সমালোচনা নয়, প্রশংসনীয়—এর থেকে নিশ্চিত প্রমাণ হয়, নিজের মনে বললো সে, এখানে কারোর অভাব বলতে কিছু নেই। তিন চারজন বৃদ্ধের মুখে ডাচেস-এর অতিথিদের গাড়ির মূল্য নিয়ে আলোচনার কথা শুনে সে এবার সেই সংরক্ষিত হোটেল দুটিতে গিয়ে হাজির হলো। পোর্টারদের কাছ থেকে খবর নিয়ে সে জানতে পারলো, সব ঘরগুলোই নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে সে চলে এলো স্কোয়ারের নিচের দিকে—এখানকার রাস্তাটা ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে—আলামেডা ডস ডি মেয়ো।

রাস্তার মুখেই ছিলো একটা মিষ্টির দোকান, সেটাও দেখতে চাইলো সে। শহরের একমাত্র মিষ্টির দোকান—থরে থরে সাজানো প্যাটিস আর মিষ্টি। দোকানের কাঁচের উপর সে তার নাক ঠেকিয়ে দেখলো, নারী ও পুরুষেরা বেশ সুসজ্জিত, যা সচরাচর দেখা যায় না। তাদের পোশাক দেখে মনে হলো, ডাচেস-এর ফ্যান্সি ড্রেস পার্টির এহেন আগাম সাজসজ্জা দৈনন্দিন পোষাকের থেকে আলাদা। ছোট ছোট টেবিলগুলোর চারপাশে ডাচেস-এর সম্ভাব্য অতিথিদের ভীড়, তারা ঠাট্টা তামাশায় মশগুল। এ যেন অপেরা হাউসে ড্রেস রিহার্সালের আয়োজন।

মনোযোগ সহকারে কৌতূহল জাগানো সেই দৃশ্যগুলো দেখার পর পেরো এগিয়ে চলে আলামেডার দিকে। দোকানগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে ঘাসের গালচে বিছানো স্কোয়ারের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো পেরো। স্কোয়ারের উপর ম্যাডোনা ডি লস রেমোডিয়াস চার্চ—নির্জন, এক বুক অন্ধকারে ডুবে আছে সেই চার্চ। অপরাহ্নের শেষ গোধূলির আলোটুকুও তখন অস্তমিত, তবু সেই আলো-আঁধারির মধ্যে রঙচটা—নীল ও বাদামী রঙ মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেলে যেমন হয়, সেই অদ্ভুত রঙের পোশাকে সুন্দর নির্মেঘ আকাশ থাকা সত্ত্বেও একটা ছাতার নিচে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো পেরো। তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধের উপর হাত রাখলো পেরো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি তার পিছন ফিরে তাকালো—বাদামী রঙের মুখ, টিকোল নাক।

'ইন্সপেক্টর!' চিৎকার করে বলে উঠলো পেরো, 'এমন চমৎকার আবহাওয়ায় ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে তুমি কি করছো? ওটা কি তোমার পাখীদের আক্রমণের হাত থেকে প্রতিরোধ করার জন্য?'

'মাফ করো', বললো ডিটেকটিভ, 'বাড়ি থেকে যখন বেরোই মনে হয়েছিল বৃষ্টি হতে পারে।'

'আর', পেরো তার কথার জের টেনে বলে, 'কেউ যদি তোমাকে 'ইন্সপেক্টর' বলে চিৎকার করে ডাকে, তুমি তাকে অনুমতি দেবে?'

'তোমাকে আমি চিনতে পারছি,' অদ্ভুত হাসি হেসে বললো সে।

এরপর তার সঙ্গে আর কিছু কথাবার্তা বিনিময় হলো পেরোর। জিজ্ঞেস করলো, কোনো অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছে কিনা সে। তাকে যখন বলা হলো, শহর মোটামুটি শান্ত, পেরো তখন তাকে ছেড়ে চলে এলো। ইন্সপেক্টর তার ডিউটির কাজে নিজেকে মনোনিবেশ করলো।

❑ তিন ❑

জায়গাটা ভালো জানা আছে এমন একজন লোকের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে স্কোয়ারের বাঁদিকের সরু গলি পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো পেরো। রাতের অন্ধকার নেমে এলো নীল আকাশের নিচে। এই সব সরু রাস্তায় প্রয়োজনে আলোগুলো জ্বলে ওঠে। রাস্তার দু'ধারে প্রাসাদ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট দু একটা বাড়ি চোখে পড়লো তার। চার্চের আলোগুলো টিমটিমে। পেরোর তাতে সুবিধে হলো। অন্ধকারে সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে গিয়ে কেউ তাকে লক্ষ্য করলো না। শেষপর্যন্ত একটা সুন্দর বাড়ির হলঘরে প্রবেশ করলো পেরো। সিঁড়িগুলো চমৎকার, তবে ধূলো-মলিন। দুটো ধাপ উঠতেই তার চোখে পড়লো একটা সুইং-ডোর। দরজার ওপারে সারিবদ্ধ ছোট ছোট ঘর ও অফিস ঘর। সামনেই একটা ডেস্ক, ডেস্কের উল্টো দিকে ফাইল ভর্তি সেল্‌ফ। ডেস্কের উপর একটা খবরের কাগজ বিছানো। একজন টাক মাথার লোক ঝুঁকে পড়ে কাগজ পড়ছিল। দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনে লোকটা মাথা তুললো ধীরে ধীরে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ কমিশনারের মুখটা পেরোর চোখের সামনে ভেসে উঠলো! পেরোকে দেখেই তাকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য উঠে দাঁড়ালো সে। তার মুখে একটা অস্বস্তির ভাব।

সাবধানে দরজা বন্ধ করলো পেরো। সুটকেসটা একটা কোণায় রাখলো। কমিশনারের বলার অপেক্ষা না করেই সে তার সামনের একটা চেয়ারের বসে পড়লো। তারপর দ্রুত তার দিকে একের পর এক প্রশ্নবান ছুঁড়তে থাকলো গম্ভীর গলায়। ওদিকে কমিশনারের হাবভাব দেখে মনে হলো, সে যেন পেরোকে আমলই দিতে চাইছে না। সেকেলে ধরণের লোক সে। আরাম প্রিয়। বিশ্বাসী পুলিশ অফিসার। পেরোর কথা অনেক শুনেছিল সে। পেরোকে তার মনে হয়, লোকটা যে শুধু চালু কাজকর্মের পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত হয় না, তার মধ্যে একটা ধ্বংসাত্মক

মনোভাব জাগ্রত। পেরোর প্রতি তার বিরূপ মনোভাবের আর একটা কারণ হলো, পেরো তার থেকে বয়সে অনেক ছোট হলেও পদমর্যাদায় সে এতোই উঁচুতে উঠে গেছে যে, তাকে হুকুম করার ক্ষমতা রাখে সে। পেরোর চাকরী জীবন বলতে গেলে সবে শুরু। অথচ তিরিশ বছর কাটিয়ে এসেও তার উন্নতি বলতে কিছুই হয়নি, যে কোনো মূহুর্তে তাকে পেনসন দিয়ে চাকরী থেকে খতম করে দিতে পারে। পেরো তাকে মুহূর্তের জন্য ফুরসত দেয় না, একটার পর একটা প্রশ্ন করে চলে। কমিশনার তার গোপন রাগ চাপার জন্য মুখ থেকে ঘন ঘন সিগারেটের ধোঁয়া উদগীরণ করে সে তার বিরক্তিতে ভরা মুখটা ঢেকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে। তার উত্তরগুলো মন্থর অনিচ্ছাকৃত। এমন কি এক একটা উত্তর সঙ্গতিহীন। পেরো তার মনোভাব বুঝতে পেরে খিঁচিয়ে উঠলো : "তোমাকে ছাড়াই আমরা এখানে সুন্দর পুলিশী ব্যবস্থা করতে পারি। তাহলে এখানে তোমাকে কি করতেই বা আনা হয়েছে?"—মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে সে, প্রথম সুযোগেই লোকটাকে শিক্ষা দিতে হবে।

টেরেসোর এখানে আগমনে স্থানীয় পুলিশ ঠিক কি ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছে, পেরো তার মতামত জানিয়ে পুলিশ কমিশনারকে বললো, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে যে সব লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার একটা তালিকা তাকে দেখানোর জন্য। কমিশনার তার ডেস্ক থেকে না উঠেই হাত বাড়িয়ে ডেস্কের উপর থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে একটা কাগজ বার করে পেরোর সামনে মেলে ধরলো। উৎসাহ নিয়ে সেই তালিকাটার উপব চোখ বোলাতে থাকলো সে। তালিকায় দেখতে গিয়ে পেরো আবিস্কার করলো, সেখানে এমন একজনের নাম আছে যাকে গ্রেপ্তার করার কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে নির্দয় ভাবে কমিশনারকে গালিগালাজ করতে থাকে সে। প্রথমে নরম গরম গলায়, তারপর এক সময় সে তার গলা চড়িয়ে কমিশনারকে জানিয়ে দিলো, সব কিছুই ভুল পথে চলেছে, এই শহরে সবাই নাকে সরষে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে, সেকেলে পদ্ধতি বদলানোর এখনি উপযুক্ত সময় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার কমিশনারের মুখের রঙ বদলে গেলো। মুখ থেকে অর্ধসমাপ্ত সিগারেটটা সরিয়ে ছাইদানির প্রান্তভাগে রেখে দিলো, চোখ থেকে চশমাটা সরিয়ে দিতেই তার গভীর কালো চোখ দুটো মনে হলো অন্ধ পাখীর মতো খুদে, ফ্যাকাশে, অনুজ্জ্বল। কিন্তু পেরো ভেবেছিল, তার দাপটে তার চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর ভয়ার্ত হয়ে উঠবে। তাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই উত্তেজিত অবস্থায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকলো সে। চিৎকার করে করে সে তাকে সমঝে দিলো, অপদার্থ সে, হেডকোয়ার্টারে সে তার রিপোর্ট পাঠাবে। সে তাকে আরো জানিয়ে দিলো, তার

সহকারীদের সমেত তাকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করবে সে। কমিশানার এখন রীতিমতো ভীত সন্ত্রস্ত। কমিশনার তার বেঢপ চেহারা নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তার আসন থেকে উঠে উত্তেজিত পেরোর পিছন ছুটতে শুরু করলো, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো তার ভুল হয়ে গেছে, পেরোর বক্তব্যই ঠিক। তাতেও কোনো ফল হতে না দেখে শেষ পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য সে ঘোষণা করলো, তার বর্ণিত লোকটির খালাসের ব্যবস্থা সে এখনি করবে। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

সে চলে যাওয়ার পরমুহূর্তে, পেরো যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলো—শান্ত, অনুত্তেজিত, ডেস্কের ধারে বসে খবরের কাগজটা পড়তে শুরু করলো। একটু পরেই কমিশনার ফিরে এলো, সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে পেরোর সামনে এসে দাঁড়াল সে। বেচারা, নিজের আসনে বসবার মতো সাহস তখন আর ছিলো না। চোখ মুখ কুঁচকে হাত কচলিয়ে পেরোকে আশ্বস্ত করতে বললো সে, এখনি সেই বন্দীকে মুক্ত করে দেবার ব্যবস্থা করে এসেছে সে।

'আমি যদি ভুল করে থাকি', শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো সে, 'তার কারণ অতি মাত্রায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলাম আমি।'

কিন্তু পেরো তার কথায় সাড়া দিলো না। বরং রাগত স্বরে সে এবার তার কাছ থেকে ডাচেস-এর অতিথিদের তালিকা চাইলো। আগের মতো শ্লথ গতিতে নয়, রীতিমতো দ্রুত বুকসেল্ফের দিকে ছুটে গিয়ে কয়েকটা কাগজের শীট টেনে বার করে পেরোর নাকের ডগায় তুলে ধরলো। ইতিমধ্যে পেরো তার চেয়ারটা ডেস্কের উল্টো দিকে টেনে নিয়ে বসেছিল।

তার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কমিশনার প্রস্তাব করলো, 'তুমি যদি মনে করো আমরা দুজনে এক সঙ্গে তালিকাটা দেখতে পারি।'

কিন্তু পেরো রূঢ় স্বরে তাকে বললো, 'তোমার মতো অপদার্থ লোকের কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন নেই আমার। তুমি বরং রিসেপসন রুমে গিয়ে অপেক্ষা করো, আমাকে একা দেখতে দাও। 'ভয়ার্ত কমিশনার তার হুকুম মতো ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে মিনতি জানায়, প্রয়োজন হলে পেরো যেন তাকে ডেকে পাঠায়। পেরো তার অনুরোধে কান দিলো না, তালিকাটা পড়ার ভান করে চুপ করে রইলো। পরমুহূর্তেই তাকে ডেকে বললো, কাছাকাছি রেস্তোঁরা থেকে তার জন্য নৈশভোজ পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যেন করা হয়। কমিশনারের উপর শেষ আঘাত হানবার জন্য পেরো তাকে ওয়েটার হিসেবে ব্যবহার করলো, তাতেই সে খুব খুশি।

একা একা ঘণ্টা দুই কাজ করলো পেরো! ডাচেস-এর অতিথি তালিকা আর সেন্ট্রাল পুলিশের তৈরী তালিকা মিলিয়ে দেখলো সে। সেন্ট্রাল পুলিশের তালিকার

প্রতিটি নামের পাশে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কি ধরণের লোক, তার চরিত্র, অতীত ইতিহাস, এবং তার গুরুত্বের ব্যাপারে সংক্ষেপে লেখা ছিলো। একজন বিশ্বস্ত পুলিশ স্পাই হিসেবে পেরো তার পেশা বেছে নিয়েছিল। সামাজিক উচ্চাকাঙ্খা কিংবা হিংসা দ্বেষ বলতে তার কিছু ছিলো না। কিন্তু ডাচেস-এর অতিথিদের মধ্যে কাউকে অপরাধী মনে করলে কোনো আপোষ নয় তার সঙ্গে। আপাতত সেই তালিকার মধ্যে তেমন কাউকে সন্দেহজনক ব্যক্তি বলে তার মনে হলো না।

কোনো নেশা নয়, ধূমপান নয়, এমনকি জলে চুমুক দেওয়া নয়, এক মনে পেরো তার কাজ করে চলে। সময় সময় তালিকায় তার পরিচিত নাম দেখে মাথা তুলছিল সে, তখন সে ছাদের দিকে তাকিয়ে সেই পরিচিত ব্যক্তির মুখটা মনে করার চেষ্টা করছিল। এর মাঝে ওয়েটার তাব নৈশভোজের খাবার দিয়ে যায়। পেরো ভুলেও চোখ তুলে তাকায়নি। এমন কি উপযাচক হয়ে ডিসের ঢাকনা তুলে তাকে খাবারগুলো দেখাতেও বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলো না সে উৎসাহী কমিশনারের কাছে। তারপর সে তার নৈশভোজ এবং কাজ একই সঙ্গে শেষ করার পর কমিশনারকে ডেকে পাঠিযে ফাইলগুলো ফিরিয়ে দিলো তাকে। কমিশনারের মনে তখনো কেবল একটাই চিন্তা পেরো একবার অন্তত তার দিকে তাকাক, একটা কথা বলুক তার সঙ্গে, প্রশংসাসূচক না হলেও অন্তত সহানুভূতিপূর্ণ যেন হয়। কিন্তু সেদিকে দিয়ে গেলোনা পেরো। মাথায় টুপিটা চাপিয়ে, তার সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে চলে আসার সময় তাকে উপদেশ দিলো, ভবিষ্যতে ওরকম ভুল যেন আর না হয়।

'আমি কি আশা করতে পারি, মহামহিম সিঙ্কো জানবেন কেমন করে আমি....?' কথার মাঝে হঠাৎ হোঁচট খেলো কমিশনার। দরজাপথে তাকাতেই বিস্মিত হলো সে। পেরো উধাও।

❑ চার ❑

এখনো পর্যন্ত প্রতারণার ষড়যন্ত্রে মাত্র কয়েকটা প্রাথমিক বাধা অপসারণ করেছে। এ কাজে সে একজন সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু এখন তার চলার গতি শ্লথ, অভিযানের আনন্দে মন ভরপুর। তার আসল উদ্দেশ্যর প্রস্তুতিতে মশগুল সে। সে তার পেশার বাইরে সত্যিকারের আনন্দ উপভোগ করে থাকে তার প্রতিবেশীকে প্রতারণা করে। এই আসল সন্তুষ্টির ব্যাখ্যা সে নিজেই করতে পারে না। সম্ভবত এর উৎস ক্ষমতা, প্রতারণার সাহায্যে সেই ক্ষমতা বাড়তে দ্বিগুণ, তিনগুণ হয়ে

উঠেছে, সম্ভবত ছলনা যে তাকে কারোর উপর নজর রাখা তাকে না জানিয়ে পিছন থেকে তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ করে দিয়েছে, এ বোধটাই তার আনন্দের মূল উৎস।

এখন এই যে ষড়যন্ত্রের কাজে সে লিপ্ত—এটা এমনি এক ধরণের যা তার নিজের হৃদয়ের নিজের বিবেকের সামিল। অনুভূতি এবং আচরণের মহত্ব উপলব্ধি করাটাই বিশেষ করে আনন্দ বলে ধরে নেয় সে। সেসব ক্ষেত্রে তার ভণ্ডামী এনে দিয়েছে এক পরিমার্জিত নিষ্ঠুরতা, চমৎকার স্টাইলের উন্নতিসাধন, স্বচ্ছ এবং ক্ষুরের মতো ধারালো। একটা নিয়মিত ছন্দ তার কথা ও কাজের বিকল্প দিকের উপর প্রভাব ফেলে থাকে, যা তাকে মাতাল করে তোলে যতক্ষণ না তার অভিনয় একটা নির্দিষ্ট কাব্যিক গুণের পর্যায়ে পড়ে। পেরো তার নিজের কাজ ছাড়া সত্যি আর কোনো কিছুতেই বিশ্বাসী নয়। কাজ ছাড়া অন্য সব কিছুই তার নেহাতই অসার এবং কুয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হয়। এ সবের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে যাকে সে আদর্শবাদী বলে মনে করে, নিজে সে দেখেছে, একজন উন্নত মনের প্রফেসারকে, তার ছাত্রদের বোঝাচ্ছে, আকাশের রুদ্ররোষের ফলে আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ঝরে পড়ে না, তবে ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকেই বৈদ্যুতিক শক্তির জন্ম। পেরো হয়তো যীশুখৃষ্টকে বিক্রী করে থাকবে, তবে তাই বলে এই নয় যে, অর্থের জন্য কিংবা কোনো অশুভ কামনার জন্য। কিন্তু স্রেফ তাকে দেখানোর জন্য, তিনি যা বলে গেছেন সব ভুল, সব বিভ্রান্তিকর।

পুলিশ স্টেশন থেকে হাতে সুটকেসটা নিয়ে সোজা হাঁটতে শুরু করলো পেরো। মাথার টুপিটা নিচে নামিয়ে চোখ পর্যন্ত ঢেকে দিলো সে। এই মুহূর্তে নিজেকে সে একজন শ্রমিক শ্রেণীর লোক হিসেবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। বিভিন্ন সরু রাস্তা দিয়ে সে তার পথ করে নিয়ে অবশেষে সে শহরে দেওয়ালগুলোর কাছে এসে হাজির হলো। সেই দেওয়াল অনুসরণ করে আরো খানিকটা পথ সে এগিয়ে চললো। তার ইপ্সিত ফটকের সামনে এসে থামলো পেরো। সেই ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সে দেখলো একটা বিরাট মুক্তাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছে সে। ইতস্তত গর্ত ছড়ানো এবং পাথর কুঁচির স্তূপে ভর্তি। পাবলিক স্কোয়ারের থেকে পরিত্যক্ত মাঠ বলেই মনে হয়। যায়গাটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল। তবে আরো খানিকটা অন্ধকারে মাঠের উপর দিয়ে লোক চলাচলে ঘাটতি নেই। আলোকিত বুথগুলোয় ছোট ছোট গোষ্ঠিতে অলস লোকদের বসে থাকতে দেখলো সে। শুটিং গ্যালারি থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসছিল, সেই সঙ্গে হাসি এবং শিষ দেওয়ার শব্দ। মুক্তাঙ্গনের মাঝখানে একটা একটা ফ্ল্যাগস্টাফ দাঁড়িয়ে আছে, তাতে কিছু পতাকা ঝুলে আছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় পতাকাগুলো পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল।

এই মুক্তাঙ্গনে একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো পেরোর। বস্তুত ঐ ফ্ল্যাগস্টাফের ঠিক নিচে। সে জানে, যে লোকটার খোঁজে সে এসেছে, এখানেই কোথাও না কোথাও আছে সে। একটা বুথের কাছে সমবেত জনতার ঝগড়ার আওয়াজ তার কানে আসতেই সেদিকে এগিয়ে চললো সে। এখন সে নিশ্চিত, এরই মধ্যে সে তাব লোকটিকে ঠিক খুঁজে পাবে।

সেই বুথটা ছিলো একটা শুটিং গ্যালারি। লাল জিনিষে এক ধরণের বাক্স ঝোলানো ছিলো, সেই সঙ্গে দুটি এসিটিলিন মশাল, মশাল থেকে চমৎকার উজ্জ্বল শ্বেত-শুভ্র আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। বুথের ভেতরে বিমর্ষ মুখের একটি মেয়ে বসেছিল, মাথা ভর্তি কালো চুল, পবণে শোকের পোশাক। কাউন্টারের পাশে বসেছিল মেয়েটি। রাইফেলে গুলি ভর্তি করে দিচ্ছিল সে। তার মুখে কোনো কথা ছিলো না। একটা ছোট ছেলে, চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে মেয়েটির হাতে কার্তুজ তুলে দিচ্ছিল।

যাই হোক ঝগড়ার কারণ চার পাঁচটি তরুণকে কেন্দ্র করে। তাদের পরণে ট্রাউজার, গোড়ালির কাছে ক্লিপ দিয়ে আঁটা, গায়ে সাইকেল আরোহীর শার্ট। তারা গোল করে ঘিরে ধরেছিল একটি লোককে। যে যেভাবে পারছিল লোকটার সামনে পিছনে এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুঁষি মেরে যাচ্ছিল। এই বিয়োগান্ত নাটকের ভিলেনের মাথাটা বিরাট, পশমের মতো কোঁকড়ান চুল। চোখে পুরু-লেন্সের চশমা। নাকটা ঈষৎ বাঁকা—এক ধরণের মাছের মতো। তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো, লোকটা বুঝি বধির। পরণে কালো জ্যাকেট, তবে তার ট্রাউজার হাল্কা রঙের এবং আঁটো।

'আমাকে একা থাকতে দাও', অবশেষে করুণ মিনতি জানালো সে, পালিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল লোকটা। 'তোমরা তোমাদের নিজের চরকায় তেল দাও। আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছি? আমি এখানে ছিলাম বটে, তবে তোমাদের দিকে ফিরেও তো তাকাইনি।'

'তোমরা চলে যাও, ওকে একা থাকতে দাও', হঠাৎ সুন্দর চুলওয়ালা এক যুবক চিৎকার করে উঠলো, তার মুখে বিজয়ীর হাসি, তাকে দলের নেতা বলেই মনে হলো। 'ওকে একা থাকতে দাও। আমি ওর প্রতিরোধের দায়িত্ব নেবো..... ....' কথাটা বলা মাত্র যুবকটি এক হাতে তার মাথাটা চেপে ধরলো তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়ার আছিলায়, অপর হাত দিয়ে তার ট্রাউজারের পকেট থেকে মদের ফ্লাস্কটা টেনে বার করে আনলো। তার চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে তুললো সে।

কিন্তু লোকটার তখন দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। 'আমাকে যেতে দাও', হাঁপাতে হাঁপাতে বললো লোকটা।

অবশেষে তাকে মুক্ত করে দিলো। লোকটা জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকে, মুখ লাল, নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তার চোখের চশমা উধাও, অন্ধের মতো হাতড়াতে থাকে সে।

'ব্ল্যাকগার্ডস্!' তোতলায় সে। 'খুনী তোমরা! তোমরা দেখবে আমি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারি কিনা।'

তার হুমকি শুনে সুন্দর চুলওয়ালা সেই যুবকটি তার সামনে এগিয়ে গিয়ে তার নাকের উপর তর্জনী ঠেকিয়ে পাল্টা শাসায়, 'তার মানে তুমি ওদের আঘাত করতে চাও? চাওনি? কিন্তু মনে রেখো, এটা স্রেফ একটা উদাহরণ মাত্র........এরপর তোমার দুটো হাতই ভেঙ্গে দেওয়া হবে—বুঝলে?'

নিঃশব্দে দৃশ্যটা দেখছিল পেরো। সত্যি কথা বলতে কি স্যাভেরিওর অমন করুণ দৃশ্য দেখে দুঃখ পেলো না সে। তার মনে হলো, এই ঝগড়ার মধ্যে সে যদি একান্তই জড়িয়ে পড়তো, সেক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর হয়ে অংশ নিতো না সে, বরং তার পীড়ণকারীদের হয়ে লড়তো সে। আর তাকে সে লাথি মেরে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতো। কিন্তু এক সময় তার মনে হলো, তার উপস্থিতির জানান দেওয়া উচিত, এখনি। এগিয়ে গিয়ে সে কাউন্টারের উপর তার সুটকেসটা রাখলো। মেয়েটির হাত থেকে একটা রাইফেল তুলে নিয়ে কাঁধের উপর রাখলো সে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে বারো বার গুণে গুণে গুলি চালালো প্রতিক্ষেত্রে ষাঁড়ের চোখ লক্ষ্য করে। ছেলেদের দল থেকে তার প্রশংসার ধ্বনি উঠলো। ইতিমধ্যে স্যাভেরিও তাকে চিনতে পেরেছিল। তার দিকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে তাকাতে গিয়ে অবশেষে সে তার চশমাটার সন্ধান পেলো এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলো সেখান থেকে। একটা রূপোর মুদ্রা ছুঁড়ে দিলো পেরো, অপেক্ষা করলো মেয়েটির কাছ থেকে তার বাকী খুচরো ফিরে পাওয়ার জন্য। তারপর তার গুণমুগ্ধদের তার প্রশংসায় সরব থাকতে দিয়ে সে তার সুটকেসটা হাতে নিয়ে মুক্তাঙ্গন দিয়ে এগিয়ে চললো।

❑ পাঁচ ❑

পেরো পুলিশ চীফকে বলেছিল, সঠিক লোকের সঙ্গেই হাত মিলাবে সে, তার সেই ঘোষণার মধ্যে দম্ভ ছিলো না। বেশ কয়েক বছর ধরে স্যাভেরিওকে চিনতো সে, এবং এই সময়ে সে তাকে গরম গরমে রেখে এসেছিল। সহজভাবে বলতে গেলে পেরো তার পেশার সুবাদে সামরিক অভিযানের সময় তার মনে হয়েছিল, নিজস্ব একটা গোপন বিদ্রোহীদের দল গঠন করলে কেমন হয়, যাকে বলে একেবারে

উগ্র ধরণের বিক্ষুব্ধ, অনুরক্তদের দলে নিয়ে। এই রকম দক্ষ উদ্ভাবনী প্রথায় সে তার প্রয়োজন দ্বৈতভাবে মেটাতে পারবে, একদিকে অনেক ভালো ভালো অথচ ভয়ঙ্কর চরিত্রের মানুষগুলোকে শান্ত করে রাখতে পারবে, এবং একই সময়ে সরাসরি পুলিশের হুকুমে বিদ্রোহী দলকে তার কাজে লাগাতে পারবে। স্যাভেরিওকে দাঁড় করেছিল উভয় দলেরই আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে। এই বিশ্বাসে যে, রাজধানীতে একটা রহস্যজনক কেন্দ্রীয় কমিটি আছে, যে কমিটির কাছ থেকে সে নিজে ইন্সপেক্টর-জেনারেল হিসেবে তাদের নির্দেশ নিয়ে থাকে ; আর এই কমিটির সঙ্গেই আবার অনেক বড় অন্য এক আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

পেরো তার নিজের পার্টিতে যে সব লোকের নাম লিপিবদ্ধ করেছে, তারা সবাই সহজ সরল, তারা কেউই বাস্তববাদী নয়, স্যাভেরিওর মতো। কারণ সে জানে, এসব কাজে পেশাদার বিক্ষোভকারীরা খুব বেশী অসুবিধায় পড়বে না। তার দলে সরল ও বোকা লোকদের স্থান দিয়ে পেরো তার লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দে মশগুল থাকা ছাড়াও তার অভিনয়ের সুবাদে পুলিশ-স্পাই-এর চেতনাবোধটাও বেশ ভালো ভাবেই রপ্ত করেছিল। কে জানে, আজ নয় কাল কিংবা পরশু সারা দেশের মানুষ বিদ্রোহে ফেটে পড়তেও তো পারে। সেই শুভলগ্নের দিন পেরো তার পুলিশী পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের পিঠের চামড়া বাঁচানোর জন্য নিজেকে একজন চক্রান্তকারী বলে বিজ্ঞাপিত করবে। এ ব্যাপারে সিক্কো তার সাহস ও শৌর্যের ব্যাপারে অজ্ঞ নয় ; কিন্তু তার চীফ হওয়া ছাড়াও কাব্যের কাছেই পেরো তার দলেব অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করেনি। কারণ সে মনে করে, দল তার নিজস্ব সৃষ্টি ; যদি অন্যেরা তার দল নিয়ে মাথা ঘামায়, তার সমস্ত সৌন্দর্য্য এবং প্রেরণা উধাও হয়ে যাবে।

মুক্তাঙ্গন ছাড়িয়ে প্রধান রাস্তার উপর স্যাভেরিওকে ধরলো পেরো। রাতের আকাশে পূর্ণ চাঁদের আলোর হাট বসেছিল যেন। নিচে রাস্তার উপর সারিবদ্ধ গাছের পাতাগুলোর ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া চাঁদের আলোর লুকোচুরি খেলা চলছিল তখন। রাস্তায় অধিকাংশ জায়গা ছায়াবৃত। পেরোর পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল স্যাভেরিও। হঠাৎ পেরোর হাত চেপে ধরে নিচু গলায় শুটিং গ্যালারির যুবকদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে শুরু করে দিলো। তার তোতলামোর জন্য কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিলো বলে একসময় নীরব হলো সে। সব শেষে কথা বলতে গিয়ে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে ফেটে পড়লো, ঠিক যেন থুতু ছিটোচ্ছে। যাই হোক, অনুযোগ করে বলে সে, সময় এলে, পেরো জানে সেই সময়টা কখন আসবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে সে, সেই সঙ্গে যারা তার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করেছিল, তাদেরও এক হাত নেবে সে।

'তা তুমি ওদের কি করবে শুনি?' জিজ্ঞেস করলো পেরো। স্যাভিরিওর হেনস্থা দেখে বেশ মজা উপভোগ করছিল পেরো, তবে সেটা সে বাইরে প্রকাশ করলো না,পাছে স্যাভেরিও তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করে বসে।

তেমনি তোতলাতে তোতলাতে উত্তর দিলো স্যাভেরিও—প্রতি বিপ্লবীদের গুলি করে হত্যা করবে সে—এটাই তাদের প্রাপ্য ছিলো। এই সব লোকেরাই অলস, সুখভোগের জীবনের গোড়াপত্তন করে থাকে, আর এদের সাহায্যেই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার গঠিত হয়ে থাকে। যারা নিজেদেরকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক বলে মনে করে, তাদের থেকে এরা অনেক বেশী বিপজ্জনক। অন্তত এই মধ্যবিত্তরা নিজেদের চরকায় নিজেরাই তেল দিয়ে থাকে। অথচ এই সব লোকেরাই আবার সুস্থ সমাজ এবং বিপ্লবী জনসাধারণকে দুর্নীতিগ্রস্থ করে তোলে। পেরো বলে, সেক্ষেত্রে দেশের অর্ধেক মানুষকে গুলি করে খতম করতে হবে। কারণ বাকী অর্ধেক জনসমষ্টির শক্তি, বা সামর্থ বলতে যেন আর কিছুই থাকবে না, তখন নারী ও পুরুষ গান গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে ষাঁড়ের কিংবা মুরগীর লড়াই-এ লিপ্ত হওয়া ছাড়া অন্য আর কিছু করার কথা ভাবতে পারবে না। উত্তরে স্যাভেরিও বলে, যদি সেটা প্রয়োজন বলে প্রমাণিত হয় তাই সে করবে। তার রক্তে মিশে গেছে বিদ্রোহ। চাতুরির খেলা খেললো পেরো—তার কাছে খোঁজ নিলো, তারা যখন তাকে দেখবে, সে তার ব্যক্তিগত শত্রুদের নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছে, তার প্রতিপক্ষ তাকে অভিযুক্ত করবে এই বলে, যে সে তার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য বিদ্রোহের বীজমন্ত্র ব্যবহার করছে, এ সব কথা কি ভাবেনি সে!

এ ব্যাপারে স্যাভেরিও সব সময় খুবই সতর্ক, কোনো অবস্থাতেই বিস্মিত হয় না সে, তার মধ্যে কোনো রকম গোঁড়ামি নেই।

'হ্যাঁ', প্রতিবাদ করে উঠলো সে, 'এদের মতো পাল্টা বিপ্লবীদের ছেড়ে রাখাটা বিরাট একটা চালে ভুল বলে কি তোমার মনে হয় না?'

পেরোর উত্তর এই রকম ঃ ব্যক্তিগত জীবনটা জনসাধারণের সখ আহ্লাদের সঙ্গে মিশে গেলে হয়তো একটা বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সেটা খুব একটা খারাপ নয়।

উত্তরটা স্যাভেরিওর মনে ধরলো না—তার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করা গেলো, তবে নীরব থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলো সে। এই জন্যই স্যাভেরিওকে ভালবাসে পেরো।

তাদের পদক্ষেপ শুভ সূচনা করলো। তার রাগ এখন প্রশমিত। পেরোর জন্য অনেক প্রশ্ন জমিয়ে রেখেছিল সে। জানতে চাইলো সে, দলের গতিবিধি সম্পর্কে। সেই সঙ্গে কিছু সমালোচনাও করলো সে, দীর্ঘদিন ধরে তার মনে ক্ষোভ জমেছিল।

তবে সে যে অবাধ্য এ রকম একটা ধারণা কমিটির হোক, সেটা তার ইচ্ছে নয়। তবু তা সত্ত্বেও, সে মনে করে, তাকে যদি অনুমতি দেওয়া হয়, দু'একটা মন্তব্য করতে চায় সে—অবশ্যই গোপনে এবং বলাবাহুল্য পেরোর কাছে। এখন সে ভেবেছে, পেরো শুধু তার উপরওয়ালা নয় বন্ধুও বটে। তাছাড়া তার মনে হয়েছে, কড়া সীমিত গণ্ডির মধ্যে থেকেও দলেব যে কোনো সদস্যদের সমালোচনা করার সুপারিশ করা উচিত কমিটির।

স্যাভেরিওর মন্তব্যের সত্যতা স্বীকার করলো পেরো। উৎসাহ পেয়ে স্যাভেরিও এবার বলতে শুরু করলো. লক্ষ্য করেছে সে দলের বিভিন্ন সদস্য অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। পেরোর নিজের কচ্চিৎ আগমন ছাড়া, প্রথম দু'বছর তার সংগ্রামী সদস্য হওয়ার পর থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে কমিটির সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। সে আবো বলে, ঝুঁকি অবশ্যই থেকে যায়, যেমন তার নিজের বেলায, আব সেই ঝুঁকি হলো, অলসতার দরুণ কিংবা বলা যেতে পারে অনিশ্চয়তাব জন্যই হোক, অনেক মূল্যবান স্নায়ুকোষ ব্যবহার না করে করে অচল হয়ে যাচ্ছে। যেমন বলা যেতে পারে, বিশেষ কবে এই গরীব এবং দুর্দশাগ্রস্ত প্রদেশে শ্রমিক ও চাষীদের জন্য অনেক কিছু করার আছে। এই সব লোকগুলো অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে নতুন আহ্বানেব, নতুন কিছু করার জন্য। কেন যে পার্টি গোপন বিক্ষোভ জানানোর জন্য সাবধানে প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যবস্থা করেনা বুঝতে পারি না। শ্রমিক ও চাষীরা চায়, কিছু একটা করে দেখাক, মুখে তুবড়ি না ফাটিয়ে কিছু একটা করে দেখাতে। আর দল বোধহয় তাকে ভুলে গেছে, অনুযোগ করে স্যাভেরিও. অনেক দিন হলো কোনো প্রচার পুস্তিকা পাচ্ছে না সে। কমিটির কার্যনির্বাহক সদস্যরা বোধহয বুঝতে পারেন না, শহরের থেকে গ্রামবাসীরা কখনো কখনো অনেক বেশী কাজের লোক, তাদের অবদান অবহেলা করা যায় না। সম্ভবত তারা এও জানে না, দলের মত ও নীতি প্রচারক শতকরা সত্তর ভাগ নিয়োগ করা হয় অনিয়মিত শ্রমিকদের মধ্যে থেকে। এই সব মানুষের প্রত্যাশা বলতে কিছু নেই, দলের প্রচারে তারা তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে থাকে। এই সব শ্রমিকদের মনে আশা জাগাতে হবে তাদের সংগঠন আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। তার জন্য চাই তাদের একজন নেতা, যে তাদের সুখে দুঃখে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে সর্বক্ষণ। অতএব পেরো যেমন সময় সময় কাজের জন্য তার কাছে এসে দাঁড়ায়, অনুরূপ ভাবে এই সব খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কেনই বা তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারেও স্যাভেরিওর অনেক অভিযোগ আছে। পেরোর ভূমিকা একটা "সেল"-এর মতো। ভালো। কিন্তু অন্য আরো "সেল"গুলোর খবর কি?

তার কথা শুনে ভেতরে ভেতরে দারুণ মজা পাচ্ছিলো পেরো। এ প্রসঙ্গে তার উত্তর একটু অস্পষ্ট যেন—হ্যাঁ, অন্য "সেল"-এর অস্তিত্ব অবশ্যই আছে বটে—কিন্তু সেগুলোর ব্যাপারে তার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। এ রকম একটা উত্তর পেয়ে স্যাভেরিও খুশি হলো। কিন্তু তাকে যে কোন কাজ না দিয়ে একেবারে অলস ও অকেজো করে রেখে ভুল করা হচ্ছে, তার উপর জোর দিতে ছাড়লো না সে। পেরো গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়, খুব শিগ্‌গীর কমিটি তার কাজের সদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু তার আগে তাকে দলের নীতি ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, তার কাছে প্রচুর বই আছে। তার বিশ্বাস, আপাততঃ এই কাজে স্যাভেরিও সময় কাটিয়ে দিতে পারবে। এবার স্যাভেরিও স্বীকার করলো প্রখ্যাত লেখক ফ্র্যান্সিসকো সেগোভিয়ানোর লেখা 'দ্য সিভিলাইজেসন অফ দ্য ফিউচার' বইটা পড়ে অত্যন্ত লাভবান হয়েছে সে—চমৎকার কাজ, দার্শনিক বিরোধিতায় মন যেন আচ্ছন্ন করে রাখে, সেটার বাস্তব যুক্তিতে একেবারে নিখুঁত, যুদ্ধে জয়ের মতোই মূল্যবান কাজ, এ রকম লেখা গত বিশ বছরে সারা সামাজিক সাহিত্যেও স্থান পায়নি। এ উৎসাহে পেরোর পূর্ণ সম্মতি আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে উপদেশ দিতে ছাড়ে না—সেগোভিয়ানোর মধ্যে কাল্পনিক রাষ্ট্রপ্রধানের আত্মপ্রসাদের ইঙ্গিত আছে—যার সব থেকে বড় দুর্বলতা, এর মধ্যে যে বাস্তব যুক্তিবাদ যথাযথ, সেটা ভুললে চলবে না তার, কারণ এই বাস্তব যুক্তিবাদের পৃষ্টপোষক সে; তার এ কথাও ভুললে চলবে না যে, অভিজ্ঞতারই সকল জ্ঞানের একমাত্র উৎস। আর সেই স্থান ব্যতিরেকে সত্যিকারের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান কখনোই সম্ভব নয়। স্যাভেরিওর উত্তর; সেটা খুবই সত্য, এবং সেটা সে মেনেও নিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, হেনরিকের লেখা বৈপ্লবিক কৌশলের সঙ্গে সেগোভিয়ানের লেখা তুলনামূলক ভাবে বিচার করে দেখেছে সে, হেনরিকের লেখা অনেক বেশী উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান। সেগোভিয়ানের লেখার মধ্যে যে অভাবটা আছে হেনরিকের লেখাটা সেটা পূরণ করতে সমর্থ। এক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণ হলো, সংক্ষেপে সেগোভিয়ানোকে যদি স্নায়ুকোষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে হেনরিককে বলা যেতে পারে বিপ্লবের ডান হাত!

কিন্তু এই উৎসাহের মধ্যে স্যাভেরিও চায় একটা নিজস্ব অস্তিত্ব; তাই সে আবার পেরোকে অনুরোধ করে কমিটির কাছে তার প্রসঙ্গটা তোলার জন্য। বিচক্ষণতা দেখিয়ে সে আরো বলে, এই যে সে যেভাবে তার বিশ্লেষণের কথা প্রকাশ করলো, সে চায় না কমিটির সর্বোচ্চ স্তরে জানাজানি হোক। এই সব সমালোচনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তার আশা, কমিটি জানুক, দলের হয়ে কাজ করার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত সে। আর পেরোর আশা যে, খুব শিগ্‌গীর কমিটি তাকে ঠিক মতো জায়গায়

ঠিক সময়ে ব্যবহার করবে।

'সত্যিই?' বেশ উৎফুল্ল হয়েই আমতা আমতা করে আবার বললো স্যাভেরিও, 'সত্যিই?'

'হ্যাঁ,' উত্তরে বললো পেরো।

তারপর স্যাভেরিও আরো বলে, পেরোর কাছে কয়েকটা নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখতে চায় সে। কিন্তু পেরো তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, প্রস্তাব রাখার কাজ তার নয়, বরং অন্ধ বিশ্বাসে পার্টির পরিকল্পনা মতো কাজ করাই তার একমাত্র কর্তব্য। ব্যক্তিগত ভাবে দর কষাকষির মতো মারাত্মক ভুল করা থেকে সে যেন সতর্ক হয়। ইতিমধ্যেই তার সমালোচনা একটা খারাপ ইঙ্গিতের নজির হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেরোর এই সতর্কবানী শুনে স্যাভেরিও এতোই ভীত হয়ে উঠলো যে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাব সংযমে ব্রতী হয়ে উঠলো। এবং নীরবে পথ চলতে থাকলো।

❑ ছয় ❑

আকাশ-ছোঁয়া দুটো গাছের মাঝখানের পথটা এখন অন্ধকারে ছায়াবৃত। এই পথে পা রাখল স্যাভেরিও। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পাতলা রোগাটে এক দীর্ঘদেহী ছায়ামূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়ালো, গাছের ছায়ায় তার মুখটা অস্পষ্ট, প্রায় ছুটে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

'তুমি এখানে কি করছো স্যাভেরিও?' পরিস্কার কণ্ঠস্বর। 'কেঁচো বা জোঁকের সন্ধানে বেরিয়েছো?'

'আ-আ-আমি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম', উত্তর দিলো স্যাভেরিও।

'সাবধান, দেখো, লুড্রা যেন বেরিয়ে না যায়; গেটটা ঠিকমতো বন্ধ করে রেখো,' লোকটার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেলো। তারপরেই তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলো দূর থেকে দূরান্তরে।

'কে ঐ লোকটি?' জিজ্ঞেস করলো পেরো।

'সে—সে—সে—' তোতলাতে শুরু করলো স্যাভেরিও। তারপর কোনো রকমে সে তার অসুবিধেটা কাটিয়ে উঠে বললো, 'আমার সৎভাই সেবাস্টিয়ানো।'

'আহ্ সেবাস্টিয়ানো', অস্বাভাবিক ভাবে তার কথার পুনরাবৃত্তি করে ঘুরে দাঁড়ালো পেরো। এই সৎভাই-এর অস্তিত্বের খবর জানতো পেরো। কিন্তু মাত্র কয়েকবারই সে তাকে দেখেছে, তাও দূর থেকে। একজন বিত্তবান জমিদার রিভাস এবং নম্র স্বভাবের চাষী মেয়ের সঙ্গে স্যাভেরিওর যোগাযোগ ছিলো। রিভাসের

মৃত্যুর সময় স্যাভেরিওর বিশৃঙ্খল অবস্থা—যাকে বলে কর্মচারি এবং আত্মীয়র মধ্যে টানাপোড়েন। একই ভিলায় স্যাভেরিও এবং তার সৎভাই থাকতো। কোনো কোনো সময় তাদের মধ্যে এক সপ্তাহ কিংবা তারও বেশী সময় দেখা-সাক্ষাৎ হতো না। স্যাভেরিও থাকতো ভিলার বাইরে একটা কেবিনে; আর সেবাস্টিয়ানোর ঘর ছিলো ভিলার ভেতরে, ঘরটা ছোট হলেও বেশ সাজানো গোছানো। ওদিকে রিভাস ছিলো অত্যন্ত অসৎ-চরিত্রের লোক, সেবাস্টিয়ানোর জন্য ভিলাটা রেখে গেলেও সেটা ছিলো বন্ধক। বাকী সম্পত্তি তার ধার দেনা মেটানোর জন্য বিক্রী করে দিতে হয়। স্যাভেরিওর মতে তার সৎভাই সেবাস্টিয়ানোর বৈপ্লবিক কোনো চিন্তাধারা নেই—এর জন্য পেরো তাকে প্রায়ই ভর্ৎসনা করে থাকে। পেরোর ধারণা, সেবাস্টিয়ানো একজন সৎ ভদ্রলোক—এবং জমিদার—এ নিয়ে স্যাভেরিওর অভিযোগ কম নয়। স্যাভেরিও তার বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে, তার বাবা তাকে এভাবে পথে বসিয়ে গেলেও সেবাস্টিয়ানো এখন তার মতোই বিত্তহীন, কপর্দকশূন্য। সে যাইহোক, স্যাভেরিও আরো বলে, সেবাস্টিয়ানোর মধ্যে শ্রেণী চেতনাবোধ আছে।

এক সময় তারা ভিলায় এসে উপস্থিত হলো। গেটের ওপারে অন্ধকারের মধ্যে একটা কুকুরকে লাফাতে দেখা গেলো। এই হলো সেই লুড্রা। স্যাভেরিও তাকে তার ছোট্ট কেবিনের ভেতরে নিয়ে গেলো। এখানেই সে তার অতিথির সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে নিতে চাইলো। সে বলে, শহরে তাদের আলোচনার কথা কেউ শুনে ফেলতে পারে।

কেবিনের মাত্র একটাই জানালা এবং একটা দরজা। ঘরে ঢুকে পেরো দেখলো ঘরটা বেশ বড় সাইজের। কয়েকটা ফার্নিচার ছাড়া ফার্নিচার বলতে কিছু ছিলো না। এলোমেলো বিছানা। টেবিলের উপর ইতস্ততঃ ছড়ানো কিছু কাগজপত্র, আর একটা সেকেলে টাইপরাইটার। ঘরের এক কোণায় প্রচুর উগ্রবাদী এবং সোসালিস্ট প্রকাশকদের বই, জনপ্রিয় সংস্কৃতি, প্রচার পুস্তিকার বন্যা বয়ে গেছে তার ঘরে। তবে এ সবই পুরনো, বছর তিরিশ আগেকার।

'এতো বই?' পেরো তার বিস্ময় প্রকাশ না করে থাকতে পারলো না।।

স্যাভেরিও মাথা নাড়লো, এবং গর্ব করে বললো, তার সংগৃহীত বইগুলো খুবই উচ্চমানের, লাইব্রেরীতে রাখার যোগ্য! তারপর বিছানার তলা থেকে টেরেসাবিরোধী কয়েকটা পুস্তিকা বার করে পেরোকে দেখালো। দুঃসহ যন্ত্রণায় সেগুলো সে আড়াল করে রেখেছে। একটা পুস্তিকার প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে—একটা বিরাট দৈত্যের মতো শ্রমিক শৃঙ্খল ভাঙবার চেষ্টা করছে। আর ছোট-খাটো মাপের টেরেসো হিংস্র সিংহকে পোষ মানানোর জন্য চাবুক হাতে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে শাসাচ্ছে তাকে।

'ওরা যদি জানে, এগুলো আমার কাছে আছে,' স্যাভেরিওর চোখে মুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'ওবা আমাকে কি যে করবে কে জানে! তবে সৌভাগ্যের কথা যে, দেশের এই প্রান্তের সবাই আমাকে এক ধরণের লোক বলে মনে করে থাকে।'

হ্যাঁ, তুমি ঠিক তাইই বটে, 'মনে মনে ভাবলো নির্দয় পেরো। একটা নিচু টুলের উপব বসে সুটকেসটা তার পাশে রেখে পেরো তার মাথার উপর থেকে টুপিটা খুলে ফেললো। তারপর ঠাণ্ডা গলায় স্যাভেরিওর সঙ্গে গম্ভীর ভাবে আলোচনা কবতে শুরু করলো। শুরুটা তার এই রকম ঃ দীর্ঘ সময় ধরে সেন্ট্রাল কমিটি তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখাব উদ্দেশ্য হলো, প্রথমে তার আনুগত্য যাচাই কবে দেখা, দ্বিতীয়ত অভ্যুত্থান কিংবা অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওযাব মতো সময় তখনো আসেনি। যাইহোক, এখন কমিটির সদস্যরা বেশ ভালো করেই জানে, তারা তাকে তাদের সব থেকে সৎ ও বিশ্বাসী কর্মী বলে গণ্য করতে পারে (এখানে স্যাভেরিও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পেরোব সঙ্গে কবমর্দন করে বললোঃ "দয়া করে ও কথা আমাকে বলবেন না")। তাছাড়া এখন সেই মুহূর্তটি এসে গেছে। একথা বলে এখানে একটু থামলো পেরো স্যাভেরিওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে স্যাভেরিও এমন ভাব ভঙ্গি করলো যার অর্থ বলতে গেলে এই রকমঃ "আমি প্রস্তুত।"

'কেউ শুনছে না তো?' জিজ্ঞেস করলো পেরো, এবার তার মধ্যে সত্যিকারেব চিন্তার ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল। স্যাভেরিও তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'না, সম্ভবত কেউ শুনছে না।'

তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে পেরো বলে, সে হয়তো শুনে থাকবে, রাজকুমারী গোরিনা আগামীকাল তাঁর ভিলায় একটা বিরাট ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি দিতে যাচ্ছেন। উত্তরে স্যাভেরিও জানায়, হ্যাঁ, ভালো রকম জানে সে। সেই সঙ্গে সে এও জানিয়ে দেয় যে, এ ধরণের রাজকীয় বিলাসিতা গরীব শ্রেণীর মানুষ ঘৃণার চোখে দেখছে, তাদের ধূমায়িত ক্রোধ যে কোনো মুহূর্তে ফেটে পডতে পারে।

পেরো তাকে বোঝায়, জেনারেল টেরেসো নিজে এই পার্টিতে স্বয়ং হাজির থাকছেন, এ খবর বোধহয় তার জানা নেই। স্যাভেরিও তার পুরু লেন্সেব চশমার আড়াল থেকে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করলো। হ্যাঁ, তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে পেরো আবার শুরু করে, টেরেসা সেখানে উপস্থিত থাকছেন, সে ব্যবস্থা এক রকম পাকা। সেন্ট্রাল কমিটি এখন মনে করছে, উপযুক্ত সময় এসে গেছে এখন। তারা এখন নিশ্চিত আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর জন্য তারা তার উপর বিশ্বাসী, স্যাভেরিও। একমাত্র তারই এই সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা আছে। যে ভাবেই হোক

এই ঘৃণিত সরকারকে শেষ পর্যন্ত গদিচ্যুত করতে হবে।

কথাগুলো শুনে স্যাভেরিওর বুক ফুলে উঠলো, তার মুখ দেখে মনে হলো, এতে খুবই মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে সে, বিস্মিত না হয়ে পারলো না সে। স্যাভেরিও তখন এতো বেশী উদ্বেলিত যে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পেরোর সঙ্গে করমর্দন করে বলে, আজকের দিনটা তার জীবনে সব থেকে সুখের দিন। কাজে নেমে পড়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত সে। এমন কি প্রয়োজনে সে তার জীবন দিতেও প্রস্তুত। এই মুহূর্তে স্যাভেরিও যেন অন্য মানুষ। অন্য মন নিয়ে পেরোর সঙ্গে কথা বলছিল, তার কেতাবী প্রচার, দম্ভ সব যেন উধাও, এখন সে ভয়ঙ্কর বাস্তববাদী হয়ে উঠেছে। সব যুক্তি-তর্কের উর্দ্ধে উঠে সে এখন প্রমান করতে চাইছে, সেই শুভ লগ্নে নিজেকে সে আত্মবলি দিয়ে প্রমাণ করবে, দলের সে একজন সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য কর্মী। পেরোর এখন যা ক্ষমতা, আধিপত্য—আজ সে যদি এই অবস্থায় এসে না পৌঁছতো, তাহলে তার ধারণা, এতো দিনে সে এখন যে অবস্থায় আছে, তা থেকে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারতো। তবে তাই বলে এই নয় যে, তার সেই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, যার মোহে সে আচ্ছন্ন, নিজের খুশি মতো কাজ করবে সে; বরং সে তার আন্তরিকতা দিয়ে, তার জীবন দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় দেশের স্বার্থে। ওদিকে পেরোর মনে হলো, স্যাভেরিওর উৎসাহের জোয়ারটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, এতোটা দরকার ছিলো না, অন্ধ বিশ্বাসই যথেষ্ট ছিলো। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তারা দুজনে মিলে আলোচনায় বসলো, তার পরবর্তী কাজের ব্যাখা করলো এই ভাবে ঃ

আগামীকাল তারা দুজনেই ডাচেস ভিলায় উপস্থিত থাকবে। রাজকুমারীর পরিচারকের পোশাকে যাবে তারা। অন্যতম খানসামার সঙ্গে আগেই একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে পেরোর, পার্টির মনোনীত সদস্য সে একজন। প্রমোদ অনুষ্ঠানের মধ্যে এইভাবে তারা অনায়াসে স্থান করে নিতে পারবে। এবং জেনারেলের ব্যাপারে তারা তাদের খুশী মতো কাজ করতে পারবে। তবে বিচক্ষণতার দরকার। কাজটা এই রকম হবে ঃ যখন সব কিছু ঠিক ঠিক চলতে থাকবে, তখনি কাজটা সারতে হবে, এক মুহূর্তের ভুলের জন্য তাদের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে। অতএব সাবধান! পেরো তার সুটকেসে একটা টাইম-বোমা নিয়ে এসেছে। সেই বোমাটা সে স্যাভেরিওর হাতে তুলে দেবে। খাবারের ট্রে আনার অছিলায় টেরেসোর ঘরে প্রবেশ করবে সে, এবং বাথরুমে সেই বোমাটা লুকিয়ে রেখে আসবে। অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা, জেনারেলের রেহাই পাওয়ার সুযোগ খুবই কম! শুধু টেরেসোর ঘরই নয়, সম্ভবত সারা ভিলা এই বোমা বিস্ফোরণে উড়ে যেতে পারে। বোমাটা রাখার আধঘন্টার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটবে

অতএব সেখান থেকে পালিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট সময় তারা পাবে। ষ্টেশনে পৌঁছে রাজধানীর প্রথম ট্রেনে চেপে বসবে। সেখানে তাদের কমিটির বন্ধুরা জেগে উঠবে। সব কিছুই নিখুঁত ভাবে আয়োজন করা হয়েছে। আর এই যে স্যাভেরিও তার সামনে এখন বসে আছে একজন দীন দরিদ্রের মতো বেকার অবস্থায়। তিন দিন পরে এই স্যাভেরিওই নতুন সরকারের একজন সদস্য হবে। তখন ক্ষমতায় আসবে বিপ্লব ও সত্যিকারের বিপ্লবীরা।

পেরো ভেবেছিল, স্যাভেরিও যখন এই অভূতপূর্ব প্রস্তাবের মুখোমখি হবে ভয়ে সে কাঁপবে, কিংবা অন্তত একটু ইতস্ততঃ করবে। কিন্তু কার্যত তা হলো না। আর একবার লাফিয়ে উঠলো স্যাভেরিও—তার স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর; সম্পূর্ণ প্রস্তুত সে। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, পেরো তাকে দায়গ্রস্ত করবে না তো! কে জানে কি ঘটতে যাচ্ছে তার জীবনে। সে বলে, হয়তো এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহারে তার অতীতের সব গ্লানি মুছে যেতে পারে। আর পেরোর প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা তার রক্তে মিশে থাকলেও, এবং তার মনটা বিরোধী মনোভাবের হলেও, এই অভাবনীয় পরিণতির জন্য স্যাভেরিওর সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছে সে, এমন কি তার সঙ্গে পাল্টা আলিঙ্গন করতে কোনো দ্বিধা নেই তার মনে এখন। তার এবং তার শিকারের মধ্যে এই আলিঙ্গন সম্ভবত অন্য এক মুহূর্তে তাকে আনন্দ দিয়ে থাকবে! তবে দুদিনের পথ পরিশ্রমে এবং স্নায়ুর উপর চাপ পড়ার দরুণ তার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। সে এখন বিছানায় তার দেহটা এলিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। একই নিরীখে স্যাভেরিও এ নিয়ে খুব বেশী চিন্তা করতে চাইল না।

সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো। চোখ থেকে চশমাটা সরাতেই তার সুন্দর নীল চোখ দু'টির দ্যুতি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আর স্যাভেরিওর ক্ষেত্রে, প্রতিবেশীদের অত্যাচার এবং দুর্ব্যবহার তুচ্ছ করে তার মনটা এখন সামাজিক সংস্কারসাধনের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। তার বিশ্বাস, একমাত্র পেরোর কাছেই আন্তরিক ভাবে সে সব কথা বলতে পারে। তাছাড়া পেরো তাকে দারুণ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, যাকে বলে ঈর্ষা করার মত প্রশংসা। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও স্যাভেরিও একজন উৎসাহী পুরুষ, পেরোর কাজের ধারা, তার শান্ত প্রকৃতির মেজাজ, তার অতি কঠিন বৈপ্লবিক চিন্তাধারা স্যাভেরিওর কাছে প্রশংসনীয়। সব থেকে বড় কথা হলো, কোনো ব্যাপারেই তার কখনো ভুল পদক্ষেপ হয় না। স্যাভেরিওর ধারণা, সে নিজেই অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, এবং আবেগপ্রবণ বেচারা স্যাভেরিও, সে একজন অতি নগন্য ব্যক্তি, তবু পেরোর আরোপিত সাহস ও সচেতনতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সে। তার কাছে এর ব্যাখা হলো—বাস্তব ক্ষেত্রে

এর কারণ হলো, পেশাদার প্রচারকের নিরাপত্তা এবং অনুভূতিশূন্যতা।

অভ্যুত্থানের প্লটে অংশ নেওয়ার জন্য রাজী হয়ে গেলো স্যাভেরিও। সে তার নিষ্ঠা এবং গভীর ভাবপ্রবণের ব্যাপারে খুবই সচেতন। সে যে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এর মূল কারণ হচ্ছে, সে এখন সব দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছে, সে তার আদর্শের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে সব ভয়, সব দ্বিধা; সে এখন সব রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েও দেশের জন্য তাব জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তার অনুভব—এই মুহূর্তে পেরোও নিশ্চয়ই একই মনোভাবের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। এবং এ যেন আত্মবিশ্বাস অর্জনের এক বিরল উৎসাহ প্রদান। যাই হোক, এখন সেই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সে নিজেই নিজেকে বলে, একই সঙ্গে দু'জন বিক্ষুব্ধের দু'জন ষড়যন্ত্রকারীর স্থান হতে পারে না, তবে একই ভাগ্যের সন্ধানে দু'জনে ভাই ভাই হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

পেরোকে সে বলতে শুরু করলো, ভয় পায়নি সে। তার শুধু ভয় বলতে কিছু নেই নয়, অবশেষে যে সম্মান সে পেতে যাচ্ছে, যদিও তার জন্য সে কখনো তেমন আকুল ভাবে কামনা করেনি, তবু সেজন্য পেরোব কাছে কৃতজ্ঞ সে। সে যখন একবার কথা বলতে শুরু করেছে, কতো দিন পরে তারা আবার নিঃসঙ্গ হবে, সে কথা তার জানার দরকার নেই। সে মনে করে, এই যে তার এখন ইচ্ছে হচ্ছে প্রচণ্ড ভাবে কৃতজ্ঞতা জানানোর, সেই ইচ্ছেটা সে শুধু প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হতে চায় না, তার ব্যাখ্যাও সে করতে চায় না। পেরো কি তার কথা শুনতে চাইবে? পেরো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার আগে বলেছিল, সে যেন আর কথা না বাড়ায়। তারপর স্যাভেবিও একেবারে প্রথম থেকে শুরু করলো, সে যখন সদস্য ছিলো না, তার তখনকার মনের অবস্থার বিবরণ দিতে থাকে। তখন সে, বলতে গেলে একেবারে নিঃসঙ্গ, বর্ণনাতীত একাকিত্বের যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। শুধু কি তাই, সে তখন অসহায়, প্রতিহিংসাপরায়ণ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং নিজের সম্পর্কে ও সারা বিশ্বের সমস্যার ব্যাপারে বিচার বিবেচনা করার পক্ষে উপযুক্ত ছিলো না সে। তখন তার সত্যিকারের কোনো মূল্যই ছিলো না, এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার মতোও কেউ ছিলো না। নিজেকে সে তখন এক সমাজচ্যুত মানুষ বলে মনে করতো; তবু তা সত্ত্বেও এক সময় প্রচণ্ড উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে সে, আর সেই নিজেকে সে বিরাট কিছু করার উপযুক্ত বলে মনে করে—তবে অভ্যুত্থানের অংশ নেওয়ার সুযোগ যদি তাকে দেওয়া হয়। এসব ছাড়াও সে মনে করে, অহংভাব যথেষ্ট নয়; সাধারণত যা বলা হয়ে থাকে—সম্মানিত ব্যক্তি কিংবা শান্তিতে নিজে এবং অপরের সঙ্গে বসবাস করার নামে নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কারোর কথা তোয়াক্কা না করাটা অন্যায়। সত্যি কথা বলতে কি কেবল নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখা, নিজের

ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধার কথা ভেবে কেউ একা একা বাঁচতে পারে না। বরং তার বদলে অন্যের দুঃখে, অন্যের কষ্টে প্রত্যেকেরই সহানুভূতি থাকা উচিত, অন্যের অভাব-অভিযোগ উপলব্ধি করার মতো তার মনকে সেই ভাবে তৈরী করা উচিত। আর প্রত্যেকেরই উচিত তার উপরওয়ালার অনুগত হওয়া। প্রত্যেকেরই উচিত আদর্শবাদে বিশ্বাসী হওয়া। প্রত্যেকেরই একটা উচ্চাকাঙ্খা থাকা উচিত, তবে তাই বলে এই নয় যে, সেটা কেবল নিজের ব্যক্তিগত উন্নতি লাভের জন্য। তবে হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই ঠিক যেদিন থেকে পেরোর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেদিন থেকেই তার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসে, তার সারাটা জীবন বদলে যায়। তখন থেকেই তার মনে কোনো সন্দেহ নেই, নেই কোনো দ্বিধা, বিরক্তির অনুশোচনা, নিজের কাছে কিংবা জগতের কাছে নিজের জন্য কোনো দাবী দাওয়া বলতে কিছু নেই তার। ঝোড়ো হাওয়া আকাশের মেঘ কেটে যাওয়ার মতোই তার মনটা তখন থেকেই নির্মল, স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল সে, দলের একজন সদস্য হতে পেরে তার মনের জোর অনেক বেড়ে গিয়েছিল; শুধু তাই নয়, একটা নির্ভেজাল শক্তির উৎস তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অভ্যুত্থান বলতে যে কি, যখন সে জানতো না, এবং প্রতিদিন যখন তার মনে হতো, উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করতে করতে সে এক বিষাক্ত পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, তখন সে এক বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছিল, তার অসহায় অবস্থা কেটে যাবে, তার মনের আকাশ থেকে সব ভাবনার মেঘগুলো একটু একটু করে কেটে যাবে। এখন সে দুনির্বার শক্তিতে অনুপ্রাণিত, এখন সে তার প্রতিটি কথা ও কাজের পেছনে যে একটা নিরঙ্কুশ যুক্তি আছে, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। আগে তার সামনে ছিলো বহু পথ, বহু মত, মনে হতো একটার থেকে আর একটা বুঝি ভালো; আর এখন তার সামনে একটাই পথ; পেরো তাকে যে পথের নির্দেশ দিয়েছে, সেটা।

দলে তার সদস্যপদ তাকে যে কি ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, সেটা ব্যাখা করার জন্য বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন স্যাভেরিও। এ অনুভব বিশ্বাসযোগ্যতার, বিপজ্জনক নিরাপত্তার। যেমন এক বিরাট দৈত্যের হাতের মুঠোয় বন্দী হয়ে গেলে যে অবস্থা হয়, সে জানে, এখন সে তাকে যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে, তবু যে তাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছে, কোথায় যে সে চলেছে ঠিকানা না জেনেই। তার উপলব্ধি হলো, সারাটা জীবন ধরে সে তার এই ইঙ্গিত পথটার জন্য আকুল আকাঙ্খা করে এসেছে—অন্ধের মতো আনুগত্য দেখিয়ে দেশের হয়ে কাজ করার জন্য, তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মানার জন্য, সব থেকে ভালো আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য। যে আদর্শে তারা বিশ্বাসী তার থেকে অন্য আর কোন্ আদর্শ মহৎ হতে পারে? পৃথিবী এখন অসতে ভরে গেছে। তাই তারা পৃথিবীকে তার আগের

সেই ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চায়—তবে উপরে উপরে চাকচিক্য এনে নয়, একেবারে ধ্বংস করে নতুন বিশ্ব গড়তে চায় তারা আবার। এ সবই তার পেরোর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া। এখনো পর্যন্ত নীরব ছিলো সে, কিন্তু এখন সে বৃহত্তর কাজে যখন নিজেকে নিয়োজিত করতে যাচ্ছে, তার ধারণা এ ব্যাপারে পেরোর সঙ্গে খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা করা উচিত। তারপর সে প্রশ্নাতীত ভাবে তার একান্ত অনুগত হয়ে যাবে, এবং দলের বহু সৈনিকের মধ্যে একজন হয়ে যাবে সে।

স্যাভেরিওর এই বক্তৃতা মনে ধরলো পেরোর। তার মতো একই মনোভাব যে সে পোষণ করে থাকে, সে কথা না বলে থাকতে পারলো না পেরো। সে আরো বলে, যৌবনে সিক্রেট পুলিশে যোগদান করে এই রকম অভিজ্ঞতাই হয়েছিল তার। দলের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করা এবং অন্ধের মতো আনুগত্য বজায় রাখার মধ্যে যে কি আনন্দ, কি সুখ তা সে পরীক্ষা করে দেখেছে।

শুরুতে তাকে একটা ভয়ঙ্কর জটিল কাজের ভার দেওয়া হয়, আর সেই কাজে দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব করেছিল সে। অবশ্যই কাজের কথা বিবেচনা করে পেরো, কাজ বলতে দলের হয়ে কাজ করা, যে কাজে একটা আলাদা অনুভূতি আছে, আছে সে কাজের ঝুঁকি, জীবন বিপন্ন হওয়ার ইঙ্গিত, তবু পেরো মনে করে, কাজ কাজই, আর যে কাজে দলের অন্য সব সদস্যের স্বার্থ জড়িত, সে কাজ করার মধ্যে একটা আলাদা মাদকতা আছে, যা ব্যক্তিগত কাজের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী মহৎ এবং উদারতা প্রদর্শনের একটা প্রকৃষ্ট উপায়। তবে স্যাভেরিওর মতো সেই কাজের বৃহত্তর স্বার্থে মানবিক মহত্বর কথা সে তার চিন্তায় স্থান দেয় না যেমন ঠিক তেমনি আবার আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সে যে পুলিশের কাজে তার দক্ষতা প্রদর্শন করে এসেছে এতোদিন, তাদের দুজনের এই চিন্তাধারার তফাতটা যে কোথায়, সেটাও বিশ্লেষণ করে দেখেছে সে। কিন্তু তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। পেরো তার নিজের চিন্তাধারার সূত্র ধরে তার বক্তব্যের ইতি টানতে গিয়ে নিজের মনে বলে, স্যাভেরিওর এই স্বাভাবিক প্রবণতাই হয়তো তাকে অত্যন্ত ভালো এক সিক্রেট এজেন্টে পরিণত করতে পেরেছে। তার এতো সব গুণ থাকা সত্বেও, স্যাভেরিওর জন্য করুণা হয় তার, তার সত্যিকারের বিপ্লবী হওয়ার পথে কিসের বাধা থাকতে পারে! কিন্তু সে যাইহোক, এখন তার ভাগ্য একেবারে নিয়ন্ত্রিত, এবং কিছু করার নেই এখন আর।

ভাবাবেগে স্যাভেরিওর চোখে জল এসে গিয়েছিল, চোখের উপর থেকে চশমাটা সরিয়ে অশ্রুসিক্ত কাঁচ মুছলো সে এবং আবার সে তার কাজের প্রসঙ্গে ফিরে এলো ভাবাবেগের আতিশয্য দেখিয়ে। পেরোর কাছে জানতে চাইলো সে,

কখন তাদের ডাচেস ভিলায় উপস্থিত থাকতে হবে। হাই তুলে পেরো বলে, পরদিন খুব ভোরে তাদের যেতে হবে। আর আজ রাতটা সে স্যাভেরিওর কাছেই কাটাতে চায়। তার আশা, স্যাভেরিও তার জন্য আর একটু ভালো বিছানার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। রাতটা পেরো তার কাছে থাকছে শুনে মনে মনে খুব খুশি হলো সে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে বললো, পেরোর জন্য সে তার নিজের বিছানা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র কোথাও রাতটা কাটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সে। এতে আপত্তি জানালো পেরো। স্যাভেরিওর বিছানার দিকে তাকাতে গিয়ে পেরো দেখলো, বিছানার চাদরটা এখনো তেমনি নোংরা, অগোছালো, তেমন ভাবে সেটা তাকে আকর্ষণ করতে পারলো না। তাই সে স্যাভেরিওকে বললো, তার জন্য একটা কম্বল এবং কয়েকটা বালিশের ব্যবস্থা করার জন্য। কোনো উত্তর না দিয়ে সেগুলো আনার জন্য কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো স্যাভেরিও।

❑ সাত ❑

স্যাভেরিও যদি তার উৎসাহের আতিশয্য একটু কম দেখাতো, তাহলে সে তার কেবিন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজার ঠিক পিছনে কাউকে দেখতে পেতো, সেই লোকটি সেবাস্টিয়ানো, তার সৎভাই। পেরোকে সে এর আগে কখনো দেখেনি, তাই কৌতুহলবশতই জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল সে কেবিনের ভেতরে ওরা কি করছে, দেখার জন্য। দীর্ঘদেহী মার্জিত চেহারার পেরো যে স্যাভেরিওর অত্যন্ত বিস্ময়কর একজন সঙ্গী, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। তাদের এই ভাবে অনুসরণ করা যথেষ্ট বলেই মনে হলো সেবাস্টিয়নোর। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু শুনে নিজেকে সে বলে, 'কেই বা এরকম অনুমান করেছিল? মনে হচ্ছে এ বাড়িতে আমিই একা বোকা লোক। তা না হলে এমন একজন ক্রটাসকে দেখতে হয়....'

স্যাভেরিওকে এক গাদা বালিশ এবং কম্বল নিয়ে ফিরে আসতে দেখে ভাবলো সে, এবার তারা শোয়ার তোড়জোড় করবে। অতএব তাদের বিরুদ্ধে এখন গোয়েন্দাগিরি করার আর কোন প্রয়োজন নেই। তাই সে ভিলায় ফিরে গেলো অতঃপর।

বাবার ধার-দেনা শোধ করতে ভিলার সমস্ত আসবাবপত্র বিক্রি করে দিতে হয়েছে সেবাস্টিয়ানোকে। তাই খড়ের গদি আঁটা চেয়ারের উপর সে তার টুপি আর হাতের চাবুকটা (ঘোড়ায় চড়তে ভীষণ ভালবাসে সে, কিন্তু ঘোড়া এখন

কোথায়? তবু ঘোড়ায় চড়ার পোশাক সে পরে থাকে এখনো) রাখে। তারপর সে তিনতলার অন্ধকার সিঁড়ি-পথে এগিয়ে চললো শোয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। দু'তিনটে ঘর পেরোতে হলো তাকে—ড্রইংরুম, বসবার ঘর, এক সময় আসবাবপত্রে ভর্তি থাকতো, কিন্তু এখন শূন্য। ঘরগুলো অন্ধকারে ডুবে ছিলো। ইলেকট্রিক বাল্বগুলো এখনো ঝুলছে—এক সময় কতো না রোশনাই ছড়িয়ে পড়তো বাল্বগুলো থেকে। অন্ধকারে পথ খুঁজে নেওয়াটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন। সে যে অন্ধকারে ভয় পায় না, এক সময় মা'র কাছে সেটা প্রমান করার জন্য এই ভাবে অন্ধকারে এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়াতো। তখন আরো অসুবিধা ছিলো, ঘর ভর্তি আসবাবপত্র, অথচ কোথাও একবারও হোঁচট না খেয়ে দিব্যি সে চলতে ফিরতে পারতো। কিন্তু কে তখন জানতো, সেদিনের সেই সখের খেলা আজ অভাবের তাড়নায় এভাবে অন্ধকারের মধ্যেই তাকে জীবন কাটাতে হবে, বলতে গেলে এক রকম বাধ্য হয়েই! সে যাইহোক, সততার সঙ্গেই একান্ত বিশ্বাসী সে, বেড়ালের মতোই অন্ধকারে সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পায়।

এইভাবে তার অন্ধকারে পথ চলার অভ্যাসের একটা সুফল সে পেয়েছে—তার এখন মনেই হয় না, আসবাবপত্র সব বিক্রী হয়ে গেছে, বাড়ি এখনো আসাবাবপত্রে সাজানো রয়েছে, তার মা এখনো বেঁচে আছে, এবং সে এখনো কিশোরই রয়ে গেছে। তার বিশ্বাস, কোনো কিছুই ঘটেনি তার বাবার মৃত্যুর পর। আগের মতোই সব ঠিকঠাক চলছে এ বাড়িতে। বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে আছে বলেই সব কিছুর অভাব ঢেকে গেছে এই অন্ধকারে। সেই অন্ধকারে দু'তিনটে ঘর পেরিয়ে মায়ের ঘরে এসে একটু সময়ের জন্য থমকে দাঁড়াতো নিঃশব্দে। 'শুভরাত্রি... ...' এত আস্তে বলতো সে, যাতে করে মা'র ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। তারপর অন্ধকারে বেড়ালের চোখ নিয়ে সে তার ঘরে ফিরে যেতো ঘুমোবার জন্য। এখন তার মা মৃত, আসবাবপত্রও সব পুরনো ফার্নিচারের দোকানে বিক্রীর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। কিন্তু সেবাস্টিয়ানোর এখনো বিশ্বাস, তার ছেলেবেলার সব কিছুই ঠিকঠাক রয়েছে। এখনো সে প্রতি রাত্রে মা'র ঘরে ঢুকে মনে মনে মাকে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের শয়নকক্ষে চলে যায় শোবার জন্য।

সেবাস্টিয়ানো যেন এখন আগের মতোই ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। এমন সব ছেলেমানুষি খেলা খেলে—ভান করে সে, যেন সে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির মানুষ। নিজের সত্যিকারের জীবন থেকে সে নিজেকে আলাদা করে রাখতে চায়। একঘেয়ে জীবনকে ভীষণ ভয় করে সে। সব থেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো তার বিচারবুদ্ধিহীন পণ্ডিতসুলভ মনোভাব। জীবনটা যে এক ধরণের অভিযান, ভাবতে খুব ভালো লাগে তার, এর মধ্যে খারাপ কিছু ঘটার আশঙ্কা থাকে না, যা করা যায় সেটাই চূড়ান্ত।

অতএব শুতে যাওয়ার আগে রোজকার অভ্যাসমতো মাকে শুভরাত্রি জানিয়ে তার ভাবতে ভালো লাগে, তার মা আগের মতোই সুন্দরী ও যুবতী আছে, এবং বেঁচে আছে, তাদের পরিবারের কবরস্থানে তার মা'র কবর দেখতে কখনো যায়নি সে। এবং একইভাবে তার মা'র মৃত্যু মেনে নিতে চায় না সে, বিশ্বাসই হয় না তার মা মারা গেছে, যেমন সে বিশ্বাস করে না তার এই ভিলার উত্তরাধিকার হওয়ার সর্বনাশা ঘটনাটা। তার এই অবিশ্বাস্য মনোভাবের দরুণই এই সব অমঙ্গলের চিন্তা তার মনে হয় না কখনো, এবং সে এমন ভাব দেখায় যে, যেন এ সব কখনোই ঘটেনি।

আজ সন্ধ্যায় অন্য দিনের মতো মাকে শুভরাত্রি জানিয়ে তার ঘরে ফিরে এসে সেবাস্টিয়ানো তার পোশাক ছাড়ার আগে বিছানার ধারে গিয়ে বসলো। পর্দাবিহীন জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোর প্লাবন ঘটে গিয়েছিল তার বিছানায়, ঘরে, সর্বত্র। 'এখানে আমি কি এক বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে গেছি', ভাবতে শুরু করলো সে, 'একটা প্লট আমি আবিষ্কার করেছি—আর সব থেকে এর খারাপ দিকটা হলো, এই প্লট সফল হওয়ার সব রকম সুযোগ রয়েছে... ..'

সেবাস্টিয়ানোর "বিশৃঙ্খলা" বলতে ফয়স্তাকে বেপরোয়া ভাবে তার ভালবাসা, আর সেটারই তার দুশ্চিন্তার কারণ। তার সেই দুশ্চিন্তার আবার মূল কারণ হলো, এই ভদ্রমহিলার আমন্ত্রণেই টেরেসো পার্টিতে যোগ দিতে আসছেন। যাইহোক, ফয়স্তার মতে সেবাস্টিয়ানোর ভালোবাসা নেহাতই আর পাঁচটা অভিযানের সামিল; পরবর্তী অভিযানের সময় এলেই মানুষ যেমন তার আগের অভিযানের সব রোমাঞ্চ ভুলে যায়, ফয়স্তার আশঙ্কা, ঠিক সেই ভাবেই সেবাস্টিয়ানোও হয়তো তাকে ভুলে যাবে। তার আশঙ্কা, সেবাস্টিয়ানোর সঙ্গে তার সম্পর্কটা হয়তো তার আকাঙ্খিত পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে উঠতে পারে। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একটা লম্বা কাহিনী আবিষ্কার করেছে সে। ফয়স্তার এক ভাই ম্যানুয়েল (যা সত্য) এখন রাজনৈতিক কারণে (যা সত্য নয়) জেলে বন্দী; টেরেসার শর্ত হলো, ম্যানুয়েলকে তিনি মুক্ত করে দেবেন, তবে ফয়স্তাকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে। অতএব এখন এই কঠিন শর্তটা তাকে মেনে নিতেই হবে, আর এর পরিণাম হলো—সেবাস্টিয়ানোর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্কটা সাফল্যের পথে মহিমান্বিত করে তোলা আর না তোলা অর্থহীন—এবং এখনই এর ইতি টানা উচিত। অবশ্য এই কাহিনীর 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষর বিশ্বাস করে সেবাস্টিয়ানো। অতএব এক্ষেত্রে এখন তাকে দ্বৈত ভূমিকা নিতে হবে—যেমন এক দিকে ম্যানুয়েলের মুক্তির পথ নিশ্চিত করা—এবং অপর দিকে একই সঙ্গে জেনারেলের কামনার হাত থেকে ফয়স্তাকে রক্ষা করা।

যে কেউ ভাবতে পারে, সেবাস্টিয়ানোর উদ্দেশ্য সফল করার জন্য হয়তো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। তা হোক, ভাবলো সে, যে যাই ভাবুক না কেন, সেই ভালো। মনে মনে সে একটা ভবিষ্যতের ছবি এঁকে ফেলে। আর সেই ছবিটা এই রকম—টেরেসো মৃত, ম্যানুয়েল জেল থেকে খালাস পেয়ে ফিরে এসেছে এবং তারপর তার প্রিয়তমা ফয়স্তার সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকতে পারে না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে আবার একটা অশুভ চিন্তাও করলো। প্রথমত বিপদ হলো, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত ভিলায় থাকতে গিয়ে ফয়স্তা হয়তো খতম হয়ে যেতে পারে, এবং দ্বিতীয়ত তার ইচ্ছা পূরণের অনেক পরে টেরেসো হয়তো খুন হতে পারেন। তাছাড়া তার সৎভাই স্যাভেরিওকে নিয়েও তার একটা সমস্যা আছে যা অস্বীকার করতে পারে না সে। পেরো কখনোই তার এই উৎসাহের সামিল হতে চাইবে না। কেবল নিজের সুযোগ সুবিধার জন্য মনে হয় না সে কোনো অপরাধ অনুষ্ঠানে মদত দেবে তাকে। শুধু তাই নয়, টেরেসোকে হত্যা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই পেরোর।

ফয়স্তার সঙ্গ ছাড়া অন্য সময় ভীষণ একঘেয়ে লাগে সেবাস্টিয়ানোর। সাধারণ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে তার দেশে মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে তার সন্দেহপ্রবণতা জেগেছে বলেই তার আরো বেশী করে জীবনটা একঘেয়ে লাগছে। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বলতে তার কিছুই নেই। কিন্তু সে এমন এক বংশের লোক যাদের কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই—না সরকারের উপর না বিপ্লবীদের উপর, না স্বাধীনতায় না কর্তৃত্বে। তাই তার বিশাল সমকক্ষরা কোনো রকম সন্দেহ কিংবা অলৌকিক ঘটনার আশা ছাড়াই নিজেদেরকে নিয়োজিত করে সুখ, স্বাভাবিক ও নির্ভাবনার জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেবাস্টিয়ানোর মতো কয়েকজনের ক্ষেত্রে এই সন্দেহপ্রবণতা তাদের করে তুলেছে স্বপ্নবিমুখতা, এনে দিয়েছে তাদের জীবনে এক অখণ্ড অলসতা এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগ বলতে কিছুই নেই তাদের।

সেবাস্টিয়ানো বেশ ভালো ভাবেই বুঝে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে এই টেরেসো সরকার স্বেচ্ছাচারী এবং সর্বতোভাবে শক্তি প্রয়োগে বিশ্বাসী। কিন্তু স্যাভেরিওর মতো লোকেদের কাছে সরকার গঠনের মাপকাঠি আরো ভয়ঙ্কর, আরো মারাত্মক বলে মনে হয় তার কাছে। টেরেসো, নিজেকে সে বলে, জানেন কি করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত সে শান্তিকামী মানুষজনদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলো মনে মনে, আর সেই পথ নির্দেশই তার কাছে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হলো। সেবাস্টিয়ানো তার নিজের ছেলেমানুষীর ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ এবং তার মতে মার্জিত রুচির অভাবের মতো বড় পাপ অন্য আর কিছু হতে পারে না, এবং কোনো কিছুতে বিশ্বাসের মতো ঋড় বুদ্ধি আর কিছু হতে পারে না। আর স্যাভেরিও হলো নোংরা, বিকৃত-স্বভাবের এবং

তার পোশাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত খারাপ ধরণের। এবং অনেক কিছুতেই বিশ্বাসী সে। আর এই সব কারণেই তার থেকে টেরেসোকেই বেশী প্রাধান্য দিতে চায় সেবাস্টিয়ানো। সেবাস্টিয়ানোর কাছে সন্দেহপ্রবণতা নিছকই একটা চিন্তাধারার ব্যাপার শুধু নয়, আসলে তার কাছে এটা একটা কর্তব্য বলেও মনে হয়। তার বিশ্বাস, যেমন শরীরটাকে বিষাক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যহ প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন হয়, এটাও ঠিক সেই রকম আর কি!

সেবাস্টিয়ানো মনে প্রাণে দল বা পার্টিকে ঘৃণা করে। কারণ তার মতে তাদের সীমাহীন নির্বুদ্ধিতার জন্যই দেশের আজকের এই ক্লান্তিকর অবস্থা। তার মনে হয়, ইতিমধ্যেই জেনারেল নিজেকে তাদের সঙ্গে সহজ ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। এ ধরণের সরকারের কি ঘটতে পারে, সেটাই দেখতে চায় সেবাস্টিয়ানো। তবে এ নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাতেও চায় না সে! দল বা দলের লোকেরা—তাদের গোঁড়ামি, তাদের বোকামি সত্বেও ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারছে না। সে কথাটা মনে হতেই হঠাৎ পুলিশের কাছে ছুটে যাওয়ার জন্য ক্ষেপে উঠলো। তার কেন জানি না মনে হলো, তাদের ষড়যন্ত্রের কথা এখনই প্রকাশ করে দেওয়া উচিত। তবে সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে কাজ থেকে নিবৃত্ত করে দিলো বহুবিধ কারণে। প্রথমত তার এ কাজের মধ্যে দেশবাসীর কাছে 'খোচর' (গুপ্ত খবর পাচারকারী) হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। শত শত স্যাভেরিওদের মতো যদিও সে টেরোসোকেই অনুগ্রহ করতো, বর্তমানে তার একটা আচরণে ভীষণ ক্ষুব্ধ সে—টেরেসো তার প্রেমিকার উপর থাবা বসাতে চাইছে, আর ফয়স্তার মনে হয়, তার ভাইকে রক্ষা করার জন্য টেরেসোর ব্ল্যাকমেইলিং-শর্ত মেনে নিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইছে সে। ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি বিষয় পর্যালোচনা করে দেখতে হবে, ভাবলো সেবাস্টিয়ানো। 'অতএব এই প্লট অবশ্যই ভেস্তে দিতে হবে', এবং ফয়স্তা যাতে করে টেরেসোর হাতের পুতুল হয়ে না যেতে পারে, সেটাও তাকে ভাবতে হচ্ছে। আবার সেটা ব্যর্থ করার জন্য খোচরের ভূমিকায় অত নিচে আমি নেমে যেতে পারি না। তার চেয়ে আমি বরং একটা মাঝামঝি পন্থা অবলম্বন করবো, পুরো নয় অর্ধেক ব্যর্থ করবো। তা না হলে ফয়স্তার দিক থেকে টেরোসোকে ঘোরানোর অস্ত্র হিসেবে সেটা আমি ব্যবহার করতে পারবো না।' এই দিক থেকে সেবাস্টিয়ানোকে এখন কৌতুকবোধ করতে দেখা গেলো। আমরা আগেই দেখেছি, সে যেন ঠিক শিশুর মতো।

'যে ভাবেই হোক দু'টি পথ ধরেই এখন আমাকে চলতে হবে', সে আবার ভাবলো। 'বড় কঠিন। সব সময়েই দেখা যায়, যা কিছুই তুমি ভাবো না কেন, কার্যক্ষেত্রে সেটা কঠিন বলে মনে হবে। তাছাড়া, আমার হাতে সময় এখন খুবই কম।

ডাচেস পার্টি আগামীকাল সন্ধ্যায়। আর সেই পার্টিতে আমি যদি কিছু একটা করতে না পারি তাহলে নির্ঘাত টেরোসো খুন হবেনই! তবে ফয়স্তা তার ভাইকে রক্ষা করার জন্য তার সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যর্থ আত্মত্যাগ করার আগে নয়.....'

'অতএব টেরোসোর খুন হওয়া আমাকে রুখতে হবে। কিন্তু এ-কাজ আমাকে করতে হবে 'খোচর' হিসেবে নয়। তবে এমন এক উপায়ে, যাতে করে তিনি ম্যানুয়েলকে মুক্ত করেন; এবং স্যাভেরিও যাতে কোনো ক্ষতি করতে না পারে।'

সেবাস্টিয়ানো মনে করে, সমাধানের একটা সূত্র খুঁজে পেতেই হবে; প্রতিটি সমস্যার একটা বিজ্ঞোচিত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু সেই ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে সফল হলো না সে। নেহাতই একটা মোটামুটি সমাধান ছাড়া কিছু নয়, সেটা কোনো কাজের কাজ নয়, তাতে অনেক সুযোগের ছাড় থেকে যায় কিংবা ভাগ্য ভালো হলে সেটা কাজেও লেগে যেতে পারে। অতএব সেটা কার্যকর কিছু বলে ধরে নেওয়া যায় না; অবশ্যই সেটা যথাযথ হতে হবে, অঙ্কের মতো মিল থাকা চাই, যেমন দুই-এ দুই-এ চার, ভাবলো সেবাস্টিয়ানো। তা না হলে ম্যানুয়েল জেলে বন্দী হয়েই থাকবে এবং ফয়স্তাকে হারাতে হবে।

সে তার বিছানায় বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো। সব শেষে সে তার কপালে হাত দিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলো, এ কথা আগে কেন সে ভাবেনি। হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই সে উপলব্ধি করলো, কোনো রকম খবর না দিয়েই এই প্লট ব্যর্থ করে দেওয়া যায়, এবং তার একটা পথ আছে, আর সেই পথেই টেরেসোর নাগাল সে পেতে পারে, ম্যানুয়েলের ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়ে নিতে পারে সে, এবং ফয়স্তাকে তার বিপদ থেকে রক্ষাও করতে পারে। আর সেই পথ হলো ষড়যন্ত্র, সেটা তাকে নিজেকেই করতে হবে। এই ভাবে সেই টাইম বোমার ফিউজ হাতে নিয়ে টেরেসোর সামনে গিয়ে হাজির হবে সে, তাঁকে তার শর্ত'র কথা বলবে। যদি তাতে টেরেসো রাজী হয়ে যান, তাহলে শুধু ফিউজটা কেটে দেবে। আর তিনি যদি তার শর্ত বাতিল করে দেন, সেক্ষেত্রে একমাত্র ফয়স্তার জন্য তার ভালোবাসা ছাড়া জীবনে আর কোনো কিছুতেই আগ্রহ থাকবে না সেবাস্টিয়ানোর। তখন স্বভাবতই তার মনে হবে, ফয়স্তা এবং জেনারেলের সঙ্গদানের সময় অবশ্যই তার মরা উচিত!

❑ আট ❑

নিস্তব্ধ রাত্রি। নীচে নেমে এলো সেবাস্টিয়ানো। তার পায়ে ঘসা পাথরের নুড়ির শব্দ শুনে লুড্রা তার মনিবের কাছে ছুটে এলো। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা লাফাতে শুরু করে দিলো। সেবাস্টিয়ানো তার পিঠ চাপড়ে আদর করলো। তার ইচ্ছে নয়, কেবিনের ঘুমন্ত মানুষ দু'জন জেগে উঠুক।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামলো সে। চাঁদের আলোয় আলোকিত গলিপথ। সেই গলিপথ ধরে কিছু দূর এগিয়ে গেলো সেবাস্টিয়ানো। তবে বড় রাস্তায় এসে আরো খানিকটা পথ চলে বাঁদিকে ঘুরলো সে। সামনেই অরণ্য, তারপর একটা ব্রিজ পেরিয়ে আবার অরণ্য পথ। আর সেই পথ ঘেঁষেই বিরাট উঁচু প্রাচীর। আর এই প্রাচীরই হলো ডাচেস গোরিনার ভিলার সীমান্ত রেখা।

এই পথের প্রতিটি ইঞ্চি সেবাস্টিয়ানোর পরিচিত! প্রায় টানা তিন সপ্তাহ ধরে এই একই সময়ে প্রতি রাত্রে সে তার মিষ্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল; রোজকার অভ্যাস মতো সেদিন সন্ধ্যায় ফয়স্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল সে। তবে কোনো কারণে দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে হলে তাদের দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিলো, ফিরে এসে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শিস্ দেবে। তিনি তখন পার্কে বেড়িয়ে আসবেন।

সেদিন রাত্রে ফয়স্তার সঙ্গে তার প্রচণ্ড বাক্-বিতণ্ডা হলো। তর্কের শেষে উভয়েই সিদ্ধান্ত নিলো, এই তাদের শেষ সাক্ষাৎকার। প্রকৃতপক্ষে ফয়স্তা ঘোষণা করলেন, তাঁর ভায়ের মুক্তির জন্য টেরেসোর শর্ত তিনি মেনে নেবেন বলে স্থির করেছেন। সেবাস্টিয়ানো দেখলো, তার সব রকম পরামর্শ, তার সব প্রতিবাদ যখন ব্যর্থ হলো, তখন ফিরে আবার তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তাই সে ফয়স্তাকে স্পষ্টই জানিয়ে এসেছে, তাঁর সঙ্গে আর দেখা না করাই ভালো। ফয়স্তা যে মনে মনে ঠিক এই রকমটাই চাইছিলো আমরা সেটা জানি। এর কারণ একটাই তাঁর আশঙ্কা, সেবাস্টিয়ানোর ভালোবাসা জেনারেলের মিস্ট্রেস হওয়ার পথে বিরাট বাধা হয়ে উঠতে পারে। তাই তারা শেষবারের মতো উভয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়। সেবাস্টিয়ানোর মনটা তখন খুবই বিক্ষিপ্ত, চোখ ভর্তি অশ্রু নিয়ে বিদায় নিতে হয় তার প্রেমিকার কাছ থেকে। আর ফয়স্তার মনেও তখন একই দুঃখ, একই যন্ত্রণা—তিনি তাঁর অশ্রু কোনো রকমে সংবরণ করে ধরা গলায় বলেন—তিনি তাঁর ভায়ের মুক্তির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার পরই আত্মহত্যা করবেন।

শূন্য হাতে এই বিদায়ে সেবাস্টিয়ানো দারুণভাবে মুষড়ে পড়লো। আজ যা অবস্থা, তাতে মনে হয়, মানুষের সৎগুণ, নৈতিক দায়িত্ববোধের অস্তিত্ব বলতে কিছু আর নেই, আর থাকলেও সেগুলো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তার সন্দেহপ্রবণতার জন্যই আজ তাকে এমন একটা ধারণার বশবর্তী হতে হয়েছে। তবে ভাগ্য বলে যে একটা কথা আছে, এ কথা সে সব সময়েই বিশ্বাস করে থাকে। যাইহোক, সেই ভাগ্যও এখন তাকে বিমুখ করেছে। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তার জীবন ব্যর্থ, স্মৃতিভারে জর্জরিত

সে। যে নারীকে এতদিন মনে-প্রাণে ভালোবেসে এসেছে, আজ সে কতই না নোংরা হয়ে গেছে, তার মন বিকৃত হয়ে গেছে। ফয়স্তা যদি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে, তাহলে সে নিজেকে খতম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সেবাস্টিয়ানোর বিশ্বাস সব সময়েই তার সাহায্যে লেগেছে, তার জীবনে সব থেকে দুঃসময়ে সেই বিশ্বাসটা আবার ফিরে এসেছে তার কাছে বন্ধুর মতো। গোপনে স্যাভেরিওর কেবিনের জানালার সামনে আড়ি পেতে একটা গোপন খবর সে জানতে পেরেছে। সে এখন ফয়স্তার কাছে যাচ্ছে, তাকে বলবে, সে আবার তার ত্রাণকর্ত্রীকে ফিরে পেয়েছে।

পাঁচিল টপকে পার্কের মধ্যে প্রবেশ করে সাদা পাথরের নুড়ি বিছানো পথ ধরে হাঁটতে থাকলো সে। পথের দু'ধারে সারি সারি ঝোপঝাড় এবং তৃণভূমিতে আচ্ছাদিত, প্লাবিত জ্যোৎস্নার আলোয় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। রাতের শিশির পড়ে ঘাসগুলো রূপোর মতো চকচকে করছিল। পার্কের একেবারে শেষ প্রান্তে আর এক প্রস্থ ঝোপঝাড়, কালো এবং লম্বা লম্বা। ঝোপঝাড়ের পাশে তৃণভূমিগুলো অমসৃণ কোঁকড়ানো কার্পেটের মতো দেখাচ্ছিল। একেবারে উপরে দাঁড়িয়েছিল ডাচেস ভিলা, লাল রঙের। বাইরে থেকে তেমন জাঁকজমক বোঝা যায় না, খুবই সাধারণ, চারতলা, চল্লিশটা জানালা, ছোটোখাটো মিলিটারি ব্যারাকের মতো দেখতে। তৃণভূমির শেষপ্রান্তে একেবারে নিচের দিকে অকৃত্রিম পুকুর, চাঁদের আলোয় চিকচিক করছিল টলটলে জল। চোখ তুলে ভিলার দিকে তাকালো সেবাস্টিয়ানো। কয়েকটা জানালার মধ্যে কেবল একটা জানালা দিয়ে আলো চুঁইয়ে পড়ছিল—সেটা ফয়স্তার ঘরের।

একদিন এক গ্রীষ্মে সৌভাগ্যবশতঃ ফয়স্তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। পথ হারিয়ে ফেলেছিল সে, তাই তার কাছে এসেছিল সঠিক পথের নিশানার সন্ধানে। বিশ বছরের তরুণ সেবাস্টিয়ানোর জীবনে এ ধরণের রোমাঞ্চকর অভিযান এর আগে কখনো আসেনি। মনে একটুও দ্বিধা না রেখে, এক হাত দিয়ে তার কোমর বেস্টন করলো। সেই মুহূর্তে ফয়স্তা তার প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোতে থাকে। সেবাস্টিয়ানো ভেবেছিল তার অমন ঔদ্ধত্যের জন্য ফয়স্তা বুঝি তার মুখের উপর চড় কষিয়ে দেবে। কিন্তু তার পরিবর্তে সে দেখলো, মেয়েটি তার হাতের উপর এলিয়ে পড়েছে, অর্ধ-নিমিলিত চোখ, ঠোঁট দু'টো অসম্ভব কাঁপছিল চুম্বনের প্রত্যাশায়। ফয়স্তার কাছ থেকে সাড়া পেয়ে তখনই সে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু তাকে বসাবে কোথায়? তার বাবার ধার-দেনা শোধ করতে গিয়ে সব আসবাবপত্র বিক্রী করে দিতে হয়েছে। হঠাৎ তার

মনে পড়ে, তার খামারের মজুররা কতকগুলো ময়দার বস্তা রেখে গেছে একতলার একটা খালি ঘরের এক কোনায়। যেমন করে সিংহ তার শিকারকে টেনে নিয়ে যায়, ঠিক সেই ভাবে ফয়স্তাকে সে টেনে নিয়ে গেলো সেই ঘরে। অন্ধকার ঘর, পায়ের নিচে ময়দার বস্তা, গুমোট অবহাওয়ায় সেবাস্টিয়ানো ভেবেছিল ফয়স্তা বিরক্তি প্রকাশ করবে। কিন্তু তা হলো না, হলো না তার পুরুষালি চেহারার জন্য। প্রেমে পড়লে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, আবার সত্যিকারের অন্ধকারে প্রেমিক বা প্রেমিকার রূপ ও সৌন্দর্য্য দেখার জন্য বোধ হয় তৃতীয় একটা চোখ থাকে। হ্যাঁ, সেই চোখ দিয়ে অন্ধকার ঘরে সেবাস্টিয়ানোর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে এক সময় সে নিজেকে সম্পূর্ণ করে সঁপে দেয় সেবাস্টিয়ানোর কাছে। সেই প্রথম মিলন সুখের স্বাদ আজও ভোলেনি সেবাস্টিয়ানো।

তারপর থেকে প্রতি রাত্রে তারা সেই পার্কে এসে মিলিত হতো। ফয়স্তার প্রেমে পাগল তখন সেবাস্টিয়ানো। এবং তার কাছে সে তার উদগ্র কামনার কথা প্রকাশ করতে একটুও দ্বিধা করেনি। তার উচ্ছাস যদি একটু কম থাকতো, তাহলে সহজেই সে উপলব্ধি করতে পারতো, তখন ফয়স্তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করলেও তার অনুমান মতো নয়, সে এক ভিন্ন চরিত্রের নারী। কিন্তু সেবাস্টিয়ানোর উঠতি বয়স তখন, যৌবনে ভরপুর, ফয়স্তার প্রতি সত্যিকারের প্রেমে বিভোর সে তখন; তখন তার ভালো-মন্দ জ্ঞান বলতে কিছু ছিলো না, তার সেই প্রেম এমনই অন্ধ ছিলো যে, যে কোনো নারীকেই তার মনে হয়েছিল সুন্দরী নারী। তাই ফয়স্তাকে ঠিক চিনতে পারেনি সে।

অভিজাত, বিত্তবান, সমাজের নেতা কিংবা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি, এ সব কিছুই ছিলো না সেবাস্টিয়ানো। তাই সে জানতেও পারলো না যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের একজন সব থেকে ক্ষমতাশালী পুরুষ, ফয়স্তার জীবনে সেই নবাগত পুরুষটি ইতিমধ্যে অনেক প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। তারই মতো অন্ধ প্রেমে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সে, ফয়স্তার প্রেমে সেও এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। সেবাস্টিয়ানো স্বপ্ন দেখে, মনে মনে চিন্তা করে, ফয়স্তার প্রতি তার সত্যিকারের প্রেম তৃতীয় কোন ব্যক্তি যেন জানতে না পারে। ফয়স্তা তার প্রথম ও শেষ প্রেম বলো কিংবা পাপই বলো একাধারে সব কিছুই। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চায় না যে, তার এই মনোভাব, তার প্রেম ভালোবাসা কিনা, সেটা যাচাই করে দেখার কথা একবারও মনে হয়নি সেবাস্টিয়ানোর। এক সময় সেবাস্টিয়ানো নিজেকে উজার করে দিয়েছে ফয়স্তার কাছে দুরন্ত প্রেম নিবেদনে। তখন কিন্তু তার একবারের জন্যও মনে হয়নি, সেই প্রেম তাকে ফিরিয়ে নিতে হতে পারে।

ফয়স্তার কাছে সে যে এখন বেতো ঘোড়ার মতো বাতিল, সে রকম কোনো ধারণাই নেই তার। ফয়স্তার মানসিকতা হলো, পুরুষরা তাকে ভালোবাসুক অন্ধের মতো, তার প্রেমে বিভোর হয়ে পড়ুক, এবং তার ধারণা, এখন সে সব কিছুর জন্যই চেষ্টা করতে পারে; কোন 'রোমান্টিক প্রেম' ছাড়া। বেচারা তরুণ সেবাস্টিয়ানো মূল্যবান ভিলার কাছাকাছি থেকে ফয়স্তাকে চাঁদের আলোর হাটে সত্যিকারের ভালোবাসা জানিয়ে যতোই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক না কেন, এ সবই ফয়স্তার কাছে নতুন, তার মনে দাগ কাটার মতো কিছু নয়; সে শুধু একটা ব্যাপারেই অভ্যস্ত—কি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন প্রেমিকের প্রেমের অভিসারে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে যেতে আগের প্রেমিককে নিষ্ঠুরের মতো প্রতারণা করতে হয়। তবু তা সত্ত্বেও ফয়স্তার চিন্তার বড় কারণ হলো সেবাস্টিয়ানোর সত্যিকারের ভালোবাসা। 'রোমান্টিক লাভ' বলতে ফয়স্তা যা বোঝে, সেবাস্টিয়ানোর প্রেমে তারই প্রকাশ অনুভব করে সে। আর সত্যি কথা বলতে কি এই জন্যই সেবাস্টিয়ানোকে বেশী ভয় তার। মানুষ সেবাস্টিয়ানোকে তার যতো না ভয়, তার থেকে বেশী ভয় তার সেই রোমান্টিক প্রেমকে। কোনো রকম বাধ্য বাধকতার মধ্যে যেতে চায় না সে। তাই সে মনে করে, ঠিক সময়েই টেরেসো দুরন্ত প্রেমের আবেগ তাকে মুগ্ধ করেছে। এই কারণেই যুগপত সে সেবাস্টিয়ানোর হাত থেকে রেহাই পেতে চায়, এবং একই সঙ্গে ভাই ম্যানুয়েলের মুক্তির অনুমতি আদায় করে নিয়ে তার মিস্ট্রেস হতে রাজী সে এখন। তাই সেবাস্টিয়ানোর কাছে তার বানানো গল্প ফেঁদে বসার কারণ কেবল সেটাই এবং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ফয়স্তার পক্ষে এর পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে। তবে মনে মনে সে শপথ নিয়েছে, সেবাস্টিয়ানোর মতো প্রেমের ফাঁদে সে আর পড়বে না কখনো। এর মধ্যে অনেক বিপদও আছে, ভাবলো সে, শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে পারবে কিনা।

সেবাস্টিয়ানো তার চিন্তার এমনই মগ্ন ছিলো যে, বুঝি হাঁটতেও ভুলে গিয়েছিল সে। তার তখন মনে হচ্ছিল, সে যেন শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, তার শরীরটা পাখীর মতো হাল্কা হয়ে গেছে। ফয়স্তার ভিলার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে সে তখন ভাবছিল, তার সাহায্য নিয়ে স্যাভেরিও ষড়যন্ত্রের প্লট বানচাল করে দিতে পারবে সে, এবং তার সত্যিকারের প্রেমই জয়ী হবে শেষ পর্যন্ত। তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী টেরেসোকে সে নিজেই খতম করে দেবার ক্ষমতা রাখে, ভাবলো সে। তারপর হয় সে ফয়স্তাকে সঙ্গে নিয়ে অন্য কোথাও উড়ে যাবে, তা না হলে এক সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে, আর সেই মৃত্যুই হবে তাদের প্রেমের স্মৃতি। কিন্তু সেবাস্টিয়ানোর বোধহয় জানা ছিলো না, সে যে ভাবধারায় জেদী ঘোড়ার

মতো ছুটছে, সেটা অলীক, বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল নেই, মূর্খের স্বর্গে বাস করছে সে।

❑ নয় ❑

ভিলায় পৌঁছে দেওয়ালের দিকে ঝুঁকে এক মুহূর্তের জন্য স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মতো দেহটা এলিয়ে দিলো তৃণভূমির উপর। একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে নিচের দিকে তাকাতেই সে দেখলো নিঃশব্দে অনেকগুলো ব্যাঙ লাফালাফি করছে ঘাসের উপর। নিচু হয়ে একটা ব্যাঙ তুলে নিলো সেবাস্টিয়ানো। ব্যাঙটা তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সংগ্রাম করলো, তারপর এক সময় শান্ত হয়ে গেলো, মরার মতো ভান করলেও তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন ছিলো প্রচুর।

ব্যাঙটা হাতে নিয়ে ফয়স্তার জানালার নিচে এসে দাঁড়ালো সে। শিকারীর মতো করে শিস দিলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জানালার সামনে একটা ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেলো। জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে তার অঙ্গুলি হেলনের ইঙ্গিত জানা ছিলো সেবাস্টিয়ানোর—তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে সে।

তাকে খুব বেশী সময় অপেক্ষা করতে হলো না। কিছুক্ষণ পরেই ধীরে ধীরে একতলার একটা জানালা খুলে যেতে দেখা গেলো এবং জানালার ফ্রেমের সামনে ফয়স্তাকে হাজির হতে দেখা গেলো। তার পরনে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কালো সিল্কের গাউন।

ফয়স্তাকে কিশোর বালকের মতো দেখাচ্ছিল। তবে তার চোখ দুটি কালো, কৌতূহল জাগানোর মতো গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন—অনুজ্জ্বল, যেন অন্ধ সে—যে কেউ বলে দেবে, নারীর চরিত্রই এরকম, সরলতার কোনো চিহ্ন নেই। চোখের পাতলা ভ্রূ দু'টি তুলে তাকিয়েছিল সে এমন করে ঠিক যেন দানবীর ভূমিকায় মেক-আপ নেওয়া অভিনেত্রী এসে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে। চোয়াল দুটো নেহাত বেড়ালের মতো দেখতে। চুলগুলো বয়-কাট করে ছাঁটা, তাবে নারী সুলভ পরিপাটি করে আঁচড়ানো, আর তাতেই বোঝা যায় যে, সে নারী না পুরুষ! তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নারীসুলভ কমনীয়তা উধাও, কেবল তার ভারী গোলাকৃতি পুরুষ্ট স্তন দুটিই বুঝিয়ে দিতে পারে, হ্যাঁ, সে নারীই বটে! কেবল নারীই নয়, নারীর থেকেও আরো বেশী কিছু যেন।

শরীরের আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে নিজের ঘর থেকে নেমে এসেছিল ফয়স্তা। প্রেমিক সেবাস্টিয়ানোকে এখনো তার ভয়, একটু আগেই সে তার আপোষহীন

মনোভাব দেখিয়ে গিয়েছিল, ফয়স্তা তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিল, এরপর থেকে টেরোসোর দিকেই ঝুঁকবে সে। কে জানে সে হয়তো বলতে এসেছে, ফয়স্তা টেরেসোর হবে জেনেও এখনো সে তাকে ভালোবাসতে চায়। ফয়স্তা তার অভিজ্ঞতায় জানে, প্রেমের আর এক নাম 'অন্ধ', নাছোড়বান্দা। সেই অন্ধ প্রেম কোনো কিছুই চিরদিনের মতো বাধা হয়ে উঠতে পারে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অন্ধ প্রেমিক বা প্রেমিকারা তাদের সেই একনিষ্ঠ প্রেমকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, আর সেটা জানানোর জন্যই কি ফিরে এসেছে সেবাস্টিয়ানো? 'কিন্তু এবার', নিচে নেমে এসে ভাবলো সে, 'এবার আমি ওকে সত্যি কথাটাই জানিয়ে দেবো, তাহলে অন্ততঃ তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে।' ফয়স্তা এখন তার সিদ্ধান্তে দৃঢ় সংকল্প। মোরগের গলায় ছুরি বসালেও সেটা যখন বাঁচার জন্য প্রাণপণ লড়াই করতে থাকে পা ও ডানা ছড়িয়ে, গৃহকর্ত্রী তখন তাকে একেবারে স্তব্ধ করার জন্য তার হাতের ছুরিটা সেটার গলার উপর চালিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়, ফয়স্তা সেরকমই একটা কিছু করার জন্য উদ্যোগী হয়ে এসেছিল!

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। চোখে ভ্রুকুটি, উদ্বিগ্ন মুখ, বিরক্তিতে ভরা ক্লান্তিকর চোখের দৃষ্টি। কিন্তু তাতে একটুও দমলো না সেবাস্টিয়ানো। এখানে আগে মনে মনে ঠিক করে এসেছিল সে, তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কের ব্যাপারে এখনই আলোচনা শুরু করবে না সে, বরং যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে খুশির মেজাজে কথা বলবে সে তার সঙ্গে। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সে তার হাতের ব্যাঙটা দেখালো তাকে এবং সেটা সে ফয়স্তাকে গ্রহণ করতে বললো। এবং সে এও বললো, পথে আসার সময় তার সম্পর্কে অন্য আরো ব্যাঙদের আলোচনা করতে শুনে এসেছে সে। তার এই অদ্ভুত মন্তব্য শুনে খুশি হলো ফয়স্তা। সে ভেবেছিল টেরেসোর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করে বসবে সেবাস্টিয়ানো। তাই সে কোনো রকম বিরক্তি প্রকাশ না করেই সে তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে হীরের আংটি পরা দুটো আঙুল দিয়ে ব্যাঙটার মুখ চেপে ধরে সেটা তার হাতে তুলে নিলো।

'ওটা তোমাকে চুমু খেতে চায়', বললো মোহাচ্ছন্ন সেবাস্টিয়ানো।

'চুমু?' ভ্রু নাচিয়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো ফয়স্তা, 'চুমু—কোথায়?'

'ঐ যে ওখানে', ফয়স্তার চুলে ঢাকা কানের দিকে ইশারায় ইঙ্গিত করে উত্তর দিলো সে।

ফয়স্তার কানটা ছোট, একেবারে নিখুঁত। তার সঙ্গে দেখা হলেই তার সুন্দর কানের প্রশংসা করতে গিয়ে কখনো একটুও ক্লান্তি বোধ করেনি সেবাস্টিয়ানো। আগ্রহ দেখিয়ে ভয়ে ভয়ে ফয়স্তা জিজ্ঞেস করলো, ব্যাঙ কামড়াবে না তো? আর

কামড়ালেও বিষাক্ত নয় তো? উত্তরে সেবাস্টিয়ানো তাকে জানিয়ে দেয়, ভয়ের কোনো আশঙ্কা নেই। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ফয়স্তা তার কানের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলো। সেবাস্টিয়ানো এবার তার কানের কাছে ব্যাঙের মুখটা নিয়ে গেলো।

'আরে, ব্যাঙটা যে আমার সঙ্গে কথা বলছে!' পরমুহূর্তেই চিৎকার করে হেসে উঠলো ফয়স্তা। তা সত্বেও ব্যাঙটা ফয়স্তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেলো, আরো কিছু বলতে চায় সে। ব্যাঙটা তার কানের পাতায় চুমু খেলো। ফয়স্তা তার অনুভূতির কথা বলে, 'উঃ ব্যাঙের ঠোঁট জোড়া কি ঠাণ্ডা, রাতের শীতল বাতাসের মতো।'

এবার সেবাস্টিয়ানো নিচু হয়ে ব্যাঙটাকে মাটিতে নামিয়ে তাকে চলে যাওয়ার জন্য বলে, ফিরে গিয়ে সে যেন তার বন্ধুদের তার অভূতপূর্ব সৌভাগ্যের কথা , ঘোষণা করে তাদের কাছে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ফয়স্তাকে জিজ্ঞেস করে, ব্যাঙটা তাকে কি বললো।

'তা ওটা আমাকে বলে গেলো তোমার আর আমার অবশ্যই ছাড়াছাড়ি হওয়া উচিত', সেবাস্টিয়ানোর দিকে গম্ভীর হয়ে বললো সে।

উত্তরটা শোনার পর সেবাস্টিয়ানোর সব উৎসাহ, উত্তেজনা নিমেষে ঝিমিয়ে পড়লো। সেই সঙ্গে তাকে আবার মত বদল করতে হলো। সে এখন নিশ্চিত, ফয়স্তা তাকে সত্যি তাকে আবার মত বদল করতে হলো। সে এখন নিশ্চিত, ফয়স্তা তাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে, কিন্তু সে তার ভাইকে রক্ষা করার জন্য মনের জোর পাচ্ছে না, তাই তার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে এখন টেরেসোর দিকে ঝুঁকছে, তার শর্ত মেনে নিয়েছে। এই সব কথা ভেবেই সেবাস্টিয়ানো হঠাৎ ভাবলো, ফয়স্তাকে ষড়যন্ত্রের কথা না বলাই ভালো, তার চেয়ে তার অজান্তে সে বরং তার প্রয়োজনীয় কাজ করে যাবে। আর যদি বা ষড়যন্ত্রের প্লট ফয়স্তা জেনে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই প্রকাশ করবে সে, এমন কি সেবাস্টিয়ানোর কাছেও। আর একবার ভাগ্য সহায়ক হলো সেবাস্টিয়ানোর। ফয়স্তা শুধু তার হাত থেকে রেহাই পেতে চায় না, সেই সঙ্গে সে তার ভায়ের মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত যা অপেক্ষা, তারপরেই টেরেসোর সঙ্গে তার প্রেমের অভিনয়ে ইতি টেনে দেবে, এবং সেই সময় পর্যন্ত টেরেসোর কাছে থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে সে, সেবাস্টিয়ানোর অনুমান সেই রকমই।

তাই ভিলায় ফিরে ফয়স্তাকে তার ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে কিছুই বললো না সেবাস্টিয়ানো। কিন্তু ব্যাঙের মুখে যে কথাটা সে শুনেছে, সেটা তার বুকে এমনই বিঁধেছে যে, বুকে ছোরা বিঁধানোরই সামিল সেটা। প্রত্যুত্তরে সেবাস্টিয়ানো তাকে

জিজ্ঞেস করলো, সত্যিই কি সে তাদের সম্পর্কের জের আর টানতে চায় না। তবে এই প্রশ্নটা কবতে আসেনি সে, আর এ নিয়ে তাকে চিন্তাও করতে হবে না। আসলে ফিরে এসেছে সে তাকে শেষ বারের মতো বিদায় জানানোর জন্য। তার কথা শুনে হাসলো ফয়স্তা, নতুন কবে আশ্বাস দিলো তাকে। তারপর, তারপর একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো, যা সে তার মনের কোণায় একটি বারের জন্যও স্থান দেয়নি। হ্যাঁ, সেই অদ্ভুত কাজটা সম্পন্ন করার জন্য ফয়স্তা তার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মুখটা তুলে ধরলো তার মুখের সামনে, তার কাছ থেকে বহু আকাঙ্খিত চুম্বনের প্রত্যাশায়।

'তাহলে সত্যিই তুমি এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছো?' ফয়স্তার তৃষিত ঠোঁটে চুমু খেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো সেবাস্টিয়ানো। এখনো সে বিশ্বাস করে, তার সত্যিকারের ভালোবাসার মর্যাদা দেবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে ফয়স্তা। তাব ভায়ের মুক্তিপণ হিসেবে নিজেকে টেরেসোর কাছে সমর্পণ করতে যাবে না। কিন্তু ফয়স্তার মনে তখন অন্য এক চিন্তা, সেবাস্টিয়ানোর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে গিয়ে দুঃখ পাওয়ার পরিবর্তে তাকে খুশি বলেই মনে হলো। এবং অকপটে সে তাকে জানিয়ে দিলো, আর কিছু করার নেই। এ ব্যাপারে সেবাস্টিয়ানো যেন তাকে আর পীড়াপীড়ি না করে এবং বিরোধিতা না করে। ফয়স্তা তার ভায়ের ব্যাপারে টেরেসোর সঙ্গে এমনই ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, এমন করে সেবাস্টিয়ানোর ভালোবাসা জাগিয়ে তোলার চেয়ে নিজের মৃত্যুই শ্রেয় বলে মনে করে সে।

'সম্ভবত আগামীকাল দিনের বেলায় আমরা কি আবাব মিলিত হতে পারি— মানে শেষ বারের জন্য?' জিজ্ঞেস করলো সেবাস্টিয়ানো। আর সে এও জানতো যে, নিজেকে প্রতারণা করার চেষ্টা করছে সে। তবু তা সত্ত্বেও হঠাৎ তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো।

'আমি তা মনে করি না', নরম গলায়, তবে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলো ফয়স্তা।

ফয়স্তার প্রতি তার প্রেম এতো বেশী আবেগপ্রবণ ছিলো যে, তার ধারণা, ফয়স্তার সঙ্গে এটাই তার শেষ সাক্ষাৎকার হতে পারে না, শেষ বারের মতো বিদায় জানানোর সময় আবার আসবেই। একটা মধুর অনুভূতি, সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও এই মুহূর্তে প্রিয়তমার নিবিড় সান্নিধ্যলাভের জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। একটিবার, অন্তত একটি বারের জন্য যে যদি ফয়স্তাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিতো, বুক ভরে তার শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ নিতো, সেই হবে তার বিদায় বেলার শেষ স্মৃতি। যখন তারা থাকবে না, তাদের এই অকৃত্রিম ভালোবাসা কাব্য গাথা হয়ে থাকবে দেশবাসীর মনে, তাদের এই সত্যিকারের প্রেম চর্চার বিষয় হয়ে উঠবে আগামী প্রজন্মের কাছে। তাদের বিদায়ের মিলন-মুহূর্ত

দীর্ঘায়িত হলো। ভালোবাসার রোমাঞ্চ হিসেবে ফয়স্তা তার বেপরোয়া তৃষ্ণা মেনে নিলো—এটা তার আজ নতুন নয়। এর আগে নিজেও সে তার ভালোবাসার রোমাঞ্চ অনুভব করেছিল অনেক, অনেকবার। সেবাস্টিয়ানো তার ঠোঁটে, তার গলায়, তার চোখে চুমু খাওয়ার জন্য মোটেই উদগ্রীব ছিলো না। আসলে সে তখন. ব্যাকুল ফয়স্তার উষ্ণ আলিঙ্গনের জন্য। ফয়স্তা তার কাছে আসতেই দু'হাত বাড়িয়ে সে তাকে জড়িয়ে ধরলো, একবার নয় বারবার সে তাকে তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে তার আলিঙ্গনের সুখানুভূতি লাভ করতে গিয়ে যে রোমাঞ্চের স্বাদ সে পেলো, তার স্মৃতি জীবনে সে কখনো ভুলতে পারবে না বলে মনে হলো তার। অবশেষে এক সময় তারা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো অনিচ্ছা সত্বেও। এবং পর মুহূর্তেই দেওয়াল ঘেষে ভিলার দিকে ছুটতে শুরু করলো ফয়স্তা। চমৎকার জ্যোৎস্নার আলোয় তখন শিশির ভেজা ঘাসের উপর আলো-আঁধারির খেলা চলছিল। ওদিকে সেবাস্টিয়ানো তখন জেনে গেছে, স্যাভেরিওদের ষড়যন্ত্রের প্লটে তার যোগদানের সময় এসে গেছে এখন।

যে পথ দিয়ে সে এসেছিল সেই পথ ধরে দ্রুত সে তার ভিলার দিকে এগিয়ে চললো। এবং চলার পথে সে তার পরবর্তী কার্যকলাপ ঠিক করে নিতে থাকলো। যে ভাবেই হোক, এখন কেবল একটাই প্রশ্ন, সে প্রশ্ন তার পছন্দ-অপছন্দের। ফয়স্তার কাছে আসার আগে স্যাভেরিওর কেবিনের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে দু'জন ষড়যন্ত্রকারীর কথাবার্তা শুনেছে সে, এবং টেরেসোর জীবনাবসান করার জন্য তাদের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের কথাও তার জানা হয়ে গেছে। এখন তার মনে হচ্ছে, জেনারেলের সরকারে পতন ঘটানোর বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করা তার পক্ষে খুব একটা কঠিন কাজ হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া সে শুধু একাই নয়, বহু বছর ধরে সারা দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সে দেখেছে, তারাও এই একই মতবাদে বিশ্বাসী, জেনারেলের সরকারকে উৎখাত করতে হবে যে কোন মূল্য দিয়ে। এই মুহূর্তে দেশের সব মানুষের ইচ্ছেয় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে সেবাস্টিয়ানো। সে এখন ভাবছে, ষড়যন্ত্রকারীদের ভাষা এবং প্রেরণা কিভাবে উন্নত করা যায়। আজ রাতে স্যাভেরিওদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনে এখন টেরেসো সরকারকে উৎখাত করা ছাড়া তার মনে অন্য আর কোনো চিন্তার স্থান নেই।

নিজেকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে ফেলার দু'টি পথ আছে; হয় স্যাভেরিওকে ভালো ভাবে জাগিয়ে তোলা এবং প্রথমে তার মধ্যে বিশ্বাস জন্মানো; কিংবা ফিরে গিয়ে হঠাৎ তার কেবিনে ঢুকে পড়েই তার ইচ্ছা প্রকাশ করা। দ্বিতীয় পথটা বেশী কার্যকর মনে করে সেটাই পছন্দ করলো সে। তাছাড়া নাটকীয় ভাবে হঠাৎ তাদের

প্রতি তার আস্থা স্থাপন করাটাই তার পছন্দ, কারণ তার আনুগত্যের সত্যিকারের অভাব-বোধটা ঢাকা পড়ে যেতে পারে এই ভাবে।

দু'জন ঘুমন্ত ষড়যন্ত্রকারীর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় তাদের কেবিনে সেবাস্টিয়ানোকে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করার শব্দে। এক দিকে তারা যেমন বিস্মিত, তেমনি আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তার তেজদীপ্ত ঘোষণার কথা শুনে।

'আমি এসেছি তোমাদের সঙ্গে যোগদান করার জন্য', বললো সে। 'তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি। আমি তোমাদের সব আদর্শের সঙ্গে একমত। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, আমাকে তোমরা তোমাদের কাজে লাগাও, আর তোমাদের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় আমাকে অংশ নেবার সুযোগ করে দাও।'

তারা তাদের বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে ওঠার আগেই (স্যাভেরিওর হাতটা চলে যায় তার বালিশের নিচে পিস্তলের খোঁজে) সেবাস্টিয়ানো যত রকম ভাবে পারলো তাদের প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাসের কথা বার বার ঘোষণা করে তাদের অনুরোধ করতে থাকলো, তারা যেন তাকে একটিবার সুযোগ দেয় তার সততা প্রমাণ করার জন্য, তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য। টেরেসোর নেকনজর থেকে ফয়স্তাকে রক্ষা করার পরিকল্পনা সেবাস্টিয়ানোকে বাকপটু এবং একজন খাঁটি-অনুগত করে তুললো। তার কথার মধ্যে কি যাদু ছিলো কে জানে, অল্প সময়ের মধ্যেই যে স্যাভেরিও একটু আগেও তার বালিশের তলা থেকে পিস্তল বার করতে যাচ্ছিল, সে এখন তার সৎভায়ের স্নেহে গদগদ হয়ে উঠলো—তার প্রস্তাবের সততা সম্পর্কে সে এখন পুরোপুরি আশ্বস্ত। আর পেরোর ক্ষেত্রে বলা হয়, সে তাকে বিশ্বাস করে না, আবার অবিশ্বাসও করে না। যাইহোক, ঘটনা যে দিকে গড়াক না কেন, তার নিজের অবস্থার কোনো হেরফের হবে না। একজন ষড়যন্ত্রকারী বেশী হলে তার কিই বা এসে যায়? এখন ষড়যন্ত্রের মেসিন খাড়া করা হয়েছে, এখন সেবাস্টিয়ানো নিজেকেই শুধু জানে, স্যাভেরিও ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে সে জড়াতে চায়, ব্যাস এই পর্যন্ত। অতএব স্যাভেরিও এবং সেবাস্টিয়ানোর মধ্যে পরিচয়ের পর্ব চলছে—একে অপরকে ভালো করে জানতে চাইছে—অনেক দূর থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে সেবাস্টিয়ানো এবং স্যাভেরিও তার আবির্ভাবের কথা ধীরে ধীরে স্মরণ করার চেষ্টা করছিল। ওদিকে পেরো তার বালিশে কনুই রেখে আধো ঘুম চোখে অপেক্ষা করছিল কখন তাদের আলোচনা শেষ হয়, সেটা দেখার জন্য।

মহা উৎসাহে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লো স্যাভেরিও এবং সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো সেবাস্টিয়ানোকে। তারপর পেরোর দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করলো তার সৎভাইকে কি কাজ দেওয়া যায়। 'তার হয়ে উত্তরটা আমিই দিচ্ছি', নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে সে আবার বলে, 'তার হয়ে উত্তরটা আমিই দিচ্ছি।'

ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে ধীরে ধীরে পেরো বলে, আসতে পারে সে এবং ভৃত্যদের প্রাপ্য ভাতা সে পাবে, তবে সেই সঙ্গে তাকে তার মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে। এই সব কথা শুনে স্যাভেরিও ভাবলো, পেরোর সঙ্গে করমর্দন করা প্রয়োজন। যাইহোক, পেরো ব্যাপারটা সতর্কতার সঙ্গে ভেবে দেখতে বললো, কারণ হয়তো সে জীবিত নাও ফিরতে পারে। কিন্তু সেবাস্টিয়ানোর তখন সারা মন জুড়ে কেবল ফয়স্তার চিন্তা। তাই মনে কোনো দ্বিধা না রেখেই উত্তরে বললো, মনস্থির করে ফেলেছে সে।

তারপর পেরো তাকে পরদিন ভোর সকালে আবার আসতে বললো, তখন তারা একসঙ্গে ডাচেস ভিলার পথে রওনা হবে। পেরো ভাবলো, সেবাস্টিয়ানোকে প্রতারণা করছে সে; আর সেবাস্টিয়ানো তখন ভাবছিল, পেরোকে প্রতারণা করছে সে; কিন্তু একজনই কেবল প্রতারিত—সে হলো স্যাভেরিও।

সব শেষে দেওয়ালের দিকে মুখ করে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলো পেরো। ওদিকে স্যাভেরিও তার সৎভাই সেবাস্টিয়ানোকে তার বিছানায় যত্ন করে বসিয়ে সে তাদের কর্ম পদ্ধতি বোঝাতে শুরু করে দিলো—কিভাবে তাদের ষড়যন্ত্রের প্লট কার্যকর করতে হবে, কিভাবে দাবার চাল চাললে তারা সাফল্যের মুখ দেখতে পাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কাজের ব্যাখা করার সময় বার বার সে তাকে বলতে থাকে, কিভাবে তারা সংগ্রাম করছে এবং সম্ভবত এও হতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাদের জীবনও দিতে হতে পারে। আত্মত্যাগের মাধ্যমে, অর্থাৎ রক্তের বিনিময়ে তারা স্বাধীনতা আনতে চায় মানুষের ভালো ভবিষ্যতের জন্য, নতুন বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে বার বার সে কেবল একটা কথাতেই ফিরে আসছিল—স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে যে কোন মূল্য দিয়ে—তার এই কথাগুলো ঠিক যেন গানের সুরকারের মতো, যেমন করে সে তার গানের সুরগুলো তোলার সময় বার বার মূল সুরে ফিরে আসে, স্যাভেরিও যেন সেইরকম ভাবেই পরাধীন মানুষের স্বাধীনতা লাভের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেবাস্টিয়ানোর কাছে স্যাভেরিও নেহাতই প্রতারক, মূর্খ। এবং কেবল ফয়স্তার জন্যই চিন্তা করলো সে। পেরোর সম্পর্কে তার ধারণা, অনেক বেশী আন্তরিক সে, অতএব অনেক বেশী বিপজ্জনক সে, অন্তত স্যাভেরিওর থেকে তো বটেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে বোকা বানানোর জন্য হতাশ হয়নি সে। তবে একটু আশ্চর্য হতে হয়েছে তাকে এই ভেবে যে, পেরো স্যাভেরিওর থেকে অনেক, অনেক সতর্ক, কি করে যে এক কথায় তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে আশ্বস্ত হলো সে—সব ষড়যন্ত্রকারীদের, পেরোর মতো দূরদর্শী হতে হবে এবং জানাতে হবে কি তারা করতে যাচ্ছে, মূলতঃ তারা কি অতিশয় গোঁড়া!

অবশেষে গভীর রাতে সেবাস্টিয়ানো এবং স্যাভেরিও একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো।

'এসো, আমরা দুজনে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই', কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে স্যাভেরিও তাকে আবার বললো, 'আজ থেকে আমরা সত্যিকারের ভাই হলাম।'

বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য কেন যে এত উৎসাহ উদ্দীপনা, সেবাস্টিয়ানো বুঝতে পারে না। সে নিজে মানুষের মুক্তির জন্য একটা আঙুলও তুলতো না। কিন্তু সৎভাইকে আলিঙ্গন করার খুবই ইচ্ছা ছিলো তার। আর স্যাভেরিওর তখন এমনই বিভ্রান্তিকর অবস্থা যে, অবশেষে সেবাস্টিয়ানোকে বিদায় জানানোর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার মনে হলো পেরোর প্রশংসা করে তার কিছু বলা উচিত যে এখন তার কেবিনে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল।

'জনতার নেতা সে এখন', বললো স্যাভেরিও, 'দারুণ শক্তিশালী সে, দারুণ জ্ঞানী, আমাদের থেকেও অনেক বেশী অটল, স্থির সংকল্পে বিশ্বাসী সে। ওবে আমাদের সবার অনুসরণ করা উচিত, ওকে আমাদের আদর্শ করা উচিত...। আর আমরা কিই বা করতে পারি? আমরা জানি, আমরা সৈনিক...তবে আমাদের হুকুম করতেই তার জন্ম। আর এর প্রমাণ তুমি নিজের চোখেই দেখো, আগামীকাল চরম সংকটের প্রাক্কালে কেমন নির্বিবাদে ঘুমোচ্ছে ও।'

পেরোকে যেভাবে চিত্রায়িত করলো স্যাভেরিও তার সঙ্গে একমত হতে পারলো না সেবাস্টিয়ানো, আর নিজেকে স্যাভিরিওর মতো 'ঘরোয়া সৈনিক' হিসেবেও ঠিক মেনে নিতে পারলো না সে। স্যাভেরিও তা কেবিনে ফিরে গেলো; এবং সেবাস্টিয়ানোও অন্ধকারে ঠিক পথ চিনে কতকগুলো শূন্য ঘর পেরিয়ে তার শয়নকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলো। অবশেষে বিছানায় ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিলো সে।

❑ দশ ❑

পরদিন সকালে তিনজনের ঘুম ভাঙলো—তিনজনেরই চিন্তাধারা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। রাতে ভালো ঘুম হওয়ার দরুণ পেরোকে খুব সতেজ এবং প্রচণ্ড শান্ত দেখাচ্ছিল, মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত সে এখন। ওদিকে স্যাভেরিও সারা রাত চোখের পাতাগুলো এক করতে পারেনি ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তায়, তার চোখে রাত্রি জাগরণের ছাপ স্পষ্ট। গতকাল সন্ধ্যার তুলনায় তাকে অনেক বেশী উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

আর সেবাস্টিয়ানো তখন বেশ ভালো ভাবেই জেনে গেছে এ কাজে প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে, এক দিকে পুলিশ অপর দিকে ষড়যন্ত্রকারীরা দুই তরফকে সামলে তাকে এখন সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তার ভূমিকা পালন করে যেতে হবে। সে এবং পেরো স্পষ্টতই স্যাভেরিওর থেকে নিজেদের অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। আবার তাদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সেটা প্রমাণ করার জন্য পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে পিছপাও নয়। অবিশ্বাস করার থেকে পেরো তার পেশাদারি মনোভাব নিয়ে মানুষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে চায়—অভিভাবক এবং আইন ভঙ্গ কারী হিসেবে। নিজেকে সে বলে, এ কথা ঠিক যে, সেবাস্টিয়ানো পুলিশের লোক নয়, অতএব সে অবশ্যই একজন অপরাধী। ষড়যন্ত্রকারী একজন হলে তাতে কিই বা এসে যায়? তার জালে মাছ ধরার ক্ষমতা একটা নয় দশটা। তা সত্ত্বেও সেবাস্টিয়ানো যে ভাবে তাদের কাছে নিজেকে উপস্থাপিত করেছে, সেটাও সমর্থনযোগ্য নয়। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, গোপনে সে তাদের আগের রাত্রের কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনে থাকবে, অতএব স্পষ্টতই বিশ্বাসযোগ্য লোক হতে পারে না সে। সে যে পুলিশের লোক নয়, এ ব্যাপারে যদি না সে নিশ্চিত হতো, তাহলে সে তাকে প্ররোচনাকারী অন্য এজেন্টের লোক বলে অবশ্যই তাকে সন্দেহ করতে পারতো। ওদিকে সেবাস্টিয়ানো তখন পেরোকে বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত—লোকটা অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির এবং নিজের উপর প্রচরড আস্থা আছে। এমন কি স্যাভেরিওর মতে লোকটা জন্ম থেকেই হুকুম-কর্তা হলেও একটু যেন বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। অপর দিকে তার আশঙ্কা, সে যে কখনো সত্যিকারের ষড়যন্ত্রকারী ছিলো না কিংবা তার সেরকম কিছু ইচ্ছেও যে নেই, সেটা যদি সে আবিষ্কার করে ফেলে? তবে তাতে সে একটুও দমবার পাত্র নয়, নিজের দিক থেকে তাদের ষড়যন্ত্রের প্লট বানচাল করার সব রকম চেষ্টা অবশ্যই করে যাবে বলে ঠিক করলো সে। তবে পিছন থেকে ছুরি মারার মতো গোপন চালাকিতে তার ভীষণ ভয়। সে শুনেছে তাদের হাতে বিশ্বাসভঙ্গকারী ষড়যন্ত্রকারীদের চরম শাস্তি দেওয়া হয়; তাই সে ভাবলো স্যাভেরিওর হাতে তাকে যদি গলায় ফাঁস লাগাতে হয় কিংবা মাথায় বুলেটবিদ্ধ হয়ে মরতে হয়, সেটা হবে জীবনের অবিশ্বাস্য প্রতিচ্ছবি, সেই মৃত্যু হবে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য।

সেদিন সকালে সেবাস্টিয়ানোর বাড়ি থেকে ডাচেস ভিলায় যাওয়ার পথে স্বাভাবিক ভাবেই একটা থেকে আর একটা বিষয়ে অনর্গল উপদেশ এবং বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে অপর দুজনের মধ্যে তখন জোর তর্ক লেগে গিয়েছিল প্রশ্নকর্তা পেরো আর উত্তরদাতা সেবাস্টিয়ানো। পেরোর অনুসন্ধিৎসু মন তখন জানতে চাইছিল, পৃথিবীতে উচ্চশ্রেণীর এমন কোন্ সুপুরুষ, আচরণে ছেলেমানুষ যুবক আছে, যে কিনা

সহজ, স্বাভাবিক এবং নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ছেড়ে সরকারকে উৎখাত করার মতো ভয়ঙ্কর চিন্তা মাথায় আনতে পারে? অপরদিকে অতি সতর্কতার সঙ্গে সেবাস্টিয়ানো আবিষ্কার করতে চাইছিল পৃথিবীতে পেরোর মতো লোক এমন এক চরম মুহূর্তে কি ভাবে অমন শান্ত ও সহজ ভঙ্গিতে থাকতে পারে!

পেরোর প্রশ্নের উত্তরে সেবাস্টিয়ানো বলে, কিছু দিন থেকে স্বার্থপরের মতো সে তার সুখের জীবনে বিতৃষ্ণা বোধ করছিল। তাই সে ভাবছিল, কোনো অলৌকিক কাজে সে তার বিশ্বাসযোগ্যতার স্বাক্ষর রাখার চেষ্টা করবে। শেষ লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সে করবে। এমন কি সেই মহৎ কাজে প্রয়োজন হলে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত সে। কারণ সে স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছে, নিজের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কেউ বাঁচতে চাইলে সেটা কখনোই প্রকৃত সুখের হতে পারে না। অপরকে দুঃখ নিয়ে কেবল নিজের সুখের কথা চিন্তা করাটা স্বার্থপরতার লক্ষণই শুধু নয়, পাপও বটে। প্রকৃত পক্ষে স্যাভেরিওর কাছ থেকে শোনা উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করে যায় সে কাকাতুয়ার মতো।

"শয়তান এর ব্যবস্থা নিক!" সেবাস্টিয়ানো উজ্জীবিত সৌম্য মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললো পেরো, 'এই সব যুবকেরা দেশের কাজ করার জন্য মৃত্যুবরণ করতে চায়। আর মনে হয়, কোনো কিছুতে বিশ্বাসী তারা!'

কিন্তু প্রকৃত সত্য ঘটনা হলো, সব সময় ফয়স্তার কথাই চিন্তা করে যাচ্ছিল সেবাস্টিয়ানো। আর তার আচরণ তার কথাবার্তা শুনে পেরো এতোই আশ্চর্য হয়েছিল যে, তার কাছে সেবাস্টিয়ানোর তখনকার মানসিক চিন্তার একটা বিকল্প অর্থ খুঁজতে গিয়ে তার মনে হয়েছিল, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ফয়স্তার প্রতি ভালোবাসারই সামিল। তাহলে ফয়স্তাই তার এই হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ। বিদ্রোহের পথে বাধা হলো টেরেসো এবং ম্যানুয়েল, যারা তাকে ফয়স্তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। সব শেষে সে যে বলেছে, সে তার ব্যক্তিগত সুখস্বচ্ছন্দে ভরা জীবনের খোলস পাল্টাতে চায়, তার সেই জীবন ফয়স্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগের জীবন। পেরোর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর সে এবার অপরাধ করার কাজে অগ্রসর হলো, নিজের আসল স্বরূপ গোপন রেখে বন্ধুসুলভ মনোভাব প্রকাশ করে সেবাস্টিয়ানো তাকে বললো, পেরোর নিজের উপর পরিপূর্ণ আস্থার প্রশংসা না করে থাকতে পারছে না সে, তবে সেই সঙ্গে আশ্চর্য হচ্ছে সে এই কথা ভেবে যে, এমন এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে কি করে সে শান্ত হয়ে থাকতে পারছে! যাইহোক, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করার খুবই চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঠিক মতো সফল হতে পারেনি, তার ভেতরের ক্রোধ, উত্তেজনা চেপে রাখতে পারেনি।

"শয়তান এর ব্যবস্থা নিক!" কথাটা আবার ভাবলো পেরো। "আমাদের বন্ধু হলো একজন পর্যবেক্ষক..." সেবাস্টিয়ানোর মনোভাব যে তীক্ষ্ণ, চাঁচাছোলা, দৃঢ়তার এবং একই সঙ্গে অস্ফুট একটা ইঙ্গিত বহন করছে, সেটা অনুমান করে নিয়ে তার দিকে সরাসরি দৃষ্টি ফেলে উত্তরে পেরো বলে, এ ব্যাপারে অভ্যস্ত সে, আর সেই কারণেই সে এমন শান্ত থাকতে পারে। তবে বিদ্রোহী হিসেবে জীবন শুরু করার সময় সে নিজেও ভেবেছিল, সে বোধহয় তার মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসেছে। তাছাড়া, তার ধারণা একজন না একজন কাউকে শান্ত হয়ে থাকতেই হয়। যেমন স্যাভেরিওকে কোনো মতেই শান্ত প্রকৃতির মানুষ বলা যায় না, আর তা সে কোনো দিনও হতে পারবে না। আর চরম বিদ্রোহের সময় তার গতিবিধি কি রকম হয়, সেটা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। তাই পেরো মনে করে, সমস্ত দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়, শান্ত হয়ে থেকে। স্যাভেরিওর নির্দেশে সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব দেখিয়ে হাসলো পেরো, কিন্তু সেবাস্টিয়ানো তার সেই হাসির প্রত্যুত্তর দিতে পারলো না।

প্রকৃতপক্ষে তারা ডাচেস ভিলার যতো কাছে আসতে থাকলো, স্যাভেরিওর মধ্যে প্রবল উচ্ছ্বাস, উল্লাস এবং নিয়ন্ত্রনহীন চঞ্চলতা দেখা দিলো। সবার আগে আগে চলছিল সে। তৃনভূমি থেকে সংগ্রহ করা একটা লাঠি ঘুরিয়ে উল্লাসে শিস্ দিয়ে উঠল সে মাঝে মাঝে, বাতাসে সেই শিস্ ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছিল। সকালের সজীবতা তখনো শীতল এবং মিষ্টি ছিলো, সেটা তাকে মাতাল করে তুলেছিল। এখনো সে নিজেকে তরুণ বলে মনে করে। কিন্তু স্বভাব নির্দয় জল্লাদ স্যাভেরিও আগেই তার ভবিষ্যৎ জেনে গেছে। অভিযানপ্রিয় সে, ভয়ডরহীন ষড়যন্ত্রকারী সে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছিল সে।

'তোমার কাছে এটা খুব আশ্চর্য বলে মনে হতে পারে', একটা ছোট্ট ব্রীজ পার হয়ে এসে বললো সে, 'তোমার কাছে এটা অবাস্তব বলেও মনে হতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা তিনজন একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছি...আমাদের দিকে কেউ তাকিয়ে নেই বা সে কথা কেউ কি মনে করতে পারে? আমরা যেন অতি সাধারণ তিন ব্যক্তি নেহাতই ভোর সকালে ঘুম থেকে উঠে বনের মধ্যে দিয়ে পথ চলেছি; অথচ বাস্তবে কে বলতে পারে আমাদের এই প্রাতঃ ভ্রমণের নীট ফল একটা নতুন পৃথিবীর আবির্ভাব ঘটতে পারে, সৃষ্টি হতে পারে একটা নতুন চিন্তাধারা, একটা নতুন ইতিহাসের অধ্যায়...এখানে যে কেউ দেখতে পারে একটা নতুন উদ্দীপনার শক্তি, অশুভ শক্তিকে দমন করার ক্ষমতা। আমরা যা ঠিক করেছি সেটা যদি সফল হয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ আমাদের আজকের এই অভিযানের পথে চলার কথা স্মরণ করবে, মনে হবে বহু মানুষ আমাদের চলার সাথী হয়েছিল।

শ্রদ্ধার সঙ্গে অবাক হয়ে তারা বলাবলি করবে, এ যেন এক অবিশ্বাসী রূপকথা বা পৌরাণিক কাহিনী। তারা বলবে, মানুষের লক্ষ্যপথে এবং সমাজে বিশ্বাসী নিষ্ঠুর অত্যাচারীদের শায়েস্তা করার জন্য আমরা তিনজন বহুদূর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য...তুমি এসব বিশ্বাস করো না? আমি তোমাকে বলে রাখছি, দেখবে এমন একদিন আসবে যখন এই জায়গাটা মানুষ তাদের ধর্মস্থান মনে করে প্রতি বছর এখানে আসবে পূণ্য সঞ্চয় করার মনোভাব নিয়ে...সে যাইহোক, তবু আমরা এই তিনজন মানুষ আজ আমরা যা করবো আমাদের কর্তব্য বলেই মনে করবো। ...তুমি দেখতে পাচ্ছো না? আজকের এই সকালের মতো, এই অরণ্য পথে অভিযানের মতো, আমাদের মতো মানুষের সক্রিয় প্রচেষ্টা, এই ভাবেই ইতিহাস সৃষ্টি হয়।...'

'সাবধান, অত জোরে চিৎকার করো না,' স্যাভেরিওর উদ্দেশ্য বলে উঠলো পেরো। পেরোর কাছে এ অর্থহীন—এ যেন স্যাভেরিওর ছুঁচোর মাটি খুঁড়ে পাহাড় বানানোর মতো। 'সম্ভবত প্রতি একশো গজ অন্তর পুলিশ তাদের বেষ্টনী তৈরী করে রেখেছে।'

'আমি তাদের তোয়াক্কা করি না।' স্যাভেরিও তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো। তারপর সে তার কথার জের টেনে বলে চলে, 'ঐ পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখো, সূর্যের কিরণ কি রকম ছড়িয়ে পড়ছে, আজ সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই আমরা মুক্তি সূর্যের আবির্ভাব ঘটাবো। কি তাজা বাতাস দেখো, যেন শিশির ভেজা ঘাসের উপর থেকে উঠে আসছে পরাধীন জীবনের শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। ফুলগুলো কতো সুন্দর, পাঁপড়ি মেলে ধরছে আমাদের হতাশ জীবনে আনন্দ দেওয়ার জন্য। পাখীদের গান শোনা, ঘুম থেকে জেগে উঠে তারা সূর্যকে প্রণাম জানাচ্ছে, তাদের ঐ গান আমাদের মুক্তির গান। আহ্, এই হলো প্রকৃতি, স্বাধীন কিংবা পরাধীন সব মানুষের কাছেই প্রকৃতির দান অকৃপণ! আমাদের জীবনকে উপভোগ করা কে রুখতে পারে? যে কোনো মুহূর্তে সূর্য আকাশে উঠে আসবে, এবং সব জায়গায় ফুলের মধু খেতে ভ্রমরের দল ভীড় করবে এখানে। হয়তো আমরা সব কিছু পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করতে পারি, ডাচেস ভিলায় যাওয়ার পরিবর্তে ঠিক এখান থেকে ডানদিকের পথ আমরা ধরতে পারি এবং গ্রামের পথে প্রাতঃভ্রমণে যেতে পারি। অভ্যুত্থানের বদলে আমরা কেবল স্বপ্ন দেখতে পারি। না, তা হতে পারে না। আমাদের পরিকল্পনা মতো বাঁদিকেই আমরা ঘুরবো। যেখানে বিপদের হুমকি আমরা সেখানেই যাবো, সম্ভবত আমাদের জন্য মৃত্যু সেখানে অপেক্ষা করছে।...তখন কেউ'বা অস্বীকার করবে অস্তিত্বের প্রেরণা; সেই উৎসাহ কংক্রীটের মতো কঠিন, অদম্য; দৃশ্যত সমস্ত বাস্তবতার থেকে অনেক বেশী সহজবোধ্য অনেক বেশী শক্তিশালী জিনিষ? মানুষের

আত্মার কথা, মানুষের স্বাধীনতার কথা কে অস্বীকার করবে?

বাস্তববাদী স্যাভেরিও মহা উৎসাহে তার মনের কথা প্রকাশ করে তার আবেগ, তার প্রেরণার কথা জাহির করতে চাইল। পেরো কিন্তু তার কথায় একটুও আমল দিলো না। তার কাছে স্যাভেরিওর কথাগুলো মিথ্যে, ফাঁপানো, ভাঁড়ামি এবং বিস্বাদ বলে মনে হলো। তবে সেবাস্টিয়ানো বয়সে তরুণ এবং প্রেমিক বলেই হয়তো আদর্শবাদের অনুভূতি যে কি রকম বোঝে সে। তার মনে স্যাভেরিওর কথাগুলো অন্য প্রভাব ফেললো। অবশ্য সে তার সৎভাই-এর উৎসাহে অংশগ্রহণ করতে পারলো না। তবু তা সত্ত্বেও তার মনে হলো, স্যাভেরিওর কথাগুলো মিথ্যে নয়, খাটি সত্য, তার বক্তব্যের মধ্যে আছে সততা, আনুগত্য এবং মৌলিকতা। তাকে দেখলে কারোরই সন্দেহ হওয়ার কথা নয়।

'এসো বন্ধুগণ', স্যাভেরিও তার দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে বললো, 'যুদ্ধে অগ্রবর্তী সৈনিকদের মতো এসো আমরা এক সঙ্গে গান গাই।' তার সঙ্গীরা তার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইলো কিনা সেদিকে ফিরে না তাকিয়েই সে একাই মনের খুশিতে গান গাইতে শুরু করলো। উদাত্ত তার কণ্ঠস্বর। অপর দুজনের ব্যক্তিগত কারণে তার সঙ্গে গান করার মতো সাহস ছিলো না। কিন্তু সেটা লক্ষ্য করলো না স্যাভেরিও। সবার আগে সে এগিয়ে চলে। তার হাতের লাঠিটা মাঝে মাঝে শূন্যে তুলে ঘোরাতে থাকে সে, বাতাসে শন্‌শন্‌ আওয়াজ ওঠে। এমন ভাবে সে লাঠি চালায় যেন সে তার শত্রুর শিরচ্ছেদ করে চলেছে একটার পর একটা। তার বেসুরো গানের কণ্ঠস্বর মিষ্টি সকালের স্তব্ধতা ভেঙ্গে খান্‌ খান্‌ করে দয়। সেই সঙ্গে ভুল ফরাসী উচ্চারণ হাসির খোরাক যোগায় তার পিছনের দু'জন সঙ্গীর কাছে। তবু তাতেও সে একটুও দমলো না।

গানের সঙ্গে স্যাভেরিওর বক্তৃতা ভালো লাগলো না পেরোর। সে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। ওদিকে সেবাস্টিয়ানো কখনো ভাবে ফয়স্তার কথা, কখনো বা জোর করে তার সৎভাই এর গান শোনে। সুন্দর সকালের ততোধিক আনন্দময় আলোর পথ ধরে তারা এগোতে থাকে। মাথার উপর আলো ঝলমলে সূর্য, হলুদ সূর্যের হলুদ আলো লুটোপুটি খেতে থাকে মাটিতে, তাদের সারা অঙ্গে এবং পোশাকে। অরণ্যে দূরে কোথাও পাহাড়ী ঝরণা থেকে জল পড়ার শব্দ ভেসে আসে তাদের কানে। স্যাঁতসেতে বাতাসে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। আগাগোড়াই ভুল করে এসেছে স্যাভেরিও; সে সব কথা ভাবতে পারছিল না সেবাস্টিয়ানো। আজকের এই সকাল শুটিং এর জন্য; কিংবা ভুঁইফোড় এবং সাইকেল আরোহীদের তোলার জন্য। তবে বৃদ্ধ জেনারেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্লটে তাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য নয়। আসলে এক নাগাড়ে ক্লান্তিকর পেরোর প্রশ্নের পর প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল

সে। তবু তিনজনের মধ্যে এই আনন্দে ইতি টানার মতো মাত্র একজনই ছিলো। ফয়স্তাকে দেখাচ্ছিল সতেজ এবং রোমান্টিকও বটে। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে তার দেহে সব সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে দিয়েছিল।

তারা একটা গেটের সামনে এসে পৌঁছলো। গতকাল রাতে ফয়স্তার সঙ্গে মিলিত হতে গিয়ে এই গেটটা টপকাতে হয়েছিল সেবাস্টিয়ানোকে। এখন সেভাবেই প্রথমে সে গেট টপকালো লাফ দিয়ে এবং তাকে অনুসরণ করলো তার সঙ্গী দুজন। সূর্যের তেজটা একটু একটু করে বাড়ছে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ময়ূররা পেখম মেলে দিচ্ছিলো তাদের সঙ্গী ময়ূরীর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে। ময়ুর-ময়ূরীর প্রেম নিবেদনের দৃশ্য দেখে ফয়স্তার কথা মনে পড়ে গেলো। মনে মনে সে বললো, ফয়স্তা আমি আসছি তোমাকে টেরেসোর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য।

পেরো তার পরিকল্পনার রূপরেখা টানার চিন্তায় ডুবে ছিলো। তবু তারই মধ্যে সেবাস্টিয়ানোর ছটফটানি তার দৃষ্টি এড়ালো না। সে জানে, কিসের জন্য তার এই চঞ্চলতা। মনে মনে হাসলো সে, ব্যাস, দেখো, তোমার না আশা ভঙ্গ হয় শেষ পর্যন্ত। আর সেবাস্টিয়ানো ফয়স্তার যতো কাছে এগোচ্ছিল, এক এক করে তার অতীতের সব কথা মনে এসে যাচ্ছিল। মনে পড়ে কতো বিনিদ্র রজনী কেটেছে ডাচেস ভিলা সংলগ্ন পার্কে ফয়স্তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তার মিষ্টি চুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে কতো মুহূর্তই না নীরবে কেটে গেছে, এক একটা চুম্বন কতোই না দীর্ঘায়িত হয়েছে, কেউ কারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি যতক্ষণ না সেই চুম্বন বিস্বাদ বলে মনে হয়েছিল তাদের কাছে। এদিকে স্যাভেরিও কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার তার রাজনৈতিক বুলি আওড়াতে শুরু করে দিলো। এই পার্কটা অবশ্যই সুন্দর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, বলে সে, বিত্তবানদের প্রমোদ বিনোদনের জন্য এই মনোরম স্থান, এই পার্ক, এই উদ্যান, তথাকথিত ধনীদের আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতা এখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে, যে কোন মুহূর্তে সেটার ডেথ-সার্টিফিকেট লেখা হতে পারে। আর সেই ডেথ সার্টিফিকেট লিখবে তারা তিনজন। এ একেবারে অসহ্য—মাত্র মুষ্টিময় কয়েকজন লোক এখানকার অনন্দ উপভোগ করবে, এ এক কলঙ্কময় অধ্যায়। কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ লোক, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে এসে এখানে এমন এক মনোরম স্থানে স্ফূর্তি করবে, সেটা দীর্ঘদিন মেনে নেওয়া যায় না। এর প্রতিকার চাই! এই পার্ক সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত বলে মনে করলো সে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার এও ভাবলো যে, আজকের অভ্যুত্থানের পর আজকের রাতটা ভোর হলেই পৃথিবীর মানুষ দেখবে এই পার্কের গেট খুলে দেওয়া হয়েছে সর্বসাধারণের জন্যে। চোরের মতো ডাচেস ভিলার দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে এই গেটকে আর টপকাতে হবে না কাউকে

তখন। সবাই তখন এই পার্কের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে এক সঙ্গে, আলাদা আলাদা করে নয়, কিংবা শ্রেণী ভাগ করে নয়। তাছাড়া আগামী কাল তারা নতুন ইতিহাসের পাতায় আর একটা অধ্যায়ের সংযোজন করবে, সেটা হবে নতুন সভ্যতা, সর্ব স্তরের মানুষের একটিই সভ্যতা, যে সভ্যতা তাদের নতুন করে দীক্ষা দেবে সব কিছু সমান ভাবে ভাগ করে নিয়ে উপভোগ করার নীতি। স্বাধীনতা বা মুক্তি মানেই তো সব কিছুর স্বাধীনতা, হীনমন্যতা থেকে মুক্তি, স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি, সংকীর্ণমনের প্রসারতা ঘটানো, এবং তার থেকেও হয়তো বেশী কিছু...এবং এমন আরো কিছু যা পরবর্তীকালে মানুষ তাদের উপলব্ধি দিয়ে ঠিক করবে, কি তাদের করতে হবে। কোন্‌টা করলে ভালো আর কোন্‌টাই বা খারাপ...

ভিলার দিকে তারা এগোচ্ছে দেখতে পেয়ে পেরো নিজেকে গুটিয়ে নিলো, আশঙ্কা যদি তার ষড়যন্ত্র কার্যকর হওয়ার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, এই সব কথা ভেবেই সে নিজেই নিজেকে নীরব থাকার পরামর্শ দিলো। আর সেবাস্টিয়ানো তখন চিন্তা করছিল ফয়স্তার কথা।

অরণ্য পেরিয়ে তারা মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ ভিলাটা দৃষ্টিগোচর হলো। ভিলার সব জানালাগুলোই বন্ধ বাইরে শীতের তীব্রতা কমানোর জন্য। অতিথিরা এখনো ঘুম থেকে জেগে ওঠেনি। ফয়স্তার রুমালটা পড়ে থাকতে দেখল সে একটা বেঞ্চের উপর। গতরাত্রে ওখানে বসেছিল তারা। শিশিরে ভেজা রুমাল। রুমালটা কুড়িয়ে নিয়ে নাকের কাছে তুলে ধরল সেবাস্টিয়ানো, ফয়স্তার ঘ্রাণ অনুভব করল সে। তারপর রুমালটা সে তার ঠোঁটের উপর এমন ভাবে চেপে ধরল যেন ফয়স্তার ঠোঁটেই চুমু খাচ্ছে সে।

মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ ভিলাটা তাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভিলার অতিথিরা কেমন নির্বিকার ঘুমোচ্ছে, কাজকর্ম নেই, দিব্যি আছে তারা, ক্রুদ্ধ স্যাভেরিওর মনে পড়ল, অথচ এই সময় গরীব চাষীরা মাঠে চাষ করতে নেমে পড়েছে, আর চাষের মুনাফা লুটবে ঐ সব অকর্মন্য লোকগুলো। এদের এই অমানুষিক অত্যাচার কবে শেষ হবে? আর বেশী দেরী নেই, হয়তো আজই তারা সেই গরীব চাষীদের মুখে তাদের পরিশ্রমের হাসি ফোটাতে পারবে। আর পেরো তখন তাদের ঈর্ষার ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল আর ভাবছিল, একবার ঐ শয়তানগুলোকে হাতে পেলে হয়, সুদে আসলে তাঁদের সব অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলবে। ওদিকে সেবাস্টিয়ানোর চোখ তখন ঘোরাফেরা করছিল ফয়স্তার ঘরের বন্ধ শাটারগুলোর দিকে। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, অলৌকিক ভাবে শাটারগুলোর উপর ফয়স্তার চেহারাটা ভেসে উঠলো, অস্পষ্ট, ভূতুরে চেহারা কালো পোশাকে, তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে। ভিলার চারপাশে মরুভূমির নিস্তব্ধতা। পূর্ব

দিগন্তে সূর্য উঁকি দিলেও ভিলার পূবের অংশ ছাড়া বাকি অংশগুলোয় তখনো শেষ রাতের রেশ রয়ে গেছে, অন্ধকারের ছায়া পড়ে আছে এখনো সেখানে।

❑ এগারো ❑

জায়গাটা পেরোর জানা ছিলো। তাই সবার আগে বাড়ির পিছনে দিকের অপ্রয়োজনীয় ছোট্ট একটা দরজার সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে ইশারা করলো, যে যার মুখোশ পরে ফেলার জন্য। তারপর বেল টিপল। দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে যেতেই বিস্মিত হলো সেবাস্টিয়ানো। দরজার সামনে তখন দাঁড়িয়েছিল একজন খানসামা। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, টাক মাথা। পরণে তার খানসামার কাজের জ্যাকেট, কালো ট্রাউজার। সেও একজজন খবর-পাচারকারী পুলিশের লোক, সেই সঙ্গে ছোটখাটো পদের একজন গুপ্তচর। কয়েকদিন আগেই সে পেরোর কাছ থেকে জানতে পারে, একটা মিথ্যে ষড়যন্ত্রের কথা। এ্যান্টিগুয়ার পুলিশ কমিশনারের মতো এই বিপজ্জনক অভ্যুত্থানের তার সমর্থন ছিলো না। কিন্তু পার্টির কথা চিন্তা করে পেরোর নির্দেশ তাকে মানতেই হবে বৈকি।

তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই সেই খানসামা ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, অতিথিরা ঠিক সময় মতোই এসেছে, এবং তারা ভিলার বেসমেন্টে শুয়ে রয়েছে। বেসমেন্টে ঢোকার মাত্র একটাই পথ, সরু অনাচ্ছাদিত এবং অস্পষ্ট। বেসমেন্টে অসংখ্য ছোট বড় সব ঘর। নামী দামী সব অতিথি। তাদের মুখে ঠিক সময়ে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য বিরাট রান্নাঘরটা এই ভোর সকালেই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে যেন। রান্নাঘর তো নয় যেন একটা মিনি ল্যাবরেটারি, ছোট বড় বহু স্টোভ জ্বলছে। এরই মধ্যে রান্নাঘরে কর্তব্যরত কর্মচারীরা অতিথিদের প্রাতঃরাশের আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। স্যাভেরিওর কথা বলতে মানা ছিলো। কিন্তু তার চিন্তার উপর কেউ খবরদারি করতে পারবে না। ধনী অতিথিদের দিলখুশ রাখার জন্য রান্নঘরের সব কর্মীরাই মুখ বুঁজে কাজ করে যাচ্ছে। ভিলার কর্মচারীদের পোশাক রাখার জন্য সব রকম ব্যবস্থাই করে রাখা হয়। আলমারির লকার খুলে সে তাদের বলে, তারা যে যার মাপের পোশাক বার করে নিতে পারে আলমারি থেকে। মাটির নিচের ঘরে তাদের পোশাক বদল করে নেয়। তারপর তারা সংক্ষেপে তাদের আসন্ন লড়াই-এর ব্যাপারে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা সেরে নেয়। ঠিক হয় যে, এই মুহূর্তে টাইমবোমা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে তদারকি করবে সে এবং অপর দুজন তার নির্দেশ মতো কাজ করবে। তারপর

তারা ড্রেসিং-রুম ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলো!

খানসামা তখন একদল পুরুষ চাকরদের নির্দেশ দিচ্ছিল। তাদের আসতে দেখে এগিয়ে এলো তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। পেরোর মত হলো ভিলার নিয়মিত কর্মচারীদের মধ্যে সন্দেহ জাগানোর মতো কোন কাজ তারা করবে না, এ দিকটা দেখার জন্য তার উপর ভার দেওয়া হয়েছে। তারা তিনজন অনুপ্রবেশকারী এবং আগের দিন সন্ধ্যায় পেরোর দম দেওয়া পুতুলের মতো অনুগামীর ছদ্মবেশে ভিলার ভেতরে প্রবেশ করেছিল। পেরো তাদের নির্দেশ দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল, ভিলার নিয়মিত কর্মচারীদের সঙ্গে তারা যেন ঘনিষ্ঠ না হয়ে ওঠে। খানসামার সঙ্গে কথা হয়েছে, সে তাদের মামুলি কাজ দেবে। হঠাৎ গণ্ডগোলের আশঙ্কা করছে খানসামা, এই ষড়যন্ত্রে বাধ্য হয়ে তার অংশ নেওয়া অভিশাপ বলে মনে হচ্ছে এখন তার। অভিশাপ দিলে পুলিশকে, অভিশাপ দিলো জেনারেল টেরেসোকে। 'কোনো রকম বিপর্যয় না হয়ে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আমি কাটিয়ে দিতে পারি ঠিক ঠিক ভাবে', ভাবলো সে, 'তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবো।' তবে তার সেই ভাবনার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না তার মুখে। তাদের তিনজনকে তিনটে আলাদা আলাদা কাজ দেবার কথা বললো সে। সেই সঙ্গে সে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললো, তাদের যা যা বলা হয়েছে ঠিক সেই ভাবে যেন কাজ করে, তা নাহলে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাবে।

খানসামা তাদের বড় হলঘরে নিয়ে এলো। এই হলঘর দিয়েই ভিলার ডানদিক বিভিন্ন ঘরে যাওয়া যায়, অতিথিরা সেখানেই এখন ঘুমোচ্ছে। অভ্যর্থনা ঘরের জানাগুলো এখনো বন্ধ, বন্ধ ঘরে আগের দিনের সন্ধ্যায় ধোঁয়া আর গুমোটে 'ম' 'ম' করছিল। সাদা আর সোনালী রঙের এই ঘরের সর্বত্র তারা ডাচেসের হাউস-পার্টির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিল। ছাইদানি ভর্তি পোড়া সিগারেটের অংশ, চেয়ার টেবিলগুলো ইতস্তত ছড়ানো, ছোট ছোট টেবিলের উপর তাস ছড়ানো, ধূলোমলিন কার্পেট, অর্ধেকখালি মদের বোতল, নোংরা গ্লাস, ফুলদানিতে বাসি ফুল, মার্বেল টপের উপর ঝরা পাঁপড়ি। একজন রাজনৈতিক বিক্ষোভকারীর চোখ নিয়ে সেই সব এলাহি মনোরঞ্জনের আয়োজন সমারোহ দেখে ঠিক করলো, এ ব্যাপারে খানসামার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা বাজিয়ে দেখতে হবে। মন্তব্য করলো সে, এই সব দামী দামী খাবার ও পানীয় নষ্ট হতে দেখে যে কেউ ভাবতে পারে, এসব এ্যান্টিগুয়ার গরীব শ্রমিকদের বাড়ির পরিপন্থি, আর ঘটনা হলো এই যে, এই সব অবিচার, দেশের মানুষের মধ্যে সম্পদ বন্টনের এতো তফাত অসহনীয়, এখনি এ সবের অবসান হওয়া উচিত। কিছুক্ষণ আড়চোখে তাদের নিরীক্ষণ করলো খানসামা, বিশেষ করে সেবাস্টিয়ানো এবং স্যাভেরিওর মুখ দেখে অবাক হয়ে সে তখন ভাবছিল,

এটা কি বাচ্চা ছেলেদের চোর পুলিশ খেলা হচ্ছে? স্যাভেরিওর প্রশ্নের উত্তরে অনেক কষ্ট করে বললো সে, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছে সে।' কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভাবলো সে; তুমি একটা আস্ত স্কাউন্ড্রেল, উজবুক...বিত্তবান লোকেরা না থাকলে আমি কি করবো? পুলিশের লোকের মতো হওয়ার চেষ্টা করো। এঁরা না থাকলে আমাদের স্ত্রী-পুত্রের মুখে অন্নই বা যোগাবে কি করে? কিন্তু সৌভাগ্যবশত আগামীকাল তোমাদের স্থান হবে লক আপে, এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে...অবশ্যই এটা তোমাদের প্রাপ্য...'

যাইহোক, খানসামার চোখ বলছিল, যে কিনা দ্বৈতভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত—একদিকে কর্তব্যরত পুলিশ, অপরদিকে তার কাজ হলো ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে গোপনে খবর পাচার করা, সেবাস্টিয়ানোর মুখ দেখে তার উপলব্ধি যেন একটু অস্বাভাবিক,তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে যেন হুকুম করার জন্যই অভ্যস্ত, কাজ করার জন্য নয়—এমন কি পুলিশের কাজও নয়। সেবাস্টিয়ানোর মতো লোক নিজে এই ষড়যন্ত্রকারী দলের মধ্যে কি করে মিশলো, সেটাই তার কাছে খুব আশ্চর্য লাগছিল, বিশেষ করে স্যাভেরিওর মতো অমার্জিত গেঁয়ো লোকের সঙ্গে কি করে সে হাত মিলালো। 'সে যে মহামান্য ফয়স্তার একজন অতিথি ভাবতে পারো তুমি!' চিন্তা করলো খানসামা, 'পেরোর মতো পুলিশের এজেন্ট সে নয়...' এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তার কি ধারণা? সে কি শুধু মজা উপভোগ করছে কিংবা একটা নতুন কিছু আনার চেষ্টা করছে?' এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সেবাস্টিয়ানোর মতো লোকেদের সঙ্গে কাজ করতে অভ্যস্ত খানসামা সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে এও দেখতে হবে, বিভিন্ন কারণে পেরো এবং স্যাভেরিওর সঙ্গে তার মনের মিল নেই, সে তাদের ভয়ঙ্কর ভাবে অপছন্দ করে; আর সেই কারণেই সেবাস্টিয়ানোর জন্য তার কোনো বাড়তি সহানুভূতিও নেই। তবে মনে মনে সে তাকে উচ্চবর্ণের লোক বলে ভাবে, যারা তাকে, তার স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছে। মূলত ভৃত্য শ্রেণীর লোক খানসামা। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক নয় সে। সব সময় সে ঈর্ষা এবং শ্রদ্ধার দোটানায় দুলছে, মনিবের প্রতি ক্রোধ এবং তোষামোদ দুটোই তাকে করতে হচ্ছে। কারোর প্রতি তার ভালোবাসা নেই, অক্ষম সে, এমন কি নিজেকেও ভালোবাসতে পারে না সে। নীরবে সব সময় উপরওয়ালার হুকুম তামিল করতেই অভ্যস্ত। সে বোধহয় নিজেও জানে না, সে তার পেশাটা পছন্দ করে নাকি ঘৃণা করে। যাইহোক, তার মনোভাব এখনো ঠিক স্পষ্ট নয়। এই মুহূর্তে তার উপলব্ধি খুবই বিরক্তিকর। এই কারণে যে, তার মনে হয় জোর করে তাকে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে, যার জন্য তার মনের কোনো তাগিদ নেই। তার দৃঢ় বিশ্বাস সমস্ত ব্যাপারটাই যেন নারীর

সন্তানধারণ করার মতো, সন্তান সম্ভবা হওয়ার আগে নারীর দেহ মনে সন্তানধারণ করার যে কৌতূহল, আনন্দ এবং রোমাঞ্চ থাকে, গর্ভবতী হওয়ার পর একটু একটু করে যখন দশমাস দশদিন পর্যন্ত প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে যে ঝামেলা, যে শারীরিক কষ্ট তাকে পোহাতে হয়, সেই অনুভূতি থেকে তখন তার মনে হয়, আর নয়, এই নয় শেষ। সে আর নতুন করে মা হতে চাইবে না, কিংবা মা হওয়ার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ সে করবে না। খানসামার মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকম এক গর্ভবতীর মনের অবস্থার মতো। তার এখন মনে হচ্ছে, না, আর নয়। এই ষড়যন্ত্র সফল হোক, কিংবা ব্যর্থ হোক আর নয়, দ্বিতীয়বার সে আর এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যাবে না। ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কায় তার মনটা স্বভাবতই বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত।

স্যাভেরিও সম্পর্কে পেরো আগেই সতর্ক করে দিয়েছ খানসামাকে—তাকে সে তার কাছে একটা গর্দভ এবং গোঁড়া মনোভাবাপন্ন লোক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আর সেই কারণেই সে তাকে গুরুত্বহীন কাজ দেওয়ার কথা বলেছে, যাতে করে সে তার হঠকারী স্বভাবের পরিচয় না দিতে পারে। একটা ছোট সিঁড়ি পথে খানসামা তাদের তিনজনকে তিনতলায় নিয়ে এলো—বিরাট লম্বা একটা করিডোর। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সারিবদ্ধ ঘর। একেবারে শেষ প্রান্তে দেওয়ালে ঝুলতে দেখা গেলো একটা নির্দেশক বোর্ড, নম্বরে ভর্তি, সব সময় একটি মেয়ে সেখানে বসে থাকে। স্যাভেরিওবে খানসামা বলে, তাকেও সেই বোর্ডের নিচে বসে থাকতে হবে। সব সময় ঐ নম্বরগুলো লাফিয়ে উঠলে মেয়েটি বিভিন্ন ঘর থেকে খাবারের ফরমাস নিয়ে দূরভাষে রান্নাঘরে জানিয়ে দেয়। স্যাভেরিওকেতার পাশে বসতে দেখে মেয়েটি চকিতে একবার তাকে দেখে নিয়ে ভাবলো, লোকটা খুব একটা কাজের হবে বলে মনে হয় না, বরং তার উপস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করতে থাকলো সে।

স্যাভেরিওকেকাজ বুঝিয়ে দিয়ে খানসামা এবার পেরো এবং সেবাস্টিয়ানোকে করিডোরের অপর প্রান্তে নিয়ে গেলো। তারপর বেশ কয়েকটা এ্যান্টিরুমের ভেতর দিয়ে একটা ছোট গ্যালারিতে গিয়ে প্রবেশ করলো। দারুণ সাজানো গোছানো গ্যালারি। মাত্র তিনটি দরজা খোলা ছিলো গ্যালারির। "এটা একটা আবক্ষ মূর্তির গ্যালারি" বললো খানসামা। কারণ এখানেই রয়েছে বিজয়ী পিজারো, করটেজদের মতো বিখ্যাত মানুষের আবক্ষ মূর্তি। বাড়ির সব থেকে বিলাসবহুল ঘর এটা, অতিথিদের দেখার জন্য খোলা রাখা হয় এই গ্যালারি। গ্যালারির একেবারে শেষ প্রান্তে চতুর্থ দরজা অন্য তিনটে দরজা থেকে সেটা অনেক বেশী কারুকার্য খচিত এবং সুন্দর দেখতে। পারিবারিক গীর্জায় যাওয়ার জন্য এই চতুর্থ দরজাটি ব্যবহার করা হয়। অপর তিনটি

দরজার মধ্যে প্রথমটি ডাচেসের নিজস্ব এ্যাপার্টমেন্টে যাওয়ার জন্য, দ্বিতীয়টি টেরেসোর স্যুটে যাওয়ার এবং তৃতীয়টি কাউন্টেস ফয়স্তার এ্যাপার্টমেন্টে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট। ফয়স্তার নাম শোনা মাত্র সেবাস্টিয়ানোর বুকটা আর একবার আন্দোলিত হয়ে উঠলো। খানসামা তার বক্তব্য শেষ করে বলে, এই গ্যালারিতে তাদের থাকতে হবে এবং এই তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে।

সে তার পকেট থেকে এক গুচ্ছ চাবি বার করে টেরেসোর স্যুট-এর তালা খুলল। একটা ছোট শয়নকক্ষ, বাথরুম এবং স্টাডিরুম। শয়নকক্ষের জানালা দুটো খুলে দেয় খানসামা। জানালার ফ্রেমের উপর ভর দিয়ে সাদা এবং সোনালী রঙের বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলে চলে, না জানি কত উল্লেখযোগ্য সব অতিথিরা—রাজকুমার, রাষ্ট্রদূত, রাজনীতিবিদ এবং জেনারেল—বালিশে মাথা রেখে বিশ্রাম নিয়েছিল। সে বেশ ভাল করেই জানে, এরা দু'জন এ সব জানার জন্য তেমন আগ্রহী নয়, অথচ এই ভিলার সব অতিথিরা এখানকার অতীত ইতিহাস জানতে কি যে আগ্রহী তা যদি তারা জানত, লজ্জা পেত নিশ্চয়ই এই ভেবে যে, তাদের অনীহা শুধু ব্যতিক্রমই নয়, অজ্ঞতার পরিচয়ে!

পেরো তার অস্বস্তিবোধ লক্ষ্য করে তাকে ভয় পাওয়ানোর কথা ভাবলো। ঠাট্টা করে বললো সে, সব থেকে ভালো কাহিনী সে ভুলেই গিয়েছিল—ঐ একই বিছানায় ভেনাস্তিয়ানো ভালডেজ রাত কাটিয়েছিলেন। তিনি তখন দেশের রাষ্ট্রপতি, টেরেসো দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভের ঠিক আগে—সেই তাঁর জীবনে শেষ ঘুম, কেননা ঐ বিছানা থেকেই তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় এ্যান্টিগুয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার উত্তরাধিকারের নির্দেশে তাঁকে সেখানে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। 'এ যেন এক অদ্ভুত মিল', সেবাস্টিয়ানোর দিকে পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে পেরো তার চিন্তার ইতি টানল। তারপর খানসামা তার দিকে ভয়ে ভয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলে গেলো, তার এখন অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

সে চলে যাওয়ার পর পেরো সিগারের একটা বাক্স থেকে দামী সিগার তুলে নিয়ে আগুন ধরাল। তারপর একটা আরামকেদারায় পায়ের উপর পা রেখে বসল। সেবাস্টিয়ানোর ইচ্ছার কথাটা জানার আগ্রহ তখনে সে ত্যাগ করেনি। তবু তারই মধ্যে আজকের অভ্যুত্থান এবং সেই রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের বিস্তারিত পরিকল্পনা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে ভুললো না সে। খাবারের ট্রে করে বোমা আনবে স্যাভেরিও, সেই বোমাটা ঢাকা থাকবে একটা প্লেট দিয়ে এমন ভাবে, যেন ট্রের নিচে খাবার গরম রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে কারোর সন্দেহের কোন অবকাশও থাকবে না। ঘরে

ঢুকেই সোজা সে বাথরুমে চলে যাবে—তোয়ালে রাখার কাপবোর্ডে সেই বোমাটা রেখে দেবে সাবধানে। সেই সময় পেরো এবং তার কতিপয় সহকারী গ্যালারিতে পাহারা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকবে। বাথরুম এবং কাপবোর্ডে চাবি দিয়ে তারা সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে আসবে সেখান থেকে। টাইমবোমা। আধঘন্টা পরে সেই বোমাটা ফাটবে, সঙ্গে সঙ্গে সারা ভিলা সেই শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ফলে বেলুনের মতো উড়ে যাবে এবং টেরেসো সমেত সমস্ত অতিথিদের মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

ধীরে ধীরে কথা বলছিল পেরো। মাঝে মাঝে সিগারের ধোঁয়া গিলে ফেলতে গিয়ে ধূর্ত চাহনি ফেলছিল সেবাস্টিয়ানো পানে। তার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার কথাগুলো শুনতে গিয়ে ক্রমশই আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল—তার ইচ্ছে নয় যে, তারা অত নিষ্ঠুর হয়, কারণ তা হলে তার প্রিয়তম ফয়স্তাও বিপদে পড়বে। এখন সে ভাবছে, 'স্যাভেরিওর কেবিনের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে যদি না আমি তাদের সেই ষড়যন্ত্রের কথাগুলো শুনতাম তাহলে ফয়স্তাকে শুধু টেরেসোর দাবী মতো তার কাম-লালসার শিকার যে হতে হতো না, তার সঙ্গে সে তার ভায়ের মুক্তিপণের দর কষাকষি করতে করতে এই অভিশপ্ত ভিলায় একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতো, তার ফুলের মতো সুন্দর শরীরটা এই বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে যেতো; আর যদি কোনদিন কেউ এই প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করতে সমর্থ হতো, চমকে উঠতো সে ফয়স্তার সারা শরীরে টেরেসোর জঘন্য কাম-লালসার চিহ্ন দেখতে পেয়ে। যাইহোক, গতকাল রাতের সেই হঠাৎ ঘটনাচক্রে পেরোদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এখন সে ভাবছে, ভালই করেছে সে—সেই ঘটনা শুধু ফয়স্তাকে রক্ষা করতেই সম্ভব হচ্ছে না, সেই সঙ্গে ফয়স্তার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসার জের টেনে যাওয়ার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত সে যেন পাচ্ছে। তার চোখের সামনে আর একটা সৌভাগ্যের হাতছানি—যা সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আজও।

সেবাস্টিয়ানোর মধ্যে ভয়ের কিছু কিছু ইঙ্গিত জাগানোর জন্য পেরো করল কি, টাইম-বোমার ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী ক্ষমতার উপর জোর দিয়ে সে তাকে নানান ঘটনার কাহিনী শোনাল। এবং সেটার প্রতিক্রিয়া যে কত বিপজ্জনক হতে পারে, সে কথাটাও বলতে ভুললো না সে। কিন্তু সেবাস্টিয়ানোর কানে তখন যন কোনো কিছুই প্রবেশ করছিল না, আসলে সে তখন তার প্রিয়তম ফয়স্তার চিন্তায় বিভোর; তবে তারই মাঝে পেরোর সীমাহীন সাহস দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না সে। 'এখন দেখা যাচ্ছে, স্যাভেরিওই ঠিক, সত্যিকারের পেশাদার টেরোরিস্ট সে', কথাটা ভেবে আশ্চর্য হলো। ওদিকে পেরো তখন ভাবছিলঃ "এই লোকটি অবশ্যই নাছোড়বান্দা; সে যেন দেখেও

দেখতে চায় না। তা না হলে এত বিপদের কথা শুনেও কেমন নির্বিকার, অবিচলিত রয়েছে সে এখনও।”

সেবাস্টিয়ানোর নিজস্ব একটা পরিকল্পনা ছিলো, যে নিজে ছাড়া অন্য আর কেউ জানে না। হঠাৎ পেরোকে জিজ্ঞেস করে বসল সে, গ্যালারিতে পাহারা দেওয়ার সময় এবং স্যাভেরিও যখন টেরেসোর বাথরুমে টাইম-বোমা লুকোতে যাবে, তখন তার কাজ কি হবে। পেরোর উদ্দেশ্য হলো, দুই সৎভাইকে তাদের কাজের মধ্যে ধরিয়ে দেওয়া। মুহূর্তের জন্য সেবাস্টিয়ানোর মুখে তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সেটা উপলব্ধি করে নিয়ে পেরো উত্তরে বলে, স্যাভেরিওকে যথাস্থানে বোমা রাখার কাজে তার সাহায্য করা উচিত। সেবাস্টিয়ানো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, স্যাভেরিও নিজেই সেটার ব্যবস্থা করতে পারবে। বরং টেরেসো এবং কাউন্টেস স্যানচেজের ঘরের সংলগ্ন দুটি ঘরের মধ্যে যে কোন একটায় থাকা বাঞ্ছনীয় বলে ভাবলো সে। এর ফলে তাদের প্রস্তুতি দেখার জন্য যদি কেউ গোয়েন্দাগিরি করে থাকে তাহলে স্পষ্ট সে দেখতে পাবে সেখান থেকে। এই অভূতপূর্ব প্রস্তাব সেবাস্টিয়ানোর মনে ধরল খুব। সঙ্গে সঙ্গে সেও ভাবল, এই ভাবে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে টেরেসো এবং ফয়স্তার সাক্ষাৎকারের সময় কোনো রকম বাধা সৃষ্টি না করেই অনায়াসে তাদের ঘরের ভেতরে গিয়ে হাজির হতে পারবে।

‘তাদের সংলগ্ন ঘরে যেতে যাবে কেন তুমি?’ ভাবল পেরো, ‘তার প্রয়োজনই বা কি?’

তবে আর একবার সৌভাগ্য সহায় হলো সেবাস্টিয়ানোর এবং পেরোকে বোঝালো, এক সঙ্গে না করে আলাদা আলাদা ভাবে সৎভাই দু’জনকে গ্রেপ্তার করলে কেমন হয়, মনে মনে ভাবল পেরো। তারা দু’জনই দারুণ শক্তিশালী এবং বেশ উৎসাহী, তারা হয়তো প্রতিরোধের চেষ্টা করতে পারে। এবং সিঙ্কোর বিশেষ ইচ্ছা, কোনো রকম ঝামেলা যেন না হয়।

এই সব কথা ভেবেই এক মুহূর্তের জন্য সেবাস্টিয়ানোর মুখের ভাব বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ভাবল সে, তার এমন রহস্যজনক প্রস্তাবের অর্থ কি হতে পারে! তার বিশ্লেষণ হলো ঃ সেবাস্টিয়ানোর অমন অস্বাভাবিক শান্তি হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা কি হতে পারে? তবে এখনি সে তার এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য উদগ্রীব নয়। এখন তার একমাত্র জিজ্ঞাসা হলো, তার কাছে কোনো অস্ত্র আছে কি না। উত্তরে সেবাস্টিয়ানো না বলাতে পেরো তার নিজের পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে তার হাতে তুলে দিলো। পিস্তলটা ছিলো একজন প্ররোচনাকারী এজেন্টের। ধরা পড়ার সময় সেবাস্টিয়ানোর হাতে সারভিস পিস্তল, পেরো ভাবল, সেবাস্টিয়ানোকে সহজেই

অপরাধী প্রমাণ করা যেতে পারে। তাকে গ্রেপ্তার করার পর বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে পুলিশ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে। পেরো তাকে আরো দু' একটা নির্দেশ দিয়ে চাকরদের কোয়ার্টারে ঘুমোতে চলে গেলো।

❑ বারো ❑

বিছনার নিচে একা একা বসে থেকে বর্তমান অবস্থার কথা ভাবছিল সেবাস্টিয়ানো। এখন তার ইচ্ছে যে কি ঠিক বোঝা মুশকিল। কোনো সময় তার চিন্তা ফয়স্তাকে ঘিরে—পাশের ঘর থেকে তার নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছিল সে।—সে যে এখানে ছদ্মবেশ ধারণ করে তার মুক্তির অপেক্ষায় বসে রয়েছে, ফয়স্তা জানে না। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আরাম কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকলো সেবাস্টিয়ানো! ফয়স্তার ঘরের কি-হোলে চোখ রেখে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল সে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। তখন সে জানালার সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখার চেষ্টা করল, ফয়স্তার জানালার শাটার উঠেছে কিনা। না, তখনো তার জানালা বন্ধ দেখল সে। ফয়স্তার জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সামনে বাগানের দিকে চোখ পড়তেই তরুণ মালিকে বাগান পরিচর্যা করতে দেখলো। কিছুক্ষণ সেই তরুণ মালির কাজ পর্যবেক্ষণ করার পর সেবাস্টিয়ানো তার দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলো ফয়স্তার ঘরের বন্ধ জানালার দিকে, ফয়স্তা জানালা খুলে সামনে না আসা পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ভাবল সে। না গিয়েই এখান থেকে লুকিয়ে তাকে দেখার একমাত্র উপায় বলে মনে হলো তার। আর সবে ঘুম থেকে জেগে উঠে ফয়স্তা নিশ্চয়ই তার দিকে ভালো করে দেখবে না, অথচ সবেমাত্র বিছানা থেকে উঠে তার দিনের প্রথম সৌন্দর্য বেশ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে পারবে সে এখান থেকে।

প্রতীক্ষা দীর্ঘায়িত হলো। এক সময় ফয়স্তার জানালার শাটার উঠে যেতে দেখল সেবাস্টিয়ানো। গভীর আগ্রহ নিয়ে জানালার ওপর ঝুঁকে পড়ল সে ফয়স্তাকে চাক্ষুস করার জন্য। কিন্তু সে জানত না, ঘরের জানালা দরজা খোলার মতো মেয়ে ফয়স্তা নয়, তার জন্য তার পরিচারিকা আছে। এবং হলোও তাই। জানালার সামনে ফয়স্তার বদলে তার খাস পরিচারিকাকে আবির্ভূত হতে দেখল সে। মনটা তার খুব খারাপ হয়ে গেলো। আবার অপেক্ষা। ফয়স্তার সুন্দর মুখ না দেখে সে নড়ছে না। আর সেই টানাপোড়েনে তার বুকের ভেতরটা দুরুদুরু করতে থাকে— কে জানে কি ভাবে সে দেখবে ফয়স্তাকে। আশা ও আশঙ্কার দোলায় দুলতে থাকে সে। তার নিঃশ্বাস ক্রমশ

ভারি হয়ে উঠতে থাকে। বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে যায় সে। এক সময় তার উত্তেজনা যখন চরমে, ঠিক সেই সময় একটা অস্পষ্ট মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখা গেলো। কিন্তু, এ মুখ যে সম্পূর্ণ আলাদা—এমুখ সে তো দেখতে চায়নি— এমন এক অচেনা মুখ দেখার জন্য সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকেনি। যে চোখে ফয়স্তাকে দেখতে অভ্যস্ত সে, সেই চোখের সামনে অন্য মুখ দেখে স্বভাবতই ভেঙ্গে পড়ল একটা অশুভ কথা ভেবে। তবে কি সে বৃদ্ধা ডাচেসের মুখ দেখছে? হ্যাঁ এ মুখ বৃদ্ধা ডাচেসের মুখই বটে— বলাবাহুল্য সে মুখ অবশ্যই ফয়স্তার নয়। বড় কুৎসিত মুখ পীকিনীজ কুকুরের মতো দেখতে পেলো সে, ভোঁতা নাক, হাঁ করে হাই তুলতেই ডাচেসের মুখের গহ্বরে কালো ছায়া পড়তে দেখা গেলো, কালো থুতনি—সব মিলিয়ে তার একটা ভয়াবহ কুৎসিত রূপ চোখে পড়ল সেবাস্টিয়ানোর, যা দেখতে অভ্যস্ত ছিলো না সে। হতভম্ব সে। মনে মনে তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে তার সেই কুৎসিত মুখ দেখার চেয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইল সে। তার বিস্ময় ভরা চোখে ধরা পড়ল ডাচেসের ব্যাভিচারী চোখের দৃষ্টি। উত্তরে বললো সে, 'সুপ্রভাত', এবং উধাও হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

সেবাস্টিয়ানো এখন অবাক হয়ে ভাবছে ফয়স্তাকে পাওয়ার জন্য এই মহিলাকেই কি সে তার খুশি মতো ব্যবহার করতে পারে? গতরাতেও ফয়স্তাকে বুকে টেনে নিয়ে বিদায় চুম্বন দেওয়ার সময় তার যে আবেগ ছিলো, যে অনুভূতি সে উপলব্ধি করেছিল তার নরম দেহের স্পর্শ পেয়ে, তার মনো হলো, সেই ভালো লাগা ভাবটা যেন উধাও হয়ে গেছে আজ, সেই মনটা আর নেই। ঐ বৃদ্ধা ডাচেস তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। কে জানে জেনারেলের ব্যাভিচারের শিকার হয়ে একদিন ফয়স্তার চেহারাও ঐ বৃদ্ধার মতো হবে কিনা। সেই কথা ভেবেই তার এই মানসিক যন্ত্রণা।

কিন্তু এখন সে কি চায়? সেটাই সমস্যা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সে তার সমস্যাটার কথা ভেবে ভেবে যখন কোনো সমাধান খুঁজে পেল না, ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতে ঘরের মধ্যে বিচলিত হয়ে পায়চারি করছিল, পাশের ঘরে ফয়স্তার চলাফেরার শব্দ শোনার ইচ্ছায়। ঠিক তখনি ফয়স্তার ঘরের দরজা খুলে যেতে দেখা গেলো। একটু পরেই একজন ভোঁতা-নাকের পরিচারিকাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। মাঝারি উচ্চতার মেয়ে সে, কিন্তু এ্যাপ্রনের নিচে তার সুন্দর সুগঠিত দেহটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে এগিয়ে আসতেই। তার সাদা-মাটা মুখ দেখে বুঝবার উপায় নেই, এ্যাপ্রনের নিচে তার শরীরটা এমন লোভনীয়। সেবাস্টিয়ানো এগিয়ে গেলো মেয়েটির দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে, সেই মুহূর্তে তার মনের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে নিজেই বিস্মিত সে, অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। একটু আগেও তার সারা দেহ-মন জুড়ে আচ্ছন্ন

হয়ে ছিলো অন্য একটি মুখ, অন্য একটি দেহ—সে মুখ ফয়স্তার, সে শরীর তার প্রিয়তমার। সেবাস্টিয়ানো অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকে প্রবোধ দিলো, মেয়েটি ফয়স্তার পরিচারিকা, তার সঙ্গে ভাব জমাতে পারলে আখেরে তারই সুবিধা হবে বেশী তার মাধ্যমে ফয়স্তার ঘরে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারে সে। তবে মেয়েটি যে ভাবে কামনা-বিদুর চোখে তাকাচ্ছিল তার দিকে, তাতে মনে হয়, মনে মনে মেয়েটি তার প্রেমে পড়ে গেছে, এবং মেয়েটি তার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সঁপে দিতে চায়—এর জন্য কিছুটা সময় মেয়েটির পিছনে অপচয় করতে হবে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তা হোক, তাকে খুশী করতে পারলে তার লাভই বেশী।

নিজেকে সেই ভাবে প্রস্তুত করে তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেবাস্টিয়ানো তাকে জিজ্ঞেস করল, সে তার কোনো সাহায্যে আসতে পারে কি?

'আহ! দেখছি এখানে তুমি একজন নবাগত', মেয়েটি তার সাদা ধবধবে দাঁতগুলো বিজ্ঞাপিত করে বললো। হাসতে গিয়ে মেয়েটির গালে দুটি টোল পড়তে দেখা গেলো তবে তার কাছে সেটা আকর্ষণীয় নয় বলেই মনে হলো। মেয়েটি তার প্রস্তাবে ধন্যবাদ জনিয়ে বলে, তার নিজের নির্দিষ্ট কাজগুলো কোনো পুরুষকে দিয়ে করানো সম্ভব নয়। তবু তা সত্ত্বেও বললো সে। তার পরিবর্তে সেবাস্টিয়ানোর মতো সুপুরুষকে মেয়েটির পরিবর্তে ডাচেস তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখলে কিছু মনে করবে না, বরং খুশিই হবে। এর থেকে সেবাস্টিয়ানোর বুঝতে অসুবিধে হলো না, সুন্দর দেখতে পুরুষ পরিচারকদের ক্ষেত্রে ডাচেস গোরিনা নিরপেক্ষ। এবং সেই সঙ্গে কুৎসিত চেহারার ঐ পরিচারিকা তাকে পছন্দ করে।

'আমি কখনই সুপুরুষ যুবক নই', প্রতিবাদ করে উঠল সেবাস্টিয়ানো। কিন্তু কথাগুলো বলতে গিয়ে তার চোখে নিশ্চয়ই সলজ্জ ভাব ফুটে উঠে থাকবে, যা দেখে সেই কুৎসিত মেয়েটি খুশিতে না হেসে থাকতে পারল না।

'আহা, ভনিতা রাখ তো, তুমি যে সুপুরুষ, সে তুমি নিজেই ভাল করে জানো,' উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো পরিচারিকা। তাকে দেখা অবধি ভেতরে ভেতরে মেয়েটি দারুণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার ঐ কুকুরের মতো সজাগ গোল দুটি চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, এখন ঐ চোখ দিয়ে কেবল দেখার দেখাই দেখছিল না। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সেবাস্টিয়ানোর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে বুঝি-বা চোখের পলক ফেলতে ভুলে গিয়ে থাকবে।

মনে মনে ঠিক এই রকমটিই চাইছিল সেবাস্টিয়ানো। তার প্রতি মেয়েটির দুর্বলতা লক্ষ্য করে বললো সে, 'ঘরে আর কে আছে?' বলাবাহুল্য তার ইঙ্গিতটা ছিল ফয়স্তার ঘরের দিকেই।

'বাইরের কোনো পুরুষকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না,' কঠোর কণ্ঠে উত্তর দিলো সে। মেয়েটি আরো বলে, সেখানে জেনারেল আরাঙ্গোর মিস্ট্রেস থাকে। কথাটা এমন তীব্রভাবে বললো সে, হঠাৎ ঈর্ষায় সেবাস্টিয়ানোর সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সে সান্ত্বনা দিলো এই ভেবে যে, কারোর কোনো সন্দেহের কারণ না ঘটিয়েই এই ভাবে ফয়স্তার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে সে।

'ঠিক আছে', সেবাস্টিয়ানোর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ দমন করতে না পেরে সে বলে, 'এখন আমাকে যেতেই হচ্ছে, কিছু মনে করো না........পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

বললো বটে, কিন্তু একচুলও নড়ল না সে। মেয়েটি যে তার কাছ থেকে কি চায় সেটা বুঝতে পেরে কাল বিলম্ব না করে তার কোমরটা এক হাতে জড়িয়ে ধরলো সেবাস্টিয়ানো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উষ্ণ ঠোঁট দুটো ভয়ঙ্কর আবেগে চেপে ধরলো সেবাস্টিয়ানোর ঠোঁটের উপর। দুটি দেহ উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল।

সেবাস্টিয়ানোর চুম্বনে তৃপ্ত হয়ে মুহূর্তের জন্য তার ঠোঁটের উপর থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সব মেয়েদের সঙ্গেই এই রকম করো?' মেয়েটি স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল দু'হাত দিয়ে সেবাস্টিয়ানোর কোমর জড়িয়ে ধরে। মেয়েটির চোখ দুটি তেমন আকর্ষণীয় নয়, কিংবা তার চোখের চাহনিতে ভালবাসার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না, কিন্তু সে চোখে এতই উত্তেজনা ছিলো যে, সেবাস্টিয়ানো তার তপ্ত গালে লজ্জার পরশ অনুভব করল। প্রথম পুরুষের সান্নিধ্যে এলে সব মেয়েদেরই যে-রকম হয়ে থাকে ঠিক তেমনই।

প্রথমে সেবাস্টিয়ানোর মনে হয়েছিল, তাকে সত্যি কথাটাই বলে ফেলে—হ্যাঁ, সেই তার জীবনে প্রথম নারী নয়। তবে হ্যাঁ, ফয়স্তাই তার জীবনে প্রথম ও শেষ নারী, তার চিন্তাতেই বিভোর হয়ে আছে সে। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার ভাবল, মেয়েদের মন বড় ঈর্ষাকাতর, সত্য কথাটা বললে সে যদি বেঁকে বসে, তার সঙ্গে সহযোগিতা না করে। তাছাড়া ফয়স্তার সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কের কথা তার কাছে প্রকাশ করে ফেললে সব ভেস্তে যেতে পারে। মেয়েরা তাদের পেটে কথা চেপে রাখতে পারে না, যেমন পারে না গর্ভবতী হওয়ার পর তারা তাদের সন্তানকে বেশীদিন পেটে ধরে রাখতে। তবু তাদের পেটে সন্তান ধারণ করার একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা আছে—দশমাস দশদিন। কিন্তু পেটের কথা তারা বোধহয় দশ সেকেণ্ডও চেপে রাখতে পারে

না। তার বাহুবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র সে তার সহকর্মীদের কাছে গিয়ে ফয়স্তার সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে দেবে। তাই সেই পথে না গিয়ে বরং মিথ্যে করে বললো, 'না। তুমি, তুমিই আমার জীবনে প্রথম নারী। বিশ্বাস করো।' তার এ-কথা বলার পিছনে আরো একটা অর্থ ছিলো—সেটা তার দূরদর্শিতার পরিচয় বলা যেতে পারে। তার মনে হলে, এই মেয়েটিই পরে তার কাজে লাগতে পারে, ফয়স্তার শয্যায় আশ্রয় নেওয়ার তাগিদটা যখন সে অনুভব করবে, এই মেয়েটি তাকে তার ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কাজে সাহায্য করতে পারে।

যাই হোক, সেবাস্টিয়ানোর মুখ থেকে তার ভালো লাগা কথাটা শুনে অভিভূত হয়ে পড়ল মেয়েটি। সে তার উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে বলে ফেলল, 'কি সুন্দর দেখতে তোমাকে', তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো মেয়েটি। সেবাস্টিয়ানোর মনে হলো, বুঝি তার কানে মধু বর্ষিত হলো। তার সেই সুন্দর অনুভূতির রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই সেবাস্টিয়ানো দেখল, মেয়েটি তার নোংরা কাঁপা কাঁপা হাতটা তার মুখের উপর বোলাতে বোলাতে বলে উঠল, 'আর তোমার চোখ দুটোই বা কত সুন্দর প্রিয়তম......আমার নাম গিউস্তিনা—আর তোমার নাম?'

চটজলদি সেবাস্টিয়ানো তার একটা নাম আবিস্কার করে নিয়ে বললো, 'রিকারডো।'

'রিকারডো?' অতি আগ্রহ সহকারে মেয়েটি তার নামটা পুনরাবৃত্তি করে বললো, 'রিকারডো।' সঙ্গে সঙ্গে সে এবার তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বলে, তাকে এখনি যেতে হচ্ছে, তাকে ছেড়ে যেতে তার মন খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু কি করবে সে, তাকে যে যেতেই হবে, ডাচেসের প্রাতঃরাশ আনতে হবে এখনি। বলেই সে একরকম ছুটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

তবে কয়েক মুহূর্ত পরেই সে আবার ফিরে এলো সেখানে হাঁপাতে হাঁপাতে খাবারের ট্রে হাতে। এসেই সে তেমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে এক নিঃশ্বাসে বললো, 'দেখলে তো, তোমাকে ছেড়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না—'

প্রথম প্রেম তো!' গিউস্তিনার গাল টিপে আদর করল সেবাস্টিয়ানো।

সেবাস্টিয়ানোর হাতটা নিজের গালের উপর চেপে ধরে মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলে, 'আমার হয়ে এটা তুমি হার-এক্সসেলেন্সির কাছে নিয়ে যাবে দয়া করে?' মেয়েটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, তাকে অন্য একজনের ডাকে সাড়া দিতে হচ্ছে এখনি, তাই সে যেতে পারছে না, কাজটা তাকেই এখন সারতে হবে। কিন্তু সেবাস্টিয়ানোকে খুব সতর্ক হতে হবে। মেয়েটি তাকে মনে করিয়ে দেয়, মিস্ট্রেসের বিছানার খুব কাছে যেন সে না যায়।

'ডাচেস খুবই অনুভূতিপ্রবণ মহিলা। সেবাস্টিয়ানোকে যদি তার মনে ধরে, নিজের থেকেই সে তখন তাকে তার বিছানায় টেনে নেবে দু'হাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে।' তার আশা এই রকমই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে সেবাস্টিয়ানোর জীবনে।' সেই সঙ্গে ধরা গলায় সে অনুযোগ করে বলে, 'দেখো, সুন্দরী ডাচেসকে পেয়ে আমাকে যেন ভুলে যেও না। আর শোনো, খুব বেশী দেরী করবে না। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো।' এই বলে মেয়েটি একরকম ছুটে পালালো সেখান থেকে, সেবাস্টিয়ানোকে বিরাট অস্বস্তির মধ্যে ফেলে রেখে গেল।

জীবনে এই প্রথম খাবারের ট্রে হাতে নিয়েছে সে। তার আশঙ্কা, ফয়স্তার ঘরে যেতে গিয়ে একটু যদি বেচাল হয় সে, তাহলে সব খাবার মাটিতে পড়ে যেতে বাধ্য। লেস লাগানো টেবিলক্লথে ঢাকা ট্রে। ট্রেতে ছিল কফি, দুধের জাগ, মাখনের ডিশ, জ্যামের পাত্র, দুটো ডিম এবং কাপ-ডিশ।

চোখ নিচু করে কোনো রকমে কাঁপা কাঁপা হাতে ট্রেটা নিয়ে এগিয়ে চললো সে ডাচেসের ঘরের দিকে। দরজার সামনে এসে নক করল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর যেতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। তাকে ঘরে ঢোকার জন্য আহ্বান করল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল সে। তখনো তর চোখ দুটি স্থির নিবদ্ধ ছিলো ট্রের উপর। একবার চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে সে দেখল ঘরটা টেরেসোর উপযুক্ত সাজানো-গোছানো। কেবল চেয়ারের উপর কতকগুলো মেয়েলী পোশাক ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। বিরাট বিছানার ঠিক মাঝখানে অনেকগুলো বালিশের উপর ভর দিয়ে বসেছিল ডাচেস। তার রঙ করা চুল, ঝাপসা চোখ, বড় আকারের লাল টিকোল নাক ঔদ্ধত্যপূর্ণ মুখে তাকে কাকাতুয়ার মতো দেখাচ্ছিল। সেবাস্টিয়ানোকে দেখা মাত্র তার ভ্রু কুঁচকে উঠল। তার চেহারাটা ছোট-খাটো হলেও ভয়ঙ্কর সুন্দর ভাবে সুগঠিত। লেস লাগানো নাইটগাউনের নিচে তার পুরুষ্টু স্তনজোড়ার আভাস লক্ষণীয়। সুউচ্চ দুটি চূড়ার মাঝখানে লাল দামী পাথরের একটা ক্রুশচিহ্ন ঝুলছিল তার গলা থেকে।

সত্যি কথা বলতে কি গতরাতের ব্যাভিচারের দরুণ ডাচেসের কুৎসিত মুখটা পরখ করতে এক মুহূর্ত সময়ও লাগল না তার বোধহয়। তার বুকটা থর থর করে কাঁপছিল, হঠাৎ তারই মাঝে ফয়স্তাকে দেখতে পেলো সে, ডাচেসের বিছানার নিচে বসেছিল সে। হাল্কা উলের পোশাক সে পরেছিল। তার গলার পিছন দিকটা দেখা মাত্র চিনতে পারল সেবাস্টিয়ানো। সবে মাত্র ফয়স্তা তার সাজসজ্জা শেষ ক… তার অভিভাবিকার কাছে সুপ্রভাত জানাতে এসেছিল। আর সেবাস্টিয়ানো ঘরে প্রবেশ করার সময় টেরেসোর আগমনের খবর দিচ্ছিল ফয়স্তা।

ফয়স্তাকে পিছন দিক থেকে দেখে ভয়ঙ্কর ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল

সেবাস্টিয়ানো। এত উত্তেজিত যে, তার হাত থেকে ট্রেটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, কোনোরকমে সামলে নিল সে। কিন্তু ফয়স্তা তার দিকে পিছন ফিরে থাকার দরুণ সেবাস্টিয়ানোকে দেখতে পাচ্ছিল না। অপর দিকে ডাচেস সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তাকালো, তার চোখে ঔদ্ধত্য। কিন্তু সেবাস্টিয়ানোর পুরুষোচিত সুন্দর চেহারা দেখা মাত্র তার সব রাগ জল হয়ে গেল, তবে মুখে সেটা প্রকাশ করল না সে। নিজেকে সে কখনই সুন্দরী বলে ভাবে না, তবে কুৎসিত বলেও মনে করে না। তার বাড়তি গুরুত্ব হলো, বিত্তবান সে, নাম যশ আছে তার, আর আছে তার স্বাধীনভাবে কাউকে ভালবাসার অভিজ্ঞতা। এখন সেবাস্টিয়ানো বুঝতে পারছে। ঈর্ষা পরবশ হয়ে ডাচেসের দুর্বলতার কথা গিউস্তিনা তাকে বলেনি, এটা একটা সত্যি ঘটনা, যা সে নিজের চোখে পরখ করল। এই ডাচেস যখন তখন যে কোনো সুপুরুষ পরিচারককে অনুগ্রহ করতে পারে। বয়স হলেও তার মনটা এখনও সতেজ, তারুণ্যের ছাপ আছে এখনো তার দেহ-মনে। তাই তার বিশ্বাস, এখনো যুবকেরা ভালোবাসতে পারে তাকে। আর সেও সুন্দরী মহিলার মতো তার প্রেমিকার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে জানে, তাদের দীর্ঘ ধৈর্যের পুরস্কার দিতেও জানে সে।

সেবাস্টিয়ানোর মাধুর্য কিংবা তার অবশ্যম্ভাবী উত্তেজনা ডাচেসের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তার সেই উত্তেজনা যে ফয়স্তাকে কেন্দ্র করে, ভাবতে পারল না সে। বরং তার ধারণা, সেবাস্টিয়ানো বুঝি তাকে দেখেই হঠাৎ অমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার তীব্র আকাঙ্খা জাগার কথা ভেবে সচেতন হয়ে উঠল। সেবাস্টিয়ানোর প্রতি তার মোহ, আকর্ষণ এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, ফয়স্তার উপস্থিতি তার কাছে অভিশাপ বলে মনে হলো। এ সময় ফয়স্তা যদি না তার ঘরে এসে ঢুকত না জানি এতক্ষণে কি অঘটনই না ঘটে যেতে পারত। ফয়স্তাকে ঘিরে সেবাস্টিয়ানোর সব উত্তেজনা, কামনা-বাসনা ছাপিয়ে ডাচেস তার দিকে সম্মোহনী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তারপর এক সময় তাকে জিজ্ঞেস করল সে, 'তুমি কি এখানকার নতুন ভৃত্য।'

'হ্যাঁ, আমি আপনার অনুগত,' উত্তরে বললো সেবাস্টিয়ানো।

'ট্রেটা টেবিলের উপর রেখে দাও।'

'হ্যাঁ, রাখছি।'

'এখন ঐ টেবিলটা আমারি কাছে নিয়ে এসো তোমাকে কি সব কিছু বলে দিতে হবে?'

'হ্যাঁ—'

'হ্যাঁ কিংবা না ছাড়া তুমি কি আর কিছু বলতে পারো না....কি নাম তোমার?'

'রিকারডো।'

'ঠিক আছে রিকারডো, এবার কফি বানিয়ে দাও আমাকে। অর্ধেক কফি, অর্ধেক দুধ।'

'ঠিক আছে।'

'কিন্তু ও তুমি কি করছ?' চিৎকার করে উঠল ডাচেস।

'শুধু এক ফোঁটা—

'শুধু এক ফোঁটা! শুধু ফোঁটা....তুমি কি কাউকে বিয়ে করার জন্য বাগদান করেছ রিকারডো?'

'না।'

'তাহলে দেখো, পরিচারিকাদের উত্যক্ত করো না যেন। তাদের একা একা থাকতে দিও.. ..ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো রিকারডো।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

ডাচেসের জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে থেকে রেহাই পাওয়া মাত্র বেরিয়ে এলো সেবাস্টিয়ানো। কিন্তু ফয়স্তার প্রশ্নটা শোনার মতো সময় তার হাতে যথেষ্ট ছিলো। তাদের আলোচনার কথা সেবাস্টিয়ানোর কানে এলো : 'কিন্তু আমার মুখের সামনে আলোটা কি নিভিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে? সেদিন সন্ধ্যায় পরার জন্য যে ফ্যান্সি ড্রেসটা সে পছন্দ করেছিল, অবশ্যই সেটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে সে।

এবং তারপরেই নিজেকে সে আবার ডাচেসের ঘরের বাইরে আবিস্কার করলো। গ্যালারিতে ফিরে সে আসামাত্র আবার তার বুকটা কেঁপে উঠতে দেখা গেলো।

❑ তেরো ❑

একটা জানালার নিচে অপেক্ষা করছিল গিউস্তিনা। তাকে ফিরে আসতে দেখেই জিজ্ঞেস করলো সে, 'কেমন লাগল তার?' কিন্তু সেবাস্টিয়ানো তখন ফয়স্তার কথাই চিন্তা করছিল, তাই প্রথমে তার প্রশ্নের অর্থটা ঠিক বোধগম্য হলো না তার। তারপর সে হেসে উঠে বলে, তাকে নাকি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।—ডাচেস যে তাকে জয় করেছে এটাই তার চিহ্ন। সেবাস্টিয়ানোর মনোভাব বোঝার আগেই ডাচেসের ঘর থেকে বেল বেজে উঠতেই গিউস্তিনা ইশারা করে তাকে জানিয়ে দেয়, এবার সে যাবে। মাত্র কয়েক মিনিটই অনুপস্থিত ছিলো সে। অভুক্ত খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে ফিরে এসে সেবাস্টিয়ানোকে খবর দিলো মেয়েটি, বৃদ্ধ মহিলার মনে একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এসেছে সে। এবং সেটা এতই গভীর যে, সেবাস্টিয়ানোর কথা ভাবতে গিয়ে সে তার প্রাতঃরাশের কথা বেমালুম ভুলে

গেছে। এরকম ঘটনা কচ্চিৎ ঘটতে দেখা যায়। সেবাস্টিয়ানো সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে চাইল ডাচেস। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ট্রে ফিরিয়ে আনতে সেবাস্টিয়ানোর বদলে সে যাওয়াতে ক্ষুণ্ন হয়েছে সে।

'দেখো, দুদিন যেতে না যেতেই ঐ বৃদ্ধা মহিলা তোমাকে তার ব্যক্তিগত পরিচারকের পদে উন্নিত করবে।' মেয়েটি তির্যক হেসে বলে, 'আর তারপরেই তুমি ওর—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে আবার হাসল সে।

মেয়েটির কথার মধ্যে ঈর্ষার ছাপ পড়তে দেখা যায়। এরকম একটা সুযোগ যে তার সামনে সহজে এসে যাবে ভাবতেও পারেনি সে। এই সুযোগে অনায়াসে ফয়স্তার শয্যায় শুতে পারবে সে, কথাটা মনে হতেই খুশির হাসি হাসল।

ওদিকে গিউস্তিনা রেগে গিয়ে তার হাতে একটা ঝাড়ু ধরিয়ে দিয়ে কটাক্ষ করে বলে, ডাচেসের প্রেমিক না হওয়া পর্যন্ত একটু কাজ করুক সে। কাউন্টেস সানচেজ-এর ঘর পরিস্কার করার কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য মেয়েটি তাকে আহ্বান করল। ফয়স্তার নাম শুনতেই ভেতরে ভেতরে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল সেবাস্টিয়ানো। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়ুটা হাতে নিয়ে তাকে অনুসরণ করল।

'একি ভয়ঙ্কর অন্যায়, অসৎ কাজ!' ফয়স্তার শয়নকক্ষে ঢুকে ভাবল সেবাস্টিয়ানো। 'এই যে আমি এখানে এই প্রথম এলাম, এ আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিলো—মনে মনে আমার কতো স্বপ্নই না ছিলো এক এক করে ফয়স্তার ব্যবহৃত পোশাকগুলোর উপর চুমু খেতে গিয়ে তার শরীরের ঘ্রাণ নেওয়ার বদলে, যে বালিশে ফয়স্তা তার গাল, চিবুক থুতনি রেখে ঘুমিয়েছিল গতকাল রাত্রে সেটার উপর আমার মুখ রাখার বদলে, কিংবা যে ঘরের বাতাসে ফয়স্তার শ্বাস প্রশ্বাস মিশেছিল বুক ভরে সেই বাতাসের ঘ্রাণ নেওয়ার বদলে তাকে এখন তার পোশাক, বিছানার চাদর, বালিশের আচ্ছাদন সাফ করার কাজে তাকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে—এর থেকে আর কিই বা ট্রাজেডি হতে পারে তার জীবনে? ভাবল সে।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে গিউস্তিনা, ফয়স্তার বিলাসবহুল জীবনযাত্রা তার মনে হিংসার উদ্রেক হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেবাস্টিয়ানো ফয়স্তাকে ঠিক সেই চোখে দেখতে চায় না, কারণ সে তার প্রিয়তমা, তার প্রেমিকা।

'দেখো, এই পোশাকগুলো দেখো?' কাপবোর্ডের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো গিউস্তিনা, 'ঐ কাপবোর্ডের মধ্যে ফয়স্তার প্রচুর পোশাক গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে, সে হয়তো জানেও না তার পোশাকের সংখ্যা কতো। ওগুলোর দাম অনেক দিতে হয়েছে তাকে। ঐ সব দামী দামী পোশাকগুলো পাওয়ার জন্য সেই বৃদ্ধ জেনারেলকে অনেক চুম্বন উপহার দিতে হয়েছে তাকে, অনেক সেক্স খরচ করতে হয়েছে তাকে তার দেহের ক্ষুধা মেটানোর জন্য। তারা যদি আমাকে ডাচেস

হিসেবে নির্বাচন করতো, তাহলেও আমি এ বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে কখনোই অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতাম না। তারপর ফয়স্তার একটা স্বচ্ছ পোশাক চেয়ার থেকে তুলে সেবাস্টিয়ানোর হাতে তুলে দিয়ে বললো সে ঃ 'এটা মেঝেতে ফেলে দাও; জেনারেলের সঙ্গে মাখামাখি করতে গিয়ে যে ভাবে এটা নোংরা করে ফেলেছে, পরিস্কার করা দরকার।'

যে পোশাকে ফয়স্তা তার নগ্ন দেহটা ঢেকে রেখেছিল, সেটা এভাবে ধূলোয় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াটা পাপ বলে মনে করল সেবাস্টিয়ানো। গিউস্তিনা একবার তার দিকে পিছন ফিরে ঘর সাফ করার কাজে লাগতেই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না সেবাস্টিয়ানো। ফয়স্তার একটা পোশাক হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেলো, বুক ভরে সুগন্ধের ঘ্রাণ নিলো সে। কিন্তু গিউস্তিনা তখন তার দিকে পিছন ফিরে থাকলেও সে তার কাজের ফাঁকে ওয়ারড্রোবের আয়নায় সেবাস্টিয়ানোকে স্পষ্ট লক্ষ্য করছিল তখন।

'হ্যাঁ, 'মুচকি হেসে বললো সে, 'তুমি বুঝি মেয়েদের পরিত্যক্ত পোশাক আর পারফিউম খুব পছন্দ করো? তোমার এটা খুবই বদ অভ্যাস, আমার কাছে অন্তত তাই মনে হয়। যাই হোক, যতো পারো শুকে নাও গন্ধ। এই পোশাকগুলো তুমি কখনো স্পর্শও করতে পারবে না যতক্ষন না লন্ড্রিতে দেওয়া হচ্ছে।'

সেবাস্টিয়ানোর মনে পড়ল, মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে এই পোশাক এবং পোশাকের নিচে তার মিস্ট্রেসের নরম শরীরটা নিয়ে কতোই না ঘাঁটাঘাটি করেছিল রাতের অন্ধকারে। গিউস্তিনার দিকে ফিরে হাসল, তার ভুলের জন্য কৃতজ্ঞ সে তার কাছে। তারপর ঘরের এক কোণায় পোশাকটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

গিউস্তিনা তার কাজে সাহায্য করার জন্য সেবাস্টিয়ানোকে আহ্বান করার আসল উদ্দেশ্য ছিলো তাকে এ ঘরে একা পাওয়ার জন্য। সে জানত খুব শীগ্গীর ফয়স্তা তার ঘরে ফিরে আসছে না। সে আশা করেছিল, তাকে একা পেয়ে সেবাস্টিয়ানো তাকে জড়িয়ে ধরবে, তারপর তার ঠোঁটে, গালে এবং তার দেহের স্পর্শকাতর জায়গায় ঘন ঘন চুমু খাওয়ার পর ফয়স্তার সুন্দর মনোরম বিছানায় টেনে নিয়ে যাবে মিলনের চরম সুখপ্রাপ্তির জন্য। সেবাস্টিয়ানো তার লালসাসিক্ত চোখের চাহনি দেখে তার সান্নিধ্য এড়ানোর চেষ্টা করে নিজেকে ঘর সাফাই-এর কাজে নিয়োজিত করে।

সেবাস্টিয়ানোর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে সাফাই-এর কাজ শেষ করে গিউস্তিনা এবার তাকে প্ররোচিত করার জন্য ফয়স্তার বিছানায় তার দেহটা এলিয়ে দিলো। মাথাটা সে রাখল-ফয়স্তার বালিশের উপর। পা দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিলো এমন ভাবে যে, দুটো পায়ের ব্যবধান চোখে পড়ার মতো এবং অর্থপূর্ণ। নিজেকে

সে ক্লান্ত বলে জাহির করে বিশ্রাম নিতে চাইল যেন। তার সেই দেহভঙ্গির আকর্ষণ এতোই দুর্বার ছিলো যে, ভীষণ ভয় পেলো সেবাস্টিয়ানো, সেই সঙ্গে ঘৃণাবোধও করলো সে গিউস্তিনোর উপর। তার মনে হলো, ফয়স্তার সঙ্গে বুঝি বা সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এমন কি ফয়স্তার বিছানায় অন্য এক মিলন-পিয়াসী মেয়ের সঙ্গ-লাভের কথাটা ভাবতে গিয়ে আঘাত পেলো সে মনে মনে। এ অন্যায়, এ পাপ, এ ঘৃণার যোগ্য। না, ফয়স্তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সে কিছুতেই করতে পারবে না। গিউস্তিনা একা একা বিছানায় শুয়ে থাকুক। তাতে সে যতোই দুঃখ কিংবা কষ্ট পাক, তবু সে তার শয্যাসঙ্গী হতে পারবে না। তার এই দেহ, এই মন সব কিছুই তোলা থাক ফয়স্তার জন্য। এ জীবনে যদি ফয়স্তাকে তার পাওয়া না যায়, তাতে হয়তো প্রথম প্রথম তার কষ্ট হবে দেহ ও মন উভয় দিক থেকেই, তবু সে আর অন্য কোনো মেয়ের প্রতি আসক্ত হবে না, হতে পারবে না।

তাই গিউস্তিনার শত প্ররোচনা সত্বেও তার অন্যায় আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বিছানার নিচে একটা আরাম কেদারায় বসে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করল সে।

'এসো, তুমিও আমার পাশে শোবে এসো', নির্লজ্জ বেহায়ার মতো বললো গিউস্তিনা। 'আরাম কেদারায় একা একা বসে থেকে কি সুখই বা পাবে তুমি শুনি?'

বিরক্ত সেবাস্টিয়ানো তার সান্নিধ্য এড়ানোর জন্য তাকে বলে, 'না, সে হয় না। যে কোনো মুহূর্তে ফয়স্তা তার ঘরে ফিরে আসতে পারে। তাই আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে পারছি না।' গিউস্তিনার জেদের শিকার হতে চায় না সে। এ ব্যাপারে মেয়েটি আরো বেশী পীড়াপীড়ি যাতে করতে না পারে, তাই সে তাড়াতাড়ি প্রস্তাব করে বসল, মধ্যাহ্নভোজের পরে ভিলার পিছনের অংশে গিউস্তিনার নিজের ঘরে তারা মিলিত হতে পারে।

'তুমি এত দুর্বল?' অবজ্ঞা করে বললো মেয়েটি। তারপর বিছানা থেকে উঠে তার দিকে প্রশ্ন চোখে তাকাল। যাইহোক, তুমি কি ভেবেছো? আমি কেবল তোমাকে আমার পাশে শোবার জন্য আহ্বান করেছি? মধ্যাহ্নভোজের পর জানি না শরীরের ধকল সহ্য করার মতো অবস্থা আমার থাকবে কিনা...এ সব কাজ খাওয়ার আগে হলেই ভালো ছিল...' মনে হলো ভীষণ বিরক্ত হয়েছে সে। আর সেবাস্টিয়ানো তার রাগ কমানোর জন্য ভাবের ঘরে চুরি করার মতো তাকে অনুরোধ করল তাকে তার দীর্ঘ মধুর মতো মিষ্টি চুম্বন দেওয়ার জন্য। মেয়েটি বিছানা থেকে নেমে এসে তার সামনে দাঁড়াল, তার মুখের সামনে নিজের মুখটা তুলে ধরল। তারপর দু'জোড়া তৃষিত ঠোঁট মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেলো, বিস্বাদ না লাগা পর্যন্ত কেউ কারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইল না। অনেকক্ষণ পরে একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি মুখে ফুটিয়ে সেবাস্টিয়ানোর কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিউস্তিনা তার বাকী কাজে

মন দিলো।

গিউস্তিনা ধরে নিলো সেবাস্টিয়ানো তার প্রেমে পড়ে গছে—এই উপলব্ধিটা তার দেহ-মনকে তখন দারুণ ভাবে উদ্বেলিত করতে থাকে। কাজ করার ফাঁকে আড় চোখে সে তার নতুন প্রেমিককে দেখতে থাকে। তার এই মনোভাব দেখে সেবাস্টিয়ানো এই নবলব্ধ প্রেমের ব্যাপারটা এড়ানোর জন্য তাকে ফয়স্তার ব্যাপারে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করে দিলো। উত্তরে মেয়েটি তাকে বলতে থাকে—ফয়স্তা অতুলনীয়, এই মুহূর্তে ভিলায় যত মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে সেই সব থেকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়ে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

'কিন্তু খারাপ মেয়ে সে', পরিচারিকাটি আরো বলে, 'আর এক নম্বরের মিথ্যুক সে। আমি যদি পুরুষ হতাম, নিশ্চয়ই তাকে বিশ্বাস করতাম না।'

সেবাস্টিয়ানো জানতে চাইল, জেনারেল ছাড়া তার অন্য আর কোনো প্রেমিক আছে কিনা। উত্তরে গিউস্তিনা জানাল, হ্যাঁ, আর একজন পুরুষ তার অবশ্যই আছে, তার প্রমাণ মেয়েটির কাছে আছে, একদিন সকালে সে তার মিস্ট্রেসের ব্যাগের ভেতরে "এস আর" এমব্রয়ডারী করা পুরুষদের একটা রুমাল দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু কে সেই প্রেমিক, গিউস্তিনা তার বক্তব্যেব শেষে জানাল, এখনো পর্যন্ত জানতে পারেনি সে। এ ব্যাপারে সে অনেক গোয়েন্দাগিরি করেছে, কিন্তু ব্যর্থ সে। তার ধারণা, নিঃসন্দেহে তার সেই দ্বিতীয় প্রেমিকটি আজকের অতিথিদের মধ্যে একজন হবে। সম্প্রতি এক রাত্রে ফয়স্তাকে সেবাস্টিয়ানো তার রুমালটা ধার দিয়েছিল। গিউস্তিনার মুখ থেকে সেই রুমালের কাহিনী শুনে মনে মনে খুব খুশি হলো সে। এই ভেবে যে, সে ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে ভালোবাসে না ফয়স্তা। গিউস্তিনার কথায় আর একবার তার প্রমাণ সে পেলো—এরপর আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হলো না সেবাস্টিয়ানোর।

পেরোর মতো মিথ্যে ভান করার লোক নয় সেবাস্টিয়ানো, যা বলার স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিতে অভ্যস্ত সে। তবে গিউস্তিনার কাছে ফয়স্তার সঙ্গে তার সম্পর্কেব ব্যাপারটা তাকে গোপন করতে হয়েছে অনেক কারণে—প্রথমত এটা তাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, তৃতীয়জনের কারোর জানার কথা নয়, এবং দ্বিতীয়ত কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে শুধু তারই নয়, তার প্রিয়তমা ফয়স্তারও ক্ষতি হতে পারে। জেনারেলের কানে কথাটা গেলে তার আশঙ্কা, ফয়স্তার ভায়ের মুক্তির ব্যাপারটা কেঁচিয়ে যেতে পারে। সেদিক থেকে এ ব্যাপারে গিউস্তিনার কাছে কথাটা গোপন করে গর্হিত কাজ যে সে করেনি, তা সে হলপ করে বলতে পারে—ভাবল

সেবাস্টিয়ানো। যাই হোক, এই মুহূর্তে ফয়স্তার নরম বিছানায় তার শোবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু আপাতত সে তার সেই ইচ্ছেটাকে, যা পূরণ করা অসম্ভব ছিলো, ঘুম পাড়িয়ে রেখে গিউস্তিনার সঙ্গে ফয়স্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক সময়।

গ্যালারি থেকে রিসেপসন রুম হয়ে সেই বিরাট হলঘরে গেলো সে। ভৃত্যদের ব্যবহৃত সিঁড়ির সন্ধান করল সে, কিন্তু সেটা দেখতে না পেয়ে সে তখন মূল সিঁড়ির প্রশস্ত ধাপগুলোর প্রথম ধাপে সবে মাত্র পা রেখেছে, সেই সময় রিসেপসন-রুম থেকে একটা বজ্র কণ্ঠস্বর তার কানে এসে বিঁধল : 'ওহে, আমি বলছি...হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে।' সে ভাবল, বোধহয় অন্য কোনো ভৃত্যের উদ্দেশ্যে কথাটা বলা, তাই সে সিঁড়ি পথে নিচের দিকে আবার নামতে শুরু করে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হলো : 'আমি তোমাকেই বলছি, তুমি কি কালা, কানে শুনতে পাওনা? হ্যাঁ, তোমাকে...আমি তোমার সঙ্গেই কথা বলছি...'

সেবাস্টিয়ানোর তখন খেয়ালই নেই যে, এই ভিলায় তার ভূমিকা—সে একজন ভৃত্য—তাই এর পরেও সে আবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে যায় এমন ভাবে যে, বক্তার কথাটা শুনতে পায়নি সে, কিন্তু হঠাৎ তার খেয়াল হলো, 'আরে আমি তো সত্যি সত্যি এখন ভৃত্য এই ভিলার!' আর সেই উপলব্ধিটাই তাকে রুখে দিলো।

পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে সে দেখল, রিসেপসন রুমের মাঝখানে একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি যুবক, তার পরণে ঘোড়ায় চড়ার পোশাক। সে তখন অধৈর্য হয়ে তার হলুদ রঙের বুটের উপর চাবুক মারছিল।

'দয়া করে তুমি যাবে...?' বলতে শুরু করে সে; হঠাৎ মাঝপথে সেবাস্টিয়ানোর দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে বিস্মিত হলো সে। সে তার মূল বক্তব্য থেকে পিছু হটে এসে চোখ বড় বড় করে বলে উঠল, 'আরে সেবাস্টিয়ানো তুমি! তুমি এখানে কি করছ?'

'আস্তে, দোহাই তোমার, চুপ করো!' তার দিকে এগিয়ে আসতে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো সেবাস্টিয়ানো।

যুবকটি একজন ধনী জমিদার এবং সেবাস্টিয়ানোর প্রতিবেশী। তাড়াতাড়ি বলতে যায় সেবাস্টিয়ানো, তাকে এই পোশাক ধারণ করতে হয়েছে এই জন্য যে—তার শ্রোতা হঠাৎ চোখ ছোট করে তার দিকে তাকায় এবং তাকে তার কথা শেষ করতে দেয়না।

'আহ, আমি বুঝেছি...এঃ, আবার সেই মেয়েমানুষের খোঁজে? কিন্তু তুমি দেখছি ভীষণ জেদী। সেই বৃদ্ধ ডাইনি ডাচেস যদি এ ব্যাপারে জানতে পারে...কিন্তু আমাকে বলতেই হচ্ছে বন্ধু, জানো এই ভৃত্যের পোশাকে তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে।'

সেবাস্টিয়ানো তার বন্ধুকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলো, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না সে। বন্ধু তাকে কথা দিঁলো, সে তার মুখ বন্ধ করে রাখবে। সেই সঙ্গে সে তাকে আশ্বাস দিলো, তার কোনো ভয়ের কারণ নেই, সে ঠিক পালাতে পারবে।

যাই হোক, এই সময় সে আর কোনো ঝুঁকি নিতে চাইলো না, কেউ তাকে এখানে আবার চিনে ফেলুক তাও সে চায় না। আর গিউস্তিনার কথা সে পেরো কিংবা স্যাভেরিও কাউকেই বলবে না। কিন্তু সে এখন লুকোবেই বা কোথায়? তার মনে পড়ল, পার্কে এক কোণায় ছোট্ট একটা টিলা জাতীয় পাহাড় আছে, নির্জন এবং অন্ধকার। রাতে তার অভিসারে চলে আসত ফয়স্তা। হ্যাঁ, ঐ জায়গাটা এখন তার লুকনোর পক্ষে উপযুক্ত জায়গা হতে পারে। এবং প্রায় ছুটেই চলল সে সেদিকে। এক সময় হাঁপিয়ে উঠে সে তার চলার গতি কমিয়ে দিলো। নিস্তব্ধ পরিবেশে পাখীদের কলরব, ডানার ঝটপটানি শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সে। তার মনে পড়ল, কত দিন, হ্যাঁ কতদিন ফয়স্তার কোমর জড়িয়ে ধরে পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছে সে। মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে উঠে ফয়স্তাকে বুকে টেনে নিয়েছে, দু'চার পা চলার পরেই তাকে চুমু খেয়েছে। সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে, সর্বোচ্চ শিখরে ছিলো একটা কেবিন, গাছের ডালা পালা দিয়ে তৈরী—সেটা প্রায় অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। আলপস্ পাহাড়ে এ ধরণের ছোট ছোট কুটির কিংবা কেবিন দেখতে পাওয়া যায়।

দরজা ঠেলে কেবিনের ভেতরে ঢুকল সেবাস্টিয়ানো। ভেতরটা অন্ধকার। গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল কেবিনের ভেতরে। ফয়স্তার দামী পোশাক যাতে নষ্ট না হয়, ঘরটা পরিস্কার করে রেখেছিল সেবাস্টিয়ানো। বাড়ি থেকে একটা ক্যাম্প ম্যাট্রেস এবং কয়েকটা কুশন নিয়ে এসে কেবিনটা একটা শয়নকক্ষে পরিণত করেছিল সে। এমন কি এক কোণায় মোমবাতি এবং দেশলাই রাখা ছিল।

অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার সামনে গিয়ে শুয়ে পড়ল সেখানে আরাম করে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল তার। কিন্তু ঘুমোতে যাওয়ার আগে ছোট্ট দরজার ফুটো দিয়ে বাইরে তাকাতে গিয়ে দেখল সে ঝরণার জলে স্নান করছে এক দল মেয়ে। তাদের মধ্যে একজন জল থেকে উঠে আসছিল জলসিক্ত দেহে। দূর থেকে হলেও মেয়েটিকে চিনতে অসুবিধে হলো না সেবাস্টিয়ানোর—যেন সে অনেক দিনের চেনা—বহু পরিচিত তার, তাকে কি ভোলা যায়, তাছাড়া সে যে তার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে গেছে, যে বন্ধন ছিন্ন হতে পারে না কোনোদিন, সে চিরন্তন; আর সেই মেয়েটি হলো তার অভিন্ন হৃদয়ের প্রিয়তমা "ফয়স্তা", ভাবল

সেবাস্টিয়ানো। তার লাল রঙের সাঁতারের আঁটো পোশাক দেখে নিশ্চিত ভাবে চিনেছিল সে। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে, ঘুমের মধ্যে ফয়স্তার সুন্দর মুখখানি তার সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন করে রাখল।

❑ চোদ্দ ❑

ঝরণার নিচে একটা ছোট খাটো সরোবর তৈরী হয়েছিল। স্প্রিংবোর্ড থেকে ফয়স্তাকেই ঝাঁপ দিতে দেখেছিল সে। জলের তলা থেকে উঠে এসে সে তার মাথা ঝাঁকালো, ভিজে চুল থেকে জল ঝরে পড়ল, তার নাসারন্ধ্র থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। সেই সময় বাথ-প্যাভিলিয়নের বারান্দায় একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে দেখল সে। স্নানার্থীরা রাবার কুশনের উপর নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল সারিবদ্ধ ভাবে, তারাও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। আর যারা তখনো জল ছিটাচ্ছিল সাঁতার কাটতে গিয়ে তারাও পুলের ধারে এক এক করে জমায়েত হয়ে পুলের উপরে উঠে এলো এক এক করে। ডচেস নিজেও, বয়সের ভারে নুইয়ে পড়লেও, জাঁকজমক পোশাকে দ্রুত বারান্দা থেকে ছুটে এলো।

চারদিকে একটা ব্যস্ততা, বিশৃঙ্খলা তখন, এ সব কিছুর মূলে একজন ছোট খাটো চেহারার একটি মানুষ। বাদামী রঙের আঁটো ইউনিফর্ম পরিহিত লোকটি তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে। বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে তার অন্য সঙ্গীরা তাকে অনুসরণ করতে থাকে। তারা সবাই তার থেকে অনেক বেশী লম্বা। কিন্তু তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, ঐ বেঁটে লোকটাকে সম্মান দেখানোর জন্য মাথা নিচু করে হাঁটছিল। ঐ বেঁটে ছোটখাটো লোকটা যে তাদের কর্তৃত্বস্থানীয় কেউ তাদের হাবভাবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। লোকটার কপাল চওড়া, গোল এবং স্পষ্ট, নাকটা ছোট এবং ভোঁতা, কতকটা পেঁচার মতো। তবে তার মুখে একটা দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট। এবং কাঠিন্যে ভরা। চোখের ভ্রু দুটো অস্বাভাবিক পুরু। সেপ্টেম্বরের রোদ পোয়াচ্ছিল সে ভাল মানুষের মতো। তার পরনে ট্রাউজার এবং কোমরে ঘোড়ায় চড়ার চওড়া বেল্ট, অসংখ্য রূপোর পদক তার বুকে ঝুলতে দেখা গেলো—সত্যিকারের একজন যোদ্ধা সে, ভাবল ফয়স্তা তার দিকে ভাল করে তাকাতে গিয়ে। আর তার জ্যাকেটে ঝোলানো অসংখ্য পদকের সঙ্গে জেনারেলের তবক-খচিত পদকটা শোভা পাচ্ছিল তার বুকে।

সেই লোকটি আর কেউ নয় টেরেসো। পুলের উপর উঠে অন্য স্নানার্থী মেয়েদের মধ্যে তখন প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল কে আগে গিয়ে জেনারেলকে

অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু ফয়স্তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো না। যেমন যে ভাবে যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেই ভাবে অবিচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য করতে থাকে জেনারেলকে। তার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট—সে জেনারেলই হোক কিংবা চাপরাশিই হোক, তাকে যতই তুমি সম্মান দেখাও না কেন, যতই তুমি তাকে খাতির যত্ন করো না কেন, আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই সমান তারা, কোনো ব্যতিক্রম খুঁজে পাবে না তুমি। আর সে এও জানে যে, তাঁর জন্যই আজ এখানে এসেছে টেরেসো। অতএব মাথা খারাপ করা না করা ফয়স্তার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু এই মানুষটা হলো বড়ো মাছ, তাকে জল থেকে তোলা মুশকিল। তাই তাকে একটু খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলতে হবে। ভাবল ফয়স্তা—"তাও যদি ময়ূরীর মতো পেখম মেলে বৃথা গর্বে গর্বিত হয়ে এগিয়ে যেত। "অবশ্যই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি না; বরং তোমাকই আসতে হবে আমার খোঁজ করতে হবে তোমাকে।" ফয়স্তা এবং ডাচেস দুজনে মিলে আলোচনা করে এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল আগে থেকেই। শেষ পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্তে আসে, টেরেসো যতই শক্তিধর পুরুষ হোক না কেন, যুদ্ধে সে যতই নির্ভীক, সাহসী হোক না কেন, এবং শান্তির দূত সে হোক না কেন ; সে একজন প্রেমিক, সে একজন সরল প্রকৃতির মানুষ, তুচ্ছ অসার যুবকদের তুলনায় সে অনেক বেশী নির্দোষ এবং প্রতিরোধহীন। এই সব কথা ভেবেই তারা তাদের আগের সব জল্পনা-কল্পনা বাতিল করে দিয়ে তার এগিয়ে যেতে থাকে। আর ফয়স্তাও জানে, এই সুযোগের সম্পূর্ণ ফয়দা তাকে লুটতে হবে। তাই সে আর একবার জেনারেলের লোকজনদের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে মরুভূমির মতো শূন্য সুইমিং পুল ছেড়ে এগিয়ে চলল জেনারেলের দিকে।

দু'জন মহিলা তাদের হিসেবে কোনো ভুল করেনি। প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক যেখানে, টেরেসো কেবল তার সারল্য প্রকাশ করেই থেমে থাকল না, আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো। কিন্তু সব থেকে খারাপ দিক হলো—সেই ভূমিকা থেকে তার সরে আসতে অস্বীকার করা ; এটা তার যুক্তিহীন মনোভাব, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই সে ভুল চিন্তা করল, ঘরোয়া যুদ্ধে যে পদ্ধতিতে সে বিজয়ী হয়েছিল ভাবল সে, ঠিক সেই ভাবেই সে বুঝি প্রেম-ভালবাসাতেও জয়ী হবে। কিন্তু সে বোধহয় জানত না, গৃহ যুদ্ধে বিপক্ষ দলের সৈনিকদের সঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করে, অমানুষিক ভাবে তাদের দমন করে হয়তো জয়ের তিলক আঁকা যেতে পারে, কিন্তু তার সেই নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে নারীর মন জয় করা অত সহজ নয়! তাছাড়া যখনি সে তার সেই নিষ্ঠুর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গেছে বিরক্ত হয়ে টেরেসো দেখেছে, সে আবার সেই একই মোহে জড়িয়ে পড়েছে, মূল্যায়ন করতে গিয়ে একই ভুল করে ফেলেছে, যা

সে এড়ানোর জন্য প্রায়ই শপথ নিয়ে থাকে।

সব ধরণের পুরুষদের প্রতি তার দীর্ঘ দিনের ঘৃণা আর অবজ্ঞার ভাব ছিলো, সম্ভবত তার নিজস্ব গোপন কিন্তু মূলত বিনয়ের ভাব থেকেই এই ঘৃণার সূত্রপাত; এর কারণ সে তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার সময় যে ভাব তাদের উপর দমন এবং নিপীড়ন করেছে, তখন একবারও সে তার হৃদয় দিয়ে ভেবে দেখেনি, তারাও মানুষ, তার কাছ থেকে ভালবাসা আশা না করলেও অন্তত অত্যাচারের একটা সীমা থাকা উচিত, এটা আশা করা প্রতিটি পুরুষের অধিকার আছে। নিজেকে সে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কখনো দেখতে চায়নি। নারীদের প্রতিও তার সমান ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছিলো। এখানেই সে তার চটজলদি সিদ্ধান্তের জন্য অপরাধী বনে যায়। সে জানত না এই নারীর হাতেই অপেক্ষা করছে তার জীবনের চরম বিপর্যয়, চূড়ান্ত পরাজয়। অবশ্য সে তার সারাটা জীবন ধরে নারীর সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যে সে দেখেছে কেবলি অবিশ্বাস আর ছলনা, শুধু তাই নয়, সে এও জেনেছে যে, টাকা দিয়ে যে কোনো নারীকে কেনা যায়, টাকা দিয়ে তাদের যা খুশি করা যায়, এমন কি টাকা দিয়ে যে কোনো বিবাহিতা নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধেও অন্যায় কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। যখন সে তরুণী ছিলো, যখন তার জ্ঞান খুবই কম ছিলো, ভাল মন্দ বোঝার ক্ষমতা ছিলো না, এই নারীরা তাকে কম ঠকিয়ে ছিল? কেন? কারণ তাদের শঠতা, তাদের ছেনালীপনা মোকাবিলা করার মতো শক্তি তার ছিলো না। আর আজ—আজ সে একজন শক্তিমান পুরুষ বলেই কি সেদিনের সেই নারী জাতির প্রতিনিধিরা ভোল পাল্টে তার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করে, তাকে তোষামোদ করে তার অনুগ্রহ লাভ করার জন্য স্বেচ্ছায় তার কাছে এগিয়ে আসছে? না, হয়তো এটাও তাদের একটা চালাকি, কাজ ফুরোলেই তারা তাদের আসল মূর্তি ধারণ করবে—কি করে তাকে ঠকানো যায়! না, তাদের সেদিনের সেই শঠতার কথা সে ভুলতে পারেনি বলেই বোধহয় মেয়েদের প্রতি তার একটুও মমতা নেই, দয়া নেই, ক্ষমা নেই। সে এখন একটা সার কথা জেনে গেছে—টাকা দিয়ে যখন যে কোনো নারীকে কেনা যায়, তার দেহ উপভোগ করা যায়, তাদের প্রতি দয়া দেখানর কি প্রয়োজন। কিন্তু টেরেসো জানত না, টাকা দিয়ে হয়ত নারীর দেহ কেনা যায়, কেনা যায় তাদের বিবেক-বুদ্ধি সব কিছু, কিন্তু কেনা যায় না মন। কোনো নারীর কোনো পুরুষকে মনে না ধরলে তাদের দু'জনের মনের মিল হওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

আর পুরুষদের সম্পর্কে টেরেসোর বিশ্লেষণ হলো—সঙ্গে সঙ্গে সে বলে দিতে পারে, নারী সম্পর্কে তাদের কি চাহিদা, তাদের কিই বা আকাঙ্খা, তাদের আবার অন্য দিকটা হলো, যতক্ষণ না কোনো পুরুষ নারী সংসর্গে চরম তৃপ্তি লাভ করে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে বহু ব্যবহৃত ব্যবহারিক জিনিষপত্রের মতো, তারা সব

সময়েই মোহাচ্ছন্নের অসুখে ভুগতে থাকে। কোনো নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তার মুখোমুখি হলে সেই বিশ বছর বয়সের যুবকের মতো আজও টেরেসো কেমন অনভিজ্ঞ পুরুষের মতো হয়ে যায় এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও! তার ভয় তখন প্রত্যাখানের, আর সেই ভয়ের জন্যই বোধহয় নারীর প্রতি তার ভালবাসার কথাটা প্রকাশ করতে পারে না। অথচ কি যুদ্ধের সময়, কি শান্তির আলোচনার সময় তার প্রতিপক্ষ তাকে এমন একটা ধাঁধায় ফেলতে পারেনি কখনো। রণে আর প্রেমে ন্যায় অন্যায় বলে কোনো কথা নেই—এই প্রবাদটা কিন্তু মিথ্যে বলেই প্রমাণিত হয়ে গেছে তার কাছে। নারীর প্রেম মিথ্যে বলে মনে হয় তার কাছে এখন। অথচ আজও সে কল্পনা করে যাকে, নারীর ব্যবহারে যদি ভালবাসার সামান্যতম ইঙ্গিতও থাকে, তার প্রেমে পড়ে যাবে সে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে এও মনে করে যে, তার ভালবাসার প্রতিদান যেন সে পায় সেই নারীর কাছ থেকে। কিন্তু তা হলো কই? আজও সেই একই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে, সেই মোহ ভঙ্গ হতে বেশী সময় লাগে না। এবং তারপর থেকেই সে মনে করেছে, কোনো নারীর প্রেম ভিক্ষা সে আর করবে না, সে এখন বেশ ভালভাবেই জেনে গেছে, প্রেম নেই, প্রেম উধাও হয়ে গেছে জগত থেকে যেদিন থেকে নারী ক্রয়যোগ্য হয়েছে, যাকে সে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভয়ে ঘৃণা করতে পারে, অবজ্ঞা করতে পারে, এমন কি তার জৈবিক ইচ্ছা পূরণের আগেই। যাই হোক, তার প্রেমের ব্যাপারে তার এই অতৃপ্ত মনোভাব—নারী ক্রয়যোগ্য বলে একটার পর একটা নারী কেনা বেচার ক্ষেত্রে তার এই প্রবৃত্তি বা ঝোঁক, মনে হয় খুব শীগগীর সে উপলব্ধি করতে পারবে। একটা ভুলকে এড়াতে গিয়ে আরো অনেক বেশী ভুল সে করে ফেলেছে, তখন ফেরার পথ আর খোলা থাকবে না তার চোখের সামনে। তখন তার অবস্থা হবে সামনে এগোলে বিপদ, আবার পিছন ফিরলেও বিপদ। অতএব এর থেকে সহজেই অনুমেয় এক দিকে নারীর প্রতি তার অবজ্ঞা, অপরদিকে নারীর প্রতি তার মোহাচ্ছন্ন ভাব, এই দু-এর মাঝে পড়ে এই পঞ্চাশ বছর বয়সে হতাশায় ভুগছে সে এখন।

অন্য অনেক নারীর মতো ফয়স্তার জীবনেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেছে। টেরেসো ভালভাবেই জানে যে, ফয়স্তা ভাড়াটে নারী এবং নেহাতই সে নিজের স্বার্থে তার সঙ্গে মিথ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে তার কাছে ভাড়া খাটাতে আসছে। তবে এ ভাড়া খাটা অর্থের বিনিময়ে নয়, তার ভায়ের মুক্তিপণের বিনিময়ে! টেরেসো তাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করলেও, তার প্রেমে সাড়া না দিয়ে বিরত হতে পারল না সে। তার আশা, না ঠিক আশা নয়, ভ্রান্ত ধারণা বলা যেতে পারে, তার জন্য, তার ক্ষেত্রে ফয়স্তা তার সঙ্গে কেনা-বেচার সম্পর্ক ভুলে গিয়ে তার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কে গড়ে তুলবে। মেয়েটির প্রতি তার প্রথম আকর্ষণ বোধের

দিন থেকেই টেরেসো বুঝতে পেরেছিল, সে তাকে তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চায়, যদিও মেয়েটির মতলব তার কাছে খুবই স্পষ্ট, কিন্তু তা সত্বেও কি করে সে তার প্রতি আকৃষ্ট হলো সেটাই বড় আশ্চর্যের ব্যাপার তার কাছে। এক এক সময় টেরেসো নিজের ক্ষমতা এবং খ্যাতি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সেগুলো গুরুত্বের থেকে সত্যিকারের নম্রতাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তার কাছে তখন। হঠাৎ সে আবিস্কার করে বসে, ফয়স্তার প্রতি তার উদগ্র কামনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের গুরুত্বর কথা এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সে।

'তাহলে আমি এখন এখানে এসে দাঁড়িয়েছি,' কখনো কখনো অকপটে নিজের মনে বলে ওঠে সে। 'দেশের সব থেকে শক্তিশালী মানুষ আমি এখন। আমি এখন জয়ের সর্বোচ্চশিখরে। তবু কিছু কিছু সন্দেহজনক কৌশল আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। আমি জানি, এ সবই আমার শত্রু এবং প্রতিপক্ষ দেশের কারসাজি।' তার রাজনৈতিক এবং সামরিক সাফল্যের মূলে যে তার যৌবনের প্রতারণা ও অটুট বাসনাই কাজ করেছিল, সেটা সে কিছুতেই বুঝতে চায় না। বুঝতে চায় না— ফয়স্তার ঠোঁট, তার চোখ, তার শরীরটার কথা ভাবতে গিয়ে সে তার সেই আগের তেজ, আগের শৌর্য, বীর্য সব সে হারাতে বসেছে।

এই যে আজ—যে টেরেসোর আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং নির্ভুল হিসাবরক্ষক বলে খ্যাতি ছিলো একদিন, ফয়স্তাকে তার অধৈর্যপনা দেখিয়ে শুরুতেই একটা মস্ত বড় ভুল করে বসে আছে সে। সত্যি কথা বলতে কি আজ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের আগে কোনো মতেই তার আসা উচিত হয়নি এখানে। এখানে আসার আগে এ্যাণ্টিগুয়ায় তার জন্য অনেক কাজ পড়ে রইল—দেশাত্ববোধক এবং একটা সেতু উদ্বোধন করার মতো সৎকাজ সে অনায়াসে সেরে আসতে পারত। তাকে হত্যা করা হতে পারে, এই অজুহাত কিংবা এই রকম ভান করে সমস্ত প্রোগ্রাম বানচাল করে দেওয়ার পিছনে তার কোনো যুক্তি নেই, থাকবার কথাও নয়। এর আগে বিভিন্ন প্রদেশে জেনারেলের ভ্রমণের সময় নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান মুলতুবি রাখার ঘটনা নতুন নয়, তখনো যুক্তি দেখানো হয়েছিল, তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে, কিন্তু এবার তাঁর জীবনহানির কোনো আশঙ্কাই ছিলো না। আসল ঘটনা হলো, ফয়স্তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য টেরেসো ভয়ঙ্কর অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

ধীরে ধীরে সোজা হয়ে এগোচ্ছিল টেরেসো, ডাচেস এবং তাঁর অতিথিদের অভিবাদন গ্রহণ করার জন্য। তার বুক কাঁপছিল, ভুর নিচে ঢাকা চোখ দুটো দ্রুত ঘোরাফেরা করতে থাকে ভিড়ের মধ্যে সে কার জন্য? উত্তর একটাই—ফয়স্তার খোঁজে। টেরেসো তার মনোভাব গোপন করতে এতই অভ্যস্ত যে, ডাচেসের মতো একজন ধূর্ত মহিলা হয়েও তার মুখের প্রকাশ ভঙ্গিমার গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করতে

পারলেন না। সে যে ফয়স্তার খোঁজেই চারদিকে তাকাচ্ছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই' ভাবলেন তিনি, 'কিন্তু আমার অনুমান মতো ঠিক সেই রকম অধৈর্যের ভাব তার মুখে প্রকাশ পাচ্ছে না।'

অতিথিদের মধ্যে ফয়স্তাকে দেখতে না পেয়ে টেরেসো এত বেশী চিন্তিত হয়ে পড়ল যে, ডাচেসের সম্বর্ধনা দেওয়ার উত্তরে এমনি রূঢ় ব্যবহার সে করল তাঁর সঙ্গে, খালি চোখে সবারই ধরা পড়ার কথা। যাই হোক, ডাচেস সৌজন্য প্রকাশের পর টেরেসোকে আভাষে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, ফয়স্তা তার ব্যক্তিগত কারণে অন্যত্র কোথাও গিয়ে থাকবে এই কারণে যে, টেরেসো যে এত তাড়াতাড়ি ভিলায় আসবে সেটা জানা ছিলো না ফয়স্তার। তা না হলে নিশ্চয়ই সে এখন তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হাজির থাকত। হ্যাঁ, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এখানে এসে হাজির হয়েছে সে। শুকনো গলায় উত্তর দেয় টেরেসো, কিন্তু তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? সম্ভবত ফয়স্তা চায়, সে আবার ফিরে যাক, যাতে করে সে ফিরে নতুন করে আসার সময় তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তৈরী হতে পারে। তার ক্ষোভ এবং অকপট বিদ্রুপাত্মক কৌতুকে ভয় পেলেন না ডাচেস তবে তিনি যে ক্লু খুঁজছিলেন সেটা পেয়ে গেলেন তার কথার ধরণ থেকে। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ফয়স্তাকে দেখতে না পেয়ে সে যে ভীষণ মুষড়ে পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।—আর মাছ যে বড়ষিতে গেঁথে গেছে সেটা নিশ্চিত, এখন শুধু খেলিয়ে জল থেকে ডাঙায় তোলার যা অপেক্ষা। কিন্তু বৃদ্ধা ডাচেস খুব সতর্কতার সঙ্গে ফয়স্তাকে আহ্বান করা থেকে বিরত হলেন, সে তখন শান্ত ভাবে জলে সাঁতার কাটছিল।

সম্বর্ধনা এবং পরিচয়-পর্ব শেষ হওয়ার পর বারান্দার নিচে একটা আরাম কেদারায় বসেছিল। তার মনটা বিরক্তিতে ভরা, আশাহত সে ফয়স্তাকে দেখতে না পেয়ে। ডাচেস তার কাছ থেকে খোঁজ নিচ্ছিলেন ভ্রমণ পথে তার কোনো অসুবিধা কিংবা কষ্ট হয়েছিল কিনা—উত্তর না দিয়ে সে তখন সুইমিংপুলের দিকে তাকিয়েছিল। অনেক মেয়ের ভিড়ে এক সময় সে ঠিক তার মনের মানুষটিকে খুঁজে পেলো—জলে সাঁতার কাটার সময় ফয়স্তার বাদামী রঙের হাত দু'টো ওঠা-নামার ভঙ্গিমা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চিনতে পারল সে তাকে।

তাকে দেখা মাত্র তার সারা শরীর উত্তেজনায় ছটফট করে উঠল। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডাচেসকে জিজ্ঞেস করল সে, ওখানে কে সাঁতার কাটছে। তার সেই আবিস্কার কি রকম গভীর ভাবে তার মনে রেখাপাত করেছিল, সেটা তার কথার মধ্যেই প্রকাশ হতে দেখা গেলো। বৃদ্ধা ডাচেস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ঐ মেয়েটিই তো ফয়স্তা—তার পদবীটা যোগ করলেন না তিনি। টেরেসোর আগ্রহ দ্বিগুন হলো তারপর—বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল সে।

'কোন্ ফয়স্তা?' সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'কাউন্টেস ফয়স্তা সানচেজ,' বললো বৃদ্ধা।

'দেখে শুনে মনে হচ্ছে কাউন্টেস আমার জন্য তেমন অধৈর্য নয়,' শান্ত ভাবে মন্তব্য করল টেরেসো। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার এও ভাবল, তার সন্দেহ, তার প্রেমিকা তার এখানে আসাতে খুব একটা খুশি হতে পারেনি বোধহয়।

ডাচেস তার মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তাই তিনি তাকে ভাল ভাল কথা বলে বোঝাতে চাইলেন, ফয়স্তা আপনার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। তার সাঁতার কাটার আসল উদ্দেশ্য হলো,—জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে অবশ্যই সে আপনার আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। তা না হলে এই আসরে সে নিজেই আপনাকে সম্বর্ধনা জানাত.....হাজির থাকত—

'কিন্তু আসলোই না বা কেন?' রূঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করল টেরেসো। 'প্রয়োজনে আমি এখানে তাড়াতাড়ি এসেছি, উৎসবের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কাউন্টেস ঠিকই করেছে, আমার কথা চিন্তা না করে ভালই করেছে সে। ও সাঁতার কাটছে কাটুক।' কথাটা বলে টেরেসো বোঝাতে চাইল, ফয়স্তা সম্পর্কে তার অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই। একটু আগে এসে পৌঁছেছে বলেই যে সে ফয়স্তাকে দেখার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে, তা নয়। অবশ্য তার কথায় কান দিলো না ডাচেস।

ওদিকে ফয়স্তা তখন সাঁতার কাটতে কাটতে সমস্ত দৃশ্য এবং ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করছিল। এবার সে জল থেকে উঠে এলো ধীরে ধীরে। স্লো-মোশন ক্যামেরার ছবির মতো লাগছিল ফয়স্তাকে—ধীরে ধীরে, অথচ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছিল তার ফিরে আসার দৃশ্যটা টেরেসোর চোখে—প্রথমে দেখা গেলো ফয়স্তা বাদামী রঙের বালকসুলভ মাথা এবং তার চমৎকার স্তনজোড়া। তার বুকের উপর একটা স্বচ্ছ আবরণ, জলসিক্ত দুটি সু-উচ্চ চূড়ার মাঝে ঢালু পথ দিয়ে মুক্তোর মতো ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল। জলসিক্ত আঁটো বেদিং কস্টিউম যেন বিদ্রোহ করতে চাইছিল। তারপর টেরেসোর কামনা জর্জরিত দৃষ্টি বিদ্ধ হলো ফয়স্তার সরু নিতম্বে; এবং সব শেষে তার সুন্দর সুডৌল পা দুটির উপর টেরেসোর দৃষ্টি স্থির হলো। টেরেসো ভ্রু কুঁচকে ফয়স্তার দেহ সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। ফয়স্তা সেটা আন্দাজ করে তার চলার গতি আরো শ্লথ করে দিলো। সুইমিং পুলের উপর উঠে এসে সে তার শরীর থেকে জল ঝেড়ে ফেলতে ব্যস্ত হলো এবার। মার্বেল পাথরের উপর দাঁড়িয়ে সে তার রবারের ক্যাপটা খুলে ফেলে চুলের জল মুছল। তারপর গোড়ালি উঁচু করে হাঁটতে গিয়ে তার ভারি নিতম্ব দোলাতে দোলাতে জেনারেলের সামনে এগিয়ে এসে তাকে এবং ডাচেসকে অভিবাদন জানাল। তার প্রতিটি গতিবিধি তারিয়ে তারিয়ে দেখতে গিয়ে টেরেসোর নাড়ির গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে

উঠতে থাকে।

টেরেসো আশা করছিল—তাদের মধ্যে অভিনন্দন বিনিময়ের পরে ফয়স্তা মেঝের উপর তার পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে পড়বে এবং সেই ভেবে নিজেকে সে তৈরী করেও রেখেছিল, হ্যাঁ তার বিলম্বের জন্য এবারের মতো সে তাকে ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু সাধারণ রীতি অনুযায়ী আনত চোখে তার দিকে তাকিয়ে কয়েকটা তোষামুদি ভাষায় বার্তা বিনিময়ের পর ফয়স্তা তার সিক্ত শরীর থেকে জল মুছে ফেলার ভান করে উধাও হয়ে গেলো তার কাছ থেকে।

❑ পনেরো ❑

কিন্তু অন্য মেয়েরা তখন টেরেসোর পায়ের নিজে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছিল তাদের জলসিক্ত দেহ তার কাছে বিজ্ঞাপিত করে। কিন্তু তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই টেরেসোর। ডাচেস সুযোগ বুঝে উঠে দাঁড়ালেন এবং ফয়স্তার খোঁজে চলে গেলেন সেখান থেকে। বাথ হাউসের পিছনে লনের উপর ফয়স্তাকে বেদিং কস্টিউম পরিবর্তন করতে দেখলেন তিনি। ডাচেস চিন্তিত ভাবে লক্ষ্য করলেন, টেরেসো যে ভাবে বিরক্ত হয়ে উঠেছে তাতে ফয়স্তা যদি এখনি তার সঙ্গে মিলিত না হয়, সে হয়তো শেষ পর্যন্ত এ্যান্টিগুয়ায় ফিরে যেতে পারে। ইতিমধ্যে অবস্থা খুবই গুরুতর হয়ে উঠেছে, ফয়স্তাকে বললেন তিনি, এখনই সেই বিপর্যয় এড়াতে হবে। কিন্তু অস্বাভাবিক ভাবে ফয়স্তা তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে তোয়াক্কা না করার ভান করল।

'ঐ কুৎসিত শয়তানটা খুব বেশী সময় আর অপেক্ষা করে থাকবে না,' ডাচেস দ্রুত উষ্ণ গলায় বলে গেলেন। সম্ভবত সে এখন ভাবছে, টেরেসোর সম্প্রতি সহজ জয়ের অপর দুটি মেয়ে কারলোচা কিংবা মারুজার দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে সে। ইতিমধ্যে যদি তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে থাকে, তার এ্যান্টিগুয়ার ফিরে যাওয়া উচিত; সেখানে সে তার চাহিদা মতো সব কিছুই তার হাতের নাগালের মধ্যে পেতে পারে।'

'হ্যাঁ, তার সে পারে, কিন্তু আমি সেটা হতে দেবো না,' বললেন ডাচেস।

'আহ্, আপনি ভয় পাচ্ছেন, সে বুঝি আপনার পার্টি বানচাল করে দেবে, তাই না?' মৃদু হেসে বলল ফয়স্তা। 'চিন্তা করবেন না........আমি এখন তাকে পেয়েছি আপনার দয়ায়। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, এখান থেকে নড়ছে না সে।'

ফয়স্তা তখন মনে মনে একটা মতলব এঁটে ফেলেছিল। বারান্দার এক কোণায় চাকা লাগানো একটা টেবিল দেখল সে। টেবিলের উপর সাজান ড্রিঙ্কস এবং

স্যাণ্ডউইচ। সেই টেবিলটা সে টেনে নিয়ে গেলো মেয়েগুলোর সামনে—টেরেসোর পায়ের সামনে বসেছিল তারা। একটা পরিচিত গানের সুরে ওয়েটারের ভঙ্গিমায় সে বলে, কেউ কি ড্রিঙ্কস কিংবা স্যাণ্ডউইচ নিতে চায়! সেই সব বিশ্রী মেয়েগুলোর মধ্যে বসে থাকাতে একঘেয়ে লাগছিল টেরেসোর, সেটা কাটানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দেয়, সে খুব তৃষ্ণার্ত, সুরা পান করতে চায় সে। অন্যমনস্ক ধরণের লোক টেরেসো, কিন্তু প্রায় এক ঢোকে কড়া ড্রিঙ্কস গলাধঃকরণ করে ফেলল। তারপর এক যুবককে স্প্রিংবোর্ডের সব থেকে উচুঁ যায়গা থেকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখে তার সাঁতার কাটার দৃশ্য দেখার ভান করে উঠে দাঁড়াল টেরেসো। তোষামোদকারী মেয়েগুলো সরে বসল তাকে পথ করে দেওয়ার জন্য।

ছোট-খাটো বেঁটে চেহারার সাঁতারু, বলিষ্ঠ চেহারা। তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চিৎকার করে বলে উঠল টেরেসো : 'ব্র্যাভো........চমৎকার।'

'ছেলেটি চমৎকার ভাবে লাফ দিলো, তাই না?' দু'হাতে মদের গ্লাস নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বলল ফয়স্তা।

টেরেসো তার হাত থেকে একটা মদের গ্লাস নিয়ে তার স্বাস্থ্য পান করল। তবে তার পরিপূর্ণ দৃষ্টি পড়ে রইল ফয়স্তার দিকে। তারা মদ্য পান করার পর এক মুহূর্ত দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ টেরেসোর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, এবং সহসাই বলে উঠল সে, 'তোমাদের এখানে একটা পার্কের কথা অনেক শুনেছি। সেটা দেখা আমার খুব আগ্রহ, চলো যাই দেখে আসি। তবে আমাদের সঙ্গে কোন গাইড থাকবে না।'

চিন্তায় পড়ল ফয়স্তা। বুঝতে পারে না সে, তাকে নিয়ে ডাচেসের ক্রুর খেলা কখন শেষ হবে। সে এখন চরম পর্যায় এসে পড়েছে, অথচ ডাচেসের সর্বনাশা খেলার সাথী থেকে নিজেকে সে গুটিয়ে নিতে পারছে না। তাই সতর্কতার সঙ্গে মিথ্যে করে সে বলল, 'তার দেহে এখনও সাঁতারের জল লেগে রয়েছে, সেই জল শুকিয়ে গায়ে পোশাক চাপাতে চাপাতে মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়ে যাবে। অতএব এখন নয়, মধ্যাহ্নভোজের পর না হয় সেখানে যাওয়া যেতে পারে। 'যাই হোক, মধ্যাহ্নভোজের পর ফয়স্তা তাকে বলে,' তাকে সঙ্গে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেলে খুবই আনন্দ পেতো সে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেখানে বেশী কিছু দেখার নেই।'

এবার টেরেসোর মনে হলো, ফয়স্তা তার সঙ্গে ছলনা করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিক করে ফেলে, এখান থেকে চলে যাবে সে। আর নয়, এবার তাকে ফিরে যেতেই হবে এ্যান্টিগুয়ায়। সেখানে অন্তত বিশাল জনতা তাকে সম্মান দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। কোনো কথা না বলে গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে দৃঢ় মনোভাব

নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেলো সে। তার অফিসাররা যে যেখানে ছিলো ছুটে এলো। ওদিকে ডাচেস এবং তাঁর অতিথিরা ধাঁধায় পড়ে ভাবল, একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটে থাকবে। কিন্তু ফয়স্তা বেশ ভাল করেই জানে, টেরেসোর উপর তার কর্তৃত্বের অবসান হওয়ার কোনো কারণ নেই। স্থির অবিচল হয়ে সে দাঁড়িয়ে থমকে নিজের যায়গায়। মদের গ্লাস হাতে এবং নিচু গলায় কি যেন বলে। ওদিকে সেই সাঁতারু যুবকটি নিচুগলায় হলেও তার কথাগুলো শুনতে পেলো এবং সুইমিং পুলের ধারে যেখানে ফয়স্তা দাঁড়িয়েছিল দ্রুত সাঁতরে এলো সেখানে।

সুইমিংপুল এবং লাল রঙের গেট-এর মধ্যে ব্যবধান মাত্র তিরিশ ফুট। সেই তিরিশ ফুট রাস্তার মধ্যে টেরেসোর মনে ক্ষোভ আরো ঘনীভূত হতে দেখা গেলো। ফয়স্তার সঙ্গে সব সম্পর্কের ইতি টানার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল সে নিজের মনে। তার চালাকি, ভণ্ডামি সে ধরে ফেলেছে। তবু তার সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদের কথা ভাবতে গিয়ে ভীষণ ব্যাথা পেলো সে। কিন্তু তার মনের সব দৃঢ়তা সত্ত্বেও সেই গেট থেকে মাত্র তিন গজ বাকী থাকতেই হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল, একটা নতুন উদ্যম, একটা নতুন উৎসাহে সে তার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো, এবং ঠিক করল সে, এখান থেকে সে চলে যাবে না, আবার ফিরেও যাবে না। তবে সে তার সেক্রেটারির সঙ্গে একটা প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে আলোচনা করার ভান করে ভিলায় তার নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে। ডাচেসের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই তিনি তার সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারে কি?' সেই সঙ্গে টেরেসোর সেক্রেটারীকে বললেন তার ঘরটা দেখিয়ে দেবার জন্য।

ওদিকে টেরেসো তার অফিসার পরিবৃত অবস্থায় ভিলায় নিজের ঘরে ফিরে যেতে গিয়ে বলল, 'এখন আমি তোমাদের কিছুক্ষণ রহস্যের মধ্যে ফেলে রাখতে চাই।' রাগত ভাবে ভাবল সে, 'আমরা দেখতে চাই কে বেশ শক্তিশালী?' টেরেসো যতই রাগ দেখাক না কেন, যতই সে হম্বিতম্বি করুক না কেন, মনে মনে সে তখন স্পষ্ট জেনে গেছে, শুরুতেই তার এক দফা পরাজয় ঘটে গেছে।

টেরেসো তার ঘরে একা—ডাচেসকে আতঙ্কের মধ্যে ফেলে রেখে সে তখন ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে আপন মনে ভাবছিল, 'আমার শত্রুদের পরাভূত করে দেশের সব থেকে শক্তিশালী লোক হয়ে, প্রায় কুড়িবার খুন হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে, প্রায় একশোবার যুদ্ধে জয়ী হয়, এবং কখনো ভয়ঙ্কর কোনো বিপদের মুখোমুখি না হয়ে কি লাভ হলো? একজন মহিলার দয়ার উপর আমাকে নির্ভর করে থাকতে হবে? তার একটু ভালবাসা পাওয়ার জন্য আমাকে লালায়িত হয়ে থাকতে হবে? আমি যখন আমার ইচ্ছামতো তাকে পাওয়ার জন্য আমাকে প্রতিক্ষা করে থাকতে হবে? আমি যখন আমার ইচ্ছামতো তাকে পাওয়ার সুযোগ পাবো,

আমাকে বোকা বানানোর মাশুল হিসেবে তখন আমি তাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।' কিন্তু ফয়স্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের এত সব জল্পনা-কল্পনা সত্ত্বেও টেরেসো কান খাড়া করে রাখলেন দরজায় নক্ করার শব্দ শোনার জন্য.........এখন তার মনে কেবল একটাই চিন্তা—কখন ফয়স্তা তার দরজায় করাঘাত করবে, কখন সে তার মিষ্টি গলায় তাকে ডাকবে।

এমন আগ্রহ নিয়ে ফয়স্তার কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষায় সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল, সেই সময় স্পষ্ট শুনতে পেলো সে, কে যেন একজন পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো ভেতর থেকে। ডাচেস তার সঙ্গে আসার সময় তাকে বলেছিলেন, তার পাশের ঘরটাই ফরস্তার। 'কিন্তু সে যদি ভেবে থাকে আমি তার দরজায় নক্ করবো', যদিও এই ভয়ে মানুষটির বুক তখন থর থর করে কাঁপছিল, 'যদি সে ভেবে থাকে, আমি তাকে ডাকতে যাবো, ভুল করবে সে। ওঃ সে যে কত বড় ভুল করতে যাচ্ছে, নিজেই বোধহয় সে জানে না।' এই রকম একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে টেরেসো তার ডেস্কের সামনে বসে পড়ল। এবং সে তার পোর্টফোলিও খুলে চোখ রাখলো কাগজপত্রের উপর। এই ভাবে অনেকটা সহজ বোধ করল, খানিক পরে তার মনে হলো, তার থেকে একচুলও সরে এলো না সে। বরং উত্তেজনাহীন মন নিয়ে নতুন করে আজকের সমস্ত ঘটনা আবার পর্যালোচনা করতে বসল সে।

তার সামনে কাগজের শীটের উপর লাইনগুলো যেন এক একটা সাপ, নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে মোচড় দিচ্ছিল। যেন সেগুলো একটা জট পাকানো দড়ি, তার দিশেহারা চোখের সামনে সেগুলো আন্দোলিত। পাশের ঘরে ফয়স্তার হাল্কা পায়ে চলার শব্দ শোনামাত্র তার ভয়ঙ্কর উত্তেজিত দেহটা নিমেষে শান্ত হয়ে গেলো। শব্দটা তাকে দারুণভাবে চঞ্চল করে তুলল—ফয়স্তা তখন পাশের ঘরে চলাফেরা করছিল, এক্ষেত্রে সাধারণত একটা বিশ্রী রকমের শব্দ উঠে থাকে, কিন্তু তার পায়ের শব্দটা ঠিক সেরকম গোলমেলে নয়। তার হাত থেকে কোনো ভারি জিনিষ পড়ে গিয়ে শব্দটা হলো, তাও নয়। সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটি তার উপস্থিতি আদপেই জানাতে চায় না, কিংবা অন্য কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও চায় না। তাঁর কাছে এর উপলব্ধি খুবই বেদনাদায়ক। মেয়েটির বিজয়ী মনোভাব এবং তার নিজের সরলতার কথা ভেবেই রাগে ফেটে পড়ল সে।

সব শেষে সহ্য করতে না পেরে ডেস্ক থেকে লাফিয়ে উঠল সে, তারপর সংযোগকারী দরজার সামনে এগিয়ে গিয়ে নক্ করার জন্য সে তার একটা হাত তুলল। একেবারে শেষ মুহূর্তে সে উপলব্ধি করল, ট্রাউজার আর গেঞ্জির থেকে জেনারেলের আঁটো জামা পরে ফয়স্তার কাছে যাওয়াটা অনেক বেশী মানানসই

হবে বলে তার মনে হলো। কথাটা মনে হতেই চেয়ার থেকে সে তার জেনারেলের আঁটো জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপাল। টেরেসো তার মান মর্যাদার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন।

জেনারেলের পোশাক গায়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেরেসোর মনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেলো। একটু আগে তার সেই অধৈর্য হওয়া ভাবটা, যা বলতে গেলে একরকম পাগলামির পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছিল, এখন সেটা অনেকটা প্রশমিত, এখন সে আগের থেকে অনেক বেশী স্বাভাবিক। এখন সে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারছে। আর সেই উপলব্ধি বোধ থেকেই নিজেকে প্রশ্ন করল সে, 'এ আমি কি করছি? স্কুলের ছেলের মতো নেহাতই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চারের মতো ফয়স্তার ঘরে নক্ করতে শুরু করেছি? আমি কে, সে কথা কি আমি ভুলে গেছি?' এ সব কথা মনে হতেই সে আবার বসে পড়ল ডেস্কের সামনে, সে এখন অনেক শান্ত, অনেক বেশী যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে। আবার পোর্টফোলিওটা খুলল সে, একটু আগে যেটা সে রাগ করে বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন তাকে যেন নেশায় পেয়ে বসেছিল ফয়স্তার ঘরের দরজায় নক্ করার জন্য। পোর্টফোলিওর কাগজপত্র দেখতে গিয়ে হঠাৎ সে উপলব্ধি করল, সে তার মান-মর্যাদা অটুট রেখেই ফয়স্তাকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে যে সমস্যাটা উদ্ভূত হয়েছিল, তার একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছে। ফয়স্তার ভায়ের নথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে টেরেসো দেখল, তার ভাই একজন প্রতারক, কন্টাক্ট চাইছে, সরকারী অর্থে ধনবান হতে চাইছে সে। নথীপত্র পড়ার ভান করে সে তার সেক্রেটারির উদ্দেশ্যে চারবার বেল বাজালো।

টেরেসোর সেক্রেটারি ঘরে ঢুকতেই বলল সে, 'কাউন্টেস সানচেজের কাছে গিয়ে বলো, তার ভায়ের ব্যাপারে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' টেরেসো তার কাজের ব্যস্ততার ভান করল, সেক্রেটারি আর দাঁড়াল না, চলে গেলো।

ইচ্ছে করে দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল টেরেসো। সেক্রেটারি কন্টেরাস চলে যেতেই দরজার দিকে মুখ করে বসল সে। চেয়ারের উপর সে তার গ্লাভস, টুপি এবং চাবুক রাখল। তারপর নথীপত্রগুলো টেনে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখার ভান করল।

দু'মিনিটের কম সময়ের মধ্যে সেক্রেটারি আবার ফিরে এসে খবর দিলো কাউন্টেস সানচেজ বাইরে অপেক্ষা করছে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। উত্তরে টেরেসো বলে, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। সেক্রেটারি চলে যাওয়ার পর সে আবার টেবিলের উপর হাত রেখে সে তার কব্জি-ঘড়ির উপর চোখ রাখল। তার হাতটা চঞ্চল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করল সে। তখন তার মনে

হচ্ছিল কন্টেরাসকে ডেকে বলে ফয়স্তাকে ভেতরে নিয়ে আসার জন্য। না, শেষ পর্যন্ত সে তার মনের অদম্য ইচ্ছা কোন রকমে দমন করে ঠিক করল, ফয়স্তাকে বাইরে দশ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখবে, প্রথমে তার মনে হয়েছিল আধ ঘণ্টা, না, পরে সে ভেবে দেখল, দশ মিনিটই যথেষ্ট। সে জানে, দুপুরে এভাবে অপেক্ষা করে থাকার মধ্যে সাক্ষাৎপ্রার্থীর প্রতি সম্ভ্রম ও সম্মান দেখানোর মনোভাব জেগে ওঠে। কিন্তু তৃতীয় মিনিটের সময় সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না বলে তার মনে হলো। সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল, ফয়স্তা নয়, সে নিজেই নিজেকে প্রতীক্ষায় রেখে দিয়েছে, এবং সেই প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্তে একটু একটু করে দৈহিক অস্বস্তিবোধ করছিল সে, তার কামনা-বাসনার প্রতিটি মুহূর্ত যেন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সেই দুর্বিষহ মুহূর্তগুলো যেন তার কাছে এক একটা বিরাট বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন তার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল ফয়স্তার বাদামী রঙের ছেলেমানুষি মুখখানি দেখে। ভাল করে দেখতে গিয়ে সে আবার এও ভাবল, ফয়স্তা তার দুর্বলতার কথা ভেবে হয়তো বিদ্রুপ করতে পারে। তা হোক, তবু তো সে তাকে তার কাছে পাবে, একান্ত সান্নিধ্যে পাবে, তার উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করতে পারবে। আর এই অন্তরঙ্গ মুহূর্তটি দীর্ঘসময় ধরে রাখার জন্যই তো তার এখানে ছুটে আসা। টেরেসোর মনে হলো সে তার পুরু লেন্স ভেদ করে ফয়স্তার সুন্দর মুখটা তার চোখের মনিতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ভাসছে, জ্বলজ্বল করছে, তার মনের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, তার মনের আকাশে এক রাশ অন্ধকার বুঝি নেমে এলো, তার সেই ভালা লাগা নক্ষত্রটা কখন যেন ঢাকা পড়ে গেছে এক খণ্ড কালো মেঘের নিচে। এ যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। হ্যাঁ, ঝড়ের পূর্বাভাসই বটে! তারপর সে আর ফয়স্তার মুখটা দেখতে পেলো না। তবে তার গলা থেকে কোমর পর্যন্ত অংশটা যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখা গেলো। তার দেহের ভাঁজে ভাঁজে জলের ফোঁটাগুলো মুক্তোর মতো দেখাচ্ছিল, বেদিং সুটের সিল্কের আটো বন্ধনীতে আবদ্ধ তার পুরুষ্টু স্তনজোড়া ভয়ঙ্কর ছুঁচলো,—খানিক আগে ঠিক যেমনটি দেখেছিল সে সুইমিং পুলের নীচে। ওদিকে তার কব্জি-ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটাটা নির্দিষ্ট গতিতেই এগিয়ে চলেছিল। আর সেই সঙ্গে তার কাল্পনিক হাতটা নড়াচড়া করতে থাকে তার একটা স্তন থেকে আর একটা স্তনের উপর, গলা থেকে পেট পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত ফয়স্তার সম্পূর্ণ নগ্ন দেহটা যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাথা নত অবস্থায় ঠাট্টার চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল ফয়স্তা, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফয়স্তা তাকে চুমু খেলো। তখন পাঁচ মিনিট সময়ও অতিক্রম করেনি—চারটে আটান্ন। টেরেসো তখন ভয়ঙ্কর ভাবে উত্তেজিত, নিজের মনে জোরে জোরে মাথা নাড়ল। এবং তারপরেই বেল টিপল

সে। ঠিক পরমুহূর্তেই তার সেক্রেটারি এসে ঘরে ঢুকল, এবং সামারিক কায়দায় তাকে স্যালুট দিলো। তারপর পরমুহূর্তেই অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়াল সে, এবং সেই সময় দেখা গেলো কার্পেট মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ফয়স্তা।

❑ ষোল ❑

ঘরে ঢুকেই ফয়স্তা আন্দাজ করল, টেরেসোর পোর্টফলিওর মধ্যে তার ভায়ের আবেদনপত্রটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। টেরেসো তাকে দেখতে চায় এবং সে তার নিজের মুখ ঢাকতে চায় এই ভাবে। ফয়স্তাকে ভুল পথে চালিত করেছে, এই আনন্দে টেরেসো নিজেই নিজেকে প্রতারিত করছে ভেবে মনে মনে খুব মজা পেলো ফয়স্তা। কালো জ্যাকেট এবং ট্রাউজার পরিহিত অবস্থায় ঘরে এসে ঢুকল ফয়স্তা, গলায় আকাশ-নীল রুমাল জড়ানো। ঘরে ঢুকেই টেরেসোর পিছন দিকটা দেখতে পেলো সে। তার হাতে কাগজের কতকগুলো সীট।

শাটারটা বন্ধ করে দেওয়া এবং ঘরটা আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেলো।

'আহ্, তুমি?' ঘাড় না ফিরিয়েই বলল সে। 'ভেতরে এসো।' এখন সে এতই উত্তেজিত যে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। তার হাত অসম্ভব কাঁপছিল, সেটা বুঝতে না দেওয়ার জন্য নথীপত্রগুলো টেবিলের উপর রেখে দিলো সে।

তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে ফয়স্তা তার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেয়। এবং আরো বলে সে, টেরেসোর সেক্রেটারি তাকে বলেছে, সে নাকি তার ভায়ের ব্যাপারে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আর সে আন্তরিক-ভাবে আশা করে, তার অনুরোধ সে রাখবে।

টেরেসো নিজেই তার উত্তেজনার কথা ভেবে প্রচণ্ড রেগে গেলো, এবং সেই সময় সে তার উত্তেজনা কিছুতেই দমন করতে পারল না, সে তখন তার রাগ প্রশমন করার উপায় খুঁজতে থাকল। সেই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেলো। ও দিকে ফয়স্তা তার সামনে দাঁড়িয়ে। উল্টোদিকের কাপবোর্ডের আয়নার মাঝে মাঝে নিজেকে দেখছিল ফয়স্তা, মাথায় হাত বুলিয়ে সে তার কানের পাশ থেকে খুচরো চুলগুলো তুলে দিতে থাকে। অপর দিকে টেরেসোর তখন অসহনীয় উত্তেজনায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলছিল, মাথাটা নিচু করে টেবিলের উপর রাখা নথীপত্রগুলোর উপর সে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। সব শেষে সে তার চোখ তুলে চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোমার ভাই একজন প্রতারক ঠক, প্রবঞ্চক!'

এ ধরণের গালমন্দ ছাড়া অন্য যে কোনো কিছু আশা করেছিল ফয়স্তা, কিন্তু

টেরেসো যে ভাবে উত্তেজিত হয়ে সেই বিশেষ ব্যাপারে তাকে আঘাত করল, তাতে তাকে প্রতিবাদ করার অবসরই দিলো না সে।

'হ্যাঁ', টেরেসো নিজেই জানত না রাগের মাথায় কি যা তা সে বলতে যাচ্ছে তার প্রেমিকা ফয়স্তাকে। 'যে কথা তোমাকে বলার জন্য এখানে ডেকে পাঠিয়েছি শোনো, তোমার ভাই এমনি একজন নির্লজ্জ চোর, ডাকাত যে, এর আগে ওর মতো দেশের এমন ক্ষতি কেউ করেনি। আর সেই প্রতারক ভাইকে কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দেওয়ার জন্য তুমি তার হয়ে ওকালতি করছ? হ্যাঁ, একবার এবং শেষ বারের মতো আমি তাকে একটা কন্ট্রাক্ট দেবার জন্য আমি প্রলোভিত—আর সেই কন্ট্রাক্টটা কি জানো? ছয় বাই তিন ফুটের একটা পবিত্র ভূমি...হ্যাঁ, তাকে গুলিবিদ্ধ করার কন্ট্রাক্ট—দেশের সঙ্গে যে ব্যবহার সে করেছে, এটাই তার প্রাপ্য হওয়া উচিত। দেওয়ালে পিঠ রেখে, হ্যাঁ, দেওয়ালে পিঠ রেখে সেই কন্ট্রাক্টটা তাকে নিতে হবে বুক পেতে— সেই একবার আর শেষ বারের মতো—এবং তারপর তার স্থান হবে সাধারণ কবরখানায়...।

পাগলের মতো চিৎকার করছিলো টেরোসো তখন। কাজের গাফিলতি হলে রেগে গিয়ে যেমন করে সে তার কর্মচারীদের বকাঝকা করে তার ঝাল মেটায়, এক্ষেত্রেও ফয়স্তাকে তার ভায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এখন তার রাগ অনেকটা প্রশমিত, মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে বলে মনে হলো টেরেসোর। কিন্তু ফয়স্তার তখন অন্য উপলব্ধি। বুঝতে পারে সে, এটা টেরেসোর অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। তাকে ডেকে পাঠানোর আসল কারণটা ঢাকার জন্য সে তার ভায়ের প্রসঙ্গ তুলে তার চোখে সে তার নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চাইছে। তাই সে এখন নিশ্চিত বুঝে গেছে, তার ভায়ের আবেদন মঞ্জুর হতে চলেছে।

'সে যে একজন প্রতারক—এর প্রমাণ আমার হাতে আছে', কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে সে বলতে থাকে, এবং কাগজের কয়েকটা পাতা ফয়স্তার নাকের ডগায় তুলে ধরে বলে, 'এগুলো হলো পাহাড়-সমান প্রমাণ...সে একজন প্রতারক—বহু বছর ধরে প্রতারণা করে আসছে সে...এটার দিকে তাকিয়ে দেখ, হেন পদ নেই যে সে দখল করে বসেনি, যেখানে সে বেহায়ার মতো ডাকাতি করেনি।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে সে। 'বিরক্তিকর, এ ভাবে চিরদিন চলতে দেওয়া যায় না। দেশের খেটে খাওয়া মানুষগুলো সৎ, গরীব, দেশপ্রেমিক, অনুগত'—এই সব মানুষগুলোরই প্রতিনিধি টেরেসো, এবং আন্তরিক ভাবেই সে বলে, 'এই সব লোকগুলো বিশ্বাস করে তাদের ভবিষ্যতের চাবি-কাঠি আমার হাতে তুলে দিয়েছে, তারই তাদের সেই বিশ্বাস অটুট রাখা, তোমার ভায়ের মতো প্রতারকের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা আমার একান্ত

কর্তব্য। তারা কিছু ভাল আশা করে আমার কাছ থেকে। বহু বছর ধরে তারা আমাকে অনুরোধ করে আসছে এই সব চুরি জোচ্চুরি বন্ধ করা উচিত এবং প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত, ঠিক মতো বিচার হওয়া উচিত...তুমি কি মনে করো, আমি কিছুই জানিনা? সব কিছুই আমি জানি। কেউ বলতে পারবে না, আমার ধৈর্য বিফলে যেতে পারে... দেশের মানুষকে আমি ভালোবাসি। এদেরই প্রতিনিধি হয়ে আমি আজ দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসতে পেরেছি। আমি জানি, এই সব গরীব খেটে-খাওয়া মানুষগুলোর উপর উঁচুতলার মানুষগুলোর কি প্রচণ্ড চাপ, তাদের কষ্ট স্বীকার—এ সবই তারা মুখ বুজে স্বীকার করে আসছে সামান্য একটু ভাত-কাপড়ের প্রত্যাশায়। তাদের চাহিদা খুব বেশী কিছু নয়। সামান্য একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই আর বাঁচার মতো যৎসামান্য আহার। তাই এদের সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারি না। তোমার প্রতারক ভায়ের মতো এদের আমি ঠকাতে পারি না। জনারেল হওয়ার আগে এই সব গরীব চাষীদের মতো আমিও একজন চাষী ছিলাম, হীন থেকে হীনতর, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একজন শ্রমিক। আমি জানি তাদের চমৎকার কর্তব্য পালনের প্রয়াসের কথা তাদের সরলতার কথা, তাদের নম্রতার কথা। অথচ, ভেবে দেখলাম, এই সব সৎ দেশপ্রেমিক গরীব মানুষগুলোর উন্নতি সাধনের জন্য সরকারী কন্ট্রাক্ট নিয়ে তোমার ঐ প্রতারক ভাই কি করেছে? কি তাদের উন্নতি করেছে? তাদের জীবনযাত্রা আগেও যা ছিলো, এখনো সেই রকমই আছে। তোমার ভাই এদের কোনো উন্নতি সাধন করতে পারেনি। কিন্তু সরকার তাদের উন্নতি, তাদের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করার জন্যই তো তোমার ভাইকে বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তোমার ভাই সরকারের সৎ প্রচেষ্টা, আর সেই সব গরীব মানুষগুলোর আশা-আকাঙ্খা ধূলিসাৎ করে দিয়ে তাদের এবং সরকারকে প্রতারণা করে গেছে বছরের পর বছর ধরে। আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থের পাহাড় বাগিয়ে তুলেছে কোনো তোয়াক্কা না করে। গরীব মানুষদের তার জঘন্য কাজের প্রতিবাদ করার সাহস নেই। সেই সুযোগটা তোমার ভাই নিয়েছে। ওরা না হয় প্রতিবাদ করতে পারে না, কিন্তু তাই বলে আমি তাদের প্রতিনিধি হয়ে চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, তা তো হয় না। তোমার ভায়ের মতো মহান-ঠগ লোক তাদের প্রতারণা করে যাবে, আর তুমি ভেবেছ, আমি তা সহ্য করে যাবো মুখ বুজে? ওদের দুঃখ কষ্টের কোন সুরাহা দেখতে না পেয়ে আমি খুবই ভাবিত এবং ব্যথিত। এই অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের সময় এসে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টির সময় এখন, ন্যায় বিচারের সময় এখন...।

টেরেসো তার বাকপটুতার গুণে দীর্ঘ বক্তৃতা চালিয়ে গেলেও স্বীকার করতেই হয় যে, তার কথা এবং কাজের মধ্যে অবশ্যই একটা সামঞ্জস্য আছে, আছে তার

আন্তরিকতা—তা সত্ত্বেও টেরেসো এখন অনুভব করতে শুরু করেছে, শুরুতে তার ক্রোধ ও ঘৃণার যে তীব্রতা ছিলো, এখন সেটা ক্রমশই স্তিমিত হয়ে আসছে। তাই বলে এই নয় যে, সে যা বলছে তাতে তার বিশ্বাস নেই; তবে সে তার অভিজ্ঞতা থেকে ভাল করে জানে যে, কেবলমাত্র আইনের জোর খাটিয়ে মানুষের প্রতারণার প্রবৃত্তি বন্ধ করা যাবে না, কেবলমাত্র তাদের বিবেককে জাগাতেই পারলেই তার প্রচেষ্টা সফল হতে পার। আর সেটা সম্ভব কয়েকজন অসৎ সরকারী আমলাদের যদি শায়েস্তা করা যায়। কারণ এদের প্রশ্রয়েই ফয়স্তার ভায়ের মতো প্রতারকরা ফুলে-ফেঁপে উঠছে। এই সব অসৎ সরকারী আমলারাও কার্যত অসৎ এক একজন। কারণ প্রতারক কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে তাদের লাভের অংশ থেকে গোপন লেন-দেন হয় তাদের। এই সব অসৎ আমলাদের বিরুদ্ধে জনরোষ ক্রমশই বেড়ে চলেছে, বেশ বুঝতে পারে টেরেসো। আর সে এও জানে যে, সেই জনরোষ চরম পর্যায় গিয়ে পৌঁছলে তখন সরকারের আর কিছু করার থাকবে না। জনরোষের আগুন নেভানো তখন মুশকিল হয়ে পড়বে। উপযুক্ত সময়ে অসৎ আমলা এবং সরকারী কর্মচারীদের শায়েস্তা করতে না পারলে জনগণকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। টেরেসো এও জানে, জনগণ যে ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, এবং যে ভাবে তাদের ঘৃণা ও ক্রোধ বাড়ছে, একদিন না একদিন সাধারণ খেটে-খাওয়া শ্রমিক-কর্মচারী চাষী ভাইরা সেই সব অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীদের শায়েস্তা করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেবে। যার একটাই অর্থ—গৃহযুদ্ধ। না, তা সে হতে দেবে না। গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবেই আজ তাকে এমন কঠোর হতে হচ্ছে।

যাইহোক, টেরেসোর ক্রোধ ও ঘৃণা এমন এক চরম পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছিল, বুঝতে পারে সে, সেখান থেকে তার ফিরে আসাটা খুবই কষ্টকর। অর্থাৎ ফয়স্তার ভায়ের মুক্তি দেওয়ার বিষয়টা পুর্নবিবেচনা করা। তবু শেষের দিকে তার কথার সুর কেমন যেন একটু নরম শোনায়, শুরুতে তার কথার মধ্যে যে ঝাঁঝ ছিল, এখন সেটা আর নেই। ফয়স্তা নিজেও লক্ষ্য করেছে, টেরেসোর কথায় যত ক্রোধ, ঘৃণা থাকুক না কেন, তার মধ্যে কোথায় যেন ক্ষমার সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়, তবে এ ব্যাপারে হলপ করে কিছু সে বলতে পারে না, অন্তত এই মুহূর্তে তো বটেই। এখন সে বুঝতে পারছে, সে যদি ঠিক সময়ে এখানে না সে পৌঁছত, না জানি টেরেসোর ক্রোধ ও ঘৃণা কোন্ পর্যায় গিয়ে পৌঁছত।

এবার বকা ঝকা করার পর দম নেওয়ার জন্য একটু নীরব হতেই ফয়স্তা দুঃখের সঙ্গে জানালো, তার ভায়ের এই অপকর্মের কথা আগে সে জানত না। টেরেসো তার ভায়ের প্রতারণার কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর পর ফয়স্তা এখন বুঝে গেছে, এ-অভিযোগ একেবারে খাঁটি সত্য; আর এই যদি হয়, তাহলে সে তার

ভায়ের মুক্তির জন্য যে আবেদনপত্রটা জেনারেলের কাছে জমা দিয়েছিল সেটা সে ফিরিয়ে নিতে চায়, কারণ সে তার অপদার্থ ভায়ের মুক্তির জন্য আর কখনো কারোর কাছে আবেদন বা অনুরোধ জানাবে না। এখন জেনারেল তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলে এখান থেকে পালিযে বাঁচে সে এবং চলে যাওয়ারে জন্য পা বাড়াল সে।

ম্যানুয়েলের আবেদনপত্রটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করল টেরেসো, এই সুযোগে ফয়স্তাকে তার একেবারে শয়নকক্ষে আনা যেতে পারে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ দেখতে পায়নি, সেই আবেদনপত্রের ফায়দা লুটতে চায় ফয়স্তা। নতুন করে কিছু পরিকল্পনা করার মতো তার হাতে সময়ও ছিলো না। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে তাকে। কারণ ফয়স্তা তখন প্রায় দরজার কাছে চলে গিয়েছিল। সব সংযম, সব বাধা ভুলে গিয়ে দরজা এবং ফয়স্তার মাঝখানে ছুটে গেল সে।

'তুমি চলে যাচ্ছ, ব্যাপার কি?' বিভ্রান্ত হয়ে বলল সে, 'এসব কি হচ্ছে? একটু অপেক্ষা করো...' তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে আবার বলে উঠল, 'মনে রেখো, জনতার মধ্যে তুমি রয়েছ, আর আমি তোমাকে রেহাই দিলে তুমি কিছুতেই যেতে পারো না।'

'সে কথা সত্য', শান্ত স্বরে বলল ফয়স্তা।

কিন্তু এই সময়, প্রথম রাউণ্ডে সে যে বিজয়িণী, সেটা বোঝানোর জন্য টেরেসোর কাছ থেকে আহ্বান পাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে, কোন কথা না বলেই এগিয়ে বিছানায় উঠে বসল ফয়স্তা। ওদিকে টেরেসো তখন ঘরের মধ্যে আবার পায়চারি করতে শুরু করেছিল।

'এসব কি শয়তানি?' আবার সে বলতে শুরু করল, 'দেশের ভাগ্যের ব্যাপারে আমায় তুমি বেশী বদান্যতা দেখাতে পার না...তোমার ভায়ের সম্পর্কে আমি অন্তত যা বললাম খাঁটি সত্য। পুলিশের রিপোর্ট আমি বিশ্বাস করতে পারি, হতে পারে তাতে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটা একেবারে সত্য। তবু তা সত্বেও বলব, গত গৃহযুদ্ধের সময় তোমার ভাই আমার অফিসারদের মধ্যে সব থেকে ভালো ছিলো। সত্যি কথা বলতে কি আমি তার ভাল মন্দ দুটি দিকের কথাই জানি...আবার বলছি, হয়তো পুলিশী রিপোর্টে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকবে, কিংবা কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে থাকতে পারে ঃ জানো, এসব ক্ষেত্রে পুলিশী তদন্ত সাধারণত একটু ভাসাভাসাই হয়ে থাকে। তাছাড়া আমাদের সর্বোচ্চ স্তরে যারা আছে, তাদেরও পারিশ্রমিক খুব কম। আর এই কারণেই হয়তো তারা কখনো কখনো সুযোগ পেলে নগদ টাকার ঘুষ কিংবা দামী উপহার সামগ্রী গ্রহণ করে থাকে, এবং তার পরিবর্তে তারা তাদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করে থাকে।

তারা তা করতে পারে না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে তারাও তো মানুষ?' হঠাৎ টেরেসো ফয়স্তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল, 'যাই হোক, তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তোমার ভাইকে সরাসরি অভিযুক্ত করা হবে না। কেবল মাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেই তাকে রেহাই দিয়ে দেওয়া হবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সে তার কন্ট্রাক্ট পাবেই...তুমি এখন খুশি তো?'

'এ আপনার মহনুভবতা, আপনি খুবই দয়ালু', ঠাণ্ডা গলায় বলল ফয়স্তা, 'কিন্তু আমার ভাই যদি সত্যিই প্রতারক হয়ে থাকে, এ কন্ট্রাক্ট তার পাওয়া উচিত নয়। আর সে যদি প্রতারক না হয়, তাহলে রিপোর্টটা ছিঁড়ে ফেলতে হবে, আর যে সব অফিসাররা তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

'না, সেটা সম্ভব নয়,' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলল টেরেসো।

'তাহলে আমার চলে যাওয়াই ভাল', ফয়স্তা বলতে শুরু করল, 'সানচেজ পরিবার কখনো তাদের সম্মান বিসর্জন দেয় না...সানচেজ পরিবার,' ফয়স্তা তার কথা অসমাপ্ত রেখে বুঝতে চাইল, টেরেসো তার ভায়ের মুক্তির বিনিময়ে তার কাছ থেকে কি দাবী করে সেটা দেখার জন্য। কারণ তার দাবীর বহর দেখে ভবিষ্যতে অন্য কোনো ব্যাপারে অনুরোধ করবে কিনা সেটা ভেবে দেখতে হচ্ছে তাকে।

কিন্তু এখন আবার সেই সুইমিং পুল-এর ঘটনার মতো অবস্থাটা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ফয়স্তার লক্ষ্য কি হঠাৎ সেটা উপলব্ধি করল টেরেসো এবং সেটা বুঝতে পেরেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে।

'সানচেজ পরিবার', অবজ্ঞা এবং বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল টেরেসো, 'সানচেজ পরিবারের আবার মান-সম্মান...' অসমাপ্ত কথাটা শেষ করতে গিয়ে ঘৃনা ভরে বলল সে, 'প্রতারকের পরিবার। আমি তদন্ত কমিশন বসাব, আর তোমরা যা যা চুরি করেছ সেগুলো ফেরত দিতে বাধ্য করাব।'

'এখন আমি অনেকদূর এগিয়ে গেছি,' ভাবল ফয়স্তা। এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতিরোধের জন্য সে তার জ্যাকেটের পকেট থেকে রুমাল বার করে কান্না চাপতে চোখে রুমাল চেপে ধরল। আর ওদিকে টেরেসো চিৎকার থামিয়ে বুঝতে পারল, সেও অনেকদূর এগিয়ে গেছে। 'এ আর এক বিস্ফোরণ,' অখুশি হয়ে ভাবল সে। 'হয়তো আমি ওকে হারাব।'

বিছানায় ফয়স্তার কাছে বসে সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে একেবারে অন্য সুরে কাঁদতে মানা করল। সেই সঙ্গে সে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, তাকে খুশি করার জন্য সে তার সাধ্য মতো সব কিছুই করবে। বুঝতে না পেরে ফয়স্তা তখনো কাঁদতে থাকে। তবে সেই সঙ্গে ভাঙা মন নিয়ে—কতকটা দুর্ঘটনার মতোই বলা যেতে পারে, ফয়স্তা তার একটা নিস্তেজ হাত প্রসারিত করল, তার সেই হাতটা টেরেসোর হাতে আবদ্ধ

করার সুযোগ নিক, তার ঠোঁট সে তার চুমোয় রাঙিয়ে দিক। কিন্তু জেনারেলের ভীরু স্বভাবের কথাটায় কোনো আমলই দিতে চাইল না সে। চুমু খাওয়ার বদলে সে কেবল ফয়স্তার হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে তাকে অনুরোই করল না কাঁদার জন্য।

'আমি ব্যথিত, তাই আমি কাঁদিনি', ফয়স্তার চোখের উপর থেকে তার হাতের রুমালটা সরিয়ে টেরেসোর মুখোমুখি বসে বলল, 'আমি ভয় পেয়েছি বলেই কাঁদছি। আমার মনে হয়, আমি যে তোমার সৈনিকদের মধ্যে একজন, তুমি নিশ্চয়ই সেটা কল্পনা করে নিয়েছ। তুমি তোমার রাগ দেখিয়ে আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। তুমি ভয়ঙ্কর, ভাবতে পারো, আমার বুকটা কি রকম ফেটে যাচ্ছে?' টেরেসোর একটা হাত তুলে নিয়ে ফয়স্তা তার বাঁদিকের স্তনের উপর চেপে ধরল। তার এ-ধরণের আচরণ দু'টি বিশেষ প্রয়োজনে ঃ টেরেসোর অহংভাবের তারিফ করে সে তাকে জানিয়ে দিতে চায়, তাকে খোশামোদ করতে পেরে নিজেকে সে ধন্য বলে মনে করছ, আর সে তাকে ভাবিয়ে তুলতে চায়, তার অনুভূতি জাগাতে চায়—এই মুহূর্তে তাকে খুব অন্তরঙ্গ করে তুলতে চায় সে। আর এবার দেখা গেলো, সংশয়ের তুলনায় সহজাত প্রবৃত্তিই অনেক বেশী শক্তিশালী। ফয়স্তার নরম কোমরে হাত রেখে তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলো সে।

কিন্তু ফয়স্তা টেরেসোকে জানত। সে জানে, সেই মুহূর্তে সে যদি টেরেসোর বিছানায় তাকে উপভোগ করতে দেয়, তার ভাই কিছুই পাবে না। তার কাম চরিতার্থর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যেতে বেশী সময় লাগে না তার, আগেও এরকম ঘটনা ঘন ঘন ঘটতে দেখা গেছে। একটা মেয়ের ঠোঁট থেকে একটা মেয়ের ঠোঁট রাখতে টেরেসোর বেশী সময় লাগেনা। ফয়স্তা এও জানে যে, ক্ষমতা প্রয়োগে টেরেসোর সিদ্ধান্ত উদার হলেও কিছুই সে করবে না। এমন কি এই চুমু খাওয়ার পরেও সে তার প্রতিশ্রুতি এড়াবার চেষ্টা করবে। তাই টেরেসোর বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া মাত্র উঠে দাঁড়াল ফয়স্তা এবং দেরী হয়ে গেছে ভান করে বলল সে, তাকে এখনি ডাচেসের কাছে ফিরে যেতে হবে, তা না হলে তিনি ভীষণ রাগ করবেন। টেরেসো বিরক্ত হলো, ঠোঁট কামড়াল এবং নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা আবার কখন মিলিত হচ্ছি?'

ফয়স্তার উত্তর অস্পষ্ট, অনিশ্চিত—জানে না সে। সম্ভবত আজ কিংবা কাল। স্নায়ু দুর্বলতা দেখিয়ে মেয়েলী ভান করল সে, টেরেসোর প্রতি তার দুর্বলতা যে কত বোঝাতে পারবে না সে, কিন্তু কি করবে সে, তার হাত পা যে বাঁধা পড়ে আছে ডাচেসের কাছে, তাই সে তার অক্ষমতা প্রকাশ না করে থাকতে পারছে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি...আর ফয়স্তাকে আর একবার চুমু খাওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়ে সরে

দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা খেলো টেরেসো। হতবাক, বিক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হলো সে। 'ক্ষমা করো আমাকে', তাকে মুখ কালো করতে দেখে বলল ফয়স্তা, 'কি করব বলো, আমি যে খুব ঘাবড়ে গেছি...আমার স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম অন্য পরপুরুষের সঙ্গে...'

সেটা এমনি অবাস্তব মিথ্যা যে, এর থেকে ভালো কিছু খুঁজে না পেয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে যে ফয়স্তা এই মিথ্যের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, কথাটা শেষ করার মতো সাহস তার ছিলো না। ওদিকে টেরেসোর মনে আবার ঘৃণা জেগে উঠল, তার মনে তখন কাম চরিতার্থ করার প্রচণ্ড স্পৃহা, সেই সঙ্গে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করল। 'এ কি রকম মহিলা', সে আর চিন্তা করতে পারছিল না। ফয়স্তাকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে দেখে টেরেসোর ইচ্ছে হলো, ফয়স্তাকে তার বিছানায় টেনে নিয়ে গিয়ে তার দেহ উপভোগ করে তাকে লাথি মেরে তার ঘর থেকে বার করে দেয়। কিন্তু তা না করে আমি তাকে সম্মান দেখিয়ে তার নির্জলা মিথ্যা ভাষণ কেমন সহজে হজম করে ফেললাম, ভাবল সে। তবে সে বুঝতে পারল, ফয়স্তা তার কাছ থেকে কি চায়, এবং তার দিকে না তাকিয়েই সে তখন তার ডেস্কের সামনে এগিয়ে গিয়ে বসল। তারপর সে বলেই ফেলল, 'তোমার ভায়ের এই কন্ট্রাক্টটা পাওয়ার জন্য তুমি কি করতে বলো?...অবশ্যই সেটা যেন সৎ পথে হয়।'

এই কথাগুলো সে ইচ্ছে করে বলল ফয়স্তাকে এবং নিজের কাছে এই বলে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যে, এখানে ভাবাবেগের কোনো স্থান নেই, নেহাতই দর কষাকষির ব্যাপার এটা এবং ডেস্কের উপর রাখা কাগজগুলো একটা দাম মাত্র, আর কিছু নয়, প্রেমও নয়, সম্মানও নয়। কিন্তু তার কথার সুরে প্রচ্ছন্নভাবে আঘাত পাওয়ার ইঙ্গিত ছিলো, কারণ ফয়স্তার নিরুত্তাপ ভাবটা তাকে আঘাত করেছে। নিজেকে প্রতারিত করার জন্য এখনো সে প্রস্তুত, তবে বিনিময়ে ফয়স্তাকে কিছু দিতে হবে, সেটা তাঁর আকাঙ্খিত বহু প্রতিক্ষিত দেহ-মনের ইচ্ছা। ফয়স্তার ভায়ের বিরুদ্ধে পুলিশী রিপোর্টটার উপর চোখ রেখে সে ভাবে, এখনো সে তার ভায়ের জন্য ঝুঁকি নিতে পারে, তাকে সরকারী কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দিতে পারে, তবে ফয়স্তাকে তার ইচ্ছা পূরণ করতে হবে...

তারপর হঠাৎ সে মনস্থির করে ফেলে একটা পেন টেনে নিয়ে একটা কাগজে তার নাম সই করে ফয়স্তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এটা তার সেক্রেটারির হাতে তুলে দিতে নথীভুক্ত করার জন্য।

'এখন তুমি সন্তুষ্ট', ফয়স্তার মুখের দিকে তাকাল টেরেসো।

হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলল না ফয়স্তা। শুধু বলল, তার বদান্যতার সম্পর্কে তার

বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেনি সে। সে জানত, তাকে জয় করার মতো হৃদয় আছে টেরেসোর। আর ফয়স্তা জানে, কি করে তার কামনার আগুন নিভাতে হয়।

'তোমার এখানে চিমনি আছে?' হঠাৎ খোঁজ নিলো ফয়স্তা। তার চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক।

'চিমনি?' অবাক হয়ে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল টেরেসো। 'না, মানে হ্যাঁ, ঐ তো...কিন্তু কেন বলো তো?'

'তোমার চিমনি,' বলল ফয়স্তা, 'অবশ্যই পরিষ্কার করা দরকার; কে বলতে পারে কত ঝুল জমে আছে সেখানে? অতএব বেচারা চিমনি সাফাই করার লোক এলে তাকে ফিরিয়ে দিও না। নৈশভোজের পর পার্টি শুরু হওয়ার আগে সে আসবে।'

'আহ্ এবার বুঝতে পারছি, কি তুমি বোঝাতে চাইছ,' বলল টেরেসো। তার সেই উপলব্ধি প্রকাশ পেলো তার মুখের উজ্জ্বলতায়, বিদ্যুৎ চমকের মতো। 'বেচারা চিমনি সাফাইকারী...ঠিক আছে, তাকে অভ্যর্থনা জানানো হবে।'

'বেচারা চিমনি সাফাইকারী', আবার বলল ফয়স্তা, তার রক্তিমাভ মুখে হাসির ঝিলিক। সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো টেরেসোর দিকে। টেরেসো তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার ঠোঁটে চুমু খেলো গভীর ভাবে। চুম্বনে সিক্ত মুখে লুকোতে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ফয়স্তা।

টেরেসোর ঘর থেকে সোজা ডাচেসের কাছে চলে এলো ফয়স্তা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসেছিলেন ডাচেস। গিউস্তিনা তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে প্রচণ্ডভাবে গালিগালাজ করছিলেন। তাঁর সেই রাগের কারণ নতুন ভৃত্য রিকার্ডোর টিকি দেখা যাচ্ছিল না। গিউস্তিনা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, সেই যে সে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারকে ধরে আনতে গেলো, তারপর থেকে তার আর কোনো পাত্তা নেই। কিন্তু ডাচেস তার কোনো কথাই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। কোনো লোক হঠাৎ এভাবে উধাও হতে পারে না—সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি।

'তবু', বলল গিউস্তিনা, সে তার মিস্ট্রেসের চিন্তার প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করে মনে মনে বেশ মজা উপভোগ করছিল। 'আমরা তার খোঁজে সারা বাড়ি চষে বেরিয়েছি, কিন্তু কোথাও তার হদিশ পাইনি।'

'কিন্তু তুমি ঠিক জানো, কোথায় সে আছে', ডাচেসের কথায় সন্দেহ প্রকাশ পায়। ক্ষোভ আর ঈর্ষায় ডাচেস যথেষ্ট সতর্ক। এক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি আবার চিৎকার করে বলতে থাকেন, তার মিথ্যে বলার অভ্যাস যে আছে তিনি জানেন, তাই তিনি তার কথা একেবারেই বিশ্বাস করেন না। তিনি তাকে সতর্ক করে দিলেন, সে যেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা না করে। কথা না শুনলে তাকে এবং তার প্রেমিককে তিনি গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবেন। রাগে ফুলতে ফুলতে

ডাচেস তাঁর ঈর্ষা প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করলেন না, 'তাছাড়া তুমি যেন ভেবো না, তোমার ঐ কুকুরের মতো মুখ দেখে রিকার্ডোর মতো যুবক আকর্ষণবোধ করবে!'

ডাচেসের ছেলেমানুষি রাগ দেখে হাসির পেলো গিউস্তিনার। গিউস্তিনা তখন বেশ ভালোই করেই জেনে গেছে, আগেই সে সেবাস্টিয়ানোর মন জয় করে বসে আছে। আর সেই কারণেই সেবাস্টিয়ানোর প্রতি ডাচেসের প্রবল আকর্ষণ লক্ষ্য করেই সে উধাও হয়ে গেছে। ডাচেস তার পরিচারিকার মুখে হাসি দেখে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন; সেই সময় ফয়স্তা ঘরে ঢুকে তাঁকে খবর দিলো, টেরেসোর অনুগ্রহ লাভ করেছে সে, সেই সুখবরটা শুনেও হঠাৎ গিউস্তিনার মুখে পরপর দু'বার চড় কষিয়ে দিলেন তিনি। তারপর তেমনি উত্তেজিত অবস্থায় তিনি আবার ফয়স্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, টেরেসোর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার কি রকম হলো, এবং নিজেই নিজের থেকে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন তিনি, একজন নিরীহ মেয়ের উপর অমন রূঢ় ব্যবহার করা উচিত হয়নি।

'খুব ভালো করেছেন', বলল ফয়স্তা। তারপর সে কৌশলে বুদ্ধি খাটিয়ে কি ভাবে সে টেরেসোর সঙ্গে মোকাবিলা করেছে বলল ফয়স্তা। কিন্তু ডাচেস তার কথাগুলো শুনছিলেন না। তিনি তখন তাঁর বুকে একটা হাত চেপে ধরে তাঁর উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করছিলেন। ফয়স্তা যে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে, এক সময় সেটা মনে হতেই তিনি জোর করে হাসার চেষ্টা করলেন, মাথা নেড়ে তার কাজে সায় দিলেন। তাঁর কামোচ্ছ্বাস এবং ঈর্ষা এমন এক চরমে পৌঁচেছিল যে, তার ওপর মেয়েটির হাসি এবং সেবাস্টিয়ানোর উধাও হয়ে যাওয়ার চিন্তার মধ্যে পড়ে তিনি তখন এমনি দিশেহারা যে, কথা বলার কিংবা চিন্তা করার সামর্থ তাঁর ছিল না। যাই হোক, কোন রকমে নিজেকে সংযত করে তিনি বললেন, টেরেসোর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেওয়ার আগে ফয়স্তা যেভাবে কাগজটা তাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে, রীতিমতো প্রশংসনীয়। টেরেসো তার নিজের খেয়ালে চলতে অভ্যস্ত, আর ফয়স্তা যদি আগেই টেরেসোর লালসার শিকার হতো, তাহলে তার ভাইকে কন্ট্রাক্ট পেতে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করে থাকতে হতো। টেরেসোর চরিত্র জানতে তার বাকী নেই। ডাচেস আবার নিজের চিন্তায় বিভোর হলেন, গিউস্তিনা এবং তাঁর সুপুরুষ ভৃত্যের চিন্তা করলেন তিনি। তাঁর মুখটা বিরক্তিতে ভরে গিয়েছিল। তবে তাঁর রাগটা যেন একটু প্রশমিত হতে দেখা গেল। রূপোর ঘন্টাটা হাতে তুলে নিয়ে তিনি প্রচণ্ড জোরে বাজালেন কয়েকবার। আবার ঘরে এসে ঢুকল গিউস্তিনা। তখন তার চোখ দুটি জলসিক্ত, তাকে তাঁর চুল আঁচড়ে দেওয়ার জন্য বললেন তিনি।

'সর্বোপরি', আয়নায় নিজের স্বাভাবিক প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, 'তাকে তোষামোদ করতেই হবে তোমাকে, মনে রেখো। অত্যন্ত দাম্ভিক লোক সে!'

"ময়ূরের মতো দাম্ভিক যাকে বলে', বলল ফয়স্তা। টেরেসোর সঙ্গে তার ব্যবহারের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফয়স্তা বলে, কি করে যে টেরেসোর একটা হাত তার বুকে চেপে ধরেছিল, তাকে বোঝাতে চেয়েছিল, তার হুমকিতে কি রকম ভীত হয়ে পড়েছিল সে তখন। 'আরো মজার ব্যাপার হলো', হাসতে হাসতে বলল ফয়স্তা, 'সেই সময় আমাব বুক একটুও কাঁপেনি, আমি তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলাম।....কিন্তু সেটা সে লক্ষ্য করেনি ; আসলে সে তখন নিজের বুকের ধড়ফড়ানিতে অতি মাত্রায় চিন্তিত ছিলো।.......এলার্ম বেলের মতো দ্রুত ছিলো নাড়ির গতি তখন।'

ডাচেস হাসলেন তার কথা শুনে। গিউস্তিনা যতক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকবে রিকার্ডোর সঙ্গ সে পাবে না, কথাটা ভেবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন তিনি। তিনি এখন এতই খুশি যে, একটু আগের সব রাগ, ক্ষোভ ভুলে গিয়ে একটা বড় পাউডারের বাক্স ড্রেসিং টেবিল থেকে নিয়ে গিউস্তিনাকে দিয়ে বললেন রেখে দেওয়ার জন্য। তার গায়ের কালো রঙ উজ্জ্বল করার জন্য সেই পাউডার খুব কাজে লাগবে, বললেন তিনি তাকে। তারপর ফয়স্তার দিকে ফিরে তিনি তাকে উপদেশ দিলেন, সে যেন অতি মাত্রায় খুশি হয়ে বিভোর না হয়ে পড়ে। কারণ, সেদিন সন্ধ্যার পার্টির সব সাফল্য নির্ভর করছে তার ব্যবহারের উপর। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফয়স্তা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল, সুইমিং পুলে যাচ্ছে সে।

❑ সতেরো ❑

সেবাস্টিয়ানো এবং টেরেসোর সঙ্গে ফযস্তার ভালবাসার সম্পর্ক ছাড়াও আরো এক জনের সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল সে। আগন্তুক সে, এবং অন্য দু'জনের থেকে তার ব্যাপারটা ছিলো আরো বেশী নাটকীয়, গল্প উপন্যাসের থেকেও রোমাঞ্চকর। ফয়স্তা ছিলো স্বাধীনচেতা মহিলা, তার সেই আদর্শ সৎপথে কাজে লাগাতে না পেরে সে তখন তার পথের কাঁটা কৌশলে এড়ানোর জন্য গোপন ষড়যন্ত্রের কাজে লেগে পড়ল। তার চিন্তাধারায় একটা প্রেমের সম্পর্ক আগের প্রেমের ব্যাপারটা বাতিল করাটা তেমন কঠিন বলে মনে হয় না। এক সঙ্গে বহুপুরুষের মনোরঞ্জন করতে অভ্যস্ত সে—যে সব পুরুষ তার সঙ্গ পেতে পাগল

সে তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রেমের অভিনয় করে যায় অনায়াসে, তারা তাকে মুহূর্তের জন্য পেয়ে নিজেকে ধন্য বলে মনে করে, কখনো তাদের মনেও হয় না, তারা তাদের শেষ প্রেমিক নয়, ফয়স্তার প্রেমের আসরে শেষ. প্রেমিক নয় সে। ফয়স্তার ষড়যন্ত্রের কথা তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না। ফয়স্তা তার আগের দু'জন প্রেমিকের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তার তৃতীয় ষড়যন্ত্রের সাথী হিসাবে একজন ভৃত্যকে নির্বাচন করতে একটুও দ্বিধা করল না। ডরোটো তার নাম—বেঁটে হলেও বলিষ্ঠ চেহারা তার—লাল কোঁকড়ানো চুল—ছাগলের মতো তার অবয়ব, তার কাজ ছিলো গলফ্ ক্লাসের তত্বাবধান করা। তার সঙ্গে প্রথম আলাপে তাকে অবিশ্বাস্যভাবে রূঢ় কথা বলতে দেখে দারুণ খুশি হয়েছিল ফয়স্তা। সে তাকে গলফ্ খেলার প্র্যাক্টিসে তার সাথী হতে বলে। তখন তারা দুজনে পাহাড়ের ঝোপঝাড়ের মধ্যে চলে যায়। সন্ধ্যার আগে ফেরেনি তারা। সেই দিনই প্রথম সত্যিকারের মিলনের এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে ফয়স্তা—সে এক আলাদা অনুভূতি যেন। একজন পুরুষের নির্দয়ভাবে দৈহিক অত্যাচার এমন কি হত্যার হুমকি থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গ, তার স্পর্শ যে এত মধুর হতে পারে সেই প্রথম বুঝতে পারল সে, এবং এর থেকেই তার মনে হয়েছিল, শয্যাসঙ্গী হিসেবে একজন নির্দয়, নিষ্ঠুর পুরুষই মেয়েদের কাম্য হওয়া উচিত। ডরোটোর বয়স আঠারো, তার নিষ্ঠুর ব্যবহার তাকে দারুণ দৈহিক সুখ দিলো। শিকারের চোখে সরাসরি দৃষ্টি রেখে আঘাত করার মতো পুরুষ সে। রান্নাঘরে নির্বিবাদে মুরগি এবং পাখীদের ধড় থেকে মুণ্ডু বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, তার হাত একটুও কাঁপে না। সেবাস্টিয়ানোর আন্তরিক প্রেম এবং টেরেসোর তোষামোদি ভালবাসার তুলনায় সেই লাল চুলের নিষ্ঠুর ডরোটোর কাছ থেকে সম্পূর্ণ এক নতুন রোমাঞ্চের স্বাদ পেলো ফয়স্তা।

ডাচেসের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত পা চালালা সে গলফ্ ক্লাবের দিকে। দেরী হয়ে গেছে, তাই এক রকম ছুটেই চলল সে ডরোটোর খোঁজে। দেখা হলে সে তাকে বলবে, তার দিনের কার্যসূচী বদল করার জন্য। সেদিন দুপুরে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা আগেই ভেবে রেখেছিল সে। তারপর সেখান থেকে সে ফিরে যাবে টেরেসোর কাছে, তাকে পার্কটা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল সে। যাইহোক, টেরেসোর কথা মুলতুবি রেখে সে এখন দুপুরে ডরোটোর সঙ্গে কাটানোর জন্য দারুণ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সেবাস্টিয়ানোর সত্যিকারের ভালবাসায় সাড়া দিতে গিয়ে কিংবা টেরেসোকে তার আকাঙ্খা মতো তার দেহ উপহার দিতে গিয়ে যেভাবে হাঁটত সে তার থেকেও অনেক বেশী জোরে এরকম লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছিল সে এখন। তার সেই দুরন্ত দৌড়ের শেষে ডরোটো নয়, সেবাস্টিয়ানোর ভালবাসা এবং তাকে ক্ষমতার বন্ধনে টেরেসোর বেঁধে রাখার প্রয়াস ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে মুক্ত হওয়ার হাতছানি অপেক্ষা করছিল সেখানে।

এই সময় গলফ্ কোর্সের প্যাভেলিয়ানে ডরোটোকে দেখতে পাওয়া যায়। গাছের ডালপালার ছাউনি দেওয়া কুঁড়েঘর। অস্ট্রেলিয়ার গ্রাম্য কুটিরের আদলে তৈরী কুঁড়েঘর। হাঁপাতে হাঁপাতে ডরোটোর ঘরের দরজার সামনে এসে বুকে হাত চেপে থমকে দাঁড়াল ফয়স্তা। ডরোটো তখন এক কোণায় একটা টেবিলের সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল।

ফয়স্তার যা স্বভাব, তার সঙ্গে টেরেসো কিংবা সেবাস্টিয়ানোর সঙ্গে খাপ খাওয়ার কথা নয়, সেদিক থেকে ডরোটো যেন তার অনেক কাছের, অনেক বেশী আপনজন বলে মনে হয় তার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডরোটোর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারে না, যা বলে তাও যে কৃত্রিম, মাপামাপা কণ্ঠস্বরে। শুধু তাই নয়, সে যে কাউণ্টেস সানচেজ, তাঁর যে একটা বংশ মর্যদা আছে, এ কথা কখনোই সে ভোলে না। তবু এ সবের মধ্যেও, ডরোটো এবং তার মধ্যে বংশ মর্যাদা, চারিত্রিক গুণের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি ফয়স্তার আকর্ষণের প্রধান কারণ হলো, সব সময় তার ইচ্ছে হলো নতুন স্বাদ গ্রহণ, নিজেকে সব সময় একজন চমৎকার মহিলা হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করে থাকে সে। ভালো অলঙ্কার তৈরীর জন্য যেমন সোনায় খাদ মেশাতে হয়, ফয়স্তার ধারণা তার থেকে নিচুস্তরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করলে নিজেকে আরো খাঁটি বলে জাহির করতে পারবে সে ; অর্থাৎ মর্যাদার মধ্যে যতো বেশী পার্থক্য থাকবে, ততো বেশী রোমাঞ্চ অনুভব করা যায়। সম্ভব হলে রাতে নিচু গলায় আঁটো পোশাক পরে ডরোটোর সঙ্গেও দেখা করতে পারে সে। তার মতে রুক্ষ স্বভাবের ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা অনেক রুচিকর।

তবে তার অনুগ্রহ পেয়ে ডরোটোকে যে খোশামোদ করা হচ্ছে, ফয়স্তার এই ধারণাই তাকে প্রতারিত করেছে। তাকে ক্রীতদাস ভাবাটাও ভুল, কারণ এই ডরোটোকেই গোপনে রাণী দেহ দান করে থাকে। শুধু সে এবং রাণীই নয়, ভিলায় আরো দু'জন অতিথির সঙ্গে ডরোটোর অবৈধ সম্পর্ক আছে। তারা দুজনেই সম্মানিত মহিলা। ফয়স্তা ভাবছে, সে বুঝি একা তার প্রেমিকা, না, তার এই ধারণাটা একেবারেই ভুল। ওদিকে ডরোটোর ধারণা শুধু নয় তার একান্ত বিশ্বাস, ভৃত্যদের মধ্যে প্রেমিক নির্বাচন করাটা এই সব অভিজাত মহিলাদের কাছে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও তার কাছে কৌতূহলজনক, সম্ভবত রহস্যজনক বলা যেতে পারে। এমনকি সেটা চিন্তারও বিষয়। তাছাড়া ফয়স্তা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করে, সে ডরোটোকে তার প্রেমিক হিসেবে নির্বাচিত করেছে ; অথচ আগের মরুশুমে ডরোটোই প্রথম দর্শনে তার প্রেমে পড়ে যায়, তাকে প্রলোভিত করে, এবং সেই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ফয়স্তাকে পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়ার জন্য আগ্রহী এখন।

অতএব এই মুহূর্তে সে যতোই মনে করে থাকুক না কেন, এটা তার ষড়যন্ত্র, এই তার মুক্তি পাওয়ার পথ, ভুল করবে সে, কারণ ইতিমধ্যে সে নিজেই তার ক্রীতদাসী বনে গেছে।

ডরোটোর কাছে গিয়ে তখনো সে হাঁপাতে হাঁপাতেই জিজ্ঞেস করল, কি করছে সে। তার দিকে না ফিরেই সে জবাব দেয়, নিজেই সে দেখতে পারে—একটা ছিপ।

'ছিপ! কিন্তু কিসের জন্য?' জিজ্ঞেস করল ফয়স্তা।

তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে বলল ডরোটো, নদীতে মাছ ধরার জন্য।

'নদীতে? ফয়স্তা বলে, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'হ্যাঁ, মাছ ধরতে।' তারপর কাপবোর্ড থেকে গুলতি বার করে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে থাকল ডরোটো। গুলতিটা ফয়স্তাকে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করে সে, পাখী শিকার করতে যাবে সে।

'তুমি একটা দানব!' চিৎকার করে উঠল ফয়স্তা। 'বেচারা ঐ নিরীহ পাখীগুলোকে তুমি....' সঙ্গে সঙ্গে সে আবার একথাও ভাবল, এই ভিলায় কোনো অতিথি যদি ডবল-ব্যারেলের বন্দুক দেখিয়ে যদি বলত, সেটা সে তিতির পাখী শিকার করার জন্য ব্যহার করবে, সেকি তাকে অমন কঠোর কথা শোনাতে পারতো? যাই হোক, সে নিজেও ভাল বন্দুক চালাতে পারে।

যাই হোক, তার কথায় কান না দিয়ে এবং তার উপস্থিতি অস্বীকার করে বাইরে চলে গেলো। তারপর একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে তার হাতের গুলতিতে সেটা লাগাল। ফয়স্তা স্থির হয়ে দেখল দৃশ্যটা। গুলতির পাথরটা তার হাতের গুলতি থেকে ছুটে গিয়ে একটা পায়রার মাথায় বিঁধতেই ছাদের উপর থেকে সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার মাথাটা ভেঙ্গে গেছে, রক্ত ঝড়ছে। ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে সে আবার ডরোটোকে দানব বলে চিহ্নিত করল। কেন সে অমন একটা নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করতে গেলো? মাটি থেকে পাখীটা তুলে নিয়ে সামনের ঝোপঝাড়ের দিকে নিক্ষেপ করে ডরোটো বলল যে, গুলতিটা পরীক্ষা করে দেখছিল সে।

যাইহোক ডরোটো তার উপস্থিতি অস্বীকার করার ভান করতে দারুণ অস্বস্তিবোধ করল সে। এরকম অভদ্র ব্যবহারের প্রতিবাদ করাতে বলল, খুবই ব্যস্ত সে, তাকে দেখার মতো অবসর তার নেই। এই হলো প্রেমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক—যারা প্রেম ভালবাসার মধ্যে একটা মিষ্টি সম্পর্ক আশা করে থাকে, তাদের কাছে এটা অদ্ভুত লাগারই কথা। ডরোটোর এ ধরনের রূঢ় ব্যবহার করার কারণ হলো, তার বিশ্বাস, এ ধরনের সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার ফয়স্তার কাম্য, তার প্রিয়—অন্য দিকে ফয়স্তাও বিশ্বাস করে, ডরোটোও তার বিশ্বাসে বিশ্বাসী। তারা দুজনে এমন এক খেলায় মেতে উঠেছিল সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে সেটার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।

তাকে অপমান এবং প্ররোচিত করতে ভালবাসে ফয়স্তা। তাকে তার কুঁড়েঘরে ঢুকে মাটির উপর বসে পড়তে দেখে খেলার ছলে তাকে বলল, সে একজন বর্বর, অসভ্য। কোনো মহিলা তার ঘরে এলে তার উঠে দাঁড়ানো উচিত। সেই ভদ্রতাটুকুও তার জানা নেই। ডরোটো তার গুলতির বাঁধন আঁটো করতে গিয়ে বলে, যে যদি তাকে পছন্দ না করে, তার চলে যাওয়ার স্বাধীনতা আছে, যাইহোক, তার আরো অনেক সঙ্গী আছে। তাতেও দমল না ফয়স্তা। বরং তার কাছে এসে পিছন থেকে তার লাল কোঁকড়ান চুলে আঙুল বোলাতে থাকল। তার নোংরা চুল ঘাঁটতে ভাল লাগে ফয়স্তার। কিন্তু ডরোটো মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে বলে, সময় নষ্ট করতে চায় না সে, ফয়স্তা চলে যেতে পারে। ফয়স্তা তার অমন রূঢ় ব্যবহার দেখে উদ্বিগ্ন, কারণ জানতে চাইল। উত্তরে ডরোটো বলে, কারণটা সে ভালভাবেই জানে।

কিন্তু তাব মুখ থেকেই কারণটা জানতে চাইল ফয়স্তা। সেদিন দুপুরে কথা দিয়ে তার কাছে আসতে না পারার জন্য ক্ষমা চাইল ফয়স্তা। তার কথা খেলাপের কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বলল সে, নামী-দামী জেনারেল টেরেসোর জন্য সে তার কাছে আসতে পারেনি, যদিও তার সঙ্গ খুবই বিরক্তিকর বলে মনে হয়েছিল।

'না, না,' মাথা নেড়ে ডরোটো বলে ওঠে, 'সেটা কোনো কারণ নয়।' এবার ফয়স্তা তাকে বলে আজ বিকেলে রোজকার অভ্যাস মতো সেই ব্যাপারে তার জন্য অপেক্ষা করবে সে—সুইস হাটের সামনে—মধ্যাহ্নভোজের পর। ঠিক আছে, বলল ডরোটো এবং তার ভাল মধ্যাহ্নভোজের কামনা করল সে।

'তাহলে এখন বলো, ব্যাপার কি তোমার?' মিনতির সুরে ফয়স্তা বলে, 'তোমার রাগের কারণ আমাকে বলতেই হবে।' কিন্তু সে যখন তার মাথাটা সজোরে ঘুরিয়ে নিল, তার নীল চোখে আগুনের ঝিলিক দেখে ভয়ে আঁতকে উঠে দ্রুত তাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল ফয়স্তা।

'যাও, চলে যাও আমার কাছে থেকে,' খিঁচিয়ে উঠল ডরোটো।

'শোনো দানব, ঐ নিরীহ পাখীগুলোকে হত্যা করো না,' কথাটা পুনরাবৃত্তি করেই তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ফয়স্তা।

❑ আঠারো ❑

ধীরে ধীরে নিজের আত্ম-সম্মান বজায় রেখে ফয়স্তা এখন পার্কের অন্য আরেক প্রান্তের দিকে হেঁটে চলল।

মধ্যাহ্নভোজে যোগ দিতে সব অতিথিরাই হাজির তখন। ফয়স্তাই সব শেষে

গিয়ে হাজির হলো সেখানে! তাকে দেখে সবাই খুশিতে উপচে পড়ল। সবাইকে পাল্টা অভিবাদন জানিয়ে মূল টেবিলে গিয়ে বসল ফয়স্তা। তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ডাচেস সেখানে। টেরেসোর সেক্রেটারিও ছিলো সেখানে।

সন্ধ্যায় পার্কটা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য টেরোসোকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ফয়স্তা। তার সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলো টেরেসো। সমস্যাটা জটিল হয়ে দাঁড়াল তার কাছে। এই কারণে যে তার কাছ থেকে ফয়স্তার চাহিদার কথা জানতে পেরে সময়ের পরিবর্তন করতে চাইল টেরেসো—সন্ধ্যায় নয় বিকেলে। ওদিকে বিকেলে ডরোটোর কাছে যাবে বলে কথা দিয়েছে সে। একই সময়ে দু'জনকে সঙ্গ দেয় কি করে সে? মধ্যাহ্নভোজের সারাটা সময় এই চিন্তায় বিভোর হয়ে রইল ফয়স্তা। ঘুরে ফিরে টেরেসো তার সঙ্গে সেই একই আলোচনায় ফিরে আসছিল, আর তাকে সমর্থন করছিলেন ডাচেস। টেরেসোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি করে? এখন ভাবছে ফয়স্তা। ফয়স্তার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, ডরোটো এবং টেরেসোর মধ্যে টেরেসোর জন্যই তার ত্যাগ স্বীকার করা উচিত তিনটি ভাল কারণে। প্রথম কারণ হলো ডরোটোর রূঢ় ব্যবহার এবং তার সঙ্গে কেন যে এমন রূঢ় ব্যবহার সে করেছে, সেটা আগে জানা দরকার। দ্বিতীয় কারণ ডরোটোর সঙ্গে দানবীয় মিলন, মনে হয় সে যেন কোনো এক জানোয়ারের সঙ্গে মিলনে প্রবৃত্তি হয়েছে, দেহ তৃপ্ত হলেও মন তার কখনো ভরে না। তৃতীয়ত, সে যদি টেরেসোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় তাহলে তার জন্য ফয়স্তাকে খুব বেশী সেক্স অপচয় করতে হবে না। কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে, এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ডাচেস জানিয়েছেন টেরেসোর সঙ্গে স্বভাববিরুদ্ধ কোনো কাজ না করার জন্য সতর্ক হতে।

মধ্যাহ্নভোজের পর কেউ কেউ বিশ্রাম নিতে চলে গেলো, কেউ বা পার্কে বেড়াতে চলে গেলো ; অল্প কিছুক্ষন পরে ফয়স্তা এবং টেরেসোও বেরিয়ে পড়ল। তাকে এড়ানোর চিন্তা ফয়স্তা এখন মনে আনতে পারে না। তারা একটা আঙ্গুর গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। অনর্গল কথা বলার ফাঁকে একটা নিচু ডাল থেকে একটা কালো আঙুর তুলে নিয়ে জেনারেলের মুখের ভেতরে পুরে দিলো। ওদিকে টেরেসো তখনো ভাবছিল, তার সঙ্গে ফয়স্তার সম্পর্ক শুধু টাকার, ভাড়াটে প্রেমিক, অর্থের বিনিময়ে সে তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে থাকে। কিন্তু মেয়েটির প্রতি তার দুর্বলতা থাকার জন্য স্বভাবতই তার মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হতে দেখা গেলো না। আগের মতোই সুন্দরী ফয়স্তার প্রতি তার আকর্ষণ তীব্র হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে তাকে একান্তে পাওয়ার জন্য তার মনটা ছটফট করে উঠল। সে যেমনি নারী হোক না কেন, টেরেসো ভাবল, ফয়স্তা তাকে ভালবাসে, এটাই যথেষ্ট তার কাছে। তাই মানুষের স্বাভাবিক স্বভাবজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জয়ের উল্লাসে বিভোর হয়ে

উঠল সে। কিন্তু সে তার স্বাভাবিক অভ্যাস মতো—সে কিছু মনে করল না বটে—তবে সত্যি কথা বলতে কি নিজেকে প্রতারিত না করার জন্যই কিনা কে জানে কিছুই সে জিজ্ঞেস করল না ফয়স্তাকে।

টেরেসোর মনের অবস্থা এখন একদিকে উল্লাস, অপর দিকে হতাশায় ভরা। তার মনে পড়ল, গৃহযুদ্ধ থেকে দেশকে রক্ষা করেছে সে এবং সব থেকে শক্তিশালী লোক সে তার দেশের, সম্ভবত সারা বিশ্বেরও। তবু তা সত্ত্বেও তার স্থান এখন একজন অপদার্থ মহিলার পায়ের নিচে। সে এখন সব কিছুর শূন্যতা এবং অসাফল্যের কথা চিন্তা করছিল—চিন্তা করছিল তার ক্ষমতা এবং ভালবাসার নীটফলের কথা। সব মিলিয়ে তার কাছে ফয়স্তার ভালবাসার মূল্য অনেক বলে মনে হলো। সে এখন চায়, ফয়স্তাও তার মতো তাকে ভালবাসতে শিখুক। অনেক কষ্টকর ভূমিকা করে অবশেষে সে তাকে বলতে শুরু করল, ফয়স্তা যেন তাকে দেশের প্রধান হিসেবে না দেখে স্রেফ একজন মানুষ মনে করে তাকে, স্রেফ একজন মানুষ—একজন সত্যিকারের প্রেমিক—

'আহ্ হ্যাঁ,' অস্ফুটে বলল ফয়স্তা।

টেরেসোর রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা, কথাবার্তার মধ্যে যেমন একটা দৃঢ়তার সাক্ষর থাকে, এই মুহূর্তে ফয়স্তার প্রতি তার ভালবাসার অঙ্গীকার শপথেরই নামান্তর। অনুরূপ ভাবে সে চায়, দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তার দেশবাসী যেমন তাকে ভালবেসে এসেছে, ফয়স্তাও তাকে ভালবাসুক। তাকে ভালবাসতে গিয়ে এর আগে বহুবার তার জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। জনতা এবং তার মধ্যে এখন যে একটা দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, তার হিসেব করতে গিয়ে টেরেসোর ধারণা, তার এবং ফয়স্তার মধ্যে তুলনায় সে দূরত্ব অনেক, অনেক কম। আর সেই আনন্দে, সেই উচ্ছ্বাসে ফয়স্তাকে বলতে ভুলে গেলো সে, তার সামনে এখন কি ভয়ঙ্কর বিপদের হুমকি, যে কোনো মুহূর্তে তার জীবনহানি হতে পারে। সাংবাদিকদের মতো তার কলম তেমন শক্তিশালী না হলেও কিন্তু সে জানে তার মুখের ভাষা অনেক বেশী কার্যকর হয়ে উঠতে পারে, অবশ্য ফয়স্তা যদি সেটা বোঝার মন নিয়ে শোনে।

ফয়স্তা তখন গাছ থেকে আঙুর পাড়তে মনোযোগী, তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো না, টেরেসোর কোনো কথাই তার কানে প্রবেশ করছিল। কিন্তু টেরেসো তখনো তাকে বলে চলে, তার জন্য কি না করেছে সে। অন্যমনস্ক ভাবে টেরেসোকে জিজ্ঞেস করে, কি বলতে চায় সে। ফয়স্তা ভাবল, হয়তো সে তার ভায়ের কন্ট্রাক্ট-এর প্রসঙ্গে আবার কিছু বলতে চাইছে।

'জানো ফয়স্তা, তোমার জন্য আমি এখন একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হতে চলেছি', হঠাৎ রাগে উত্তেজনায় বলে উঠল টেরেসো, 'এখানে, হ্যাঁ, এই ভিল্লায় কিছু লোক

এসেছে আমাকে খতম করার মতলব নিয়ে। তারা আমাকে হত্যা করতে চায়, তারা আমার কাজ ধ্বংস করে ফেলতে চায়.......'

টেরেসো ভেবেছিল, তার সেই আশঙ্কার কথা শুনে ফয়স্তা গাছ থেকে আঙুর সংগ্রহ করা থেকে বিরত হবে, এবং ভয়ে আতঙ্কে তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হবে। কিন্তু ফয়স্তার হাবভাব দেখে মনে হলো, তার কথা সে আদৌ শুনছিল না, এবং ভাবছিল, নেহাতই সন্দেহের বশে ভয় পাচ্ছে সে। উল্টে সে বলে, সে তো সবার প্রিয়, তাহলে তার জীবন-হানির আশঙ্কাই বা করছে কেন সে।

'ও হ্যাঁ, অবশ্যই আমাকে সবাই খুব ভালবাসে,' তাকে নিরুৎসাহ দেখে বিরক্ত হয়ে টেরেসো উত্তর দেয়, 'কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, কতকগুলো অন্ধ উগ্রবাদী, মূর্খ লোক কিংবা অপরাধীরা যদি তার জীবন হানির চেষ্টা করে, তাদের ভালবাসা দিয়ে ঠেকানো সম্ভব।'

টেরেসো তাকে বলতে যাচ্ছিল, দেখো, আমার প্রভূত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেমন করে আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কিন্তু সে কথা না বলে ফয়স্তার কাছে সে নিজেকে নির্ভীক সাহসী একজন পুরুষ হিসেবে জাহির করে বলে, তার বিশ্বাস, তাকে ভালবাসার জন্য হয়তো সে তার দেশের মানুষের কাছে আজ অপ্রিয় হয়ে উঠেছে ; তবে তার ভালবাসা যদি সাচ্চা হয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই ফিরে আবার তার দেশবাসীর মন জয় করতে পারবে, এই অনাকাঙ্খিত সমস্যার একটা সহজ সমাধান করতে পারে। তাছাড়া সে মনে করে, ফয়স্তার প্রতি তার প্রেমের একটা আলাদা কর্তৃত্ব আছে, যার জোরে কোনো বিপদকেই সে বিপজ্জনক বলে মনে করে না। কাপুরুষের মতো পালিয়ে না গিয়ে সে বরং জনগণের মুখোমুখি হয়ে তাদের সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধানের পথ খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে সে। আদৌ সে এসকালোনা যুদ্ধের বিজয়ী বীর টেরেসো, যুদ্ধক্ষেত্রে শক্ত হাতে শত্রু পক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো স্বদেশে দেশবাসীর সঙ্গে মোকাবিলা করা অনেক সহজ বলেই মনে করে। তবে এ ব্যাপারে ফয়স্তাকে সাহায্য করতে হবে, অবশ্যই সে যদি তাকে সত্যিকারের ভালবাসা দেখাতে চায়।

'জনগণ ভাবছে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমায় বয়স হয়েছে,' জেনারেল তার বক্তব্য শেষে বলে, 'কিন্তু তারা দেখবে, তাদের ধারণা কতো ভুল।' তার আন্তরিকতা, তার অতৃপ্ততা, মহত্ত্বের জন্য কিছু করে দেখানো, ভাবাবেগ—এ সব কিছুই এখন তারা সারা মন জুড়ে আলোড়িত। এর থেকেই তার ধারণা, ফয়স্তার সঙ্গে তার প্রেম ভালবাসা খাঁটি সত্য। একই সঙ্গে তার বুকটা ফুলে উঠল একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে—হ্যাঁ, পঁচিশ বছর আগের যুবকের মতো এখনো তার সাহস আছে, আর একবার সে যুদ্ধ করতে চায়—শত্রুপক্ষের সঙ্গে নয়, তার দেশের জনগণের

সঙ্গে, ফয়স্তার প্রতি তার প্রেম ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

টেরেসো ভাবল তার সেই আবেগ, উচ্ছ্বাস, নিষ্ঠা, আন্তরিকতার উদ্বুদ্ধ হয়ে ফয়স্তার মনে প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারল, কি ভুলই না সে করেছে। প্রথমেই ফয়স্তার মনে হলো, টেরেসো যতোটা তার বিপদের কথা ভাবছে, ঠিক ততোটা নয়, তার জন্য বেচারা টেরেসো যে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে একটু একটু করে, সে কথাও বিশ্বাস করে না ফয়স্তা। তার ধারণা, এটা স্রেফ তার মনের দুর্বলতা কিংবা অহেতুক ভয় বই কিছু নয়! ফয়স্তা ভীরু নয়, তবে তাই বলে এই নয় যে, জেনে শুনে টেরেসোর দুর্ভাগ্য এবং মৃত্যুব ভাগীদার হতে যাবে সে। হঠাৎ আঙুর ফল সংগ্রহ করা বন্ধ রেখে ফয়স্তা অভাবনীয় ভাবে জিজ্ঞেস করল, তাই যদি হয়, কেনই বা না এমন একটা বিপজ্জনক ভিলায় এখনো সে পড়ে রয়েছে। উত্তরে সে বলে, সে এখনো এখানে পড়ে রয়েছে স্রেফ তার প্রতি ভালবাসার জন্য। তাছাড়া, এখানে একটু থেমে ফয়স্তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে হতাশ হলো তার নিরুত্তাপ মুখের ভাব দেখে, আহত মন নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করল, তাছাড়া প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে ফেলেছে পুলিশ, আর তারা তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করার আগেই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে ফেলবে। এই আশা নিয়ে এখনো সে এখানে অপেক্ষা করে বসে আছে এই ভিলায়। কেউ জানতে পারবে না ষড়যন্ত্রকারীদের উচ্ছেদ করার ঘটনার কথা, আর ফয়স্তারও ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। ফয়স্তা দেখল, অহেতুক সে নিজের ক্ষতির আশঙ্কা করছিল। এখন তার মনে হচ্ছে, সত্যিই তো, সে তো নিরাপদেই আছে। কথাটা তার বোধগম্য হওয়া মাত্র টেরেসোকে বলে সে, টেরেসোর প্রাণের আশঙ্কা নেই বলেই তো তার কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই। যাইহোক, আজ সন্ধ্যার ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি সফল করার দিকে এখন তাদের মনোনিবেশ করা উচিত।

ফয়স্তার কথা শুনে উৎসাহ বোধ করল টেরেসো। কয়েক মিনিট ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে নীরব রইল সে। এক সময় সেই ভাবাবেগটা অন্তর্নিহিত হলে সে বুঝতে পারল, তার ধারণা ভুল, এতদিন সে ভেবে এসেছিল, সে বুঝি ফয়স্তার মনে তার ভালবাসা জাগাতে পারেনি, কিন্তু এখন সে উপলব্ধি করতে পারছে, তার ধারণা ভুল। একটু আগের ফয়স্তার কথাগুলো তার মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলেছে।

'আমি সব সময় তোমার পাশেই থাকতে চাই,' হঠাৎ বলে উঠল ফয়স্তা, 'যতো বেশী সম্ভব। ভাবছি, সকলের সঙ্গে নৈশভোজে না বসে কেবল তুমি আর আমি দু'জনে এক সঙ্গে সেটা সারলে কেমন হয়, আর সেটা তোমার ঘরে, তোমার কি মত? আর সেই ভাবে, ফয়স্তা তার বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে বলে, 'যদি আক্রমণ

হয়, তাহলে না হয় আমরা দুজনে এক সঙ্গে মৃত্যুবরণ করব। সেই হবে আমাদের সুখের মরণ, আমাদের সত্যিকারের প্রেমের একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চিরদিন।'

জেনারেলের কানে কথাগুলো মধুর মতো বর্ষিত হলো এবং তার মনে আবার আশার সঞ্চার হলো। তার স্পর্শকাতর মন আবার এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে গেল। তার একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, সত্যি কি সে তার প্রতি ভালবাসার স্বাক্ষর রাখার জন্য ফয়স্তা তার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে চায়? কিন্তু তার স্বাভাবিক লজ্জা তাকে সেই প্রশ্ন থেকে বিরত করল। তার বদলে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার হাতে চুমু খেলো।

'আমি আমার ফ্যান্সি পোশাকে তোমার ঘরে আসব।' বলল ফয়স্তা, 'মনে থাকবে তো? বেচারী সেই চিমনি সাফাইকারিণী আসবে বুরুশ আর বালতি হাতে নিয়ে।'

টেরেসো উত্তরে বলে, হ্যাঁ, অধৈর্য হয়ে সেই চিমনি সাফাইকারিণীর জন্য অপেক্ষা করবে। ফয়স্তার আগের নিরুত্তাপ কথার কথা সে বেমালুম ভুলে গেল এবং এই মিথ্যে ও সম্ভাবনাহীন ভালবাসা সত্য বলে আঁকড়ে ধরে সে আবার নতুন করে নিজেকে প্রতারিত করার ব্যবস্থা করল।

টেরেসোকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করা সত্ত্বেও, এমন কি তার প্রতি টেরেসোর অকৃত্রিম ভালবাসার কথা জেনেও ডরোটোর সঙ্গে দিনের অবশিষ্ট সময় কাটানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করল না সে। টেরেসোর সঙ্গে তার ঘরে নৈশভোজ সারার প্রস্তাব করাতে হয়তো সে ভেবে থাকবে, তার প্রতি ভালোবাসা এবং গভীর অন্তরঙ্গতা দেখানোর জন্য বুঝি সে নিজের থেকে সেই প্রস্তাবটা করে থাকবে, না, আসলে টেরেসো যা ভাবছে তা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, বিকেলে টেরেসোর সঙ্গে পার্কে বেড়ানোর কর্মসূচী বাতিল করার জন্য সে তার কাছে এক নতুন লোভনীয় টোপ ফেলেছিল এবং সেটা হজমও করে ফেলেছে। এদিকে অনায়াসে বিকেলে ডরোটোর সঙ্গে মিলিত হতে পারছে।

ওদিকে টেরেসো তখন ফয়স্তার হঠাৎ সেই পরিবর্তন, তার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসার প্রদর্শন—এ সব নিয়ে চিন্তা করছিল গভীর ভাবে। সে আবার একথাও ভাবল, 'এটা ঠিক যে, এই ভদ্রমহিলা তার প্রতি আঙুল দেখিয়ে হয়তো মনে মনে হাসছে।' আর এই কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হলো, ফয়স্তার প্রতি তার সব ভালোবাসা বুঝি ঘৃণায় পর্যবসিত হয়ে গেলো। একবার সে ভাবল তাকে বলে, তার সম্পর্কে কি ধারণা তার। কিন্তু সেই লোভটা সম্বরণ করে টেরেসো ভাবল কিছু না বলে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলে বরং আখেরে তার বেশী লাভ হবে। সন্ধ্যায় তার হাতে যে সব প্রমাণপত্র আছে সেগুলো সঙ্গে নিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারলে সেটা হবে তার সব থেকে সাফল্যের উপযুক্ত

পুরস্কার। কিন্তু কিসেরই বা প্রমাণ? টেরেসো নিজেই জানে না। কিন্তু সে তার দীর্ঘ তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বাতাসে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ যেন পাচ্ছে। তবে তার এই নবলব্ধ অনুভূতির প্রকাশ হতে দেখা গেলো না তার মুখে। এদিকে তার কিছু কাজ তখনও বাকী ছিলো, সেগুলো মুলতুবি রাখতে চাইল না সে। টেরেসো তার সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠিয়ে সেই অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার কাজে মনোযোগ করল। তারপর সন্ধ্যায় মিলিত হবে সে ফয়স্তার সঙ্গে, তারপর...

ওদিকে ডরোটোর সঙ্গে বিকেলে মিলিত হওয়ার সমস্যাটা সহজভাবে সমাধান করতে পেরে, জেনারেলের মনে কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক না হওয়াতে মনে মনে খুব খুশি হয়ে হেমন্তের সূর্যস্নাত আঙুর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তার পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করে ফেলল মনে মনে।

ফয়স্তা চলে যাওয়ার পর টেরেসো আবার এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেলো। ফয়স্তার মিষ্টি হাসি, তার প্রতি তার ভালবাসার আশ্বাস, এ সবই কি অভিনয়, মিথ্যে, নিজেকে জিজ্ঞেস করল সে। কিন্তু সেই সোনালী রোদের আলোয় ফয়স্তার মিষ্টি চেহারা মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেলো তার মনে, সেখানে এখন কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, নেই অহেতুক চিন্তিত হওয়ার কারণ, ভাবল সে। তবে ফয়স্তা একটু আগে যা সব বলে গেলো, সেটা মিথ্যে কিনা জানার জন্য সে তার সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠাল ঘরে ফিরে এসে। সেক্রেটারি হাজির হতেই সে তাকে নির্দেশ দেয়, সারাটা বিকেল ফয়স্তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করার জন্য। এই সব সতর্কতা অবলম্বন করার পরেও টেরেসো এখন ভাবছে, তার সব সন্দেহই অমূলক, সত্য নয়, ফয়স্তা হয়তো সত্যি সত্যিই বিশ্রাম নিতে চলে গেছে তার ঘরে।

টেরেসোকে বিদায় দিয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে ডরোটোর কুঁড়েঘরের দিকে ছুটতে শুরু করল ফয়স্তা। এখন তার মনে হচ্ছে, এই যে ডরোটোর কাছে ছুটে যাওয়া তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার মধ্যে একটা আলাদা রোমাঞ্চ থাকলেও সে এবং ডরোটো যে আজ দিনের সর্বোচ্চ একটা ঝড় তুলতে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনে মনে ভয় পেলেও ফয়স্তা আবার এও ভাবল, তা হোক, সে মনে মনে চায়, এমন একটা ঝড় উঠুক, যাতে করে সেই ঝড়ের তাণ্ডবে তারা দু'জন এক সঙ্গে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। এই ছেলেটিকে সম্পূর্ণ করে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য আর কিই বা সে ভাবতে পারে? 'নিজে খুন হয়ে আমি আমার সব চাওয়া পাওয়ার অবসান করতে চাই আজ।' ডরোটোর কুঁড়ে ঘরের পথে পাহাড়ী সিঁড়ির ধাপগুলো গুণে গুণে উঠতে থাকার সময় ভাবল সে, 'ডরোটোর মতো একজন নিষ্ঠুর লোকের হাতে খুন হয়ে আমি নিজেকে শেষ করতে চাই। আমার

থেকেও সেটা হবে অনেক অনেক বেশী শক্তিশালী.....আমার জীবন থেকেও সেটা হবে অনেক, অনেক বেশী মহৎ এবং উদারতার পরিচয়......'

সে আশা করেছিল ডরোটোকে তার কুঁড়েঘরের ভেতরে দেখতে পাবে। কিন্তু তার বদলে তাকে সে বাইরে মাটির উপর আকাশের দিকে মুখ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে দেখল, তার দাঁতগুলোর ফাঁকে একটা ঘাসের টুকরো। নিঃশব্দে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে তার নাম ধরে ডাকল কয়েকবার, তাকে উঠে আসতে বলল—সে যে তার কাছে নিজেকে আজ বিলিয়ে দিতে এসেছে, সে কথাটাও তাকে সে জানিয়ে দিতে ভুলল না। কিন্তু ডরোটো এক চুলও নড়ল না তার যায়গা থেকে। ফয়স্তা তখন হাঁটু মুড়ে তার পাশে বসে তার লাল কোঁকড়ানো চুলের ভেতরে তার সরু আঙুলগুলো দিয়ে বিলি কাটতে থাকলো। তবু সে একটুও নড়ল না। বিরক্ত হয়ে বলল সে, আজ সে তার সঙ্গ পেতে চায় না সে ; সে যেখানে আছে, সেখানেই শুয়ে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঘুমোতে চায়। এর পরেও ফয়স্তা তার ইচ্ছে মতো যা খুশি করতে পারে। ডরোটোর এমন নিরুত্তাপ এবং নিস্তেজ ভাব ফয়স্তার কাছে নতুন মনে হলো। ফয়স্তা তখন রেগে গিয়ে তাকে 'নিষ্ঠুর' আখ্যা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, তার এমন অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ কি! ডরোটোর একটা উত্তর, তাকে শান্তিতে শুতে দিক সে।

'ঠিক আছে, কি হয়েছে আমাকে বলো', ফয়স্তা বলে।

ডরোটো তখনো আধ বোজা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। সেই অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞেস করল আগের দিন রাত্রে সুইমিংপুলের কাছে পার্কের একটা বেঞ্চে বসে কি করছিল সে। এখনো পর্যন্ত সে কখনো ঈর্ষাবোধ করেনি কারণ তার বিশ্বাস ছিলো, যখন কোনো মহিলা তার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে সঁপে দেয় তার দেহ মন দিয়ে, তার অর্থ হলো, অন্য আর কোনো পুরুষকে ভালবাসতে পারে না সে। কিন্তু গত রাত্রে পার্কের বেঞ্চে বসে ফয়স্তা এবং সেবাস্টিয়ানোকে আলিঙ্গন অবস্থায় চুমু খেতে দেখে তার জীবনে সেই প্রথম ঈর্ষান্বিত বোধ করে সে। আর ফয়স্তা এখন ভাবছে, ডরোটোকে মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই, টেরেসো কিংবা সেবাস্টিয়ানোকে মিথ্যে কথা বলা যায়, কারণ সে তাদের মন থেকে ভালবাসে, কিন্তু ডরোটো তার কাছে সম্পূর্ণ একটা আলাদা পুরুষ। তার নিষ্ঠুরতা যতো ভয়াবহই হোক না কেন, তার বলিষ্ঠ আলিঙ্গন, মিলনে তার নিষ্ঠুর আচরণই ফয়স্তার একান্ত কাম্য। ফয়স্তার মতে দৈহিক মিলনে সব পুরুষই নিষ্ঠুর আচরণ করুক, এমন একটা ধারণা বোধহয় সব মেয়েদেরই ইচ্ছে। তাকে মিথ্যে অজুহাত দেখালে হয়তো সে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, সেই কথা ভেবে সত্যি কথাটাই বলল ফয়স্তা, গত রাত্রে তার সঙ্গে যে পুরুষটিকে সে দেখেছিল, সে তার প্রেমিক।

ফয়স্তার মুখ থেকে সত্য কথাটা শোনা মাত্র উঠে দাঁড়াল ডরোটো। ফয়স্তার হাত ধরে তাকে টানতে টানতে তার কুঁড়েঘরের ভেতরে নিয়ে গেলো। তারপর সেখানে তাকে ঘরের একটা দেওয়ালে ঠেসে ধরে সে ক্রুদ্ধ স্বরে হুকুম করল একটু আগে সে যা বলল তার পুনরাবৃত্তি করার জন্য। কুঁড়েঘরের অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না ফয়স্তা, কিন্তু তার হাতের কঠিন বন্ধন দেখে সে উপলব্ধি করতে পারে, কি পরিমাণ ক্রোধ তার মনে জমা হয়েছে। তবু তা সত্ত্বেও তার সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে সে, তার একবার বলা কথা কখনো পুনরাবৃত্তি করে না সে। এমন কি ডরোটো যদি বধির হয়, তাহলেও নাচার সে।

'ওঃ, আমি তাহলে বধির, তুমি বলছো?' অন্ধ আক্রোশে ডরোটো তখন অদ্ভুত একটা কাজ করে বসলো কোনক্রমে ফয়স্তার দু'গালের উপর প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মেরে বসল। তার সেই নিষ্ঠুর আচরণে ভয় পাওয়ার বদলে ফয়স্তা তখন ভাবছিল, তাকে প্ররোচিত করবে কিনা। কারণ সে তখন মনে মনে চাইছিল, ডরোটো আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, আরো নিষ্ঠুর ভাবে তাকে আঘাত করুক, কারণ সে যত বেশী উত্তেজিত এবং নিষ্ঠুর হবে, মিলনে তার থেকেও বেশী সুখ অনুভূত হবে তার। তবে তার একবার ভয় হলো, যে ভাবে সে ঘুষি চালাচ্ছিল তাতে তার চোখ দুটো না অন্ধ হয়ে যায়। নিজের মনে সে স্বীকার করল, এখনো পর্যন্ত ডরোটোর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তাতে প্রাথমিক ভাবে এই রকম একটা বিস্ফোরণের প্রয়োজন ছিলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সে অনুভব করল, তার বিপদ এখন চরম পর্যায় এসে পৌঁচেছে।

তার ক্রমাগত অত্যাচারে হাঁফিয়ে উঠেছিল ফয়স্তা। তার হাত দু'টো তখনো ডরোটোর দৃঢ়-মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল। কোনো রকমে শ্বাস নিয়ে ফয়স্তা এবার তাকে অপমান করার জন্য গালিগালাজ করতে শুরু করল ঃ

'সম্ভবত তুমি হয়তো ভেবে থাকবে, আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই ভাবো না তুমি? কিন্তু আমার কাছে তুমি স্রেফ একটা চাকর মাত্র.........হয়তো সেটা তুমি ভুলে গেছ? অনেক ভৃত্যের মধ্যে তুমি স্রেফ একজন ভৃত্য মাত্র........ঘরের কাজকর্ম করাই তোমার কর্তব্য, বুঝলে? তোমার মতো যে কোনো ভৃত্যকে বিশ্বাস করতে আমার আপত্তি নেই। আমি তোমার সঙ্গে একটু মজা করছিলাম, এই আর কি.........আর তুমি যদি কোনো উল্টোপাল্টা কাজ করো, তবে ডাচেসকে বলে তোমাকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করবো, যাতে করে তিনি তোমাকে কুত্তার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেন। ক্রীতদাসের মতো আমি তোমাকে প্রহার করতে চাই.....,

ডরোটোকে খুশি মতো অপমান করতে পেরে ফয়স্তা অত্যন্ত খুশি হলো। আর

চোখে তার দিকে তাকাতে গিয়ে সে দেখল তার মুখটা আগের থেকে আরো বেশী হিংস্র হয়ে উঠেছে এবং দম নিচ্ছে নতুন করে তাকে আক্রমণ করার জন্য। ফয়স্তা তার কঠিন হাতের বন্ধন শিথিল করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু ব্যর্থ হলো। ডরোটো তখন নতুন উদ্যমে আরো বেশী নির্দয়ভাবে তার চোখে মুখে যেখানে পারল ঘুঁষি মারতে কসুর করল না। ফয়স্তা দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকার চেষ্টা করল। অবশেষে তারা দু'জন এক সঙ্গে ঘরের এক কোণায় জড়ো করা খড়ের গাদায় পড়ে গেলো। অন্ধকারে এলোপাথাড়ি ভাবে মারা ডরোটোর ঘুষি তার মুখের উপর বর্ষিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে চিৎকার, প্রচণ্ড উত্তেজনা, আকাঙ্খা এবং ভালবাসার প্রতি ঘৃণা।

ওদিকে সেই কুঁড়েঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে টেরেসোর এজেন্ট পলক-পতনহীন চোখে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে ভাবল, সে যা দেখল তা টেরেসোর কাছে রিপোর্ট দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাই সে ভিলায় ফিরে চলল অতঃপর।

❑ উনিশ ❑

অনিচ্ছাকৃত হলেও টেরেসোর এজেন্ট ছাড়াও আরো একজন ফয়স্তা এবং ডরেটোর ঝগড়ার দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইলো—সে সেবাস্টিয়ানো। হঠাৎ ফয়স্তার কঠোর, ঘৃণা মেশানো কথা শুনে সে ভাবল, সে বোধহয় তার মিস্ট্রেসের কণ্ঠস্বর স্বপ্নের ঘোরে শুনছে। রেগে গেলে যেমন করে তাকে বলত যে এক এক সময়। কিছুক্ষণ বিরতির পর তার কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেয়ে তার মনে হলো, না, এতো স্বপ্ন নয়, বাস্তব, সে আর ঘুমিয়ে নেই, সত্যি ফয়স্তা নিজেই কথা বলছে। একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কে উঠে বসল সে। তার বুকটা কেঁপে উঠল, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। দেওয়ালে কান দিয়ে পাশে কি ঘটছে, আন্দাজ করার চেষ্টা করল সে। অকথ্য গালিগালাজ, মারপিটের শব্দ তার কানে ভেসে আসছিল। কাঠের ঘর। দু'টি কাঠের টুকরোর মাঝখানের সামান্য একটু ফাঁকে চোখ রাখতেই দেখল নিচে মেঝের উপর কি ঘটছে। তাদের দু'জনের ঝগড়া সে দেখতে থাকল। ফয়স্তার মুখের উপর যেভাবে সে ঘুষি, চড় মারল, রাগের মাথায় সে কখনো এমন গর্হিত কাজ করেনি। এক সময় তারা দু'জনে ঝগড়া করতে করতে তার চোখের আড়াল হয়ে গেলো। কেবল ফয়স্তার মুখের উপর ডরোটোর চড়-চাপড়, ঘুষির আওয়াজ কানে ভেসে আসতেই চমকে উঠছিল সে। সেবাস্টিয়ানোর এখন ইচ্ছে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে তার

জ্ঞান যদি হারাত, খুব ভালো হতো, তাহলে তাকে ফয়স্তার কাতরোক্তি শুনতে হতো না। তাছাড়া একজন অন্য পুরুষের ঘরে এসেছে, সেই কথাটা ভেবেও তার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। তবে তাই বলে এই নয় যে, তার হিংসা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুতেই ভাবতে পারছিল না, তার এতদিনের প্রেম, ভালবাসা সব কি তাহলে মিথ্যে? তাদের চোখে দেখতে না পেলও তার কেবলি মনে হচ্ছিল, 'ঐখানে ফয়স্তা রয়েছে, ঠিক আমার নিচে.......অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে.:......ফয়স্তা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।'

কতক্ষণ যে হতাশ হয়ে পড়েছিল সেবাস্টিয়ানো জানে না। তার সেই চেতনাহীন মুহূর্তে মাঝে মাঝে ফয়স্তার দীর্ঘশ্বাস আর ডরোটোর হম্বিতম্বির শব্দ তার কানে ভেসে আসছিল, আর মনে মনে অবাক হয়ে ভাবছিল সে, এ কি করে সম্ভব? যাকে সে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিল, যাকে সে তার মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এসেছিল, সেই ফয়স্তা তার সঙ্গে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করল? সেবাস্টিয়ানো জানত না, তাকে এভাবে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে হবে কখনো। তার এই যন্ত্রণা, কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে তার মনে হয় না।

অবশেষে ফয়স্তা এবং ডরোটো কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের কণ্ঠস্বর ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেলো এক সময়। এবং এক সময় সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরও একেবারে মিলিয়ে গেলো অদূরে পার্কের আনাচে-কানাচে। আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে সে দেখল, দিনের আলো প্রায় স্তিমিত, একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। প্রায় আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল সে, এবং তার জাগরণ ভয়ঙ্কর এক ঘৃণার মধ্যে দিয়ে।

সে জানে না, এখন সে কি করবে, চিন্তা করার মতো সে মনও তার নেই এখন। একটা ভয়ঙ্কর বিস্ময় ও হতাশা তাকে পঙ্গু করে ফেলল, তার মনে হলো, তার জীবনের মূল্য বলতে এখন আর কিছু নেই। এখন তার মনে হচ্ছে, প্রতিটি মুহূর্ত সে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্খা বুঝি হারাতে বসেছে।

তার খুব খিদে পেয়েছিল। সুইমিং পুলের কাছে এসে তার মনে হলো, যে ভাবেই হোক, তাকে কিছু খাবারের সন্ধান করতে হবে। সুইমিং পুলের চারধার মরুভূমির মতো দেখাচ্ছিল, নির্জন, নিস্তব্ধ যায়গাটা। একটা বারে গিয়ে ঢুকলো সে—স্যাণ্ডউইচের একটা প্লেট তার সামনে রেখে গেলো ওয়েটার। কিন্তু খেতে গিয়ে তার দু'চোখ জলে ভরে গেলো, আর বুকের ভেতরটা এমনি হাহাকার করে উঠল যে দ্বিতীয়বার স্যান্ডউইচের টুকরো মুখে তুলতে গিয়ে তার হাতটা কেমন অবশ হয়ে এলো, খাওয়া তার হলো না আর। অর্ধেক খাওয়ার পর তার মনে হলো, তার আর খিদে নেই। বার থেকে বেরিয়ে এসে সে এবার ভিলার দিকে পা বাড়াল।

পার্কের সব যায়গা, সব বেঞ্চগুলো সেবাস্টিয়ানোর নখ-দর্পণে। কতদিন, হ্যাঁ, তার মনে পড়ছে কতদিন গভীর রাত্রে সে আর ফয়স্তা একটা বেঞ্চে বসে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিয়েছে। ফয়স্তা তার বুকে মাথা রেখে তাকে তার ভালবাসার কথা শুনিয়েছে, তাকে আশ্বাস দিয়েছে, সে তারই, এবং ভবিষ্যতেও তার হয়ে থাকবে চিরদিন। চলে আসার সময় ফয়স্তা তাকে বিদায় চুম্বন দিয়ে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন, এখন এই পার্কের প্রতিটি যায়গা, প্রতিটি বেঞ্চ যেন তার কাছে অশুভ বলে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে এখানকার সব কিছু যেন লুঠ হয়ে গেছে, যা গতকাল পর্যন্ত অটুট ছিলো, তার নিজস্ব ছিলো সব কিছু। এখন তার মনে হচ্ছে, এই পার্কের আকাশে বাতাসে ফয়স্তার প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছো। তার অতি আপনজন, তার প্রিয়তমা, তার মিস্ট্রেস ফয়স্তার হৃদয়ের মৃত্যু ঘটেছে একটু আগে ডরোটার কুঁড়ে ঘরে। অন্যমনস্ক ভাবে পকেটে হাত রাখতেই ফয়স্তার রুমালটা তার হাতে ঠেকল, যেটা সে আজ সকালে পার্ক থেকে সংগ্রহ করেছিল, এবং হঠাৎ তার মনের প্রচন্ড তাগিদে রুমালটা সে সামনের একটা ঝোপের মধ্যে নিক্ষেপ করল। তার মনে হলো ফয়স্তার রুমালটা তার কাছে রাখার প্রয়োজন এখন আর নেই। ফয়স্তার রুমালটা এখন তার কাছে স্মৃতি বলে আর মনে হলো না, এখন সেটার স্মৃতি যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারে ততই মঙ্গল বলে মনে হলো তার।

সে যখন ভিলায় এসে পৌছল, তখন দিনের শেষ আলোটুকুও নিভে গেছে, ভরে গেছে ঘন অন্ধকারে, কতকটা তার জীবনের মতো। তার জীবনের শেষ আশার আলোটুকু নিভে গেছে একটু আগে। এখন তাকে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে পথ চলতে হবে। ভৃত্যদের প্রবেশপথ দিয়ে সে গিয়ে বেসমেন্টে পৌছল। সেখানে তখন নৈশভোজের আয়োজন চলছিল পুরোদমে, দেখল সে। সেবাস্টিয়ানোর এখন কেবল একটাই ইচ্ছে, ফয়স্তাকে একবার চোখের দেখা দেখে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে সে তার ঘরে। এখন সে দেখতে পেলো, ফয়স্তার গায়ে টেরেসোর নোংরা হাত দেওয়া থেকে তাকে বিরত করা কিংবা তার সৎ ভায়ের ষড়যন্ত্রের সামিল হওয়ার আর কোনো প্রয়োজন নেই। তাই সে ঠিক করল, ফয়স্তাকে তার আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে কোনো মানে হয় না। তাছাড়া টেরেসো, স্যাভেরিও এবং পেরোকে তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে তার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল বরং। যদি তাদের অভ্যুত্থান সফল হয়, তাহলেও মনে হয় পেরো এবং স্যাভেরিওর পক্ষে অশুভ। রাজনৈতিক ব্যাপারে চিরদিনই উদাসীন ছিলো সেবাস্টিয়ানো। তাহলেও মনে হয় পেরো এবং স্যাভেরিওর পক্ষে অশুভ। তার মনে হয়, এ দেশের লোকগুলো দুর্নীতিপরায়ণ এবং অসৎ। তাদের দিয়ে কোনো সৎকাজ করানো যায় না। এখন যা কিছু ভালো হতে পারে, সেবাস্টিয়ানোর মনে

হলো, দুর্নীতিগ্রস্থ সমস্ত মানুষগুলোর অবসান হওয়া উচিত।

এই মুহূর্তে তার মনে হলো, এখানকার সমস্ত অতিথি, সাধারণ মানুষ, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী, যারা এখন চলাফেরা করছে সহজ, সাবলীল গতিতে, একটু পরে স্যাভেরিও এবং পেরোর নরক যাত্রার মেসিনটা হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠলে তারা সবাই স্তব্ধ হয়ে যাবে।

উপরতলায় ওঠার সিঁড়িটা খুঁজছিল সেবাস্টিয়ানো। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও যখন সেটা তার চোখে পড়ল না, একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবছিল সে, তখনি হঠাৎ আধ-ভেজানো একটা দরজার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে স্যাভেরিওর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে। দরজা ঠেলে সেই ঘরের ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করল।

বিরাট একটা ঘর। মাঝখানে একটা বিরাট টেবিল। টেবিলের চারপাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন সাদা এ্যাপ্রন পরিহিত নারী ডাচেসের অতিথিদের পোশাক ইস্ত্রি করছিল; কেউ কেউ তাদের জুতো পালিশ করছিল। ঘরের মধ্যে সবাই মহিলা। কেবল ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ নাচের জুতো পালিশ করতে-ব্যস্ত। সেই পুরুষটি হলো স্যাভেরিও।

ভিলায় প্রবেশ করার সময় স্যাভেরিও মনে মনে শপথ নিয়েছিল, প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীর মতো ব্যবহার করবে সে, ঠিক পেরোর মতো। নাচের জুতো পালিশ করতে করতে উপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশে সে বলতে থাকে, এখন থেকে তাদের ভাবতে হবে তারা ঐ তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মহিলা অতিথিদের ক্রীতদাসী আর নয়। নূতন সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় মনিব আর ভৃত্যের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না, সবাইকে একই আসনে বসতে হবে, একই সঙ্গে একই খাবার খেতে হবে। মেয়েরা তার দিকে তাকিয়ে হাসল, এবং তার কথায় কোনো গুরুত্ব দিলো না।

'তা মনিব আর মনিব-পত্নী না থাকলে আমার কি ভাল হবে শুনি ?' এক যুবতী, হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি চাই, আমি নিজে যেন একজন মিস্ট্রেস বনে যাই।'

উত্তরে স্যাভেরিও বলে, 'না তা আর সম্ভব নয়। মনিব ও মনিব-পত্নীর যুগ শেষ হয়ে আসছে। এখন যে সব সীমিত উচ্চশ্রেণীর মানুষ সুখ ভোগ করছে, তখন দেশের প্রতিটি মানুষ সেই একই সুখ ভোগ কবার অধিকার পাবে।'

'যত সব বাজে কথা!' পাতলা রোগাটে এক মহিলা বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠল, 'এ হতেই পারে না। মনিব আর মনিব-পত্নীর যুগ ছিলো, আছে আর থাকবেও চিরদিন। সেই সঙ্গে আমরা সব সময়েই তাদের দাসত্ব করে যাবো।'

তারপরেই একজন বয়স্কা মহিলা রেগে দিয়ে বলল, 'তোমার ঐ মতলব নিজের মধ্যেই রেখে দাও। আমরা কোনো গোলমাল চাই না। মূর্খ কোথাকার, তুমি কি

জান না, এ ধরনের কথা বললে পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করতে পারে? পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করলে তুমি নিশ্চয়ই তোমার এই বাজে ভাবধারা নিয়ে আমাদের জেল থেকে মুক্ত করতে পারবে না।'

উত্তরে সে বলে, 'দেশের অত্যাচারিত মানুষের স্বার্থে জেলে বন্দী হওয়া দূরে থাক, মরণও অনেক শ্রেয়।'

'তুমি নিজে বরং একা জেলে চলে যাও,' এবার সম্মিলিত প্রতিবাদে ঘরটা মুখর হয়ে উঠল, 'বোকা মূর্খ, ব্ল্যাকগার্ড, তুমি যদি এর পরেও চুপ না করো, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে আমরা রিপোর্ট করতে বাধ্য হবো।'

স্যাভেরিও তাদের সেই প্রতিবাদ শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, 'তোমরা হচ্ছ অন্ধ, ক্রীতদাস হয়ে জন্মানই তোমাদের চির-কাম্য, আমি তোমাদের মুক্তির পথ দেখাতে চাইছি, আর তোমরা উল্টে আমাকে জেল-বন্দী করার হুমকি দিচ্ছ ? ছিঃ ছিঃ এই পোড়া দেশের ভাল করতে গিয়েও দেখছি মহা বিপদ। স্যাভেরিও তার কথা শেষ করে টেবিলের কাছে ছুটে এসে সেবাস্টিয়ানোকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে তাকে তাকে জড়িয়ে ধরল।

সেই সময় খানসামা করিডোর পথে সেখানে দিয়ে যাচ্ছিল, ঘরের ভেতরে গোলমাল শুনে দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'এখানে কিসের এতো গোলমাল শুনি ?'

'ঐ লোকটা একেবারে নির্লজ্জ', স্যাভেরিওর দিকে আঙুল তুলে সেই বয়স্কা মহিলা চিৎকার করে বলে উঠল, 'জুতো পালিশ করার অছিলায় এখানে এসে মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছে সে। তবু যদি বা সে দেখতে শুনতে ভাল হতো—কিন্তু ব্যাঙের মতো দেখতে—'

বয়স্কা মহিলার এই অভিযোগ শুনে মেয়েরা হাসিতে ফেটে পড়ল, বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের বিদ্রুপ আর ঠাট্টা করতে দেখে স্যাভেরিওর মনে হলো, রাজনৈতিক বিক্ষোভকারীর আসন থেকে তারা বুঝি তাকে নামিয়ে দিলো একেবারে রাস্তায় তাকে ইয়াঙ্কি আখ্যা দিয়ে। তবে খানসামা চিৎকার করে তাদের থামতে বলে স্যাভেরিওকে হুকুম করল, 'মেয়েদের উত্ত্যক্ত না করে তুমি তোমার জুতো পালিশের কাজে মন দাও।'

'মেয়েদের আলাদা থাকতে দেওয়ার উচিত শিক্ষা তো পেলে,' বয়স্কা মহিলা মুখ টিপে হেসে বলে, 'আশাকরি এখন থেকে তুমি তোমার আসল কাজে মন দেবে। ঐ সব রাজনৈতিক বুলি কপচাবে না, কেমন ?'

ঘর থেকে বেরিয়ে স্যাভিরিও এবং সেবাস্টিয়ানো ভৃত্যদের সিঁড়ির পথে এগিয়ে গেলো।

'চাকার বাকরদের উন্নত্তির জন্য কোনো কিছুই করা আর সম্ভব নয়,' আক্ষেপ করে বলল স্যাভেরিও।

স্যাভেরিওর ক্ষোভের কথাগুলো অনামনস্ক ভাবে শুনল সেবাস্টিয়ানো। সে বেশ বুঝতে পারে, তার সৎ ভায়ের মোহভঙ্গ হয়েছে, যেমন ফয়স্তার প্রতি তার মোহভঙ্গ হয়ে গেছে একটু আগে। ফয়স্তার জীবন রক্ষার ব্যাপারটা এখন নেহাতই একটা কর্তব্য মাত্র। 'এখন আমার মাত্র একটাই মোহ অবশিষ্ট আছে', স্যাভেরিওর পিছন পিছন গ্যালারিতে এসে সেবাস্টিয়ানো তার চিন্তার ইতি টানল, 'ভালবাসার সম্পর্কে মোহ ; এখন আমি সেটাও হারিয়ে বসে আছি। এখন সেই একঘেয়েমির জন্য বিরক্তি সম্পূর্ণ হবে।' তার মনে হলো মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার বয়স যেন কুড়ি বছর বেড়ে গেছে।

❑ কুড়ি ❑

গ্যালারিতে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পেরো এগিয়ে এল তাদের দিকে। উদ্ধতস্বরে সেবাস্টিয়ানোকে জিজ্ঞেস করে সে, সারটা দিন কোথায় সে গা ঢাকা দিয়েছিল। উত্তরে সেবাস্টিয়ানো বলে, ঘুমিয়ে ছিলো সে।

তার অকপট স্বীকারোক্তি শুনে পেরো ভাবে, মিথ্যে বলছে না সে। কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হয়ে সে ভাবে, 'হয় তার বোধ শক্তি নেই......না, তাকে তেমন মনে হয় না.....কিংবা সে একজন পুলিশের এজেন্ট, যা সম্ভব নয়.....কিংবা সে একজন নিষ্ঠুর কঠোর প্রকৃতির উগ্রবাদী, এমন লোকের সঙ্গে জীবনে আমি কখনো মিলিত হই নি।' একটা রক্তাক্ত কান্ডকারখানা যেখানে ঘটতে যাচ্ছে, কি করে সেখানে তার ঘুম আসে, ভেবে পায় না পেরো, সে তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।

যাই হোক, পেরো তাদের সামনে ঘোষণা করল, চূড়ান্ত মুহূর্ত এখন তাদের হাতের মুঠোয়। কিছুক্ষণ পরেই কাউন্টেস সানচেজ টেরেসোর নৈশভোজ সারতে যাচ্ছে, আর বাথরুম খালি পড়ে থাকবে। তারপর স্যাভেরিও বোমা সমেত খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে টেরেসোর ঘরে গিয়ে ঢুকবে। সেই সময় সে নিজে গ্যালারির একটা জানালার সামনে জায়গা করে নেবে। পাশে ফয়স্তার ঘরে যে কোনো ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য সেবাস্টিয়ানো লুকিয়ে থাকবে। সেবাস্টিয়ানোকে ফয়স্তার ঘরে লুকিয়ে থাকার প্রস্তাব করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল পেরো।...কিন্তু তার কথায় বাধা দিয়ে সেবাস্টিয়ানো বলে, তার জন্য পেরোর দুঃখ করার দরকার নেই, আজ

সকালে একজন পরিচারিকার সঙ্গে ফয়স্তার ঘরে ঢুকেছিল সে। আবার অবাব হলো পেরো। সে তখন হিসেব করছিল, সেবাস্টিয়ানোকে পিস্তল হাতে এবং অনুরূপ ভাবে একই সময়ে স্যাভেরিওকে টেরোসোর বাথরুমে বোমা রাখতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরে ফেলে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে। তাদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে পার্কের গেটের সামনে অপেক্ষারত পুলিশের গাড়িতে তোলা হবে। কেউ কিছু দেখতেও পাবে না, এমন কি টেরোসোও। অনেক পরে, যখন সব কিছু সারা হয়ে যাবে তখন রিপোর্ট পাবে সে।

আরো কিছু উপদেশ দেওয়ার পর স্যাভেরিও এবং পেরো সেখান থেকে চলে গেলো বোমা আনার জন্য, পেরো আগেই সেটা একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। আর সেবাস্টিযানো একা গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে রইল। সে তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছিল ফয়স্তার ঘরে গিয়ে তাকে জেনারেলের ঘরে না যাওয়ার কথা বলার জন্য। অবশেষে থাকতে না পেরে ফয়স্তার ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় নক্ করতে যাবে তখনি ডাচেস তার ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গিয়ে সেবাস্টিয়ানোকে চিনতে পেরে তার নাম ধরে নিচু গলায় ডেকে উঠলেন, 'রিকারডো!'

সেবাস্টিয়ানো তার নিজের মানসিক যন্ত্রণায় এতই চিন্তিত ছিলো যে, বুঝতেই পারেনি সে, কার ঘরে নক করছিল সে। ডাচেসের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সে তখন তার ঘরের ভেতরে ঢুকল, তখন সে বুঝতে পারল, ভুল করে ফেলেছে সে। ডাচেসের স্বচ্ছ পোশাকে ঘরের তিন দিকের আয়নায় প্রতিফলিত তখন। বয়স্কা ভদ্রমহিলা তাঁর বিগতা যৌবনকে পুরুষদের চিত্রগ্রাহী করে তোলার জন্য যতদূর সম্ভব দেহটা স্বচ্ছ পোশাকের আড়ালে বিজ্ঞপিত করে তোলার চেষ্টা করছিলেন।

মুহূর্তের জন্য তাকে সেই কদর্য পোশাকে দেখে হাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হলো তার। ডাচেস তাকে তার দু'হাত দিয়ে যে ভাবে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিলেন, সেবাস্টিয়ানোর বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না, এই বয়সেও ভদ্রমহিলা তার মতো যুবকের সঙ্গে প্রেমের খেলায় মেতে উঠতে চান। আর একবার প্রেমের মোহে পড়ার ইচ্ছে তার একেবারেই ছিলো না। ভাগ্যের একি পরিহাস। সেবাস্টিয়ানো অবাক হয়ে ভাবে, এখন তার সময় অপচয় করার কথা নয়। যে ভাবেই হোক ডাচেসকে অল্পে সন্তুষ্ট করে এখান থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে। সকালে যে ভাবেই সে গিউস্তিনার এক হাতে তার কোমর ধরে ফয়স্তার ঘরে ঘোরাফেরা করছিল, ঠিক সেই ভাবে ডাচেসের কোমর জড়িয়ে ধরে আয়নাগুলোর সামনে ঘোরাফেরা করতে থাকল।

সেবাস্টিয়ানোর মতো যুবকের স্পর্শে ডাচেস তখন মনে মনে স্বপ্ন দেখছিলেন, কি করে তাকে উপভোগ করা যায়। তাকে প্ররোচিত করার জন্য তিনি তাকে

জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ পোশাকে আজকের ফ্যান্সি ড্রেস পার্টিতে তাকে মানাবে। পরক্ষণেই তিনি নিজের থেকে আবার বললেন, জিপসি মেয়ের পোশাকে কেমন দেখাবে ? উত্তরে সেবাস্টিয়ানো তাকে বোঝায়, আজকের পার্টিতে অনেক কালো মেয়ে জিপসি পোশাকে আসবে। অতএব জিপসি পোশাকে তাঁর না গেলেই ভাল হয়।

ডাচেসের কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সেবাস্টিয়ানো বললে, এ ব্যাপারে তার খুব একটা জানা কিছু নেই, তবে এটুকু সে বলতে পারে, ফুলের পোশাকে তাঁকে মানাবে ভাল।

'হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে একমত।' উৎফুল্ল হয়ে ডাচেস বলে উঠলেন, 'দারুণ সুন্দর হবে। ফুলের পোশাক আমি পড়ব। মাথায় পাখীর পালক লাগনো টুপি। আমার পাশে থাকবে একটা ছোট্ট জালা। সেই জালায় ভাল মদ ঢেলে পার্টির আসরে ঘুরতে ঘুরতে আমি বলতে থাকব, 'মদ নেবে গো ? মদ নেবে......'

তিনি তখন এতোই মুগ্ধ যে, পোশাক পরিবর্তন করতে গিয়ে পিছন ফিরে দেখলেন, সেবাস্টিয়ানো তাঁর ঘরে নেই। আহত হলেন, তাহলে তিনি এতক্ষণ কার উদ্দেশ্যেই বা এত সব কথা বলে গেলেন! সেবাস্টিয়ানোকে তাঁর ঘরে দেখতে না পেয়ে তিনি তখন অবাক হয়ে ভাবলেন, কে এই সুপুরুষ ভৃত্য ? বারবার এই ভাবে তিনি যখন তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে চান, তখনি সে উধাও হয়ে যায়। তার অমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহারে আহত হলেন তিনি।

ডাচেসের ঘর থেকে সোজা ফয়স্তার ঘরে গিয়ে হাজির হলো সেবাস্টিয়ানো। ঘরের সব আলোগুলোই জ্বলছিলো। ঘরটা বেশ গরম। বিছানার ধারে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বসেছিল ফয়স্তা। ফয়স্তা তার সুন্দর সুডৌল পা দু'টো ছড়িয়ে দিয়েছিল তার পরিচারিকা গিউস্তিনার দিকে। গিউস্তিনা তখন তার পায়ে মোজা পরাচ্ছিল। পিছন থেকে ফয়স্তাকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই মুহূর্তে আর একবার ফয়স্তার প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হলো সেবাস্টিয়ানোর। তাকে দেখতে পেয়ে দু'জন মহিলা আঁতকে ওঠার মতো করে লাফিয়ে উঠল। ফয়স্তার জীবন রক্ষা করা ছাড়া এখন আর সে অন্য আর কিছু চিন্তা করতে পারে না, ভাবল সেবাস্টিয়ানো।

'চিৎকার করো না', অতি আগ্রহ সহকারে বলল সে, 'আমি শুধু তোমাকে বলতে এসেছিলাম, তোমার সামনে ভীষণ বিপদ। এখনো সময় আছে, এখনি ভিলা থেকে বেরিয়ে যাও।'

সেবাস্টিয়ানোকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ফয়স্তা তার নগ্ন দেহে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে খিঁচিয়ে উঠে তাকে চলে যাওয়ার জন্য বলল।

'আমি যাবো না', সেবাস্টিয়ানো বলে, 'যদি না তুমি আমার সঙ্গে যেতে না চাও।'

তার কথায় দৃঢ়তা ছিলো। ফয়স্তার দিকে তাকাল না সে ভয়ে, যদি সে আবার তার প্রেমে পড়ে যায়।

'কিন্তু বিপদটাই বা কি ?' বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল ফয়স্তা। 'কেউ তোমাকে এখানে দেখে ফেলার আগে এখুনি তোমার চলে যাওয়া উচিত ...... তুমি এতই জেদী ?'

'বোকামো করো না', জোর দিয়ে সে বলল, 'যদি তুমি না আমার সঙ্গে চলে আস, আমি তোমাকে জোর করে বাধ্য করাব', এই বলে পেঁরোর দেওয়া রিভলবারটা সে তার পকেট থেকে বার করল।

ফয়স্তা বুঝতে পারল, সেবাস্টিয়ানোর কথার মধ্যে আন্তরিকতা ছিলো। হঠাৎ তার মনে পড়ল টেরোসো তাকে বলেছে, তাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তবে জেনারেল তাকে আশ্বাস দিয়েছে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কেউ। তাই তাব মনে হলো ঈর্ষাকাতর প্রেমিকের মতো কথা বলছে সেবাস্টিয়ানো। কোনো সন্দেহ নেই, টেরেসোর কাছে যাওয়া থেকে তাকে বিরত করার জন্য শেষ চেষ্টা করে দেখছে সে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো ফয়স্তার।

গলার স্বর বদল করে নরম সুরে তাকে গ্যালারিতে অপেক্ষা করতে বলল ফয়স্তা। একটু পরেই পোশাক বদল করে আসছে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। 'তাড়াতাড়ি চলে যাও এখান থেকে', একরকম জোর করেই ফয়স্তা তাকে ঘর থেকে বার করে দিলো।

সেবাস্টিয়ানো চলে যাওয়ার পরেই গিউস্তিনার দিকে ফিরে ফয়স্তা বলে উঠল, 'আমার কালো সিল্কের পোশাকটা এনে দাও গিউস্তিনা। আর তুমিও কালো পোশাকে তোমার শরীরটা ঢেকে নাও।' তারপর গিউস্তিনাকে প্রায় নগ্ন করে নিজের হাতে তার আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢেকে দিয়ে ফয়স্তা বলতে থাকে, তার বদলে তাকে সেবিস্টিয়ানোর সঙ্গে মিলিত হতে হবে। ফয়স্তা এবং গিউস্তিনা দু'জনেই একই উচ্চতার মেয়ে। আর গিউস্তিনা যদি মুখে মুখোশ লাগিয়ে নেয়, আর মাথায় একটা শাল জড়িয়ে নেয় কোনো তফাত বুঝতে পারবে না সে। ভিলা থেকে বেরিয়ে গিউস্তিনা তার ইচ্ছা মতো তার সঙ্গে যতদূর খুশি যেতে পারে। সেই সঙ্গে এই যুবকটি তার সঙ্গে প্রেম করতে চাইলে এবং চুমু খেতে চাইলে সে যেন তাকে গ্রহণ করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। ফয়স্তার শেষ কথাগুলো তার বেশ মনে ধরল, কারণ সকালে এই রকম মোহেই পড়েছিল সে সেবাস্টিয়ানোকে সঙ্গে নিয়ে ফয়স্তার ঘর পরিষ্কার করার সময়। সেবাস্টিয়ানোর প্রতি তার দুর্বলতার জন্ম হয়েছিল তখনি। তাই ফয়স্তার প্রস্তাবে সে মনে মনে ভাবল, তার কাছে এ যেন অপ্রত্যাশিত।

গিউস্তিনাকে নিজের হাতে সাজিয়ে, তার মুখে মুখোশ লাগিয়ে দেখল তাকে চেনার উপায় নেই, সে যেন তারই প্রতিচ্ছবি। আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে তার গহনার বাক্স থেকে একটা নেকলেস বার করে গিউস্তিনার গলায় পড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা সেবাস্টিয়ানোর মায়ের নেকলেস, সে তাকে উপহার দিয়েছিল। গিউস্তিনার গলায় এই নেকলেসটা দেখলে সে ঠিক ধরে নেবে গিউস্তিনাই ফয়স্তা। মনে মনে হাসল ফয়স্তা। গিউস্তিনা এক সময় তার অনেক উপকার করেছিল। রাতে সেবাস্টিয়ানোর সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎকারের বহু সাক্ষী এই মেয়েটি। তাই তাকে উপহার হিসেবে সেবাস্টিয়ানোকে দিতে চায় ফয়স্তা, তাতে হয়তো তার একটু কষ্ট হবে। নিজের একদা প্রেমিককে অপর একটি মেয়ের হাতে তুলে দেওয়া, সে কি কম কষ্টের কথা! যাই হোক, গিউস্তিনাকে অজস্র চুমু খাওয়ার পর সেবাস্টিয়ানো যখন তার সঙ্গে মিলনে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য তার মুখের উপর থেকে মুখোশ খুলে ফেলবে তখন তার আসল রূপ দেখে ভাববে, এ তো তার ফয়স্তা নয়, এ এক অন্য মেয়ে। সেবাস্টিয়ানোর তখনকার মুখের অবস্থা অনুমান করার চেষ্টা করল ফয়স্তা। এ এক নতুন ধরণের মিলনান্তক নাটক—গিউস্তিনাকে সেবাস্টিয়ানোর দেহ মন উপহার দিতে গিয়ে হঠাৎ ফয়স্তার বুকটা কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই টেরেসোর কথা ভেবে, তার ভায়ের কন্ট্রাক্ট পাওয়ার কথা ভেবে ফয়স্তা তার মনটাকে শক্ত করে তোলার চেষ্টা করল।

❑ একুশ ❑

ফয়স্তার উপর গোয়েন্দাগিরি করার রিপোর্ট গুপ্তচর মারফত ততক্ষণে হাতে এসে গিয়েছিল টেরেসোর। রিপোর্টটা পড়তে গিয়ে টেরেসোর মনে হলো, তার চোখের সামনে সারা বিশ্ব যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ইচ্ছে হলো এখনি পাশের ঘরে গিয়ে ফয়স্তাকে হত্যা করে আসে। না, তাকে সে হত্যা করবে। তাকে হত্যা করাটা খুবই সামান্য ব্যাপার। তাকে বেঁচে থাকতে হবে, এবং জীবিত অবস্থায় প্রতিনিয়ত তাকে অপমানিত হতে হবে এবং তার ব্যাভিচারের এবং বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি অবশ্যই তাকে পেতে হবে। ফয়স্তার মাথার একটা চুল ছিঁড়েও সে তাকে আঘাত করবে না, নিজেকে বলল সে। তবে তার সমস্ত সম্পত্তি, তার ভায়ের সম্পত্তি তার ভায়ের ডাকাতির সব অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। আর সেই সব হারানোর বেদনায় ডারোটো, তার প্রিয়তম ডরোটাকে বিয়ে করার জন্য তাকে বাধ্য করাতে হবে। এই অভিনব এবং চমৎকার জুটির বিয়ের ব্যবস্থা সে নিজেই করবে। সাক্ষি থাকবেন ডাচেস, যিনি পরিকল্পনা করে তাকে এখানে

এনেছিলেন দুশ্চরিত্রা ফয়স্তাকে তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। আজ রাতেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে গ্যালারির শেষ প্রান্তে ভিলার গীর্জায়। ডরোটো হবে কাউন্ট সানচেজের স্থলাভিষিক্ত। বিয়ের পর সেই সুখী দম্পতিকে সে পাঠাবে লস ল্যান্ড্রনস দ্বীপে মধুচন্দ্রিমা যাপন করার জন্য। গরম আবহাওয়ার জায়গা এবং মশায় ভর্তি। মনে মনে হাসল টেরেসো, গরমে আর মশার কামড়ে ভালই জমবে তাদের মধুচন্দ্রিমা বছরের পর বছর ধরে।

টেরেসো তার নিজের পরিকল্পনায় নিজেই উৎফুল্ল। নিষ্ঠুর হলেও পরিকল্পনাটা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। সত্যি কথা বলতে কি এটা একটা ভাল কৌতুকও বটে! তার উল্লাসিত হওয়ার বড় কারণ হলো, আজ রাতেই ভিলার গীর্জায় এখানকার উপস্থিত সমস্ত অতিথি, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ভৃত্য ক্রীতদাসদের সামনে সানচেজ পরিবারের সম্মানিত মহিলা ফয়স্তার সঙ্গে এই ভিলারই একজন ভৃত্য ডরোটোর সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে। সবাই জানবে, ফয়স্তার দুশ্চরিত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই সে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। টেরেসো ভাবল, এই ভাবেই ফয়স্তাকে চরম অপমানিত করা যাবে। সে তার সেক্রেটারিকে ডেকে ডরোটোর সঙ্গে ফয়স্তার বিয়ের আয়োজন করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর বিয়ে হবে আজই, নৈশভোজের আগে।

টেরেসো যখন তার সেই পরিকল্পনার সাফল্যের ব্যাপারে উল্লাসিত হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে একজন চিমনি সাফাইকারীর বেশে টেরেসোর ঘরে এসে ঢুকল। তার কাঁধে একটা ব্রাশ, হাতে একটা বালতি, চুলগুলো ছেলেদের মতো করে আঁচড়ানো। তাকে দেখলে মনে হয়, যেন সত্যিকারের একজন চিমনি সাফাইকারী বয়।

'আমি একজন গরীব চিমনি সাফাইকারী' ; গানের সুরে তার মুখ থেকে কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো। টেরেসোর উদ্দেশে ফয়স্তা বলল, 'আমি শুনেছি এখানে নাকি প্রচন্ড ঝুল জমেছে। তাই আমি এসেছি চিমনি পরিষ্কার করার জন্য.... আমি কি আপনাকে বিরক্ত করলাম ? দেখছি আপনি যেন কারোর সঙ্গে নৈশভোজ সারার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাই যদি মনে করেন, আমি আপনাকে বিরক্ত করছি, পরিষ্কার করে বলুন, আমি তাহলে এখনি চলে যাবো।'

প্রেমিকের চোখে নয়, সম্পূর্ণ অন্য এক চোখে ফয়স্তার দিকে তাকাল টেরেসো। চিমনি সাফাইকারীর বেশে তাকে চমৎকার মানিয়েছিল। সেই বেশের নিচ থেকে তার লোভনীয় দেহের আভাস তার চোখে এসে পড়ল। কিন্তু তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। বরং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠল সে। সে তাকে বলল, না, সে তাকে বিন্দুমাত্র বিরক্ত করেনি। বরং সে যদি ইচ্ছা করে চিমনি সাফাই-এর আগে সে তাকে এক গ্লাস শেরি পান করতে পারে। এই বলে সে দু'গ্লাস শেরি

প্রস্তুত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ফয়স্তাকে একটু খেলিয়ে নিতে চায় সে যেমন করে ফয়স্তা তাকে খেলিয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ফয়স্তা তার নতুন ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সে তার স্বাভাবিক গলায় বলল, তার মুখের কালিঝুলি পরিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না সে। তাই বাথরুমে গিয়ে সে তার হাত মুখ ধুয়ে আসতে চায়। টেরেসো কিছু বলার আগেই সে তার হাতের বালতি এবং ব্রাশ মেঝের উপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে টেরেসোর শয়নকক্ষের মধ্যে দিয়ে বাথরুমের পথে পা বাড়াল।

ওদিকে টেরেসোর স্যুটে ফয়স্তা প্রবেশ করার মুহূর্তে স্যাভেরিওর হাতে একটা বোমা তুলে দেয়। সেই বোমাটা ট্রের উপর একটা ডিসের আড়ালে রেখে পুলিশ স্পাই-এর সঙ্গে করমর্দন করে নক্ না করেই সোজা টেরোসোর স্যুটে গিয়ে প্রবেশ করল সে। ভেস্টিবিউলের মধ্যে তিনটি দরজার মুখোমুখি হতে হলো তাকে। মাঝের দরজাটা জেনারেলের শয়নকক্ষ। যেখান থেকে তার এবং ফয়স্তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল। বাঁ দিকের দরজাটা বাথরুমে যাওয়ার, আর ডানদিকের দরজাটা তার স্টাডিরুমে যাওয়ার। বাথরুমে গিয়ে ঢুকল স্যাভেরিও।

বাথরুমে ঢুকে আলো জ্বেলে দরজাটা ভেজিয়ে ছিলো সে ভেতর থেকে। তারপর সে ছোট্ট টাওয়েল কাপবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডালা খুলে বোমাটা তার ভেতরে দুটি লিলেনের মাঝখানে রেখে দিলো সাবধানে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাথরুমের দরজা খুলে ফয়স্তাকে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

কাপবোর্ডের ডালা তখনো বন্ধ করেনি স্যাভেরিও, বোমা ভর্তি কালো বাক্সটা তখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ; এবং সেটাই তার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিলো। কাপবোর্ডের ডালা বন্ধ করতে পারলে স্যাভেরিও তার উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে ফয়স্তাকে বোঝাতে পারত, একজন সত্যিকারের ভৃত্য, বাথরুম পরিষ্কার করতে এসেছিল। আর তাতে ফয়স্তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হতো না। কিন্তু ডালা খোলা কাপবোর্ড থেকে কালো বাক্সটা দেখা যাচ্ছিল বলে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইল না স্যাভেরিও। যাইহোক, ফয়স্তার হঠাৎ উপস্থিতিতে সে তারা মাথা ঠিক রাখতে পারল না। সে কি করতে যাচ্ছে, সেটা উপলব্ধি করার আগেই অতর্কিতে ফয়স্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বাথরুমের ভেতরে টেনে আনল তাকে এবং এবার সে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। চার দেওয়ালের মধ্যে ফয়স্তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে সে ভাবে, এরপর সে কি করবে ? অবশ্যই বৈপ্লবিক আইন অনুসারে ফয়স্তাকে খতম করে ফেলতে হবে। এটা একটা খুনের প্রশ্ন। কিন্তু স্যাভেরিও জানে যে, পার্টির বৃহত্তর স্বার্থে খুন তাকে করতেই হবে। না, কোনো ক্ষমা নেই। কথাটা মনে হতেই সে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার দু'হাত দিয়ে ফয়স্তার গলা টিপে ধরল শক্ত করে। মাত্র একবারই সে মৃদু চিৎকার করতে পেরেছিল, আর

তারপরেই তার নিস্তেজ দেহটা এলিয়ে পড়ল।

ফয়স্তাকে খুন করার পর স্যাভেরিও দেখল, একটা বিপদ এড়াতে গিয়ে আর একটা বিপদে পড়ে গেলো সে। ফয়স্তা বেঁচে থাকলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতো ; কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার অনুপস্থিতি দীর্ঘক্ষণ হলে স্বভাবতই জেনারেলের মনে সন্দেহ জাগবে কেন সে ফিরে আসছে না। তখন সে নিজে কিংবা তার কোনো অনুচরকে পাঠাবে ফয়স্তার খোঁজ করতে। আর তখনি তাদের চক্রান্তের প্লটটা ভেস্তে যাবে। কি সে করবে বুঝতে না পেরে সে করল কি, ফয়স্তার মৃতদেহ দু'হাত দিয়ে তুলে বাথটবে শুইয়ে দিলো এবং জলের ট্যাপটা খুলে দিলো—জল পড়ার শব্দ শুনে জেনারেল ভারতে পারে ফয়স্তা হাত মুখ ধুচ্ছে। এই অবস্থায় এর আগে পর্যন্ত একজন ষড়যন্ত্রকারীর ভূমিকায় ঠিক ঠিক কাজ করে এসেছিল, আর বুদ্ধি খাটিয়ে এবার ফয়স্তার মৃতদেহ বাথটবে রেখে ট্যাপটা খুলে দিতেই তাকে সত্যিকারের খুনী বলে মনে হলো। তারপর হাত ধুয়ে সে যখন বাথরুম থেকে বেরুতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার চৌকাঠের সামনে এসে হাজির হলো টেরেসো।

শয়নকক্ষ এবং বাথরুমের ব্যবধান মাত্র একটি দেওয়াল। তাই একটু আগে ফয়স্তার মাত্র একবার মৃদু চিৎকারের শব্দ শুনতে পেয়েছিল টেরেসো। এক মুহূর্তের জন্য বোবা বনে গিয়েছিল সে। তারপরেই তাকে খুন করার চক্রান্তের কথা মনে পড়ে যায়, আর তখনি সে ছুটে এসেছিল। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে সে তখন তার কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা দিতেই দরজার ছিটকিনি ভেঙ্গে গিয়ে সেটা খুলে যায়। চকিতে একবার বাথটবে ফয়স্তার নিশ্চল দেহটা দেখে নিয়ে সে বুঝে যায়, ফয়স্তা বেঁচে নেই।

স্যাভেরিও পালাতে যায়। কিন্তু পারে না। অব্যর্থ লক্ষ টেরেসোর। স্যাভেরিওর বুক লক্ষ্য করে সে তার পিস্তলের ট্রিগার টিপেছিল। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্যুট থেকে পালাতে যায় স্যাভেরিও। তবে ঠিক সময়ে পেরো এসে পড়ায় তার হাতে ধরা পড়ে গেলো সে। পেরো তখন আসছিল তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তার পরিকল্পনা মাফিক। তাকে অনুসরণ করে বহু পুলিশ অফিসার এবং স্বয়ং সিস্কো এলো।

'বাথরুমে নিশ্চয়ই বোমা রাখা হয়েছে,' বলল সিস্কো। দু'জন পুলিশ অফিসার স্যাভেরিওকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেলো। 'কিন্তু আপনি যে এখনো জীবিত, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি....যেন কিছুই হয়নি মনে করে আপনি আপনার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন।' তারপর পেরোর দিকে ফিরে সে বলে, 'ঐ লোকটাকে গ্রেপ্তার করো। আর বাকি তোমরা বাথরুম সার্চ করে দেখ কোথায় বোমা লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু কোনো গোলমাল যেন না হয়। কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।'

টেরেসো নিজে বাথরুমে ঢুকে ফয়স্তার মুখের উপর থেকে আবরণ সরিয়ে বলে উঠল, 'মৃত সে।' তারপর পুলিশ চীফের দিকে ফিরে সে বলে, 'আমার অভিনন্দন

গ্রহণ করো সিস্কো .... তোমরা দুজনে, ওর মৃতদেহ বাথটব থেকে তুলে নিয়ে এসে আমার বিছানায় শুইয়ে দাও।'

এই ফাঁকে কাপবোর্ড থেকে বোমার বাক্সটা নিয়ে টেরেসোকে দেখিয়ে পুলিশ চীফের হাতে তুলে দিতে গিয়ে পেরো বলল, 'এই সেই বোমাটা। কিন্তু পুলিশী দক্ষতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার মতো মনের অবস্থা ছিলো না তখন টেরেসোর। তাই সে ফিরেও তাকাল না সেদিকে।

টেরেসোর নির্দেশে তার সেক্রেটারি গীর্জার যাজককে খবর দিলো, বিয়ের অনুষ্ঠান নয়, তাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

টেরেসোকে এখন ব্যর্থ প্রেমিকের মতো মনে হচ্ছিল। ফয়স্তার মৃতদেহ কবর দেওয়ার আগে তার মৃতদেহের সামনে নতজানু হয়ে সে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে, নিহত ফয়স্তার জন্য নয়, তার নিজের জন্য এবং তার মৃত্যুর জন্য। তারপরেই হঠাৎ তার মনে হলো, আবার সে এখন একজন স্টেটসম্যান ; তার নিজের কাছেই মনে হলো, সে তার নিজের ক্ষমতা ঐতিহ্যই শুধু পুনরুদ্ধার করেনি, ঈশ্বরের কাছে সে তার নিজের স্থানের পরিচয়ও দিতে পেরেছে।

সেই সময় পার্কের একেবারে শেষ প্রান্তে, ম্যাগনোলিয়ার শেডের নিচে বসে গিউস্তিনার মুখের উপর থেকে মুখোশটা সরাতেই সেবাস্টিয়ানো ঘৃণার সঙ্গে আবিষ্কার করল, আর একবার সে প্রতারিত হলো। ফয়স্তাকে হারাল সে চিরদিনের মতো।

আর ঠিক সেই সময়ে স্যাভেরিও তার মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, তার দেহে তিন তিনটি গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। পুলিশের গাড়ি তাকে নিয়ে দ্রুত এ্যান্টিগুয়ার পথে ছুটে চলছিল, সেখানে তাকে কবর দেওয়ার জন্য। এটা হলো সিস্কোর অতি প্রিয় পদ্ধতি—এ ধরণের অপরাধীকে আদালতে চালান করে কিংবা তাকে জেল বন্দী করে অহেতুক আইনের কচকচি না বাড়িয়ে, ট্রায়ালের ব্যবস্থা না করে বরং মাঝপথে তাকে একেবারে খতম করে দেওয়াই ভাল। বন্দী পুলিশের হেপাজত থেকে মাঝপথে পালাবার চেষ্টা করেছিল বলেই তাকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছিল তারা। এ ধরণের একটা প্ল্যান আগেই করেছিল সিস্কো।

কিন্তু যে লোকটা স্যাভেরিওর দেহে শেষ মৃত্যুবাণ ছুঁড়ে ছিল, পিছন থেকে তার গলা লক্ষ্য করে গুলি করেছিল, সে আর কেউ নয়, সে পেরো।

মূল গল্প ❑ ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি
অনুবাদ ❑ সৌরেন দত্ত

ও হেনরী

১৮৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা প্রদেশে জন্ম হয়েছিল উইলিয়াম সিডনী পোর্টারের। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ লাভে বঞ্চিত ছিলেন তিনি। তরুণ বয়সে একটি ওষুধের দোকানে চাকরি করতে হয়েছিল উইলিয়াম সিডনী পোর্টারকে। অবশেষে ১৮৮২ সালে তিনি টেক্সাস যাত্রা করেন, তারপর পেশাগত পরিবর্তনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আসেন সাংবাদিকতার পেশায়। একটি ব্যাঙ্গধর্মী সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁর। এরপর হাউস্টন পোস্টে (houston Post) তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হল কৌতুকপ্রদ দৈনিক কলাম লেখার জন্য।

জীবনের এই বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে পোর্টার, ও হেনরী ছদ্মনাম গ্রহণে ব্যাপারে একটি অদ্ভুত ঘটনা আছে। যখন তিনি ওষুধের দোকানে কাজ করতেন, পি, ইউ, এস, ডিসপেনসারিতে একটি ফরাসী ফার্মাসিস্টের নাম দেখতে পা'ন। এই নামটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি ও হেনরী নামটি গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ও হেনরী সাহিত্য পিপাসু পাঠক-পাঠিকার অন্তরে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন। ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর অনবদ্য ছোটগল্প সংকলন—যথাক্রমে ১৯০৬ সালে 'দ্য জেন্টল গ্র্যাফ্টার' ও 'দ্য ভয়েস অব দ্য সিটি', ১৯০৯ সালে 'অপশনস্' ও 'রোডস্ অব ডেস্টিনি' এবং ১৯১০ সালে 'হুইরলজিস' ও 'স্ট্রিক্টলি বিজনেস।'

ইতিমধ্যে তিনি একটি অনবদ্য উপন্যাস 'অফ ক্যাবেজেস অ্যাণ্ড কিংস' রচনা করেছিলেন। অবশেষ ১৯১০ সালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে উইলিয়ম সিডনী পোর্টারের মৃত্যু হয়।



সেরা উপহার

ও হেনরী

নিচের দেউরিতে কাঠের লেটার বক্স-এ জেমস-ডিলিংহাম (ইয়ং) নামটা যেন মালিকের আর্থিক দুরবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। বেচারার দোষ নেই, খোদ মালিক জিমি ডিলিংহামের সাপ্তাহিক আয় তিরিশ ডলার থেকে নেমে যে দাঁড়িয়েছে মাত্র কুড়ি ডলারে।

এদিকে কালই বড়দিনের পর্ব। কি করে বেচারী মিসেস ডিলিংহাম ওরফে তরুণী ডেলা! প্রিয়তম স্বামীকে বড়দিনে একটি তাক লাগানো উপহার দেওয়ার বাসনা তার কতদিনের। গোপন সঞ্চয়ের ক্ষুদ্র ভাড়ারটি খুলে দেখে তার বিষন্ন মুখ আরও ম্লান হয়ে এলো। মাত্র এক ডলার সাতাশি সেন্ট। তার মধ্যে ষাট সেন্ট ছিল পেনিতে। পেনিগুলো একটা দুটো করে সে জমিয়েছে। মুদি, সব্জীওলা, মাংসওলা সবার সঙ্গে লাগাতার দ[illegible]কষি করে। পাড়ায় হাড়কেপ্পন বলে নাম রটে গেছে তার।

কিন্তু কি হবে এই সামান্য পয়সায়? কত নিভৃত মুহূর্তে সে কেবল এই স্বপ্নই দেখেছে, যে সে তার আদরের জিমিকে একটি দুষ্প্রাপ্য, সুন্দর ঠিক জিমের রুচির সঙ্গে মানানসই উপহার কিনে দিচ্ছে, কিন্তু মাত্র এক ডলার সাতাশি সেন্ট সে রকম উপহার তো হতেই পারে না।

জানলার বাইরে ধূসর রঙের খিড়কির ধূসর দেওয়ালের ওপর দিয়ে যে বেড়ালটা এক্ষুনি হেঁটে গেল, তার রঙটাও ধূসর, ঠিক তার বিষন্নতার রঙ।

পুরোনো তেলচিটে সোফা ছেড়ে এসে ডেলা আয়নার কাছে এসে দাঁড়াল। চোখের জল মুছে নিয়ে এক পলক দেখলো নিজেকে। তারপর মাথার ওপর হাত দিয়ে কাঁটাদুটো খুলে নিতেই জলপ্রপাতের মত একঢাল রেশমী চুলের তরঙ্গ বয়ে গেল। আশ্চর্য শ্রীময়ী দেখালো তার ছিপছিপে একহারা চেহারাটিকে।

অল্পবয়সী দুটি ছেলেমেয়ের এই দীনহীন ঘর গেরস্থালীতে কেবলমাত্র দুটি জিনিষই ছিল মূল্যবান। ডেলার এই অঢেল চুলের রাশি আর জিমির পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া সুন্দর একটি হাতঘড়ি। এছাড়া দুজনের ভালবাসা ছিল অমূল্য, এ কথা বলাই বাহুল্য।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে এক মুহূর্তের জন্য থমকালো ডেলা, তারপরেই উত্তেজনায় বড় হয়ে উঠলো তার চোখদুটি। দ্রুত হাতে পুরোনো বাদামী জ্যাকেটটা গায়ে জড়িয়ে নিল, মাথায় পরে নিল পুরোনো বাদামী টুপিটা।

দুতিন লাফে সিঁড়িগুলো টপকাতেই একেবারে রাজপথে। শীতের উজ্জ্বল নরম আলোয় মায়াময় হয়ে উঠেছে পৃথিবী। রাস্তায় অগনিত দোকানে অভাবনীয় পন্যসম্ভার হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দৃঢ় পদক্ষেপে ডেলা মাদাম সাফ্রেনির কেশপ্রসাধনের দোকানে এসে ঢুকলো। বিশালবপু মাদাম সাফ্রেনিকে রাজি করিয়ে ফেললো তার মাথার চুলগুলি কিনতে। বিশ ডলার দাম দিলেন মাদাম।

এর পরের দুটো ঘন্টা যেন প্রজাপতির পাখায় উড়ে চলে গেল। অনেক খুঁজে, অনেক বেছে একদম হঠাৎই ডেলা পেয়ে গেল ঠিক তার মনের মত জিনিস। প্লাটিনামের একটি সুন্দর ঘড়ির চেন। জিমির হাতে ঐ সুন্দর ঘড়িটার সঙ্গে কি দারুনই না মানাবে। এক মুহূর্তে চুলের দুঃখ ভুলে গেল সে। একুশ ডলার দাম দিল ওটার জন্য। বাকি সাতাশি সেন্ট হাতে নিয়ে চঞ্চলা কিশোরীর মতই প্রায় একছুটে বাড়ি পৌঁছালো সে। বেচারী জিমি, এত সুন্দর ঘড়িটায় একটা কম দামী চামড়ার বক্‌লস লাগিয়ে রাখে। এত বেমানান দেখায়।

গ্যাসটা জ্বেলে নিয়ে নিজের সম্পূর্ণ অচেনা চেহারাটা একটু ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করল ডেলা। চুল কোকড়ানোর যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বসলো আয়নার সামনে। চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই কোকড়ানো ছোট ছোট চুলে ভর্ত্তি তার মাথাটা দেখাতে লাগল ঘর-পালানো ছেলেদের মত।

যথেষ্ট হয়েছে। এখন প্রথম দর্শনেই জিমি যদি অগ্নিশর্মা না হয়ে যায়, তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, আমাকে ঠিক কোনী দ্বীপের মেয়েদের মত দেখাচ্ছে।

সাতটা বেজে গেল। কফি তৈরী। চপগুলো জিমি এলেই চটপট ভেজে নেওয়া যাবে। দরজার পাশে উপহারটি হাতের মুঠোয় নিয়ে কিছুটা উৎকণ্ঠায় উত্তেজনাময় সময় গুনছে ডেলা।

ক্লান্ত পায়ে ওপরে উঠে এলো জিমি, মাত্র বাইশ বছর বয়সেই গোটা একটা সংসারের বোঝায় নুয়ে পড়েছে বেচারী। গায়ের ওভারকোট, হাতের দস্তানা, দুটোর অবস্থাই শোচনীয়। স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকালো ডেলা, অস্ফুট প্রার্থনায় তার ঠোঁটদুটি কাঁপছে—ঈশ্বর, খুব বেশী যেন রেগে না যায় জিম। ওর চোখ যেন

আমাকে এখনও আগের মতই সুন্দর দেখে।

কিন্তু স্বামীর চোখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল ডেলা। সে চোখে খুশি, আনন্দ, বিস্ময়, ক্রোধ কিছুই নেই। কেমন একরকম শূন্যদৃষ্টি নিয়ে হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে আছে তার ভালমানুষটি স্বামীটি।

সইতে পারে না ডেলা। দুহাতে ঝাঁকিয়ে দেয় জিমিকে; দোহাই তোমার। ওরকম করে তাকিয়ো না। চুল কেটে ফেলেছি। আবার বড় হয়ে যাবে। তুমি তো জানো, আমার চুলের কি ভীষণ বাড়।

তবু তাকিয়ে থাকে জিম, মনে হয় সে ঠিক করতে পারছে না, হাসবে না কাঁদিবে। স্খলিত কণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস করলো—চুল কেটে ফেলেছো? কেটে ফেলেছো চুল?

এবার ঝাঁঝিয়ে উঠলো ডেলা মানছি তোমায় জিগ্যেস না করে চুল কাটাটা বোকামি হয়েছে। কিন্তু সত্যি করে বলতো, তুমি কি আমার চুলের জন্যেই আমায় ভালবাসতে, আমার চুলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভালবাসায় কিছু কম পড়ে নি। জিমের মুখে তবুও ভাবান্তর নেই দেখে নিজের অপরাধী হৃদয়কে লুকোতে সমানে বক্ বক্ করে চলে ডেলা।

কি করবো বল? কতদিনের সাধ বড়দিনে তোমাকে একটা দারুণ উপহার দেবো। তাই তো চুলগুলো বেচে তোমার জন্য আশ্চর্য এক উপহার এনেছি। চুল আবার ঠিক আগের মতই সুন্দর হবে জিম। তুমি একটুও ভেবো না। কাল বড়দিন, আজও কি তুমি ওরকম মুখ ভার করে থাকবে জিম? একটুও ভালবাসবেনা আমাকে?

এতক্ষনে যেন কেটে গেল জিমের হতভম্ব ভাবটা। দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে নিলো ডেলাকে।

—আমাকে ভুল বুঝো না ডেলা। আমি যে মেয়েকে ভালবাসি, সে চুল কাটলে বা শ্যাম্পু করলে আমার ভালবাসার উনিশ বিশ হয় না। এটা সেরকম কোন ব্যাপারই না। তোমার জন্য আমি যে উপহার এনেছি সেটি দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে কেন একটু আগে এত ভেঙে পড়েছিলাম।

জিম-এর হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে খুলে ফেলে ডেলা। এক মুহূর্তে চাপা আবগে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায় তার। চোখের জল চাপতে জিমের বুকেই লুকোয় সে।

টেবিলের ওপর মোড়ক খুলে ছড়িয়ে আছে একসেট মহার্ঘ চুলে লাগাবার চিরুনী। ব্রডওয়ের দোকানের জানলায় সাজানো সেই সেটটিকে দীর্ঘদিন প্রত্যহ দেখেছে ডেলা, মনে মনে পূজো করেছে। খাঁটি কাছিমের খোলায় তৈরী চিরুনীগুলো। হীরে মুক্তো দিয়ে বেড় দেওয়া। যে চুল কেটে ফেলা হয়েছে, তাতে পরার উপযুক্ত বটে। আবার ফুঁপিয়ে ওঠে ডেলা, তারপর হঠাৎই মনে পড়ে যায় হাতের মুঠোয়

লুকিয়ে রাখা জিমের জন্য আনা উপহারটির কথা।

—আমার স্বপ্নের জিনিসটাই এনে দিয়েছো তুমি জিম। মন খারাপ কোরো না লক্ষ্মীটি, আজ না হোক, একদিন আমার চুল আবার আগের মত হয়ে যাবে, আমি প্রাণভরে প্রসাধন করবো তোমার উপহার দিয়ে। এখন, এদিকে একটু তাকাও, দেখ সারা বাজার তোলপাড় করে ঠিক তোমার যোগ্য উপহার এনেছি কিনা? সুন্দর না এই চেনটা? কই ঘড়িটা দাও, দেখি কেমন মানায়।

নিঃশব্দ অট্টহাস্য ফুটে ওঠে জিমির চোখে। ধপ্ করে সোফায় বসে পড়ে।

—ডেলা, এই চমৎকার উপহার দুটি এত বেশি সুন্দর, যে এখনই পরা ঠিক হবে না। তোমার চিরুনী কেনার জন্য ঘড়িটা বেচে দিয়েছি আমি। আচ্ছা এবার চপগুলো ভাজলে হয় না?

প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতরা সদ্যোজাত যীশুর জন্য নানা আশ্চর্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকেই বড়দিনে উপহার দেবার প্রথা চলে এসেছে। তাঁরা নিঃসন্দেহে জ্ঞানী ছিলেন, তাঁদের উপহারগুলিও ছিল যথেষ্ট সুচিন্তিত। কিন্তু এই যে নিতান্ত তরুণ দরিদ্র দম্পতি, শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় দুটি দামী জিনিস খুইয়ে ফেললো, এদের উপহারের কাছে কোথায় লাগে জ্ঞানবৃদ্ধদের হিসেব করা ভালবাসার দান?

মূল গল্প ❑ দি গিফ্‌ট অফ ম্যাগী

ডি এইচ লরেন্স

পুরো নাম ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্ম, তার লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে 'লেডি চ্যাটারলিস লাভার', 'সন্‌স অ্যাণ্ড লাভারস', 'রেনবো' অন্যতম। এক সময় 'লেডি চ্যাটারলিস লাভারকে' তদানীন্তন সমাজ অশ্লীলতার দোষে অভিযুক্ত করেছিল। ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের উপর প্রভাব ফেলেছেন। তিনি শুধু গল্পকার নন কবি হিসেবেও যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। সেরা গল্পগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল ঃ 'ইংলণ্ড মাই ইংলণ্ড', দ্য ওম্যান হু রোডঅ্যাওয়ে অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ' ও 'লাভ অ্যামঙ দ্য হে-ষ্ট্যাক্‌স অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ'। মাত্র পয়তাল্লিশ বছর বয়সে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।



সূর্য

ডি. এইচ. লরেন্স

ডাক্তার বলল, তাকে সূর্যের আলোয় সরিয়ে নিয়ে যাও।

সূর্যের আলোয় তার খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। তবু তাকে যখন সমুদ্রের ধারে তার শিশুসন্তান, ধাত্রী ও মাতাসহ সূর্যালোকিত এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সে তখন বাধা দিল না।

জাহাজ ছাড়ল মধ্যরাত্রিতে। শিশুকে বিছানায় শোয়ানো হলে তার স্বামী দু'ঘন্টা তার কাছেই রইল। সেদিন রাত্রিটা ছিল ঘন অন্ধকার। একঝাঁক কম্পিত আলোর ছটা ফেলে এক বিশাল গ্রহপুঞ্জের মত অন্ধকার সমুদ্রের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল হাডসন জাহাজটা।

রেলিং-এর উপর ঝুঁকে নিচে জলের দিকে তাকিয়ে ভাবল সে, এই সমুদ্র এত গভীর যে তা কল্পনা করা যায় না। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই সমুদ্রের সঙ্গে। এখন সমুদ্রের ঢেউগুলোকে অসংখ্য কালো কালো সাপের মত দেখাচ্ছিল।

তার স্বামী তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, এই ধরনের বিচ্ছেদ কখনো ভাল হতে পারে না। আমি তা চাই না।

তার মনে পড়ল তারা দুজনেই বিচ্ছেদ চেয়েছিল একদিন। এই কথাটা মনে পড়তেই তার আবেগে কিছুটা টান পড়ল। কিন্তু তার লৌহকঠিন মনটা শক্ত হয়ে উঠল আবার।

তারা দুজনেই তাদের ঘুমন্ত শিশুর পানে তাকাল। পিতার চোখদুটো সিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তারা বুঝতে পারল তাদের দুজনের মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ দুটো শক্তি কাজ করে এসেছে এতদিন। যেন দুটি এঞ্জিন ভিন্ন দুটি দিকে গিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে তাদের দুটো অন্তরকে।

এমন সময় যাত্রীরা সবাই চীৎকার করে উঠল, উপকূল এসে গেছে। এবার নামতে হবে।

সে তখন মনে মনে বলল, তার যাত্রা এখানেই শেষ, কিন্তু আমাকে এখনো সমুদ্রেই ভেসে চলতে হবে।

আলো জ্বালা কতকগুলো ফেরী নৌকো এসে হাডসন জাহাজের কাছে লাগল। লাকাওয়ালা স্টেশান এসে গেছে।

জাহাজ আবার এগিযে চলল। সারারাত যাওয়ার পর সকাল হতে ইতালির এক উপকূলে এসে জাহাজ ভিড়ল। আবার সূর্যের মুখোমুখি হলো সে। নীল সমুদ্রের পারে বড় বাগানওযালা তাদের বাড়িতে এসে উঠল।

বাড়িটা দেখে তার ভাল লাগলেও তার অন্তরের অশান্তি আর বিক্ষোভকে দমন করতে পারছিল না সে। এই আনন্দময় পরিবেশ থেকে কোন আনন্দই অনুভব বা উপভোগ করতে পারছিল না সে। বিশেষ করে তার সন্তানের জন্য রাগ হচ্ছিল তার। মনে হচ্ছিল এই সন্তানই তার মনের শান্তিকে কুরে কুরে খাক করে দিচ্ছে। তার প্রতি দায়িত্বটা কত ভয়ঙ্কর। তার মনে হলো তার প্রতিটি নিঃশ্বাসের জন্য সে দায়ী।

একদিন তাব মা বলত, তুমি জানো জুলিয়েত, ডাক্তার তোমাকে রোদে বিবস্ত্র অবস্থায় শুয়ে থাকতে বলেছে। কিন্তু তুমি যাও না কেন?

আমি যখন পারব যাব। তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও না নিশ্চয়?

মা বলল, তোমাকে মেরে ফেলতে চাই না, তোমার ভাল করতে চাই।

এই বলে মা চলে গেল।

তারপর দিনকতক বৃষ্টি বাদলে কেটে গেল। সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তারপর আবার সূর্য উঠল আকাশে। নগ্ন নবীন সূর্যের আলো ঝলমল করতে লাগল সমুদ্রের বুকে। তাদের বাড়িটা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। জুলিয়েত সেদিন সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়েই সূর্যোদয় দেখল। জীবনে যেন এই প্রথম সূর্য ওঠা দেখছে সে। সমুদ্র-রেখাঙ্কিত দিগন্তের উপর সূর্যকে এমন করে নগ্ন ঋজু হয়ে দাঁড়াতে দেখেনি কখনো।

এবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে সূর্যের রোদে নগ্ন হয়ে গা ডুবিয়ে শুয়ে এক গোপন বাসনা জাগল তার মনে। আসলে সে চাইছিল চিরদিনের এই বাড়ি ছেড়ে মানব সমাজ থেকে দূরে যেতে। কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়, কারণ এখানে প্রতিটি অলিভ গাছেরও চোখ আছে।

অবশেষে একটা জায়গা খুঁজে পেল সে। জায়গাটা সমুদ্রের ধারে। তিন-দিকে

পাথর আর ক্যাকটাসের ঝোপ দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে মোটা গুঁড়িওয়ালা একটা সাইপ্রেস গাছ। সমুদ্রের দিকটা একেবারে খোলা।

সাইপ্রেস গাছের পাশে বসে একে একে তার পোশাকগুলো খুলে ফেলল জুলিয়েত। ক্যাকটাসকে লোকে কাঁটাওয়ালা ভালুক বললেও তার ঝোপটাকে ভাল লাগছিল তার।

সূর্য তখন নীল আকাশে কিরণ দিচ্ছিল। প্রথমে তার অনাবৃত বুকের উপর সমুদ্রের মৃদুমন্দ বাতাসের স্পর্শটা অনুভব করছিল সে। কিন্তু সূর্যের উত্তাপটা সে অনুভব করছিল না।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সে তার সারাদেহের মধ্যে সূর্যের উত্তাপটা অনুভব করল। সে উত্তাপ যে কোন প্রেম, তার স্তনদুগ্ধ ও শিশুসন্তানের হাতের উত্তাপের থেকে বেশী।

সব পোশাক খুলে নগ্নদেহে রোদে শুয়ে পড়ল জুলিয়েত। চিৎ হয়ে শুয়ে সূর্যের দিকে একবার তাকাল। দেখল সূর্যের ভিতরটা নীল আর গোলাকার। তার চারদিক হতে কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সূর্য নীল আগুনভরা দৃষ্টি দিয়ে তার, বুক, মুখ, তার গলা, তার জানু, জঙঘা, পেট, পা সব বিদ্ধ করছে।

চোখদুটো বন্ধ করে শুয়ে ছিল সে। তার চোখের পাতার উপর একটা গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। একটা গাছের পাতা কুড়িয়ে মুখের উপর চাপা দিল। তার মনে হলো সূর্যের আলোটা তার দেহগাত্র ভেদ করে অস্থি-মজ্জার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এমন কি তার চিন্তা ও আবেগানুভূতির গভীরেও প্রবেশ করেছে। তার আবেগানুভূতির বিভিন্ন কোণ থেকে সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল একে একে। তার চিন্তার সব জটগুলো খুলে যেতে লাগল আপনা থেকে। তার হিমশীতল বরফের মত কঠিন অন্তরটা গলে যেতে লাগল। এইভাবে সূর্যের মধুর উত্তাপটা সর্বদেহে ও মনে অনুভব করল সে। সে নিজের দেহটাকে উল্টে পাল্টে সে উত্তাপটা গ্রহণ করতে লাগল নিবিড়ভাবে।

এবার সে উঠে পোশাক পরে উপরে তাকিয়ে দেখল সূর্য আকাশের উপরে অনেকটা উঠে গেছে। সাইপ্রেস গাছের পাতাগুলো বাতাসে নড়ছে।

বাড়িতে গিয়ে তার মনে হলো চোখে যেন অন্ধকার দেখছে সব কিছু। তার অর্ধেকটা চেতনাও যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার মনে হলো তার চোখের এই অন্ধকার, তার চেতনার অর্ধ-বিলুপ্তিই এক পরম ঐশ্বর্য এবং সম্পদ তার কাছে।

তাকে দেখেই তার শিশুপুত্র 'মা' 'মা' বলে ছুটে এল তার কাছে। ছেলেকে কোলের উপর তুলে নিল সে। তারপর ভাবল এও যদি আমার মত প্রাণভরে সূর্যস্নান করত তাহলে এমন একতাল মাংসের মত হত না। সে লাফাত।

ছেলেটা তার গলাটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তার ভাল লাগছিল না। সে আস্তে আস্তে ছেলেটাকে নামিয়ে দিল কোল থেকে। বলল, যাও, রোদে ছুটে বেড়াওগে। রোদে খেলা করগে।

ছেলেটার মনে অভিমান জমে উঠেছিল। তার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু জুলিয়েত তার সামনে একটা কমলালেবু গড়িয়ে দিয়ে খেলা করতে লাগল তার সঙ্গে।

সূর্যের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হওয়ার ফলে এক বিরাট পরিবর্তন এল জুলিয়েতের জীবনে। ছেলের প্রতি যে দায়িত্ববোধ এক তীব্র উদ্বেগ হয়ে অনবরত পীড়িত করে তুলত তার মনটাকে সে বোধটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল সে। ছেলেটার প্রতি কোন আগ্রহ বা উদ্বেগ কিছুই রইল না যেন। সে শুধু ভাবত সূর্যের কথা। সূর্যের সকল উত্তাপ সকল ঐশ্বর্য সে তার দেহ মনের গভীরে চেতনার সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে শোষণ করে নিতে চায় সে।

সকালে সূর্য ওঠার অনেক আগেই জেগে ওঠে সে। তখন আকাশের কোলে কিছু মেঘের চাপ থাকে। গলন্ত সোনার মত সূর্য যখন এক নিরাবরণ নগ্নতায় আকাশে প্রথম ওঠে তখন সে সূর্য বড় লাজুক, বড় কুণ্ঠিত তার পদক্ষেপ। ক্রমে এই সূর্যের দৃষ্টি কেমন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। তারপর সে যতই আকাশের উপর উঠে যেতে থাকে ততই সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তার উত্তপ্ত প্রতাপের অসহনীয় তীব্রতা।

একমাত্র বৃষ্টির দিন ছাড়া প্রতিদিন সমুদ্রের ধারে সেই সাইপ্রেস গাছের কাছটায় চলে যায় সে। এখন সে আর বেশী পোশাক পরে যায় না। তার পরনে থাকে একটা স্কার্ট, গায়ে একটা ধূসর রঙের চাদর আর পায়ে একজোড়া চটি। ক্যাকটাস ঝোপে ঘেরা সেই নির্জন জায়গাটায় গিয়েই গা থেকে সবকিছু খুলে নগ্ন হয়ে পড়ে সে। নিজেকে সূর্যের অপ্রতিরোধ্য প্রতাপ আর পৌরুষের কাছে একবারে নগ্ন করে দিয়ে সকাল থেকে প্রায় দুপুর পর্যন্ত শুয়ে থাকে।

তার মনে হয় যে সূর্য তারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে কিরণ দেয় সেই সূর্য তার মত একটি নারীকেও কিরণদানে ধন্য করতে পারে। সে যেমন সূর্যের গতি-প্রকৃতি সব কিছু জানে, সূর্যও তেমনি তার সব কিছু জানে। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার মনের প্রতিটি দিক দিগন্ত এক দ্বিধাহীন নগ্নতায় অনাবৃত তার কাছে।

এই ভাবে সূর্যের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে ততই মানুষের সমাজ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে সে মনে মনে। কোন মানুষের সঙ্গ বা সাহচর্যই ভাল লাগে না তার।

একদিন সে তার ঝি মেরিয়ানাকে বলল, ডাক্তার সূর্যস্নান করতে বলছে। এটাই যথেষ্ট। আর কোন ওষুধ লাগবে না আমার।

মেরিয়ানার বয়স ষাটের উপর। লম্বা খাঁড়া চেহারা। জীবনে তার অভিজ্ঞতা অনেক। সে বলল, কিন্তু বেশী রোদ লাগলে গায়ের রূপ যে নষ্ট হয়ে যাবে। শেষে যেন সূর্যকে দোষ দিও না।

জুলিয়েত কিছু না বলে শুধু মনে মনে ভাবল, সে রূপসী কিনা তা জানে না, তার দেহে রূপসৌন্দর্য বলে যদি কিছু থাকে ত একমাত্র সূর্যের কাছেই তা পাবে উপযুক্ত সমাদর।

এক একদিন সূর্যস্নান শেষ করে পাহাড়ের ধারে লেবুগাছের ছায়াতলে একটা জলাশয়ের পাশে বেড়াত জুলিয়েত। একদিন সে তার ছেলেটাকেও নিয়ে গেল। তাকেও একবারে নগ্ন করে সূর্যস্নান করাল। তারপর ছেলেটা ছুটে ছুটে খেলা করে বেড়াতে লাগল। জুলিয়েত বলল, দেখো যেন কাঁটা না লাগে।

সেবার ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে দারুণ গরম পড়ল। সামান্য বাতাস লাগতেই বাদামের কুঁড়িগুলো গোলাপী তুষারকনার মত ঝরে পড়তে লাগল গাছ থেকে। জুলিয়েত কিন্তু যথারীতি ছেলেকে নিয়ে সূর্যস্নানে যেতে লাগল সমুদ্রের ধারে সেই সাইপ্রেস গাছটার তলায়। এক একদিন সমুদ্রেও স্নান করত সে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাটাত সে সেখানে। ছেলেটা সর্বক্ষণ ছোটাছুটি করে খেলে বেড়াত। লেবু ফুল তুলত।

একদিন ছেলেটা তার মাকে ডেকে বলল, দেখ মা, একটা সাপ।

জুলিয়েত গিয়ে দেখল পাথরের ধারে সত্যিই একটা সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভাঙ্গায় বিরক্ত হয়ে সে পাথরের পাশ দিয়ে একটা গর্তের ভিতর চলে গেল।

আর একদিন জুলিয়েত একটা কালো সাপ দেখে। সে বাড়িতে গিয়ে মেরিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করে, কালো সাপ কামড়ায়?

মেরিয়ানা বলল, কালো সাপের বিষ নেই। কিন্তু হলদে সাপে কামড়ালে মানুষ বাঁচে না।

মার্চ মাসে সূর্যের রোদ আরো প্রখর হয়ে উঠল। কিন্তু সেই প্রখর রোদেও বেশ কিছুক্ষণ সেইখানে শুয়ে থাকত জুলিয়েত। তারপর সে চলে যেত লেবু গাছের শীতল ছায়াভরা কুঞ্জবনে। ছেলেটা প্রাণোচ্ছল এক জন্তুর মত ছুটে বেড়াত কিছু দূরে।

একদিন জুলিয়েত একটা জলাশয়ে স্নান করার পর সমুদ্রের ধারে ঢালু

কিনারাটায় বসেছিল। এমন সময় মেরিয়ানা একটা কালো কাপড় মাথায় বেঁধে ছুটতে ছুটতে এসে তাকে ডাকল, সিনোরা জুলিয়েত্তে!

জুলিয়েত উঠে ঘুরে দাঁড়াল। তার অনাবৃত দেহ দেখে মেরিয়ানা কিছুক্ষণের জন্য থামল। তার রোদেপোড়া সুন্দর সোনালী চুলের গোছাগুলো পিঠের উপর ছড়িয়েছিল। সত্যিই আগের থেকে জুলিয়েত যেন অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছে। সে যেন হয়ে উঠেছে এক নতুন মানুষ।

মেরিয়ানা তার কাছে সরে গিয়ে বলল, সত্যিই কত সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। তোমার স্বামী এসে গেছে।

আমার স্বামী! বিস্ময়ে চমকে উঠে জুলিয়েত।

তোমার স্বামী নেই?

কোথায় সে?

মেরিয়ানা তার পিছনে কিছুদূরে হাত বাড়িয়ে দেখাল। এখানে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

মেরিয়ানার দিকে তাকিয়ে জুলিয়েত বলল, ঠিক আছে। তাকে আসতে বল।

একটুখানি বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে মেরিয়ানা বলল, এখানে আসতে বলব? ঠিক আছে, তুমি যা চাও।

ছেলেটা তখন গাছ থেকে একরাশ লেবু ফুল পেড়ে তার বুকের উপর একটা হাত দিয়ে আটকে রেখে ছিল। মেরিয়ানা হাসিমুখে ছেলেটাকে বলল, দেখ দেখ, ছেলেটাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর বাবা দেখে খুব আনন্দ পাবে।

জুলিয়েত বলল, ওকে নিয়ে এস এখানে।

ওদিকে ধূসর রঙের একটা টুপি আর ধূসর রঙের পোশাক পরে আঙ্গুর ক্ষেতের কাছে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মরিস। সত্যিই পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

মেরিয়ানা তাকে ডাকল, এখানে চলে এস। এই নিচু জায়গাটায় ও আছে।

ঘাসে ঢাকা একটা উঁচু জায়গায় উঠে মেরিয়ানা মরিসকে বলল, এবার নেমে ঐখানে যাও।

সেখান থেকে চলে গেল মেরিয়ানা। তাকে ধন্যবাদ দিল মরিস।

জুলিয়েত একটা বড় পাথরের আড়ালে নগ্ন দেহে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মরিস প্রথমে তাকে দেখতে পায়নি। সে জুলিয়েতের অনাবৃত দেহটা দেখেই লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর ভয়ে ভয়ে ডাকল, জুলি, জুলি! চমৎকার!

মরিস জুলিয়েতের অনাবৃত দেহটার দিকে সলজ্জভাবে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এল। তার মনে হলো জুলিয়েতের দেহটা অনাবৃত থাকলেও তার সোনালী গোলাপী চামড়ার আবরণ তার দেহটাকে ঢেকে রেখেছে।

জুলিয়েত বলল, হ্যালো মরিস, আমি তোমাকে এত তাড়াতাড়ি আশা করিনি।

না, আমি কাজটা সেরে একটু তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে মরিস কাশতে লগল। বলল, চমৎকাব লাগছে তোমায়। ছেলেটা কোথায়?

জুলিয়েত লেবু গাছের গভীর ছায়াভরা কুঞ্জবনের দিকে একটি নগ্ন ছেলের পানে তাকিয়ে বলল, ঐ দেখ ওখানে।

মরিস বলল, খুব ভাল। চমৎকার হয়েছে ছেলেটা। হ্যালো জনি!

ছেলেটা লেবু ফুলগুলো আঁকড়ে ধরে তাকাল একবার। জুলিযেত বলল, চল, আমরা ওর কাছে যাই।

মরিস তার স্ত্রীর সঙ্গে ছেলেটার কাছে গিয়ে বলল, হ্যালো জনি, তোমার বাবাকে চিনতে পারছ?

জনি এসে তার বাবার হাত ধরে বলল লেবু, দুটো লেমন।

তার বাবা বলল, অনেক অনেক লেবু।

জনি তার বাবার দুটো হাতে দুটো ফুল গুঁজে দিল। তারপর বলল, বাবা আবার চলে যাবে?

মরিস বলল, হ্যাঁ যাব, কিন্তু আজ নয়।

ছেলেকে কোলে তুলে নিল মরিস। জনি বলল, বাবা, তোমার কোটটা খুলে ফেল।

মরিস তার কোটটা খুলে নিচে নামিয়ে রাখল। তারপর ছেলেকে কোলে তুলে নিল। জামাপরা এক শহুরে ভদ্রলোক উলঙ্গ একটি শিশুকে কোলে তুলে নিল, নিজে নগ্নদেহে দাঁড়িয়ে তা দেখল জুলিয়েত। জনি তার বাবার টুপিটা খুলে ফেলল। জুলিয়েত দেখল মরিসের মাথার ধূসর-কালো চুলগুলো ঠিক বিন্যস্ত আছে।

জনি তার বাবাকে ভালবাসে বলে অনেকক্ষণ চেপে রইল তার কোলে।

জুলিয়েত একসময় তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে এ-বিষয়ে কি ঠিক করলে?

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মরিস বলল, কি বিষয়ে জুলি?

আমার যাওয়ার বিষয়ে। আমি কিন্তু তোমার কাছে গিয়ে থাকতে পারব না।

না না, আমিও তোমাকে এখন যেতে বলছি না।

শুধু এখন না, কখনই না।

ঠিক আছে, পরে ভেবে দেখা যাবে।

তুমি কি মনে করো আমার এখানে তুমি থাকতে পারবে?

হ্যাঁ। মাসখানেক আমি এখানে থাকতে পারব। একটা মাস আমি কাজকর্ম সামলে নেব।

এই বলে কুণ্ঠা ও লজ্জার সঙ্গে তার স্ত্রীর মুখপানে তাকিয়ে তার কথার প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করল।

জুলিয়েতও তার স্বামীর পানে নীরবে তাকাল। তার বুকের স্তনদুটো যেন উচ্চকিত ও উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল সহসা। এক গোপন অসহিষ্ণুতা ও বিতৃষ্ণার দমকা হাওয়ায় কেঁপে উঠল যেন সে।

সে বলল, আমি ওখানে যেতে পারব না। তুমি যদি না আসতে পার এখানে—

স্ত্রীর দেহসৌন্দর্যে ক্রমশই মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ হয়ে উঠল মরিস। সে বলল, ঠিক আছে তোমাকে যেতে হবে না। এ জায়গাটা যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে এখানেই থাকবে তুমি। তোমাকে আর যেতে হবে না।

অতীতের কথাগুলো একবার মনে করে দেখল মরিস। সে জানে সে যখন নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাটে তার স্ত্রীকে নিয়েছিল তখন কত অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে তাকে। বিশেষ করে সন্তান হওয়ার পর থেকে আরো বেশী বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে স্ত্রী তার প্রতি। মেয়েরা এই রকমই। তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই অনেক সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাদের মন। যার মনের চিন্তা ভাবনা আবেগ অনুভূতি তার সম্পূর্ণ বিপরিত এমন একটি নারীকে নিয়ে এক ঘরে বাস করা কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তার স্ত্রীর অকারণ শত্রুতার জাঁতাকলে দিনের পর দিন নিষ্পেষিত হয়েছে সে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সে আর চায় না। তাতে যা হয় হোক। তাতে যা তাকে করতে হয় সে করবে।

জুলিয়েত এবার তার স্বামীকে বলল, কিন্তু তুমি কি করবে?

আমি আমার ব্যবসাই করে যাব। তুমি যতদিন থাকবে এখানে ছুটি পেলেই চলে আসব। ছুটিগুলো এখানে কাটাব।

মরিসের দৃষ্টির মধ্যে অস্বস্তিকর এক প্রার্থনার সকরুণ আবেদন ছিল।

জুলিয়েত বলল, চিরদিন এইভাবে চলবে?

হ্যাঁ। তুমি যদি চাও চিরকালই এভাবে চলবে।

আমি তাহলে যা খুশি তাই করব?

এই বলে সে স্বামীর দিকে সরাসরি তাকাল উদ্ধতভাবে। অনেক আলো হাওয়ার ঘা খাওয়া তার শক্ত সুন্দর দেহের অনাবৃত ঐশ্বর্য সম্ভারের সামনে নিজেকে অসহায়বোধ করছিল মরিস।

অবশেষে মরিস বলল, যতদিন তুমি তোমার নিজের বা ছেলেটার কোন ক্ষতি

না করবে ততদিন এইভাবেই চলবে।

না, ক্ষতি আমি করব না।

না, আমিও তা মনে করি না।

এরপর দুজনেই চুপ করে গেল। গাঁয়ে—কোথায় মধ্যাহ্নকালীন ঘণ্টা বাজল তার মানেই লাঞ্চের ডাক।

নিজে পোশাক পরে এবং ছেলেটাকে জামা পরিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়ে পড়ল জুলিয়েত। মরিস তাদের সঙ্গে যেতে লাগল।

খাওয়ার টেবিলে জুলিয়েত তার স্বামীর বেশভূষা ও শহুরে কেতাদুরস্ত হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগল বারবার। মরিসও তার স্ত্রীর দিকে বারবার তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। কিন্তু তার সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল এমন এক গৃহপালিত জন্তুর ভীরুতা যে জন্তু আশৈশব বন্দীত্বের মধ্যেই লালিত পালিত হয়েছে।

খাওয়ার পর বারান্দায় কফি খেতে গেল তারা। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পা দিয়ে জুলিয়েত দেখতে পেল তাদের বাড়ি থেকে কিছুদূরে একটি বাদাম গাছের তলায় সবুজ গমের ক্ষেতের ধারে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছে এক চাষী দম্পতি। মাটির উপর একটুকরো সাদা কাপড় পাতা। তাদের সামনে ছিল একটা বড় পাঁউরুটি আর দুটো গ্লাস ভরা কালো মদ।

ওদের দেখার জন্য কৌশলে জুলিয়েত বাইরের দিকে মুখ করে বসল, আর তার স্বামীকে বাইরের দিকে পিছন ফিরে তার দিকে মুখ করে বসাল।

সমুদ্রের ধারে সূর্যস্নান করতে গিয়ে এর আগে চাষীটিকে অনেকবার দেখেছে জুলিয়েত। কথাবার্তা না হলেও তাকে বেশ ভালভাবেই চিনত। চাষীটির বয়স ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ, চওড়বুক, বলিষ্ঠ চেহারা। তার স্ত্রীকে সুন্দরী বলা যায়। তবে গম্ভীর প্রকৃতির। তাদের কোন ছেলেপুলে ছিল না।

চাষীটা মাঠে প্রায়ই সাদা পায়জামা আর রঙীন জামা পরে কাজ করত। তার গায়ে যেমন শক্তি ছিল তেমনি সে ছিল কর্মঠ এবং প্রাণচঞ্চল। তার মাথায় থাকত একটা বেতের টুপি। তার মুখখানা ছিল গোল আর থ্যাবড়া। গোঁফের আর ভ্রূর চুলগুলো বাদামী রঙের। একদিন জুলিয়েত তাকে দেখার আগে সে দেখতে থাকে জুলিয়েতকে। জুলিয়েত তার মাথার টুপি খুলে লজ্জায় মুখটা নামিয়ে নেয়।

তারপর থেকে সমুদ্রে যাবার সময় রোজই কিছুটা দূর থেকে দেখতে পেত তাকে জুলিয়েত। তাকে দেখে তার মনে হত লোকটা স্বাধীনচেতা এবং তার স্ত্রী তাকে খুব ভালবাসে। আবার তার দেহমনের পূর্ণতায় তার স্ত্রী ঈর্ষাবোধও করে। কারণ সে জানে সে তার স্বামীর কাছ থেকে যা চায় তার থেকে অনেক বেশী কিছু দেবার

ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য তার আছে।

একদিন জুলিয়েত দেখে একটা গাছের তলায় একদল চাষীর মাঝখানে সেই চাষীটি আনন্দে নাচছে আর তার স্ত্রী তার সেই নাচ দেখছে।

এইভাবে জুলিয়েত আর ঐ চাষীটি সচেতন হয়ে ওঠে পরস্পরের প্রতি। দূরে থেকেও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। সকালে কখন সে তার গাধা নিয়ে মাঠে আসবে তা জানত জুলিয়েত। একদিন সে না এলে মনটা কেমন করত।

আজ তাকে বারান্দায় দেখতে পেয়েই চাষীটি তাকে চিনতে পেরে মুখ তুলে তাকায় তার পানে।

একদিন সকালে জুলিয়েত যখন নগ্নদেহে হেঁটে বেড়াচ্ছিল তখন চাষীটি কাঠ জড়ো করে তার গাধার পিঠে চাপাচ্ছিল। সে জুলিয়েতকে দেখতে পেয়েই লজ্জা পায়। পিছন ফিরে চলে যায় জুলিয়েত। তবু তার চোখে চোখ পড়তেই সে বুঝতে পারে উত্তপ্ত কামনার যে অগ্নিশিখা তার আপাত সলজ্জ চোখদুটিতে ফুটে ওঠে সেই অগ্নিশিখাই তার শিবায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে গলিয়ে দিচ্ছে তার অস্থিমজ্জাগুলোকে।

লোকটা এত নীরবে কাজ করছিল যে জুলিয়েত তা বুঝতেই পারেনি আগে হয়ত।

এরপর তার নিজের সেই নির্জন জায়গাটায় চলে যায় জুলিয়েত।

এরপর থেকে কেউ বাইরে প্রকাশ না করলেও এক দুর্বোধ্য জটিল চেতনার এক বেদনা অবদমিত হতে থাকে দুজনের দেহের মধ্যে। চাষীটির স্ত্রী হয়ত এর কিছুটা জানতে পারে।

তখন একদিন ভাবতে থাকে জুলিয়েত, কেন আমি ঘন্টাখানেকার জন্য লোকটির সঙ্গে মিলিত হয়ে তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করব না? কেন আমি শুধু একটি লোকের সঙ্গে সারা জীবনটাকে জড়িয়ে রাখব আমার? আমাদের দুজনের মধ্যেই যখন কামনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলছে তখন কেন শুধু একটি বারের জন্য সাধ মিটিয়ে সে কামনাকে চরিতার্থ করব না? কিন্তু কোনদিন তার এই মনের কথাটা ইশারাতেও জানায়নি লোকটাকে।

আজ সেই চাষীটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর তার স্ত্রী দেখছে তার স্বামীকে। তার স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষা হলো জুলিয়েতের।

একথা ভাবতে খারাপ লাগছিল আজ জুলিয়েতের যে মরিসের চোখের পানে তাকিয়ে সে বেশ বুঝতে পেরেছ তার সন্তান আবার গর্ভে ধারণ করতে হবে তাকে।

সে একবার মরিসকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমিও আমার সঙ্গে সূর্যস্নানে যাবে?

নগ্নদেহে আমার সঙ্গে বেড়াবে সমুদ্রের ধারে?

মরিস তখন বলেছিল, হ্যাঁ, যখন রয়েছি এখানে তখন নিশ্চয় যাব। জায়গাটা সত্যিই খুব নির্জন।

জুলিয়েত দেখল মরিস লোকটা ভীরু প্রকৃতির হলেও এক্ষেত্রে আর সব পুরুষের মত এক পৌরুষসুলভ কামনায় উত্তপ্ত ও উদ্দীপ্ত। তার নির্লজ্জ দৃষ্টি এরই মধ্যে নিবদ্ধ হয়েছে তার চাদর-ঢাকা উত্তুঙ্গ স্তনযুগলের উপর। তা হোক, কিন্তু লোকটার গায়ে সভ্য জগতের ছাপ। সভ্য জগতের যত সব জটিল বন্ধনের গন্ধ তার গায়ে।

আসলে সে চেয়েছিল সেই স্বাধীনচেতা গ্রাম্য চাষীটার কাছে গিয়ে তার সন্তান গর্ভে ধারণ করতে কিন্তু তা আর হলো না। অকালে শুকিয়ে যাওয়া গোলাপের পাপড়িগুলোর মত তার কামনার কুঁড়িগুলিও ফুটতে না ফুটতেই শুকিয়ে ঝরে গেল।

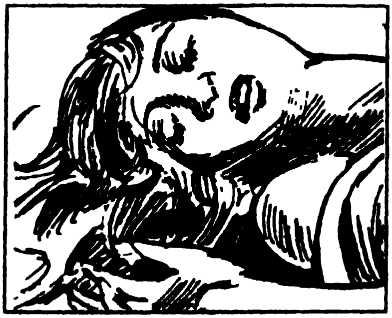
মরিসের সন্তানকেই আবার গর্ভে ধারণ করতে হবে তাকে।

মূল গল্প ❑ দি সান

টমাস মান

জন্ম ১৮৭৫, মৃত্যু ১৯৫৫। ১৯২৯-এ সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন জার্মান কথাসাহিত্যিক টমাস মান। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ঃ দ্য ম্যাজিক মাউনটেন, ডেথ ইন ভেনিস, ডক্টর ফষ্টাস এবং কনফেসনস অফ এ কনফিডেন্টম্যান। 'জোসেফ' সিরিজের চারটি উপন্যাস এবং ভারতীয় উপকথার পটভূমিতে লেখা 'দ্য ট্র্যানসপোজড হেডস' অনন্য স্মরণীয় সৃষ্টি। প্রুস্ত ও জয়েসের মতই মানুষের অন্তর্লীন অচিন মানুষ ছিল তাঁর ভাবনার কেন্দ্র। কিন্তু চেতনাতরঙ্গের বিশ্লেষণে বা স্মৃতিচারণে তাঁর আসক্তি ছিল না। যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা ব্যক্তি-মানুষকে কিভাবে ঘিরে আছে এবং মানুষ কিভাবে মৃত্যু ও সময়কে জয় করেঃ এই ভাবনাই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। হিটলারের আমলে জার্মানী থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন মান, প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডে ও পরে অ্যামেরিকায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। অথচ অতীতে তিনিই 'রিফ্লেকশনস অফ অ্যান আনপলিটিক্যাল ম্যান' নামক গ্রন্থে জার্মান জাতীয়তাবাদকে সমর্থন জানিয়েছিলেন! শিল্পীর সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধের বিশ্লেষণে আঁদ্রে জিদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আত্মবিশ্লেষণের বৃত্ত জিদের মত তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি।

বর্তমান কাহিনীটি মানের হিউমারধর্মী প্রেম কাহিনী 'কনফেসনস অফ এ কনফিডেন্স ম্যান' থেকে গৃহীত।



কামনাবাসনা

টমাস মান

লিফট চালানো খুবই সহজ ব্যাপার। চেষ্টা করলে অল্প সময়েই শিখে নেওয়া যায়। আমার সুন্দর য়্যুনিফর্মটা আমার খুবই পছন্দ এবং যে মহিলারা আমার লিফটে ওঠানামা করে, তাদের চাহনির ধরণ থেকে বুঝি, তাদেরও পছন্দ। তাছাড়া নতুন নামটা আমার পছন্দ হয়েছিল। কাজের ধরণটাও মজার মনে হয়েছিল। কিন্তু যদিও ব্যাপারটা ছেলেখেলা, সামান্য বিরতির সময় বাদ দিয়ে সকাল সাতটা থেকে রাত বারোটা অবধি কাজ করা খুবই ক্লান্তিকর। এমন একটা দিনের শেষ লোকে দেহমনে ক্লান্ত হয়ে কোনমতে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ে। একনাগাড়ে ষোল ঘণ্টা। মধ্যে সংক্ষিপ্ত বিরতির সময়। লিফটম্যানরা তখন পালা করে রান্নাঘর ও ডাইনিং হলের মাঝমাঝি একটা খাওয়ার ঘরে ঢোকে। জঘন্য খাবার। বাসি, পচা, পাতকুড়োনো হাবিজাবি রান্না। জেলে ছাড়া অন্য কোথাও এতো জঘন্য খাবার আমি খাইনি। কাজের সময় তো ছোট্ট বন্ধ ঘরের ভেতরে, যেখানে হাওয়া লিফট যাত্রিনীদের ব্যবহৃত সেন্টের গন্ধে ভারী, সেই বন্ধ আবহাওয়ায় কন্ট্রোল চালু রাখতে হবে, ইনডিকেটর দেখতে হবে, নির্দেশমত থামতে হবে, লোক তুলতে হবে, তাদের জায়গামত নামিয়ে দিতে হবে এরই মধ্যে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের নির্বোধ অসহিষ্ণুতা দেখে আমার অবাক লাগতো। যখন লবিতে ওঁরা অনর্গল ঘণ্টি বাজাতেন, ওঁরা খেয়ালও করতেন না যে আমি চারতলা থেকে একলাফে একতলায় নামতে পারিনা, আমাকে প্রত্যেক তলায় থামতে হবে, যাঁরা নামতে চান তাঁদের অভিবাদন জানিয়ে হাসিমুখে যেতে দিতে হবে।

আমি একটু বেশী হাসতাম, বলতাম, 'মসিয়েঁ ও মাদাম, সাবধানে পা ফেলবেন।' যদিও ওসব বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন ছিল। কারণ প্রথম দিনেই শুধু লিফট থামাতে একটু ঝাঁকি দিয়েছি। তারপর আর কোন ভুল হয়নি। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধা মহিলাদের হাত

ধরে সাহায্য করতাম। ভাবটা এমনই যেন লিফট থেকে বের হতে ওঁদের কষ্ট হচ্ছে। বিনিময়ে পেতাম ঘাবড়ে-যাওয়া চাউনিতে ধন্যবাদের ইঙ্গিত, কখনো বা বিষণ্ণতা মেশানো এক ধরণের ছেনালি, বয়স্কা মহিলাদের যুবকেরা ভদ্রতা দেখালে ওঁরা যে রকম ভাব দেখান, সেই রকম আর কি। কেউ কেউ আবার খুশী হয়েছেন বলে মনে হতনা। তাঁদের হৃদয় শীতল ও শূন্য। শ্রেণীগত অহংকার ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই। যুবতীদেরও আমি সাহায্যে করতাম। তারা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে ধন্যবাদ জানালে আমার দৈনন্দিন কাজের একঘেঁয়েমি কেটে যেতো। আসলে আমার এইসব ভদ্রতার লক্ষ্য ছিল এমন একজন যুবতী, যার জুয়েল-কেসটা কিছুদিন আগে আমি চুরি করেছি এবং যার জুয়েলারী চোরাই মালের দোকান বেচে সেই পয়সায় আমি কিনেছি আমার বোতাম লাগানো নতুন জুতোজোড়া, আমার ছাতা, আমার পোষাক। যুবতীর জন্যে আমাকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

দ্বিতীয় দিনে বিকেল পাঁচটা নাগাদ। আর একটা লিফটের লিফটম্যান ওহ্‌ষ্টাশ-ও লিফট থামিয়েছে একতলায়, ঠিক তখনই মাথায় হ্যাট ও স্কার্ফপরা সেই যুবতী এল। আমার সহকর্মীর চেহারাটা একেবারেই সাধারণ। তাই বড় বড় চোখে আমাকে দেখলো যুবতী, হাসলো, কোন্ লিফটে উঠবে তাই নিয়ে একটু দ্বিধা দেখালো এবং ওহ্‌ষ্টাশ হাত নাড়ছে দেখে এবার ওর লিফটের পালা ভেবে ওর লিফটে চড়ার সময় আমার দিকে তাকালো, চোখ দুটো আবার বড় বড় হলো। পরে ওহ্‌ষ্টাশের কাছে জানা গেল, মহিলা বিবাহিতা।

ওঁর নাম মাদাম হুপফ্রেহ্।

পরের দিন একই সময়—অন্য দুটো লিফট ওপরে উঠে গেছে, নীচের তলায় লিফটের সামনে একা দাঁড়িয়ে আছি আমি। যুবতী এল। ওর পরনে লম্বাঝুল, পশুলোমের তৈরী, দামী ও সুন্দর জ্যাকেট এবং একই রং-এর পশুলোমের টুপি। আমাকে দেখে ও খুসী হয়ে মাথা নাড়লো। আমি অভিবাদন জানিয়ে এমন গলায় 'মাদাম' বললাম, যেন নাচের আসরে ওকে পার্টনার হতে বলছি! আমার সঙ্গে আলোজ্বলা বন্ধ ঝুলন্ত ঘরে ঢুকলো মাদাম। ইতিমধ্যে চারতলা থেকে ভেসে এল ঘন্টির শব্দ।

'তুমি তো নতুন, নাম আর্মাদঁ, তাই না?'

'আপনার সেবক, মাদাম।'

'তোমার গলার স্বরটা ভারী সুন্দর।'

চারতলার ঘন্টি বেজেই চলেছে। আমরা দোতলায় উঠেছি। আমি বিনীতভাবে মহিলার কনুই ধরে লিফট থেকে বের হতে সাহায্য করলাম, যদিও সত্যিই তার কোন দরকার ছিল না।

'মাদাম, আপনার অনুমতি পেলে প্যাকেটগুলো আপনার ঘরে বয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

লিফট ছেড়ে প্যাকেটগুলো বয়ে নিয়ে করিডর বেয়ে মহিলার পেছন পেছন বিশ কদম এগিয়ে বাঁ দিকের তেইশ নম্বর স্যুইটে ঢুকলাম আমি। আমাকে বেড়রুমে ঢুকতে বলা হয়। সাজানোগোছানো বেডরুম—হার্ডউডের মেঝেতে পারস্য-গালিচা, চেরীকাঠের ফার্নিচার, টয়লেট টেবিলে অনেক ঝকঝকে জিনিষ, সাটিনের চাদরে ঢাকা পেতলের তৈরী চওড়া খাট, সিল্কের পর্দা। কাঁচঢাকা টেবিলে প্যাকেটগুলো রাখলাম আমি। পশুলোমের তৈরী জ্যাকেট খুলে যুবতী বলে—

'আমার ঝি এখানে নেই। ও ওপরতলার ঘরে থাকে। তুমি আমার কোট খুলতে সাহায্য করবে?'

'আনন্দের সঙ্গে।'

আমি বললাম। রেশমের লাইনিং দেওয়া পশুলোমের কোটটা ওর কাঁধ থেকে খুলছি, যুবতী আমার দিকে তাকালো। ওর মাথার চুল পুরু, রং বাদামী, কিন্তু সামনে চুলের কোঁকড়ানো একটা বলয়ের রং সাদা। চোখ দুটো একবার বড় হল, আবার ছোট। যেন ও স্বপ্ন দেখছে। যেন ও জলে ভেসে যাচ্ছে। ও বললো—

'সামান্য চাকর হয়ে তোমার এতো সাহস যে তুমি আমায় উলঙ্গ করছো?'

'মাদাম, আপনার বর্ণনামাফিক কাজটা সম্পূর্ণ করার সময় আমার থাকলে কতো ভালো হত, ঈশ্বর জানেন—'

'আমার সঙ্গে কাটাবার মত সময় তোমার নেই?'

'এই মুহূর্তে নেই, মাদাম। আমার লিফট অপেক্ষা করছে। ওপরতলায় ও নীচেরতলায় অনেক লোক লিফটের জন্যে ঘন্টি বাজাচ্ছে। হয়তো নীচের তলায় ভীড় জমে গেছে। আর দেরী করলে আমার চাকরী যাবে।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে কাটাবার মত সময় তোমার হবে?'

'অন্তহীন সময়, মাদাম।'

'কখন সময় হবে?'

কথা বলতে বলতে মহিলার চোখ বড় হয়, চোখের তারায় সেই স্বপ্নদেখা ভেসে-যাওয়া দৃষ্টি, নীলচে ধূসর স্যুটপরা রমনী শরীর আমার কাছে আসে।

'রাত এগারোটায় আমার ডিউটি শেষ হবে।'

'আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো, কথা দিলাম।'

'ও কি করতে যাচ্ছে বুঝতে পারার আগেই আমার মাথাটা ওর হাতে বাঁধা পড়লো এবং আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুমু খেলো মহিলা।

প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ধরণটা একটু অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে।

ওর জ্যাকেটটা রেখে যখন আমি ওর ঘর ছেড়ে এলাম, আমাকে নিশ্চয়ই খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। লিফটের খোলা দরজার সামনে তিনজন লোক অবাক হয়ে অপেক্ষা করছে। অপ্রত্যাশিত একটা কাজে ডাক আসায় দেরী হয়েছে বলে ক্ষমা চাইলাম, ওদের নীচে নামাবার আগে চারতলায় লিফট তুলতে হল বলে ক্ষমা চাইতে হল। কিন্তু চারতলায় যে ঘন্টি বাজিয়েছিল তাকে পেলাম না। নীচে লিফট নামাতে কাজে গাফিলতির জন্যে কথা শুনতে হল। বললাম, একজন মহিলার মাথা ঘুরছিল বলে তাঁকে ঘর অবধি পৌঁছে দিতে হয়েছে।

মাদাম হুপফ্রেহ্-র মাথা ঘুরবে? কি সাহস মহিলার । আমার চেয়ে বয়স বেশী বলে এবং সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দা বলে আমার থেকে বেশী সাহস।

'সামান্য চাকর হয়ে এতো সাহস....'

—কি সুন্দর কথাটা বললো, যেন কবিতার মত—

'তুমি আমায় উলঙ্গ করছো?'

উত্তেজনা-জাগানো কথাগুলো সারা সন্ধ্যা আমার মনে জেগে রইলো দুঘন্টা ধরে। যতোক্ষণ না আবার ওর সঙ্গে দেখা হল। 'চাকর' কথাটা আমাকে একটু আঘাত দিল, 'কিন্তু 'উলঙ্গ করা', যে কথাটা আমি ভাবিনি, আমার যে উদ্দেশ্য ছিল বলে মহিলা ভেবেছে, কথাটা ভেবেই আমার গর্ব হল। তাছাড়া প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বহরটা যেরকম— সন্ধ্যে সাতটায় আমার লিফটে চড়ে ডিনার খেতে নামলো মহিলা। তখন লিফটে অন্য লোকও ছিল। মহিলার পরণে এখন সাদা রেশমের অদ্ভুদ সুন্দর পোষাক, লেস লাগানো জামার এমব্রয়ডারী, কোমরে কালো সার্টিনের বেল্ট এবং গলায় ঝকঝকে উজ্জ্বল দুধ-সাদা সাচ্চা মুক্তোর নেকলেস। (দুর্ভাগ্য, জুয়েল-কেসটা চুরি করার সময় মুক্তোর হারটা ওর মধ্যে পাইনি।) একটু আগে অতো জোরে চুমু খাওয়ার পর এখন আর আমার দিকে তাকাচ্ছেই না মহিলা। আমার একটু খারাপ লাগলো! প্রতিশোধ হিসেবে আমি ওর বদলে এক বিচ্ছিরি চেহারার বুড়ীকে হাত ধরে লিফট থেকে বের হতে সাহায্য করি।

ও হাসে ও কখন নিজের ঘরে ফিরেছে আমি জানি না। এগারোটার সময় আমার ছুটি হল। বাথরুমে ঢুকে সাফসুৎরো হয়ে নিলাম, তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামলাম। করিডরের লাল কার্পেটে পায়ের শব্দ হয়না। ২৫ নম্বরে বসবার ঘরের দরজায় ঘা দিয়ে শব্দ না পেয়ে আমি ২৩ নম্বরের বাইরের দরজা খুলে ভেতরের দরজায় আলতো টোকা দিলাম। একটু যেন অবাক হয়ে ভেতর থেকেও বললো—

'এসো'। অবাক হওয়ার ধরণটাকে পাত্তা না দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকি। সিল্কের শেড দেওয়া ল্যাম্প থেকে ম্লান লালচে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকাণ্ড ঝকমকে পেতলের খাটে লাল সাটিনের চাদরের নীচে সুন্দরী, হাত দুটো মাথার পেছনে জড়ো

করা, পরণে খাটো ঝুল লেস-লাগানো ক্যাম্বিজের নাইটগাউন। রাতে শোবার আগে চুল খুলে মাথার চারপাশে টায়রার মত বেঁধেছে রূপসী। আমি ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়। বিছানা থেকে একটা তার টেনে দরজার ছিটকিণি খোলা বন্ধ করা যায়।

সোনালী চোখদুটো একটু বিস্ফারিত হয়। লহমার জন্যে। যেন একটু নার্ভাস হয়ে বলে মহিলা—

'একি, হোটেলের কর্মচারী, সাধারণ লোক শোয়ার পর আমার বেডরুমে ঢুকছে?'

'আপনি তাই চেয়েছিলেন, মাদাম। আপনার ইচ্ছেমতো—'

আমি খাটের কাছে যাই।

'আমার ইচ্ছে? মানে কোন মহিলা যেমন লিফটম্যানকে অর্ডার দেন? আসলে তুমি বলতে চাইছো আমার নির্লজ্জ প্রতীক্ষা, তপ্ত কামনা, নগ্ন বাসনার কথা। তুমি দেখতে সুন্দর, বয়সে যুবক, স্বভাবে উদ্ধত। আমার ইচ্ছে? বলতো, তোমার ইচ্ছে কি আমারই ইচ্ছের মতো?'

তারপর সে আমার হাত ধরে বিছানার ধারে বসায়। ব্যালান্স রাখার জন্যে আমাকে হাত বাড়িয়ে বিছানার মাথার দিকটা ধরতে হয়।

ফলে আমি লিনেন ও লেসে হাল্কাভাবে ঢাকা নগ্ন শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ি। ও বারবার আমার সামান্য জীবিকার কথা বলছে কেন, আমি বুঝিনা। আমি ঝুঁকে পড়ে ওর ঠোঁটে ঠোঁট মেশাই, ওর দিক থেকে সহযোগিতার অভাব হয় না। ও আমার হাত ধরে হাতটা ওঁর পোষাকের ভেতর বুকের ওপরে নিয়ে যায়। ওর স্তন, আমার হাত—চমৎকার মিশে যায়। ও আমার হাতটা মনিবন্ধের কাছ ধরে এমনভাবে নাড়ায় যে, আমার পৌরুষ জেগে ওঠে। আমার পুরুষাঙ্গের দিকে তাকিয়ে খুসী হয়ে ও বলে—

'সুন্দর যুবক, যে শরীর তোমার কামনা জাগিয়েছে, তার থেকে তুমি সুন্দর।'

তারপর সে দুহাতে আমার জ্যাকেটের কলার খোলে, আমার জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলে—

'খুলে ফেলো। সব বাধা দূরে যাক। যেন আমি দেবতার শরীর দেখতে পারি। তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকে নগ্ন দেবতার বাহু আমি দেখতে চেয়েছি। এই তো! দেবতার মত বুক, কাঁধ, হাত। এবার প্যান্টটা খোলো বীরের মতো। এবার আমার কাছে এসো—'

কোনো মহিলাকে এতো সুন্দর কথা বলতে আমি কখনো শুনিনি। ওর কথা কবিতার মত। এবং আমি যখন ওর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় মেতেছি, তখনও ও কথা বলে। এটা ওর স্বভাব। সব কিছু কথায় প্রকাশ করা।

'ওঃ, প্রিয়তম, প্রেমের দেবতা, বাসনার সন্তান, যুবক শয়তান, নগ্ন বালক, কাজটা

তুমি কি সুন্দর করতে পারো! আনন্দে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। তোমার ভালোবাসা আমায় মেরে ফেলছে।'

আমার কানে, আমার ঘাড়ে, আমার ঠোঁটে ওর কামনার দংশন, চরম পুলকের মুহূর্ত কাছে আসতে ও হঠাৎ চীৎকাব করে ওঠে—

'আমাকে তুই বলো। আমাকে আপন করে নাও, আমাকে নীচে নামাও। আমাকে অপমান করো।'

আমি আমার সুখ পেয়েছি, আমার যথাসাধ্য সুখ দিয়েছি। কিন্তু চরম সুখের মুহূর্তে 'নীচে নামানোর' কথাবার্তা বা আমাকে 'বোকা চাকর' বলা আমার ঠিক পছন্দ হয় না। আমার শরীরে চুমু খেয়ে ও বলে—

'আমাকে তুই বলো। আমাকে এখানে শুয়ে সামান্য একটা চাকরকে আমার শরীর দিয়েছি। কি সুন্দরভাবে আমি নীচে নেমেছি। আমার নাম ডায়ানে। তুমি আমায় ও নামে ডেকো না।

তুমি স্পষ্ট করে বলো—'মিষ্টি বেশ্যা!'....

'মিষ্টি ডায়ানে!'

'না, বেশ্যা বলো। আমি নীচে নেমেছি, সেটা কথায় শুনতে চাই।'

'না, ডায়ানে, ওসব খারাপ কথা আমি বলতে পারবো না। আমার ভালোবাসা তোমায় নীচে নামিয়েছে বলছো বলে আমার খারাপ লাগছে।'

'তোমার না, আমার ! তুচ্ছ একটা ছেলে তুমি, নির্বোধ, সুন্দর, তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা আমায় নীচে নামিয়েছে। আমি লেখিকা, বুদ্ধিজীবি। আমার নাম ডায়ানে ফিলবার্ট। আমার স্বামীর নাম হুপফ্রেহ্। হাস্যস্কর নাম। আমি আমার কুমারী নামেই লিখি। উপন্যাস, মনস্তত্বভিত্তিক, কামনাবসনা নিয়ে....হ্যাঁ, ডার্লিং, ডায়ানে বুদ্ধিমতী। এবং কিভাবে তোমাকে বোঝাই যে বুদ্ধিমতী সব সময় কামনা করে নির্বোধের সঙ্গ। যে জীবন্ত, সুন্দর কিন্তু নির্বোধ তাকেই নির্বোধের মত ভালোবেসে আত্মনিগ্রহ এবং নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকটা। যে দেবতার মত সুন্দর কিন্তু বুদ্ধিহীন, তারই সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নিজেকে নীচে নামানোর, নিজেকে অপমান করার এই আনন্দে, এমনই নেশা....'

কিন্তু দেখতে ভালো হওয়ার কথাটা বাদ দিলেও....ডীয়ার চাইল্ড, আমি ততোটা বোকা নই, অবশ্য আমি তোমার লেখা উপন্যাস বা কবিতা পড়িনি—'

'কি বললে? ডীয়ার চাইল্ড!'

ঝড়ের মতো আমায় আঁকড়ে ধরে চুমু খায় ডায়ানে।

'কি সুন্দর! 'মিষ্টি বেশ্যা' বলার থেকেও ভালো। প্রেমের শিল্পী, তুমি যা কিছু করেছো তার থেকে তোমার এই কথাটা আমায় বেশী আনন্দ দিয়েছে। আমি, ডায়ানে

ফিলবার্ট, লেখিকা, বুদ্ধিজীবি—আমার পাশে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে ছোট্ট একটা লিফটবয় বলছে, 'ডীয়ার চাইল্ড'। সুন্দর, আশ্চর্য্য সুন্দর। তুমি বলছো, তুমি বোকা নও। তাই কখনও হয়। যেখানে সৌন্দর্য্য সেখানেই বুদ্ধির অভাব। কারণ মানুষের মনের দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে উঠবে বলেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। এসো, আমি তোমাকে দুচোখ ভরে দেখি। মসৃণ, পেশীবহুল বুক, স্লিম্ হাত দুটো, কি সুন্দর পাঁজরাগুলো, সরু কোমর, পা দুটো হারমিসের পায়ের মতো—'

'থামো, ডায়ানে। আমারই উচিত তোমার রূপের প্রশংসা করা—'

'ননসেন্স! পুরুষদের এই একটা ভুল ধারণা। আমাদের মানে মেয়েদের শরীরের বাঁকগুলো তোমাদের চোখে ভালো লাগে বলে আমরা খুসী হই। কিন্তু দেবতার মত সুন্দর, সৃষ্টির সুন্দরতম মাষ্টারপীস, সৌন্দর্য্যের আদর্শ হল পুরুষের শরীর। তুমি, যুবক, হারমিসের মত পা। তুমি কি জানো হারমিস কে?'

'সত্যি কথা বলতে কি—'

'সুন্দর! ডায়ানে ফিলবার্ট এমন একজনকে শরীর দিয়েছে যে গ্রীক উপকথার চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত নয়! কতো নীচে নেমেছি আমি। হারমিস ছিল চোরেদের দেবতা।'

আমি লজ্জা পাই। আমার মুখ লাল হয়ে ওঠে। তবে কি ও বুঝতে পেরেছে—

'তুমি কি বিশ্বাস করবে যে আমি শুধু তোমাকে অর্থাৎ তুমি নামের একটা আইডিয়াকে, একটা সুন্দর জীবন্ত আইডিয়াকে ভালোবেসেছি।'

তুমি এটাকে ব্যভিচার বলতে পারো, যৌনবিকার বলতে পারো, অন্যায় বলতে পারো। কিন্তু আমি বয়স্ক, দাঁড়িওলা, বুকে-লোম-ওলা পুরুষ, যাদের গুরুত্ব আছে, সেই সব পুরুষকে ভালোবাসিনা। আমার নিজের গুরুত্ব আছে। সুতরাং ওইসব পুরুষের সঙ্গে শোয়াই হবে যৌনবিকারের চিহ্ন। প্রথম থেকেই আমি তোমার মত কমবয়সী ছেলেদের পছন্দ করি। যখন আমার তেরো বছর বয়স ছিল তখন আমি চোদ্দ বা পনেরো বছরের ছেলেদের ভালোবাসতাম। তোমার বয়স কত?'

'কুড়ি।'

'তোমাকে আরও ছোট দেখায়! আমার পক্ষে তোমার বয়স বড্ড বেশী।'

'বড্ড বেশী?'

'শোনো, আমার এই ইচ্ছের সঙ্গে যে ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে, তা হ'ল, আমি মা হইনি, আমার ছেলে হয়নি। আমার ছেলে হলে মানে মসিয়ঁ হুপফ্রেহ্ যদি ছেলের বাবা হতো, ছেলেটা সুন্দর হত কিনা সন্দেহ। তোমার জন্যে আমার কামনা আমার সন্তান কামনার একটা পরিবর্তিত রূপ। যৌনবিকার? তুমি তো তাই বলবে? কিন্তু রমনীর স্তন তোমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে, রমনীর গর্ভ তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তুমি

কি তোমার অবচেতনে মাতৃস্তনের কাছে মাতৃগর্ভের কাছে ফিরে যেতে চাওনা? তুমি কি তোমার স্ত্রীর মধ্যে তোমার মাকেই খোঁজনা। যৌনবিকার! প্রেম মানেই যৌনবিকার, খুঁজে দেখো, গভীরে যাও, প্রেমের আর কোন রূপ নেই! বয়স্কা রমনীর পক্ষে অল্পবয়সী ছেলেদের পছন্দ করার ব্যাপারটা ট্রাজিক, বেদনাদায়ক। বাস্তবে সম্ভব নয়, অন্ততঃ বিয়ে করা। আমি ধনী ব্যবসায়ী মসিয়ঁ হুপফ্রেহ্‌কে বিয়ে করেছি। ওঁর ধনদৌলতের আশ্রয়ে আমি নিশ্চিন্তে উপন্যাস লিখতে পারি। তুমি আমার সঙ্গে যা সব করলে, মসিয় হুপফ্রেহ্ ও সব পারেন না। অবশ্য থিয়েটারের একটা মেয়ের সঙ্গে ওসব করেন। ভালোমত পারেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে। তবে ও-ব্যাপারে আমি উদাসীন। এই পৃথিবী মেয়ে, পুরুষ, বিবাহ, ব্যভিচার—এসব ব্যাপারে আমি উদাসীন। আমি থাকি আমার তথাকথিত যৌবনবিকারের জগতে। আমার এই ভালোবাসার সুখ, দুঃখ, অভিশাপ নিয়ে। এই দৃশ্য পৃথিবীতে অল্পবয়সী পুরুষের শরীরের মত সুন্দর আর কিছু নেই। তোমার সুন্দর শরীর আমার কামনা জাগায়! আমি আমার বুদ্ধি ও বিবেক ভুলে তোমাকে চুমু খাই। তোমার সাদা দাঁতের ওপরে উদ্ধত ঠোঁট দুটো হাসে। আমি চুমু খাই। তোমার পুরুষ-বুকের বৃন্ত তারার মত। সেখানে ঠোঁট রাখি। তোমার বগলের কালো চামড়ার ওপরে সোনালী লোম। সেখানে চুমু খাই। এসব কি করে হয়। নীল চোখ, ব্লণ্ড চুল, তুমি কোথা থেকে পেলে চামড়ার এই ব্রোঞ্জ রং? এই নেশার শেষ নেই। আমি মরে যাবো কিন্তু আমার আত্মা তার পিপাসা নিয়ে চিরদিন তোমায় ভালোবাসবে। তুমিও বুড়ো হবে কিন্তু আমার মনে এই শান্তি থাকবে, তোমার প্রথম যৌবনের এই রূপ, সৌন্দর্য্যের এই সংক্ষিপ্ত আনন্দ, এই সুন্দর চঞ্চলতা, এই চিরন্তন মুহূর্ত চিরদিন বেঁচে থাকবে।'

'তোমার কথাগুলো কি অদ্ভুত?'

'কেন? যাকে ভালোবাস, তাকে কবিতার প্রশংসা করলে তোমার অবাক লাগে?'

আমি ছোট ছেলের মত মাথা নাড়ি। এতো প্রশংসা এতো আদর, এতো কবিতা—আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি। যদিও প্রথম আলিঙ্গনে আমি আমার সবকিছু দিয়েছি, আমার পৌরুষ আবার জেগে ওঠে। আমরা আবার শরীরে শরীর মেশাই। কিন্তু তা বলে আমি যে হীন, নীচ, সামান্য এবং ডায়ানে যে নীচে নামছে, সে কথা ভোলেনা আমার প্রেমিকা।

আর্মাদঁ, আমাকে পিষে ফেলো। আমি তোমার দাসী। সামান্য একটা ঝিকে যেভাবে ব্যবহার করবে, সেইভাবে আমায় ব্যবহার করো। তাই আমার স্বর্গ।....আর্মাদঁ, আমাকে মারো, খুব মারো, বেল্ট খোলো, চাবুক মারো, রক্ত ঝড়াও....'

'আমি সে রকম প্রেমিক নই, ডায়ানে—'

'কি লজ্জা! তুমি মহিলাকে সম্মান দেখাচ্ছো—'

'শোনো, ডায়ানে, একটি কথা স্বীকার করছি। তুমি যা চাইছো, তার বদলে—কিছুটা ক্ষতিপূরণ হিসেবে। তোমার ব্যাগে একটা জুয়েল কেস ছিল। কাস্টমসে তুমি আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি তোমার ব্যস্ততার সুযোগে তোমার জুয়েলারী চুরি করেছি!'

'তুমি চুরি করেছো? তুমি চোর! কি আনন্দ, কি আনন্দ। আমি চোরের সঙ্গে শুয়ে আছি। শুধু সাধারণ একটা লিফটবয়ের সঙ্গে নয়, একটা চোরের সঙ্গে!'

'আমি জানতাম, তুমি খুশী হবে। কিন্তু তখন আমি একথা জানতাম না। জানতাম না যে আমরা একদিন পরস্পরকে ভালবাসবো। নাহলে আমি তোমার টোপাজ-বসানো জুয়েলারী ও হীরেগুলো চুরি করে তোমায় দুঃখ দিতাম না।'

'দুঃখ? আমার ঝি ওটা খুঁজেছিল বটে। আমি দু সেকেণ্ডের জন্যেও ওগুলোর কথা ভাবিনি। আমার স্বামী কাল আসছে। সে দারুণ বড়লোক। ওর কোম্পানী বাথরুমের টয়লেট তৈরী করে, সবারই দরকার হয় ওটা। হুপফ্রেহ্‌র টয়লেট, খুব চালু, সারা পৃথিবীতে রপ্তানী হয়। বিবেকের দংশন এড়াতে স্বামী আমাকে এইসব জুয়েলারী দেয়। তুমি যা চুরি করেছো, তার থেকে তিনগুণ সুন্দর জিনিস ও আমায় দেবে। ওগুলোর চেয়ে অনেক বেশী দামী সেই চোর যে চুরি করেছে। চোরের দেবতা হারমিস! আর্মাদ?'

'বলো'।

'ভালো একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। তুমি এই ঘরে আমার গয়না চুরি করবে। আমার আরও গয়না আছে। কাপবোর্ডের ডানদিকের ড্রয়ারে ব্যুরোর চাবি। আমার নাইটড্রেসের নীচে গয়না। টাকাও আছে। বেড়ালের মত চুপি চুপি পা ফেলে ইঁদুর ধরো। এইটুকু করবে না? তোমার ডায়ানের জন্যে?'

'ডীয়ার, কাজটা ঠিক ভদ্রলোকের মত হবে না। তোমার সঙ্গে এইসবের পর—'

'বোকা! এই হবে আমাদের ভালোবাসার অপূর্ব সমাপ্তি!'

'কাল যখন মসিয়ঁ হুপফ্রেহ্ আসবেন—'

'আমার স্বামী? ওকি বলবে? আমি উদাসীন ভঙ্গীতে জানাবো, ওখানে আসার সময় রাস্তায় সব চুরি হয়ে গেছে। বড়লোকের বউরা অসাবধান হলে ওসব হয়।

চোর তো সড়ে পড়েছে। স্বামীর ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও—'

'কিন্তু ডায়ানে, তোমার চোখের সামনে—'

'বেশ, আলো নিভিয়ে দিচ্ছ। এখন আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। শুধু শুনতে পাবো চোরের আস্তে পা ফেলার শব্দ, চোরের নিঃশ্বাসের শব্দ, চোরের হাতে গয়নার ঝুনঝুন আওয়াজ। যাও, ওঠো, আস্তে আস্তে, খুঁজে নাও, চুরি করো। এই আমার

ইচ্ছে।'

এবং আমি ওর আদেশই মানলাম। সাবধানে উঠে আমি সব নিলাম। চুরির কাজটা খুবই সোজা হল। টেবিলের উপর ছোট্ট ডিশে ওর আংটি এবং মুক্তোর নেকলেস। অন্ধকারেও কাপবোর্ডে ব্যুরোর চাবি খুঁজে পেতে কোন ঝামেলা হল না আমার।

আমি প্রায় নিঃশব্দে ড্রয়ার খুললাম।

কয়েকটা নাইটড্রেসের নীচে—

জুয়েলারী, পেনড্যান্ট, ব্রেসলেট, ব্রুচ, বেশ কিছু টাকা। সব নিয়ে আমি ওর বিছানার পাশে এলাম। যেন ভদ্রতার খাতিরে। যেন ওব জন্যেই এইসব এনেছি।

'বোকা, তুমি কি করছো? এই তোমার ভালোবাসা ও তোমার চুরির লাভ। সব পকেটে পড়, পোষাকে ঢোকাও, পালিয়ে যাও! তাড়াতাড়ি পালাও, পালাও! আমি সব শুনেছি, চুরির সময় তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেছি। এইবার আমি পুলিশে ফোন করবো। কিম্বা না করাই ভালো। তোমার কি মনে হয় ঐ তুমি কতো দূরে? কাজ শেষ? প্রেমিক ও চোরের শরীরে তখন লিফ্‌টবয়ের য়্যুনিফর্ম, তাই না? তুমি আমার বাটন্‌-হুক চুরি করোনিতো?

না, এইতো রয়েছে। বিদায়, আর্মার্দ। বিদায়, বিদায়, চিরদিনের জন্যে বিদায়। তোমার ডায়ানেকে ভুলো না। তার স্মৃতিতেই তুমি বেঁচে থাকবে। অনেক বছর পরে, যখন তুমি-আমি দুজনেই কবরের আড়ালে, তখনও জেগে থাকবে স্মৃতি...তোমার ঠোঁট আমায় চুমু খেয়েছিল, পৃথিবীর কেউ জানবে না...বিদায়, বিদায় প্রিয়তম...

মূল কাহিনী □ কনফেসনস অফ-এ কনফিডেন্স ম্যান

রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন

জন্ম ১৮৫০ মৃত্যু ১৮৯৪—এই সংক্ষিপ্ত জীবনে প্রচুর ও বিভিন্নমুখী সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন রেখে গেছেন ব্রিটিশ সাহিত্যিক স্টিভেনসন, তা আজও আমাদের বিস্ময় জাগায়। ষোল বছর বয়সে প্রকাশিত প্রথম বই 'দ্য পেনটল্যাণ্ড রাইজিং'। মৃত্যুর অল্পদিন আগে প্রকাশিত শেষ বই 'দ্য এব টাইড।' শ্রেষ্ঠ রচনা ঃ ১৮৮৬তে প্রকাশিত 'দ্য ষ্ট্রেঞ্জ কেস অফ ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড'। প্রেম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে ডিকেনস, ওয়াল্টার স্কট ও ন্যাথ্-ন্যাথনিয়েল হথর্ণের প্রভাবের কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। যে পটভূমিতে ফ্যাণ্টাসি লিখতেন স্টিভেনসন, সেই পটভূমি থেকে যতো দূরে তিনি থাকতেন, ততোই তাঁর গল্প উপন্যাস বেশী মনোগ্রাহী হত। নিজের লেখা ফ্যাণ্টাসিতে নিজেই বিশ্বাস করতেন তিনি। স্বপ্নের মধ্যে দেখতেন ডক্টর জেকিল ও মিঃ হাইডকে। তাঁর নিজের মতে 'ওলালা' তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প। আধুনিক সমালোচকেরা বর্তমান সংকলনের গল্পটিকেই বেশী পছন্দ করেন। গল্পের ষ্টাইলে বালজাকের রচনাশৈলীর ছাপ স্টিভেনসনের অন্য অনেক গল্পের মতো এই গল্পেও লক্ষ্য করা যায়।



প্রেমের ফাঁদ

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

দেনী দ্য ব্যোলীয়া-র বয়স এখনো বাইশ পার হয়নি। নিজেকে সে বয়স্ক বলেই ভাবে এবং যোদ্ধা হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই উঁচু। সেই যুগে, যখন সময় রুক্ষ এবং যুদ্ধসংকুল, তখন প্রচণ্ড কোনো সংঘর্ষে এবং এক ডজন ঝটিকা-আক্রমণে অংশ নিলে, সম্মানজনক সংগ্রামে শত্রুকে হত্যা করলে এবং রণকৌশল ও মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হলে চলাফেরার একটা মেজাজী ভাব যুবকদের মধ্যে দেখা যেতো। এটা সহজেই ক্ষমা করা যায়। খুব যত্নের সঙ্গে ঘোড়া রাখার ব্যবস্থা করে এবং যথেষ্ট সময় নিয়ে নৈশ-ভোজ সেরে সন্ধ্যার ধূসর আঁধারে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলো দেনী। খুশ-মেজাজেই গেলো। যদিও যুবকের পক্ষে কাজটা বুদ্ধিমানের মত হলোনা। আগুনের পাশে বসে থাকলে বা চুপচাপ শুয়ে পড়লেই ও ভালো করতো। কারণ শহরটা সৈন্যে ভর্তি। বারগানডী ও ইংল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীর সৈন্যেরা মিশ্র অধিনায়কত্বের অধীনে রয়েছে। এবং যদিও দেনীর কাছে নিরাপদ যাতায়াতের জন্যে অনুমতিপত্র রয়েছে, হঠাৎ বিপদে পড়লেও অনুপতিপত্র কোনো কাজেই লাগবেনা।

১৪২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ হয়েছে। উল্টোপাল্টা হাওয়া বইছে, বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তায় ঝরা পাতার ভীড়। এখানে-সেখানে এক একটা জানলায় এর মধ্যেই আলো জ্বলছে। সৈন্যেরা নৈশভোজ সারতে সারতে চেঁচামেচি করছে এবং তাদের ফূর্তির শব্দ ভেসে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়ায়। অন্ধকার তাড়াতাড়ি নেমে আসে। চূড়ার উপরে ইংল্যাণ্ডের পতাকা উড়ছিল। অন্ধকারে সেটা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ভাসমান মেঘের ও সীসে-রং আকাশের দুর্যোগপূর্ণ পটভূমিতে ছোট্ট একটা চড়ুইপাখীর মতো দেখাচ্ছে পতাকাটাকে। রাত যতো বাড়ে হাওয়ার গতিও

বাড়ে। খিলানের এবং শহরের নীচে উপত্যকার বৃক্ষচূড়ার মধ্যে গর্জাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া।

দেনী দ্রুত হাঁটছিল। একটু পরেই সে বন্ধুর দরজায় টোকা দেয়। যদিও সে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করছিল যে একটু সময় থেকেই তাড়াতাড়ি ফিরবে। তাকে এতো আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানানো হলো এবং সময়টা এমনই ভালো কাটলো যে ফিরতে তার মাঝরাত হয়ে গেল। হাওয়া কমে গেছে।

রাত এখন কবরের মতোই অন্ধকার। মেঘের চাঁদোয়ার ফাঁকে একটা তারা বা চাঁদের আলোর একটা ফলাও নজরে আসছেনা। শ্যাতো লাদঁ-র অলিগলি চেনেনা দেনী। দিনের আলোতেই রাস্তা খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে শক্ত। এখন রাতের আঁধারে পথের নিশানা সে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। শুধু একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, তাকে পাহাড় চড়তে হবে। কারণ বন্ধুব বাড়ী পাহাড়ের নীচে, সরাইখানা পাহাড়চূড়োর বড় গির্জার চূড়োর নীচে। এই একটা মাত্র ক্লুর উপর ভরসা করে সে হাঁটছে, হোঁচট খাচ্ছে, খোলা জায়গায় যেখানে মাথার ওপরে আকাশের টুকরো দেখা যাচ্ছে সেখানে শান্তিতে শ্বাস নিয়ে হাঁটছে আর নিশ্বাস বন্ধ করে দেয়াল ধরে হাঁটছে।প্রায় অচেনা শহরে অস্বচ্ছ অন্ধকারে এভাবে হাঁটা এক ভয়ংকর ও রহস্যময় অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন বাড়ীর জানালার ঠাণ্ডা গরাদ ছুঁয়ে যাচ্ছে তার আঙুল। সে চমকে উঠছে। এই নৈশব্দের সঙ্গে মিশে আছে ভয়ংকর কিছু সম্ভাবনা। গভীরতর অন্ধকার দেখলেই মনে হচ্ছে, শত্রু ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারে কিম্বা ওখানে হয়তো রয়েছে একটা অন্ধকার খাদ। কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে সে সরাইখানায় ফিরতে চায়। সুতরাং অসুবিধে ছাড়াও বিপদের ইঙ্গিত রয়েছে। সে সাবধানে কিন্তু সাহসের সঙ্গে হাঁটছে এবং রাস্তার প্রত্যেকটা কোণে থেমে থেমে চারপাশ দেখে নিচ্ছে।

কিন্তু খোলা রাস্তায় একটু আলো পাবে ভেবে সে এগোতে থাকে। গলিটা শেষ হয়েছে উঁচু টেরাসে। দু-সারি উঁচু বাড়ীর ভেতরের ফাঁক দিয়ে কয়েক'শ ফুট নীচের অন্ধকার উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। নীচে চোখ মেললে দেখা যাচ্ছে বাতাসে দুলে-ওঠা কিছু বৃক্ষচূড়া এবং নদীর স্রোতের একটা জায়গায় উজ্জ্বল একটা রেখা। আবহাওয়া আগের চেয়ে ভালো। আকাশের মেঘ কতকটা কেটে যাচ্ছে। মেঘের টুকরোগুলোর সরু রেখা ও শেষ দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের অন্ধকারে রেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে। আবছা আলোর বাঁ-হাতে বাড়ীটা বেশ জমকালো মনে হয়।

অনেকগুলো চূড়ো, গির্জার গোল ছাদ, প্রধান ব্লক থেকে উঁচিয়ে থাকা কয়েকটা খিলান, দরজার ওপর কারুকাজ। জানলার কারুকাজের আড়ালে যেন অনেক আলো জ্বলছে। ফলে ছাদ ও খিলানগুলোয় আলো পড়ে আকাশের আঁধার যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বুর্জে দেনীর নিজের বাড়ীটার কথা মনে পড়ে যায় দেনীর। এ বাড়ীটাও

নিশ্চয়ই কোনো অভিজাত পরিবারের। স্থপতির কৌশল এবং নিজের ও এই পরিবারের গুরুত্ব তুলনা করে বুঝতে চেষ্টা করে দেনী। গলিপথ ছাড়া টের‍্যাসে পৌঁছোনোর কোনো রাস্তা নেই। ফিরে যাবার রাস্তা অবশ্য ছিল। কিন্তু দেনী এখন কোথায় পৌঁছেছে সেটা বুঝে নিয়ে বড় রাস্তাটা খুঁজে বের করে সরাইখানায় পৌঁছুতে চাইছিল। সে জানতোনা যে আজ রাতে কয়েকটা অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটে আজকের দিনটাকে তার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন করে রাখবে। কেননা এক'শ গজ না যেতেই সে দেখলো একটা আলো তার দিকে এগিয়ে আসছে এবং সরু গলিপথে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে উঁচু পর্দার কিছু কণ্ঠস্বর। আসলে মশাল হাতে এগিয়ে নৈশ প্রহরারত কিছু সৈনিক। দেনী জানে, ওরা আকণ্ঠ মদ গিলেছে এবং ওদের কাছে নিরাপদ যাতায়াতের সরকারী অনুমতিপত্র অথবা মধ্যযুগীয় নাইটদের শিষ্টাচারসম্মত যুদ্ধের ধরণের কোনো মূল্যই নেই। ওরা তাকে কুকুরের মত মেরে ফেলে এখানে রেখেই চলে যাবে। পরিস্থিতির মধ্যে উত্তেজনার কারণ আছে, নার্ভাস হওয়ারও যুক্তি আছে। ওদের হাতে মশাল। সুতরাং আলোর আড়ালে লুকোনো শক্ত হবে না। ওদের গলার চড়া আওয়াজে দেনীর পায়ের শব্দও হয়তো ঢেকে যাবে। যদি দেনী নিঃশব্দে দ্রুত চলতে পারে, সে ওদের নজরে আসবেনা।

কিন্তু তার ভাগ্য খারাপ। পিছু হটতে যেয়ে সে পাথরে হোঁচট খেয়ে দেয়ালে ধাক্কা খায়, নিজের অজান্তে চেঁচিয়ে ওঠে এবং তার তরোয়াল পাথরে শব্দ তোলে। 'কে ওখানে'?—দু'তিন জন সৈনিক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে। কেউ ইংরিজীতে, কেউ ফরাসী ভাষায়। কিন্তু দেনী জবাব দেয় না। সে গলিপথ ধরে দ্রুত ছোটে টের‍্যাসের দিকে। সে পেছন ফিরে তাকায় না। সৈনিকেরা পেছন থেকে ডাকছে। তাকে অনুসরণের উদ্দেশ্যে ওদের গতি বেড়েছে। বর্মের ঝনঝনাৎ শোনা যাচ্ছে। সরু পথের মুখে এদিক ওদিক ঘুরছে মশালের আলো।

দেনী দরজার সামনের অন্ধকার জায়গাটার দিকে ছুটে যায়। এই অন্ধকারে সে হয়ত নজরে পড়বে না এবং তা যদি অসম্ভবও হয়, সে আত্মরক্ষার সুযোগ পাবে। কিন্তু তরোয়াল হাতে নিয়ে দরজায় পিঠ রেখে দাঁড়াতেই তার ওজনের ভারে দরজার প্রকাণ্ড পাল্লা সদ্য-তেল-লাগানো কব্জার ওপর নিঃশব্দে ঘোরে। দরজা খুলে যায়। ভেতরে গাঢ় আঁধার। সুযোগ এভাবে হাতে এসে গেলে কেউ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কথা চিন্তা করে না। নিজের ব্যক্তিগত সুবিধেই এক্ষেত্রে বড় কথা, যেন পৃথিবীর অদ্ভুত ঘটনাগুলো মানুষের সুবিধের জন্যেই ঘটে। সুতরাং এক মুহূর্তও ইতস্ততঃ না করে দেনী ভেতরে ঢুকে দরজাটা অংশতঃ বন্ধ করে নিজের লুকোনোর জায়গাটা গোপন রাখার চেষ্টা করে। কোন এক অজ্ঞাত কারণে, হয়তো স্প্রিং বা ভারী কিছুর জন্যে ওক কাঠের প্রকাণ্ড ভারী দরজাটা তার হাত ফসকে ঘরঘর শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে যায়।

সেই মুহূর্তে নৈশপ্রহরারত সেনাবাহিনী টেরাসে পৌঁছায় ও চীৎকার করে গালাগালি দিয়ে তাকে ডাকে। ওরা অন্ধকার কোনগুলো খুঁজছে, সে টের পায়। একজন সৈনিকের বর্শা দরজার বাইরের কাঠে ধাক্কা খায়। কিন্তু মদের নেশায় ওরা খুশমেজাজে আছে বলেই ওরা বেশী দেরী করে না। কর্ক-স্ক্রুর মতো পেঁচানো একটা রাস্তা নীচে নেমে গেছে। সেটা দেনীর চোখেই আসেনি। সেই রাস্তা দিয়ে নেমে দৃষ্টি ও শ্রুতির আড়ালে চলে যায় প্রহরীর দল।

দেনী আবার শ্বাস নেয়। দুর্ঘটনায় আশঙ্কায়, অর্থাৎ ওরা ফিরে আসে কিনা দেখার জন্যে সে কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করে। তারপর সে দরজা খুলে বাইরে পালাবার চেষ্টা করে। দরজার ভেতরের কাঠ মসৃণ। কোন হাতল নেই, টানবার মত কিছু নেই। কাঠের ধারে নখ ঢুকিয়ে টানবার চেষ্টা করে দেনী। কিন্তু দরজা খোলে না। সে দরজা ধরে জোরে ধাক্কা দেয়, কিন্তু পাথরের মত অনড় এই দরজাটা। দেনী ভুরু কোঁচকায়। দরজাটার কি হয়েছে? এতো সহজে খুলে গেল?

এত সহজে বন্ধ হয়ে গেল? এখন খুলছে না? ফাঁদ নয়তো? কিন্তু এই নির্জন জায়গায় অভিজাত পরিবারের এই প্রাসাদে এরকম ফাঁদ থাকার তো কথা নয়।

কিন্তু এটা ফাঁদ হোক না হোক, দেনী এখন বন্দী, তার পালাবার পথ নেই। অন্ধকার তার মনের ওপর চাপ দেয়। সে কান পেতে শোনে, বাইরে সবকিছু নিঃশব্দ, ভেতরে কোথায় যেন দীর্ঘশ্বাসের মৃদু শব্দ, ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ, চুপিচুপি পা ফেলার শব্দ। যেন বাড়ীর ভেতরে অনেক মানুষ নিঃশব্দে নিঃশ্বাস চেপে অপেক্ষা করছে। তারপর চমকে উঠে তার খেয়াল হয়, তাইতো, অনেকটা উঁচুতে বাড়ীর ভেতরে আলো জ্বলছে। আলোর রেখা এসেছে একটা খোলা দরজা থেকে। যাহোক কিছু দেখতে পাওয়া এখন দেনীর কাছে সান্ত্বনার মতো। যেন পাঁকের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা মানুষ শক্ত জমি খুঁজে পেয়েছে।

তার মনে সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে আঁকড়ে ধরে। আলোর দিকে তাকিয়ে পরিবেশটা বুঝতে চেষ্টা করে দেনী। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এক সারি সিঁড়ি উঠে গেছে এখান থেকে এই আলোজ্বলা দরজার দিকে এবং সিঁড়ির পালিশকরা রেলিং-এ বিচ্ছুরিত সূচের মত সূক্ষ্ম এবং রাতের সমুদ্রের ফরফরাস শীতল আলোর মতো অস্পষ্ট একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। তার সন্দেহ হয়, সে একা নয়। তার হৃৎপিণ্ড ধকধক করে ওঠে। কোনো কিছু একটা করবার দুর্বার আকাঙ্খা যুবকের হৃদয়ে জেগে ওঠে। তার মনে হয়, সে ভয়ংকর কোনো বিপদে পড়েছে। এখন এই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক পরদা তুলে সরাসরি বিপদের মুখোমুখি হওয়া। অন্ততঃ বিপদটা কি, তাতো বোঝা যাবে। অন্ততঃ এভাবে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হবে না। সে হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে সামনের দিকে, সিঁড়ির শেষ ধাপে

পা রেখে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে এবং পর্দা তুলে ভেতরে ঢোকে।

চকচকে পালিশ-করা পাথরের তৈরী প্রকাণ্ড একটা কামরা। তিনটে দরজায় পর্দা। দুটো বড় জানলা। পাথরের চিমনী। এবং সবকিছুর ওপরে অভিজাত মালেমত্রোয়া পরিবারের প্রতীক চিহ্ন। অভিজাত পরিবেশে এসেছে বুঝে খুশী হয় দেনী। ঝকঝকে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। একটা ভারী টেবিল ও দু-একটা চেয়ার ছাড়া এই ঘরে আসবাব বিশেষ নেই। ফায়ারপ্রেসে আগুন জ্বলছে না। এবং চিমনীর ধারে দেনীর মুখোমুখি বসে আছে—

পশুলোমের পোষাকপরা এক বেঁটেখাটো চেহারার ভদ্রলোক। একটা পায়ের ওপর সে আর একটা পা রেখেছে। হাতদুটো ভাঁজকরা। দেয়ালের ব্র্যাকেটে ওর কনুইয়ের কাছে কাপভর্তি সুগন্ধি মশলা-মেশানো মদ।

বুড়ো ভদ্রলোকের মুখে অত্যন্ত প্রখর একটা পুরুষালী ভাব আছে। যে ধরণের ভাব সচরাচর মানুষের চেহারায় দেখা যায় না, বরং ষাঁড় বা পাঁঠা বা শূয়োরের মুখেই দেখা যায়। দুর্বোধ্য একটা ভাব। লোভ, হিংস্রতা এবং বিপদের ইঙ্গিত জড়ানো। ওপরের ঠোঁটটা অস্বাভাবিক পুরু, যেন ঘুঁষিতে বা দাঁত ব্যাথার দরুণ ফুলে আছে হাসিটা, চোখের উঁচু ভুরুদুটো আর ছোট্ট চকচকে চোখদুটোর চাউনিতে অদ্ভুত একটা ভাব, কিছুটা মজা, কিছুটা বা শয়তানী। সুন্দর সাদা চুল মাথায়। খৃষ্টান সন্তদের মতো। কুঁকড়ে লুটিয়ে পড়েছে পোষাকের ওপরে। দাড়ি আর গোঁফে মিষ্টি লালচে রং। বয়স সত্ত্বেও, হয়তো বেশী যত্ন নিয়েছে বলেই বুড়োর হাতদুটোতে বয়সের কোনো ছাপ নেই। এবং এই অভিজাত পুরুষের হাতদুটোর খ্যাতি আছে। মাংসল অথচ সুচারু। দীঘল আঙুলগুলো লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির গড়া মেয়েদের আঙুলের কথা মনে করিয়ে দেয়। বুড়ো আঙুলের ভাঁজ বন্ধ করলে টোল পড়ে। নখগুলোর আকার সুন্দর এবং অদ্ভুত সাদা, মরার মত। এই হাতদুটো বুড়োর চেহারার রহস্যময় ভাবটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এরকম অদ্ভুত হাতও একটা মানুষ খৃষ্টান সন্ত ও শহীদের মতো হাতদুটো কোলে জড়ো করে বসে আছে। যে মানুষটা মুখে অতো গভীর ও বিস্ময়কর অনুভূতির রেখা, সে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে নিথর চোখে দেবতার মত কিম্বা দেবমূর্তির মতো দেখছে অন্য মানুষকে। ওর প্রশান্তিতে কোথায় যেন বিদ্রূপ ও বিশ্বাসঘাতকতা মেশানো যা ওর চেহারার সঙ্গে খাপ খায় না।

ইনিই অ্যালাঁ, সীয়ারা দ্য মালেম্‌ত্রোয়া।

দেনী ও উনি দু-এক সেকেণ্ড পরস্পরকে দেখে। তারপর বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে—

'ভেতরে এসো। সারা সন্ধ্যেটা আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ায়নি, শুধু কথার সঙ্গে ভদ্রতাসূচক ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়েছে। কিছুটা ওর হাসির জন্যে কিছুটা ওর গলার অদ্ভুত সুরেলা স্বরের জন্যে আতঙ্কের এক

শীতল শিহরণ দেনীর মজ্জায় বয়ে যায়। কিছুটা সেই কারণে, কিছুটা সত্যিই অবাক হয়েছে বলে তার জবাব দিতে দেরী হয়।—

'আমার মনে হয়, দুদিক থেকে এটা দুর্ঘটনা। আপনি আমাকে অন্য কারো সংগে ভুল করছেন। আপনি হয়তো আশা করেছিলেন, সে আসবে। কিন্তু আমার দিক থেকে বলতে পারি, বিনা অসন্তোষ এখানে এখন আসা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'

'বেশ, বেশ। তুমি এখানো এসেছো, সেটাই বড়ো কথা। বন্ধু, তুমি বসো, আরাম করো। আমাদের ছোটখাটো ব্যাপারগুলো তারপর ঠিক করা যাবে।'

'আপনার দরজাটা....'

'আমার দরজা ? একটু নতুন ধরণের উদ্ভাবনী শক্তির প্রমাণ। আতিথেয়তা সম্বন্ধে নতুন ধরণের ভাবনাও বলতে পারো। তুমি তো নিজেই বললে, তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাওনি। আমরা বুড়োরা মাঝে মাঝে এ ধরণের অনীহার সম্মুখীন হই। যখন সেটা আপনাদের সম্মানে আঘাত হানে, আমরা সেই অনিচ্ছা কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থা করি। তুমি বিনা নিমন্ত্রণে এসেছো। কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি স্বাগতম্ জানাচ্ছি।'

'স্যার, আপনি ভুল করছেন। আমরা কেউ কাউকে চিনি না। এই এলাকায় আমি নতুন এসেছি। আমার নাম দেনী দ্য বোলীয়া। আমি ঘটনাচক্রে আপনার বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি।'

'বন্ধু, আমি তোমায় খুঁজে পেয়েছি এবং এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব কিছু ধারণা আছে। হয়তো এই মুহূর্তে তোমার ভাবনা চিন্তা মিল হবে না। কিন্তু সময় প্রমাণ করবে, কে সার্থক!'

বিশ্রী হাসি হাসলো বুড়ো ভদ্রলোক।

এতোক্ষণে দেনী বুঝেছে ; সে পাগলের পাল্লায় পড়েছে। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে। ভাবে, দেখাই যাকনা, কি হয়। একটু পরে সে শোনে, উল্টোদিকের পর্দার আড়াল থেকে ভেসে আসছে প্রার্থনার শব্দ। কখনও একজন, কখনও দুজন কথা বলছে। এবং চাপা গলায় কথা বলছে ওরা, ওদের স্বরের তীব্রতা থেকে অনুমান করা যায় হয় ওদের তাড়া আছে নয়তো কেউ আত্মিক যন্ত্রণার মুহূর্তে প্রার্থনা করছে। এতোক্ষণে দেনী বোঝে, এই পর্দার আড়ালে রয়েছে বাইরে থেকে দেখা সেই ছোট্ট প্রার্থনা-গৃহের দরজা।

বুড়ো ভদ্রলোক আস্তে আস্তে হাসতে হাসতে পা থেকে মাথা অবধি দেখলেন দেনীকে। মাঝে মাঝে উনি পাখী বা ইঁদুরের মতো অদ্ভুত শব্দ করে জানাচ্ছেন, দেনীকে দেখে উনি খুবই খুসী হয়েছেন। অবস্থাটা ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভদ্রতার খাতিরে দেনী শেষ অবধি বলে, বাইরে ঝড় থেমেছে।

বুড়ো ভদ্রলোক নিঃশব্দে দীর্ঘ সময় ধরে হাসতে থাকে। তার মুখটা লাল হয়ে

ওঠে। দেনী উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা মাথায় দিয়ে বলে—

'স্যার, আপনার মাথার ঠিক থাকলে আপনি আমায় অপমান করেছেন। আর মাথা খারাপ হলে পাগলের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই। আমার মনে কোনো পাপ নেই। প্রথম থেকেই আপনি আমায় বোকা বানাচ্ছেন, আমার বক্তব্য শুনছেন না, এবং এখন ঈশ্বরের তৈরী এই পৃথিবীতে এমন কোনো ক্ষমতা নেই, যা আমাকে এখানে বন্দী করে রাখতে পারে। যদি দরজা খুলে না দেন, আমার তরোয়াল দিয়ে দরজাটা টুকরো টুকরো করে বেরিয়ে যাবো।'

বুড়ো ভদ্রলোক ডান হাত তুলে তর্জনী ও অনামিকা সামনে বাড়ালেন। 'বোসো, জামাই, বোসো।'

'জামাই!'

'তুমি কি বুঝছো না যে দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেই আমি থেমে যেতে পারি না? তুমি পালাবার চেষ্টা করলে তোমার হাত-পা বেঁধে ফেলা হবে। তখন তোমার হাড়ে ব্যথা হবে। তার চেয়ে বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলো। আরামে বসে থাকো। ঈশ্বর তোমার সহায় হবেন।'

'তার মানে? আমি এখানে বন্দী?'

'যা ঘটনা, আমি তাই বললাম। এর থেকে যা বোঝার, তুমি বুঝে নাও।' দেনী বসলো। বাইরে থেকে শান্ত মনে হলেও ভেতরে ভেতরে সে রাগে জ্বলছে। একটা আতংকের ভাবও রয়েছে। লোকটা বোধহয় পাগল নয়। যদি পাগল না হয়, ঈশ্বর জানেন, ওর ধান্দাটা কি? এ কি অদ্ভুত ও ট্র্যাজিক অ্যাডভেঞ্চার জুটলো তার ভাগ্যে? এখন সে কি করবে?

প্রার্থনা-গৃহের পর্দা তুলে আলখাল্লাপরা খৃষ্টান পাদ্রী ভেতরে এসে তীক্ষ্ণ চোখে দেনীর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বলে বুড়োকে।

'মেয়েটার মেজাজ ভালো?'

বুড়ো জানতে চায়।

'স্যার, মেয়েটা ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে!'

ঈশ্বর ওকে সাহায্য করুন। ওকে খুসী করা সত্যিই শক্ত। ছোকরা দেখতে মন্দ নয়, অভিজাত পরিবারের ছেলে, মেয়ের নিজের পছন্দ। আর কি চায় ও?'

'স্যার, অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে পরিস্থিতিটা অভিনব। ওর লজ্জা পাওয়া স্বাভাবিক।'

'নাচ শুরু করার আগে মেয়ের সেটা ভাবা উচিত ছিল। ঈশ্বর জানেন, এসব আমি শুরু করিনি। নাচ যখন মেয়ে শুরু করেছে, তাকে শেষ করতে হবে। মসিয়ঁ দেনী দ্য বোলীয়া, আমার ভাগ্নীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। সে আমার চেয়েও

অধৈর্য হয়ে তোমার জন্যে এতোক্ষণ অপেক্ষা করছে।'

দেনী এখন নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা কতো দূর গড়ায় দেখাই যাক। সে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মতি জানায়। ধর্ম-যাজকের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছে বুড়ো। স্থাপত্য ও কারুকাজের উৎকর্ষ সারা বাড়ীতেই চোখে পড়ে। স্তম্ভ থেকে ঝুলছে দুটো পেনড্যাণ্ট ভ্যাণ্টের ঠিক মাঝখানে। প্রার্থনাবেদী খোদাই করা মৌচাকের মত কারুকাজে সাজানো। ছোট ছোট জানলা। আকারে কোনোটা নক্ষত্রের মত, কোনোটা চাকার মতো। জানলার কাঁচের ফাঁক দিয়ে রাতের হাওয়া বইছে। বেদীর ওপরে পঞ্চাশটা মোমবাতির শিখা কাঁপছে। আলো কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও অন্ধকার।

বেদীর সামনে বিয়ের কনের সাজে প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে অপরূপ রূপসী এক যুবতী। ওর পোষাক দেখে দেনীর বুকে শীতল শিহরণ বয়ে যায়। একটাই সম্ভাবনা তার মনে আসছে। কিন্তু তাও কি হয় নাকি?

বাঁশীর মতো গলায় বুড়ো বলে—

'শোনো মেয়ে, এই বন্ধু তোমায় দেখতে এসেছে। ঘুরে দাঁড়াও। ওর সঙ্গে করমর্দন করো। ধার্মিক হওয়া ভালো, কিন্তু ভদ্র হওয়ারও দরকার আছে।'

যুবতী আগন্তুকের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। লজ্জা ও ক্লান্তি তার সুন্দর যুবতী শরীরের প্রতিটি রেখায় ফুটে ওঠে। তার মাথা নীচু, চোখ মেঝের দিকে। দেনীর পায়ের দিকে ওর চোখ যায়। পায়ের জুতো-মোজার ব্যাপারে দেনী ফুলবাবু। কিন্তু দেনীর পায়ের হলুদ বুটজোড়া দেখে আঁতকে উঠে মেয়েটি ওর মুখের দিকে তাকায়। মেয়েটির মুখে লজ্জার বদলে আতঙ্ক। ঠোঁট দুটো ফ্যাকাসে। তীব্র আর্তনাদ করে দুহাতে মুখ ঢেকে সে মেঝেয় বসে পড়ে।

'এ সে নয়। মামা, এ সে নয়।'

'বলা বাহুল্য। আমি ও তাই ভেবেছি। লোকটার নাম পর্যন্ত তমি জানোনা, এটা দুর্ভাগ্যজনক।'

'আজকের এই মুহূর্তের আগে এই ভদ্রলোককে আমি কখনো দেখিনি। স্যার, আপনি যদি ভদ্রলোক হন, আপনিও কথাটা স্বীকার করুন।'

দেনী বলে—

'আমারও সে সৌভাগ্য হয়নি। স্যার, আপনার সুন্দবী ভাগ্নীকে আমি জীবনে এই প্রথম দেখলাম।'

বুড়ো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—

'শুনে দুঃখ পেলাম। যাকগে, এখন তো পরিচয় হল। আমার স্বর্গগতা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের আগে আমার বিশেষ পরিচয় ছিলনা। তবুও আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম।

এর থেকেই প্রমাণ হয় যে হঠাৎ বিয়ে হলেও শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালো বোঝাবুঝি হয় শেষ অবধি। যেহেতু বিয়ের ব্যাপারে বরের মতামতের একটা প্রশ্ন আছে। সুতরাং ওকে মনস্থির করার জন্যে দুঘন্টা সময় দেওয়া যাক। ততোক্ষণ আমরা না হয় বাইরে যাচ্ছি।

পাদ্রীর সঙ্গে বুড়ো দরজার দিকে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়— 'মামা, এ তুমি কি বলছো? আমি ঈশ্বরের সামনে বলছি, এই যুবককে জোর করে বিয়ে করার থেকে নিজের বুকে ছুরি মারা ভালো। আমার মন কিছুতেই এটা মেনে নেবেনা। ঈশ্বর এ ধরণের বিয়ে চান না। মামা, আমাকে দয়া করো। পৃথিবীতে যে কোন মেয়ে এ রকম বিয়েতে রাজী হওয়ার চাইতে আত্মহত্যা করবে! মামা, তুমি কি বিশ্বাস করছোনা যে এ সে নয়—'

'বিশ্বাস করছি। শোনো মেয়ে, যে আভিজাত্যের গৌরব ষাট বছর বয়স ধরে যুদ্ধ এবং শান্তির পরিবেশে আমাকে ঘিরে ছিল, যেদিন তুমি সেই সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছো, সেদিন থেকে তুমি আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করার ও আমার মুখের দিকের তাকাবার অধিকার হারিয়েছো।

তুমি জানো, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে আজ তোমার গায়ে থুথু ফেলে তোমায় বাড়ী থেকে বার করে দিতো। তোমার বাবার হাত ছিল লোহার মতো শক্ত। আমার হাত মখমলের মতো নরম। সে জন্যে তুমি তোমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। তাড়াতাড়ি তোমার বিয়ে দেওয়া কর্তব্য। তোমার প্রেমিককে খুঁজে বার করার চেষ্টাও করেছি আমি। আমার ধারণা ছিল যে আমি সফল হয়েছি।

কিন্তু ঈশ্বর ও দেবদূতেরা জানেন, এই যুবক যদি তোমার প্রেমিক নাও হয়, আমার কিছু আসে যায় না। আমার তরুণ বন্ধুর সঙ্গে তুমি ভালো ব্যবহার করো। নইলে এরপর যাকে তোমার বর হিসেবে আনা হবে, সে হয়তো এর মতো সুন্দর নাও হতে পারে।'

এই বলে বুড়ো ধর্মযাজকদের সঙ্গে চলে যায়। পর্দাটা যথাস্থানে দোলে। কটমট করে দেনীর দিকে তাকায় যুবতী—

'স্যার, এসবের মানে কি?'

'ঈশ্বর জানেন। আমি এই বাড়ীতে বন্দী। মনে হচ্ছে, এখানে সবাই পাগল। আর কিছু আমি জানিনা।'

'এখানে আপনি এলেন কি করে?'

সংক্ষেপে সব বলে যায় দেনী। তারপর বলে—

'এবার বলুনতো, এ সবের মানে কি?'

'আমার মাথায় যন্ত্রনা হচ্ছে। বুক ধড়ফড় করছে। তবু, কুমারীর পক্ষে এসব লজ্জার

কথা হলেও আমায় সব বলতে হবে। আমার নাম ব্লাঁশ। আমার মা-বাবা নেই। আমার জীবনে সুখ নেই। তিন মাস আগে এক যুবক ক্যাপ্টেন গির্জায় আমার পাশে দাঁড়াতে শুরু করে! আমাকে ওর ভালো লাগে, আমি বুঝলাম। দোষটা আমারই। ও আমায় চিঠি দিত। তখন থেকে আজ অবধি ক্যাপ্টেন আমায় অনেক প্রেমপত্র লিখেছে। বেচারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইতো।

চিঠিতে লিখতো, কোন একদিন সন্ধ্যেবেলা দরজাটা খোলা রাখতে। যেন ও আমার সঙ্গে দুটো কথা একান্তে বলতে পারে। ও জানতো, আমার মামা আমায় কতো বিশ্বাস করে। আমার মামা বড়ো শক্ত মানুষ ও ভীষণ চালাক। যুদ্ধে বয়সকালে অনেক কৃতিত্ব দেখিয়েছে মামা। সেই আমলে রাণী ইসাবো ওকেখুব বিশ্বাস করতো। আমার প্রেমের ব্যাপার কি করে যে টের পেয়ে গেল মামা, আমি জানিনা। ওর চোখ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখা শক্ত।

আজ সকালে চার্চ থেকে প্রার্থনা সেরে ফেরার সময় মামা আমার হাতে হাত রেখে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চিঠিটা পড়ে নিয়ে খুব ভদ্রতা দেখিয়ে চিঠিটা আমায় ফিরিয়ে দিলো। এই চিঠিতেও ক্যাপ্টেন অনুরোধ জানিয়েছিল, দরজাটা খুলে রেখো। তার ফলেই এই সর্বনাশটা হয়েছে। মামা আমায় সন্ধ্যে অবধি নিজের ঘরে বন্ধ রেখে তারপর কনের পোষাক পড়তে বললো। আমি যখন কিছুতেই যুবক ক্যাপ্টেনের নাম বলতে রাজী হলাম না, ও আমার প্রেমিকের জন্য ফাঁদ পাতলো।

তুমিই বলো, ক্যাপ্টেন সত্যিই আমায় বিয়ে করতে চায়, না আমাকে সস্তা মেয়ে ভেবে প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছে, আমি কেমন করে জানবো? কিন্তু এতো লজ্জাস্কর শাস্তির কথা, এভাবে কোন যুবকের সামনে অপমানিত হওয়ার কথা আমি কখনো ভাবিনা। এবার আমার সব কথা তোমায় বলা হয়েছে। এখন তুমি নিশ্চয়ই আমায় ঘেন্না করবে।'

'ম্যাডাম, আপনার গোপন কথা আমায় বলে আপনি আমায় সম্মান দেখিয়েছেন। এখন আমায় প্রমাণ করতে হবে যে আমি সেই সম্মানের যোগ্য পাত্র। আপনার মামা কোথায় গেলেন?'

'বাইরের ঘরে বসে লিখছেন।'

'ম্যাডাম, আমায় সেখানে নিয়ে চলুন।'

প্রার্থনাগৃহ থেকে বেরোয় যুবক-যুবতী। লজ্জায় মাথা নীচু করে আছে যুবতী। যুবক তার কাজের গুরুত্ব ও সাফল্যের প্রতীতির দরুণ খুশমেজাজে হাঁটছে। ওদের দেখে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন সীরান দ্য মালেমত্রোয়া। দেনী বলে—

'স্যার, এই বিয়ের ব্যাপারে আমারও মতামতের প্রশ্ন আছে। আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, এই মহিলার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি ওঁকে বিয়ে করতে চাইনা। উনি যদি স্বেচ্ছায়

আমায় বিয়ে করতে চাইতেন, এই সুযোগের জন্যে আমি গর্বিত হতাম। কেননা উনি শুধু রূপে সুন্দরী নন, গুণেও অপরূপা। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে এই বিয়েতে আমি রাজী নই।'

দুচোখ ভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে যুবতী। বুড়ো শুধু হাসছে। হাসিটা দেনীর চোখে অসহ্য লাগে। শেষে বুড়ো বলে—'মসিয়ঁ দেনী দ্য বোলীয়া, তোমার সামনে দুটো বিকল্প আছে। ওই জানলার দিকে তাকাও। দেখছোতো, ওই লোহার রিং থেকে শক্ত একটা দড়ি ঝুলছে। দ্যাখো, তুমি যদি আমার ভাগ্নীকে বিয়ে করতে গররাজী হও, কাল সূর্যোদয়ের সময় তোমাকে ওই দড়ি থেকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। কাজটা করতে আমার দুঃখ হবে। কারণ আমার ভাগ্নী জীবনে সুখী হোক, এটাই তো আমি চাই। তোমার মৃত্যুতে আমার কোন লাভ নেই।

তুমি যদি গোঁয়ার্তুমি করো, তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো ছাড়া আমার উপায় নেই। দ্য বোলীয়া পরিবার খুবই সম্ভ্রান্ত, কিন্তু তুমি স্বয়ং শার্লেমাগনের উত্তরাধিকারী হতে, তবুও মালেমত্রোয়া পরিবারের মেয়ে বিয়ে করতে আপত্তি করা তোমার উচিত হতো না। এই বিয়ের ব্যাপারে আমার ভাগ্নী, তুমি বা আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রশ্ন নিয়ে আমি আদৌ ভাবছি না। আমার পারিবারিক সম্মান বিপন্ন হয়েছে।

আমার ধারণা হয়েছিল, তুমিই দোষী। তা যদি নাও হয়, এখন আমার পরিবারের সেই গোপন কথাটা তুমি জেনে গেছো। আমার ভাগ্নীকে তুমি যদি বিয়ে করো, সেই কলঙ্ক মুছে যাবে। যদি না করো, তোমার মৃত্যুর জন্যে তুমি নিজেই দায়ী হবে। তোমার মৃতদেহ আমার জানলার নীচে ফাঁসীতে ঝুলছে দেখলে আমার বিশেষ কোন আনন্দ হবে না। তবে খালিপেটে থাকার চাইতে আধখানা রুটি খাওয়া অনেক ভালো। যদি অসম্মানের প্রতিকার না হয়, আমি অন্ততঃ কেচ্ছার মুখ বন্ধ করতে চাই।'

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর দেনী বলে—

'ভদ্রলোকেদের মধ্যে এরকম মতবিরোধের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়ার প্রথা আছে। আপনার কাছে তরোয়াল আছে। আমি শুনেছি, আপনি তরোয়াল ব্যবহারে অতীতে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।'

জবাবে বুড়ো ধর্মযাজকদের দিকে তাকিয়ে কি একটা ইঙ্গিত করতেই সে নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে তিন নম্বর দরজার পর্দাটা লহমার জন্যে তোলে। দেনী দেখে, অন্ধকার প্যাসেজে সশস্ত্র প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো বলে—

'মসিয়ঁ, আমার বয়স আরো কম হলে আমি তোমার সঙ্গে তরোয়াল খেলতাম। কিন্তু এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বুড়ো বয়সে বেতনভোগী বিশ্বস্ত সমস্ত সৈন্য রাখাই ভালো। তুমি আরও দুঘন্টা ভাবার সময় পাবে। তুমি আর আমার ভাগ্নী, এই দুঘন্টা এঘরেই থাকো। তাড়াহুড়ো করার কোনো দরকার নেই। যদি ফাঁসিতে মরা তোমার

অপছন্দ হয়, তুমি দুঘন্টা পরে জানলা থেকে লাফিয়ে মরার কিম্বা আমার বেতনভোগী সৈন্যের বর্শার মুখে ঝাঁপিয়ে পরে মরার যথেষ্ট সুযোগ পাবে। কিন্তু জীবনের দুটো ঘন্টার অনেক গুরুত্ব আছে। দুঘন্টায় অনেক কিছু ঘটতে পারে।

তাছাড়া আমার ভাগ্নী একান্তে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায় বলে মনে হচ্ছে। জীবনের শেষ দুটো ঘন্টা তুমি নিশ্চয়ই একজন মহিলার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতে চাও না?'

যুবতীর দিকে তাকিয়ে দেনী দেখে, যুবতী ইঙ্গিতে অনুণয় করে কি যেন বোঝাতে চাইছে। তাই দেখে বুড়ো খুব খুসী হয়ে হেসে বলে—'মসিয়ঁ, যদি কথা দাও যে দু'ঘন্টার মধ্যে অর্থাৎ আমি ফেরার আগে তুমি হঠাৎ কিছু করে বসবে না, তাহলে আমি প্রহরীদের সরিয়ে নেবো এবং তোমরা নিরিবিলিতে কথা বলতে পারবে।'

দেনী দেখে, যুবতী নিঃশব্দে ইঙ্গিতে তাকে প্রস্তাবটা মেনে নিতে বলছে। 'আমি কথা দিলাম'—দেনী বলে।

গলা সাফ করে পাখীর মতো অদ্ভুত সুরেলা আওয়াজ করতে করতে বুড়ো টেবিলের ওপব থেকে কাপগুলো তোলে, প্যাসেজের সৈনিকদের কি যেন নির্দেশ দেয় এবং হাসতে হাসতে যুবক-যুবতীকে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে চলে যায়। লণ্ঠন হাতে তার পেছন পেছন যায় ধর্মযাজক।

দুহাত বাড়িয়ে যুবকের দিকে এগিয়ে আসে যুবতী। তার মুখ লাল, চোখে জল।

'আমি তোমায় মরতে দেবোনা। তুমি আমায় বিয়ে করবে।'

'ম্যাডাম, তুমি ভাবছো, আমি মৃত্যুকে খুব ভয় করি?'

'না, না, আমি জানি, তোমার ভয় নেই। কিন্তু এতো সামান্য একটা কারণে আমি তোমায় মরতে দিতে পারি না।'

'ম্যাডাম, কারণটা তুমি যতো সামান্য ভাবছো, হয়তো ততো নয়। তুমি দয়াপরবশ হয়ে আমায় যা দিতে চাইছো, হয়তো আমার আত্মমর্য্যাদা আমাকে তা গ্রহণ করতে দেবে না। আমার প্রতি সহ্য হতে যেয়ে হয়তো তুমি প্রেমিকের প্রতি তোমার দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছো।' চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে যুবতী। দেনী চারপাশে তাকিয়ে প্রেরণার উৎস বৃথাই খোঁজে। আসবাব কম, অনেক ফাঁকা জায়গা ঘরে, আলো কম, কোথাও সুখ নেই, বাইরে অন্ধকার, ঠাণ্ডা হাওয়া। যেন বিশাল এক গির্জা। যেন বিষণ্ণ এক কবর। ফুঁপিয়ে কাঁদছে যুবতী। দুঘন্টা ফুরিয়ে আসছে। মৃত্যুও এগিয়ে আসছে। মুখ নীচু করে দুহাতে মুখ ঢেকে আছে যুবতী। কান্নার দমকে কাঁপছে। তবুও কি সুন্দর। কি নরম, কি মোলায়েম। চামড়ায় বাদামী রং। মাথায় কি সুন্দর চুল। পৃথিবীতে এমন রূপসী আর কেউ আছে? হাতদুটো মামারই মতো, কিন্তু যুবতীর শরীরেই মানায়। কি নরম, কি সুন্দর। নীল চোখে কখনো করুণা ঝড়ছে, কখনো ক্রোধ, কখনো নিষ্পাপ

দৃষ্টি। এবং যুবতী যতো সুন্দর, মৃত্যু ততো কুৎসিৎ। যে পৃথিবীতে এতো সুন্দরী যুবতী আছে, সেই পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়ার সাহস কোনো যুবকের আছে? ওর সঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে কথা বলেছে। এখন জীবনের শেষ চল্লিশটা মিনিট সে ওর মন ভোলাবে।

হঠাৎ জানলার নীচের অন্ধকার উপত্যকা থেকে ভেসে আসে মোরগের ডাক, নৈঃশব্দের মধ্যে শব্দটার প্রতিক্রিয়া হয়। যেন অন্ধকারে আলো জ্বলে। ব্যক্তিগত চিন্তার জগৎ থেকে জেগে ওঠে যুবক-যুবতী।

'তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আমি কি কিছুই করতে পারবোনা?'

যুবতী জানতে চায়।

'ম্যাডাম, আমি যদি তোমাকে আঘাত দিয়ে কিছু বলে থাকি, বিশ্বাস করো, সে তোমারই জন্যে। তোমার পরিস্থিতিটা আমি বুঝতে পারছি। পৃথিবী তোমাকে দিয়েছে শুধু কঠোরতা, তিক্ততা আর নিষ্ঠুরতা। তোমার মামা মানবজাতির পক্ষে একটা লজ্জা। ম্যাডাম, ফ্রান্সে এমন কোনো যুবক নেই যে তোমার সামান্য উপকার করার জন্যে জীবন দিতে কুণ্ঠিত হবে।'

'তুমি সাহসী এবং মহৎ, আমি জানি। আমি শুধু জানতে চাই, এখন বা পরে আমি কি তোমার কোনো কাজে আসতে পারি?

'নিশ্চয়ই। আমি অপরিচিতের ভূমিকা ভুলে এখন বন্ধুর মতো তোমার পাশে বসবো। আমরা কি বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি, সেটা ভুলে যাবো। আমার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো তোমার জন্যে সুন্দর হয়ে উঠবে। এইসব তুমিই আমাকে দিতে পারো।'

'কাছে এসো। তুমি কথা বলো, আমি বন্ধুর মত শুনবো। কিন্তু মসিয়ঁ, আমি তোমার মুখের দিকে কোন লজ্জায় তাকাবো।?'

আবার কেঁদে ফেলে মেয়েটি। দুহাতে ওর হাত ধরে দেনী বলে—

'ম্যাডাম, সময় বড়ো কম। তোমার দুঃখ আমাকে যন্ত্রনা দেয়। আমার জীবনের শেষ কটি মুহূর্তে তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিও না।'

'আমি বড় স্বার্থপর। আমি তোমার কথা মতো সাহস না হারাবার চেষ্টা করবো। যদি আমি তোমায় বাঁচাতে না পারি, অন্ততঃ বলে যাও, তোমার বন্ধুদের কাছে কোনো খবর দিতে হবে কিনা। কান্না ছাড়া আর কিছু করতে পারলে আমার মনের ভার হয়তো আবার হাল্কা হবে।'

'আমার বাবার মৃত্যুর পর মা আবার বিয়ে করেছে। আমার সৎ ভাই এখন সব কিছুরই মালিক হবে এবং সে আমার মৃত্যুতে খুসীই হবে। ধর্মগ্রন্থে যেমন লেখা আছে, জীবন বাষ্পের মত দূরে মিলিয়ে যায়। যখন সময়টা ভালো যায়, যখন সারা জীবন মানুষের সামনে পড়ে থাকে, সে ভাবে, তার গুরুত্ব অনেক। তার ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি

করে, শিঙা বাজে, সে ঘোড়ায় চড়ে শহরে ঢুকলে মেয়েরা জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখে। বিশ্বাস ও সম্মানের অনেক চিহ্নই তার কাছে পৌঁছায়। কখনো চিঠিতে, কখনো মুখোমুখি—বিখ্যাত লোকেরা তাকে সম্মান জানায়। যদি সে এসবের জন্য গর্বিত না হয়, এ সবই খুব সুন্দর। কিন্তু মরে গেলে, মানুষ হারকিউলিসের মতো বীর হোক বা সলোমনের মতো জ্ঞানী হোক, মরা মানুষকে কেউ বেশীদিন মনে রাখেনা।

দশ বছর আগে আরও অনেক নাইটের সঙ্গে বিধ্বংসী যুদ্ধে মারা যায় আমার বাবা। আমার ধারণা, তাদের সবাই ভুলে গেছে। যুদ্ধটা কোথায় হয়েছিল, তাও কারো মনে নেই।

না, ম্যাডাম, মৃত্যুর যতো কাছে আসা যায়, বোঝা যায় মৃত্যু এক ধুলোঢাকা অন্ধকার যেখানে মানুষ কবরের আড়ালে চলে যায় এবং তার পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে যায়, যতোদিন না শেষ বিচারের দিন আসে। এখন আমার কয়েকজন বন্ধু আছে। যখন মরে যাবো, কেউ থাকবে না।'

'মসিয়ঁ, আমার কথা তুমি ভুলে যাচ্ছো।'

'মাদাম, তোমার স্বভাব মিষ্টি। তোমার সামান্য উপকার করেছি বলে তুমি ব্যাপারটাকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছো।'

'না, আমি আমার নিজের কথা ভাবছিনা। ভাবছি, তোমার মতো মহৎ পুরুষ আমি আগে কখনো দেখিনি। ভাবছি, তোমার মতো হৃদয় থাকলে সাধারণ মানুষও একদিন দেশজোড়া খ্যাতি পায়।'

যুবতীর চোখে যন্ত্রণার দৃষ্টি। সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর তার ঠোঁটে হাসি ফোটে।

'অন্যের জন্যে যে জীবন দেয়, স্বর্গে দেবদূতেরা তাকে অভিনন্দন জানায়। তুমি মাথা নীচু কোরোনা। বলোতো, আমি সুন্দর নয়?'

'হ্যাঁ, তুমি সুন্দর।'

'শুনে খুসী হলাম। ফ্রান্সে এমন পুরুষ আছে, যাকে কোনো সুন্দরী কুমারী বিয়ের প্রস্তাব নিজের মুখে করলে সেই পুরুষ রাজী হবেনা?'

'আমি জানি, পুরুষের কাছে ভালোবাসার তেমন দাম নেই। কিন্তু আমরা মেয়েরা ভালোবাসার মর্য্যাদা বুঝি। ভালোবাসা মানুষের নিজের চোখে তার মর্য্যাদা বাড়িয়ে দেয়। আমরা মেয়েরা তাই ভালোবাসাকে এতো সম্মান দিই।'

'তুমি খুব ভালো। কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি না যে ভালোবেসে নয়, করুণা করে তুমি বিয়ের প্রস্তাব করছো!'

'না, আমি জানি, তুমি আমাকে ঘেন্না করো, তোমার মনে আমার কোনো ঠাঁই নেই, অথচ আমারই জন্যে তোমাকে কাল সকালে মরতে হবে। তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে সম্মান করি, তোমায় দেখে আমি মুগ্ধ বলেই আমি নিজের মুখে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়েছি। যখন তুমি আমার হয়ে মামার সঙ্গে তর্ক করছিলে, তখনই আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছি। সেই মুহূর্তে যদি তুমি নিজেকে আয়নায় দেখতে পেতে, তোমাকে কতো মহৎ কতো সুন্দর দেখাচ্ছিল তুমি যদি দেখতে, তুমি বুঝতে পারতে, তোমাকে না ভালোবেসে আমার উপায় ছিল না। তাহলে তুমি আমায় ঘেন্না না করে অন্ততঃ করুণা করতে, তুমি অভিজাত পরিবারের ছেলে। বারবার অনুরোধ জানিয়ে তোমায় বিরক্ত করবো না। আমারও কিছু আত্মমর্য্যাদা আছে। ঈশ্বরের নামে বলছি, তুমি আমার কথা না রাখো, তুমি যদি তোমার প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নাও—'

'যে ভালোবাসা সামান্য একটু অহংকারের দেয়াল ডিঙোতে পারে না,' দেনী হাসে। 'তাকে বড়ো প্রেম বলে না।'

'জানালার ধারে এসো। সকালের আলো ফুটছে।'

সত্যিই ভোরের আলো ফুটছিল। আকাশে বর্ণহীন স্বচ্ছ আলো। নীচের উপত্যকার ধূসর রং। বনের আড়ালে এবং নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথের আশেপাশে এখনও হাল্কা কুয়াশা। এই দৃশ্যের নৈঃশব্দ ভেঙে মোরগের ডাক শোনা যায়। ভোরের আলো দেখে মোরগটা খুশী। জানলার নীচে বৃক্ষচূড়ায় বাতাস খেলা করে। পূবের আলো হয়ে এখুনি উঠে আসবে কামানের তপ্ত গোলার মত লাল উদয়সূর্য। দেখতে দেখতে একটু কেঁপে ওঠে দেনী। সে এখনও সঙ্গিনীর হাত ধরে আছে।

যুবতী বলে—

'এরই মধ্যে ভোর হয়ে গেলো! বড় দীর্ঘ ছিল রাতটা। তুমি আমার মামাকে কি বলবে?'

'তুমি যা বলবে।' ওর হাতে মৃদু চাপ দেয় দেনী।

'তুমি তো দেখেছো, আমি মৃত্যুকে ভয় পাইনা। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার শরীরে আঙুল ছোঁয়ানোর চেয়ে আমি বরং এই জানলা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়বো। কিন্তু তুমি যদি আমায় ভালোবাসো, আমি মরতে চাই না। এই সুন্দর পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে আমি তোমায় বেশী ভালোবাসি। আমি তোমার জন্যে প্রাণ দিতে পারি। কিন্তু তোমার পাশে জীবন কাটানো আমার কাছে স্বর্গসুখ।'

ওর কথা থামতেই বাড়ীর ভেতরে কোথায় যেন ঘন্টা বাজে। করিডরে বর্মের ঝনঝন শব্দ। প্রহরীরা ফিরে আসছে। দুঘন্টা কেটে গেছে।

'সবকিছু জেনেও তুমি আমায় বিয়ে করবে?'

দেনীর গায়ে ঝুঁকে পড়ে প্রত্যাশাভরা ঠোঁট ও চোখ তুলে যুবতী ফিসফিস করে বলে।

'আমি কিছুই শুনিনি।'

ওর কানে কানে বলে যুবতী—

'ক্যাপ্টেনের নাম ছিল ফ্লোরীমঁদ দ্য শাঁপ দী ভেয়ার।'

'নামটা আমি শুনিনি।'

দেনী বলে।

তারপর যুবতীর নরম শরীর সে আলিঙ্গনে বাঁধে।

তারপর যুবতীর কান্নাভেজা মুখ সে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেয়।

বাইরে সুরেলা গলার আওয়াজ।

তারপর মিষ্টি হাসির শব্দ।

অভিজাত মালেমত্রোয়া বংশের উত্তরাধিকারী সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাসছে।

নতুন জামাইকে সে সুপ্রভাত জানাচ্ছে।

মূল গল্প □ দি লাভ ট্রাপ

সিনক্লেয়ার লুই

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই আমেরিকান কথাসাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসঃ মেইন্ স্ট্রীট। তাঁর সমকালীন অ্যামেরিকার ছোট শহরের পুরুষ ও রমণীদের মানসিকতা, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে কতো সহজে কেচ্ছাকাহিনী ছড়িয়ে যায় এবং কিভাবে সংবেদনশীলতাহীন ও অনুভূতিহীন সমাজের চাপে ব্যক্তিমানুষ নিতান্ত অসহায়ভাবে সামাজিক যাঁতাকালে পিশে যায়; সিনক্লেয়ার লুই-এর বিভিন্ন রচনায় এইসব বিষয়ে বারবার ফিরে আসে। তাঁকে বলা হয় 'দ্য অ্যামেরিকান আর্টিষ্ট অফ দ্য কন্টেপপোরারী স্মল টাউন'। উপকথার পৌরুষদীপ্ত পাওনীয়ার ও নারীত্বের সব গুণে গুণবতী রমণীদের সন্তান হলেও একালের ছোট ছোট শহরের অ্যামেরিকান নাগরিকদের মধ্যে যে আদর্শ পৌরুষ বা আদর্শ নারীত্ব কোনটাও নেই, গুজব ও কেচ্ছাকাহিনী ছড়ানোই যে তাদের আহার, রমণ, চাকরী, ব্যবসা ইত্যাদির বাইরে একমাত্র আনন্দদায়ক সখ এবং ছোট শহরের ছোট পরিধির মধ্যে জীবন কতো ন্যাক্কারজনক হতে পারে—এই লেখকের বহু কাহিনীতে এইসব বিষয় কখনও বিদ্রূপ কখনও হিউমারের আড়ালে ধরা পড়ে। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাসঃ 'ক্যাস্‌টিমবারলেন্' ও 'র‍্যাবিট'।'



পরকীয়া প্রেম

সিনক্লেয়ার লুই

চিপ্‌পেওয়া এভিনিউয়ের চশমাব দোকানেব মালিক অরলো ভে। রঙ-করা বাঁকা ধরণের ফ্রেমের স্মার্ট চশমা তার বিশেষত্ব। সে জনগণের সুপরিচিত মানুষ, গোরস্থানের মতোই সুপরিচিত। মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্যে সাজানো যার কাজ, শিল্প সম্বন্ধে লেকচার দেয় যে অধ্যাপক এবং মবমন্ মিশনারী—এদের কাজের মতোই চশমাওলার ধৈর্য্য বা টেকনিক্যাল কৌশলের যথেষ্ট মূল্য দেয়না নাগরিকবৃন্দ।

সে বড় হতে চায়। সে ভালো বক্তা, খুব হাসিখুশী, জনসমক্ষে স্থানীয় মেফ্লাওয়ার চার্চ এবং যুদ্ধসংক্রান্ত সব প্রচেষ্টার ব্যাপারে সে অনেক কথা বলে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তার মাথায় টাক পড়েছে। তার মুখ ও কপাল ডিমের মত চকচকে, সেই মসৃণতার মাঝখানে ভে'র তৈরী হাই-বাইফোক্যাল চশমা—যুদ্ধের চাদা ওঠানোর যে কোন ফাংসনে এই মুখ দেখা যাবে।

তাই এইসব আত্মিক প্রচেষ্টায় তার স্ত্রী ভারগা সহযোগিতা করুক, এই তো সে চায়। কিন্তু ভারগা ছোটখাট, সহজে ভয় পাওয়া, রোমান্টিক মেয়েমানুষ। ভারগা বয়সে স্বামীর চেয়ে দশ বছর ছোটো। তার ভালো লাগে টেকনিকালার সিনেমার প্রেম এবং পাহাড়ের ওপরে শরতের কুয়াশার পটভূমিতে যে প্রেমের কবিতা অ্যামেরিকান খবরের কাগজে ছাপা হয়।

ভারগা সান্ত্বনা খোঁজে তার প্রেমিকের কাছে। তার প্রেমিক একজন ডেন্টিষ্ট। তার নাম ডাঃ অ্যালান সিডার। যদি ওদের বিয়ে হতো ওরা হোত খুব শান্ত, ছোট্ট, পরস্পর নির্ভর ও বিশ্বাসী এক দম্পতি। কিন্তু ওরা খোলাখুলি মিশতে পারে না। ওরা ভয় করে অরলো ভেকে এবং অ্যালানের মোটা ও কুঁদুলে বউ মারথাকে। তারা সন্ধ্যারাতের

আলো আঁধারিতে অ্যালেনের গাড়ীতে চড়ে যেতো শ্যাওলা ঢাকা মাঠে, যেখানে তারা শরীরে শরীর মেলাত।

স্থানীয় অভিনেতৃ সংঘের সেরা অভিনেতা অ্যালান এবং যদিও ভারগা অভিনয় করে না, সে অভিনেত্রীদের পোষাক তৈরী করে ও এই সুযোগে সে রিহার্স্যালে ঘোরাঘুরি করে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করে। অ্যালানের বউ বারথা সিডারের সন্দেহ জাগাবার কারণ ঘটে না।

মিসেস বারথা সিডারের মতো শয়তান মেয়েমানুষ সত্যিই কম দেখা যায়। সে স্বামীকে সত্যি সত্যিই ঘেন্না করে। স্বামীর অভিনয়ের 'মেয়েলী' অভ্যাস, কবিতা লেখার বদভ্যাস, মস্ত বড় গোঁফ এবং সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানোর কায়দা সব কিছুকেই সে বিদ্রূপ করে আর তার সাত বোন এবং সাত ভগ্নীপতি বাঁধানো দাঁতে চুইং গাম চিবোতে চিবোতে শোনে যে মিসেস সিডারের মতে প্রেমের শয্যায় 'অ্যালি' রমনীরমন রণে তাড়াতাড়ি হার মানে।

চেনাশোনা সব মেয়েমানুষের কাছে প্রচুর সহানুভূতির দাবী করে এবং তা পায় এই মহিলা। স্বামী গলফ্ ও ব্যাকগ্যামন খেলতে ভালোবাসে। অতএব খেলা দুটোর কোনটাই শিখতে রাজী নয় মারথা।

এইভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্বামীকে নার্ভাস করে তুলতো মারথা। তারপর বলতো— 'তুমি খুব নার্ভাস হয়ে উঠেছো মনে হচ্ছে।'

ক্রসওয়ার্ডের ধাঁধার সমাধান খোঁজা অ্যালানের সখ। তাই নিয়ে বিদ্রূপ করে বারথা। এবং শেষে স্বামী যখন চীৎকার করে উঠে 'আমায় একা থাকতে দাও', স্ত্রী মসৃণ মুখে বলে, 'ব্যাপার কি বলোতো, ছোটখাট কথায় রেগে যাচ্ছো আজকাল? তোমার মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। পাগলের ডাক্তার দেখাও।'

তারপর এই মার্থাই একদিন ভয়ংকর চেহারা ও স্বভাবের এক পিসীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে পেলো ক্যালিফোর্নিয়ার সান্ জোসেতে একটা বাড়ী আর সাত হাজার ডলার। স্বামীকে প্রস্তাব দিলোনা স্ত্রী, স্রেফ জানালো, ওরা ঠাণ্ডা মিনোসোটার বদলে ক্যালিফোর্নিয়ার উষ্ণ আরামে থাকবে এবং এখন সেখানেই প্র্যাকটিস করবে অ্যালান।

স্ত্রীকে খুন করার কথা অ্যালানের মাথায় এলো। অথচ স্ত্রীর সঙ্গে যেতে অস্বীকার করার কথা একবারও মাথায় এলোনা। অনেক অ্যামেরিকান পুরুষই তাদের স্ত্রী ও পুলিসম্যানের পার্থক্য বোঝেনা।

কিন্তু অ্যালান জানে, ভারগা ভে-কে ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে মৃত্যুর সমান। সে ভারগাকে সাংকেতিক কোডে টেলিফোনে বললো 'সুপার মার্কেট থেকে বলছি। আপনাকে তিন গোছা অ্যাসপ্যারাগাস্ পাঠানো হচ্ছে।' ফোনের জবাবে ভারগা বিকেলে

তিনটায় তার অফিসে এলো এবং বললো 'আমরা দুজনে কি একসঙ্গে কোথাও পালিয়ে যেতে পারিনা? আমরা যদি ছোট একটা ফার্মের মালিক হই—'

'আমার বউ আমাদের ধরে ফেলবে। ওর খুড়তুতো ভাই ডালাসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

'হ্যাঁ আমারও মনে হয়, ও আমাদের ধরে ফেলবে। আমরা কি কোনদিন সবসময় একে অন্যের কাছে থাকতে পারবোনা?'

'একটা মাত্র উপায় আছে। যদি তোমার ভয় না করে—'

উপায়টা বুঝিয়ে বললো অ্যালান। তার প্রেমিকা ভারগা জবাব দিলো 'না, আমার ভয় করবে না যদি তুমি আমার পাশে থাকো।' ডাঃ অ্যালান সেডার পেশাদার যন্ত্রবিদ না হলেও তার কাজের হাত ভালো। এক রবিবার বিকেলে তার বউ বারথা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেই সুযোগে নিজের ছোট্ট কালচে-ধূসর মোটর গাড়ীর লাগেজ কম্পার্টমেন্টের ইস্পাতের মেঝেয় একটা গর্ত করলো ডাঃ অ্যালান।

লাগেজ কম্পার্টমেন্ট-এর সঙ্গে গাড়ীর ভেতরের সরাসরি যোগাযোগ আছে। একই দিনে নিজের ভ্যাকুয়ম-ক্লীনারের হোসপাইপ চুরি করে নিজের গ্যারেজে লুকিয়ে রাখে অ্যালান।

ফেব্রুয়ারীর এক মঙ্গলবার সে ইগনেশিয়াস স্ট্রীটের গোল্ডেনক্রন্ ব্রাদার্সের দোকান থেকে নীল রঙের নতুন একটা রেডিমেড সুট কিনলো। ভালোই ফিট করলো, অদলবদলের দরকার হলোনা। দোকানদার বিকেলে সুটটা ওর বাড়ী পাঠিয়ে দেবে বলায় অ্যালান বললো 'না, কাল সকালে এখানে এসে পরবো, আমি অবাক করে দিতে চাই।'

মন্টি গোলডেনক্রন্ বললো, 'তোমার বউয়ের স্যুটটা খুব পছন্দ হবে।'

'আশাকরি যখন ও স্যুটটা দেখবে!'

সাদা লিনেনের তিনটে সার্ট আর লাল একটা বো কিনে নগদে দাম মেটালো ডেন্টিষ্ট। মন্টি বললো—

'ক্যাশ দেওয়ার কি দরকার? তোমাকে ধার দিলে টাকা মারা যায়না, আমি জানি, ডক।'

'সেই সুনামটা অক্ষুণ্ন রাখা এই মুহূর্তে সবচেয়ে দরকার।' ওর কথার ধরনে অবাক হয় মন্টি।

মন্টির দোকান ছেড়ে অ্যালান যায় এম্পোরিয়মে, গোল্ডেন রুল ড্রাগষ্টোরে, কোঅপারেটিভ ডেয়ারীতে। সব জায়গায় সে নগদে টাকা দেয়। রাস্তায় স্থানীয় এক বিশিষ্ট নাগরিক বিচারক টিমবারলেন ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে অ্যালান। জীবনে

তাদের সঙ্গে দশটা কথাও হয়তো বলেনি অ্যালান। কিন্তু সে ভাবে, এই এক বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান্ দম্পতি। প্রেমেব মূল্য কি, এরা জানে।

সেদিন সন্ধ্যায় সে স্ত্রীকে বলে—

'অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে আজ। য়ুনিভার্সিটি স্কুল অফ ডেনটিসট্রি থেকে আমায় ফোন করেছে।'

'লং ডিসট্যান্স?'

'নিশ্চয়ই'

'তাই নাকি!'

স্ত্রীর গলায় অবিশ্বাস যতোটা, বিরক্তি তার থেকে বেশী।

'ওরা ডেন্টিষ্টদের ট্রেনিং ঝালাই করার বিশেষ একটা সেশনের ব্যবস্থা করেছে। ওরা বলেছে, কাল আমাকে সকালে মিনীয়াপোলিস যেতে হবে এবং তিন দিন ধরে দাঁত বাঁধানোর কাজ শেখাতে হবে নতুন ডেন্টিষ্টদের! তোমাকেও যেতে হবে কিন্তু। আমাকে অবশ্য সকাল নটা থেকে রাত বারোটা অবধি কাজ করতে হবে। এইসব স্পেশাল কোর্সে বড্ড তাড়াহুড়ো করে ওরা। তুমি না হয় একা একা সিনেমা দেখবে নয়তো আরামে হোটেলে বসে থাকবে।'

'না, ধন্যবাদ। আমি এখানেই থাকবো? রবিবার সকালের আগেই তোমায় ফিরতে হবে।'

'তার আগেই আমি বাড়ী ফিরবো।'

ডক্টর অ্যালান বউকে বলে গেল, সে মিনীয়াপোলিসের ফ্লোরা হোটেলে থাকবে। কিন্তু বুধবার সকালে, যখন হাল্কা তুষার ঝরছে, নতুন স্যুট পরে গাড়ী চালিয়ে সেন্ট পলে যাওয়ার পথে অ্যালান ভাবছিল—আমার মধ্যে সত্যিকারের কোন কবিত্ব শক্তি নেই। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং অতি সাধারণ। সে একটা কবিতা ভাবতে চেষ্টা করে এবং তার মাথায় আসে শুধু আজেবাজে তিনটে লাইন—

'ঝরছে তুষার, বইছে হাওয়া, সুখের খোঁজে আমার যাওয়া...।'

সেন্ট পলে হোটেল অরকনেসে ডবলবেড রুম ভাড়া করে সে হোটেলের ক্লার্ককে বোঝায়—'আমার বউ ট্রেনে আসছে। সতেরো মিনিটের মধ্যে আসার কথা।' নিরুৎসাহ ভঙ্গীতে লিফটে চড়ে ঘরে যায় ডক্টর। উনিশ মিনিট পরে এসে হাজির হয় ভারগা ভে। তাকে পৌঁছে দিয়ে যায় হোটেলের বেলবয়। ভারগার সদ্য-কেনা নকল চামড়ার ব্যাগটা সে পৌঁছে দিয়ে যায়। 'তুমি পৌঁছে গেছো, হাজব্যান্ড। ঘরটা মন্দ নয়'—উদাসীন স্বরে বলে ভারগা।

তার উদাসীন স্বর এবং পুরুষকে 'হাজব্যাণ্ড' বলা শুনেই বেলবয় বোঝে মহিলা

এই পুরুষের স্ত্রী নয়, কিন্তু এই পুরুষকে সত্যিই ভালোবাসে। তার মাথার ওপর ছ'তলার ঘরে ভারগা ও অ্যালান তখন পাগলের মত, অন্ধের মত কাঁপতে কাঁপতে একে অন্যকে চুমু খাচ্ছে। ভারগা বলছে—'ওঃ, তুমি নতুন স্যুট পরেছো! ঘুরে দাঁড়াও তো। বাঃ, কি সুন্দর ফিট করেছে। লাল টাইটা কি সুন্দর। বো-টাইয়ে তোমার বয়স আরও কম মনে হয়। এসব কিনেছো কেন? আমার জন্যে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া...এখন ও ব্যাপারে কথা বলতে চাইনা...তবে ওরা যখন আমাদের খুঁজে পাবে, আমাদের যেন খারাপ না দেখায়, কেউ যেন না ভাবে, আমরা দুজনে সুখে ছিলাম না...তুমি, তুমি মনস্থির করছো তো?'

'তুমি পাশে থাকলে আমি সবকিছুর জন্যে তৈরী।'

পরের দিন বিকেলে, ওরা পোষাক পরে ও মালপত্র প্যাক করে। লাগেজ খাটের পায়ার কাছে রেখে যায় ওরা। ব্যুরোর ওপরে রইলো দশ ডলারের দুটো নোট। ঘরের কিছু নেয় না ভারগা। শুধু নেয এক বোতল ব্যুরবঁ হুইস্কি আর নতুন কবিতার সংকলন একটা পকেট বই।

গ্যারেজের পবিচারকে এক ডলার টিপস্ দিয়ে অবাক করে দেয় ডক্টর অ্যালান। তারপর ধূসর কালো গাড়ীটা ছুটে চলে চঞ্চলা মিসিসিপি নদীব ধারে ইণ্ডিয়ান মাউনডস পার্কের দিকে।

হোটেল ছেড়ে আসার পর একটু সময় গম্ভীর থেকে বাকী সময়টা ওরা সবকিছুতে হেসেছে। ভারগা হাঁচলেও অ্যালান হেসে বলে—'এখন আর নিমোনিয়ার ভয় নেই।'

তারপর কাছের ছোট্ট একটা রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করায় অ্যালান। আধো-অন্ধকার। ইঞ্জিন চালু আছে। এক্সহসট পাইপ-এর সঙ্গে লাগানো হোসপাইপ, যার অন্য মুখটা এখন লাগেজ কম্পার্টমেন্টের তলার ফুটোয় লাগানো। ভেতরে ঢুকে যায় অ্যালান। গাড়ীর ভেতরে ভারগা বসে আছে। গাড়ী ভরে উঠেছে কারবন মনোক্সাইডের মিষ্টি অথচ বিশ্রী গন্ধে।

হুইস্কির বোতল বার করে পুরুষ বলে—একটু খাও। তাহলে সাহস হারাবে না।

'প্রিয়তম, সাহস বজায় রাখার জন্যে কোন কিছুর দরকার নেই।'

'আমার আছে। আমি তোমার মতো সাহসী নই, ভারগা।'

দুজনেই হাসে। দুজনেই মদ খায়, চুমু খায়।

পুরুষ ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালে, পকেট-বইটা যেন এখন সীসের মত গুরুভার, সে কনর্যাড আইকেনের কবিতা পড়ে শোনায় প্রেমিকাকে...

স্বপ্নের নন্দনকানন থেকে তাদের ফিরিয়ে আনে তীক্ষ্ণ ও তীব্র শব্দ। গাড়ীর জানলা ভাঙা হচ্ছে। ভারগার গালে চড় মারছে বারথা! অ্যালানের কাঁধে ব্ল্যাকজ্যাকের ঘা

মেরে তার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করে বারথার দূর সম্পর্কের ভাই, যে কিনা পেশায় ডিটেকটিভ। তার মারের চোটে অ্যালানের চোয়ালের হাড় ভাঙে।

বারথা ওকে গাড়ীতে তুলে গ্র্যান্ড রিপাবলিকে নিয়ে যায়, সেবা শুশ্রূষা করে ওবে সারিয়ে তোলে এবং ওর রোগশয্যার পাশে প্রতিবেশিনী কূটনী ও ডাইনী মেয়েদের ডেকে এনে গল্প করে—

'অ্যালান...তোমরা তো জানো...ও একটা মেয়ের সঙ্গে...কিন্তু পুরুষের কাজ ঠিকমত করতে না পেরে লজ্জায় ও আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।'

পরে, বারথা ভারগার প্রত্যেকটা চিঠি গাপ করে। ভারগাব স্বামী অরলো ধর্মের দোহাই দিয়ে ভারগাকে ডিভোর্স করেছে। ভারগা এখন ড্রেস মোয়নেসের ছোট্ট দোকানে কাজ করে। তার কোন চিঠি অ্যালানের কাছে পৌঁছায় না।

'প্রেম!!! বারথা তার আগ্রহিনী বান্ধবীদের শোনায়, 'অ্যালি এখন বুঝছে, ওসব জঞ্জাল মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়!'

মূল কাহিনী □ ভারগা ভে অ্যাণ্ড অ্যালান সিডার

চার্লস ডিকেন্স

জন্ম ১৮১২, মৃত্যু ১৮৭০। উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক। দরিদ্র এক কেরানীর সন্তান। পনেরো বছর বয়সে জীবিকার প্রয়োজনে অফিস-বয়ের চাকরী নিতে হয়েছে। পরে নিজের চেষ্টায় ভাষা, সাহিত্য, শর্টহ্যাণ্ড শিখেছেন, সংবাদপত্রের রিপোর্টার হয়েছেন এবং যে দারিদ্র্য তাঁর শৈশবকে ঘিরেছিল, তারই স্মৃতি তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে অসহায়, অনাথ, নিপীড়িত ও নির্য্যাতিত মানুষের স্বপক্ষে ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে কথা সাহিত্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে। 'অলিভার টুইস্ট' সেকালের অনাথাশ্রমগুলির বাস্তবধর্মী বর্ণনায় সমৃদ্ধ, 'নিকোলাস, নিকল্‌বি' সেকালের জঘন্য ক্যানট্রি স্কুলগুলির পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছে, 'ডেভিড কপারফিল্ড' ঋণগ্রস্ত পিতার স্মৃতির উদ্দেশে ডিকেন্সের বিদ্রূপ ও হিউমার মিশ্রিত বেদনার প্রকাশ। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা 'এ টেল্‌ অফ টু সিটিজ' এবং কিছুটা রম্যরচনার ধরণে লেখা অনবদ্য রচনা সংকলন 'পিকউইক পেপার্স' ডিকেন্সকে তাঁর জীবৎকালে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। তাঁর উপন্যাস মূলতঃ ডায়ালগ্‌-নির্ভর এবং তাঁর ডায়ালগ্‌ বাস্তবধর্মী, সোচ্চার, হিউমার-সমৃদ্ধ, পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত বদলে যায় এই ডায়ালগের ধরণ। যুক্তি দিয়ে জীবনকে বোঝা যায় না এবং সময়ের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ তার হাসি ও তার অন্তর্লীন করুণা—এই চিন্তাধারা তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের অন্তরালেই ছিল।



অলৌকিক প্রতিশ্রুতি

চার্লস ডিকেন্স

'আমার কাকা দেখতে ছিল বেশ একটু মোটাসোটা, মুখটা স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশী লাল। খুব হাসিখুশী, নাক আর চোয়ালটা সুন্দর, চোখে সব সময় হাল্কা হাসির ঝিলিক, এবং মুখে অর্থহীন দেঁতো কাষ্ঠহাসি নেই বরং সত্যিকারের খুশমেজাজী হাসিই ওর ঠোঁটে সবসময় লেগে থাকতো। একবার গাড়ি থেকে ছিটকে পরে মাইলস্টোনে মাথা ঠুকে গিয়ে অজ্ঞান, তার ওপর আবার রাস্তার ধারের নুড়িপাথরে মুখটা কেটে গিয়েছে। আমার বাবার ভাষায়, আমার ঠাকুরমা স্বর্গ থেকে নেমে এসে ছেলেকে দেখলেও তখন চিনতে পারতেন না। তবে কাকার যখন দু'বছর সাতমাস বয়স, তখন মারা গেছে আমার ঠাকুরমা এবং স্বাভাবিক অবস্থাতেও টপবুট-পরা লালমুখ কাকাকে দেখলে উনি চিনতে পারবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। যাইহোক, যে লোকটা বাবাকে ধরে তুলেছিল, সে বলেছিল, কাকার ঠোঁটে তখনও হাসি লেগেছিল এবং সে আমলের চিকিৎসা অনুযায়ী জোঁক দিয়ে রক্ত বার করার পর কাকার জ্ঞান একটু ফিরতেই কাকা জোরে হাসলো, সামনে যে তরুণী বেসিন ধরেছিল তার ঠোঁটে চুমু খেল এবং মাটন চপ ও নুনে জড়ানো ওয়ালনাটের অর্ডার দিল। শেষেরটা, ওর মতে, ভিনিগার ছাড়া খেলে বীয়ারের চাটের কাজ করে।

গাছের পাতা ঝরার ঋতু এলে পাওনা আদায় ও অর্ডার নেওয়ার জন্যে স্কটল্যাণ্ডে যেতো কাকা। লণ্ডন থেকে এডিনবরা, ওখান থেকে গ্লাসগো, ফের এডিনবরা তারপর লণ্ডন। এক জায়গায় দ্বিতীয়বার যাওয়াটা ব্যবসার জন্যে নয়, ফূর্তির জন্যে। ওখানে এক হপ্তা থেকে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতো কাকা। কারো বাড়ী ব্রেকফাস্ট, কারো বাড়ী লাঞ্চ, কারো বাড়ী ডিনার। স্কচ ব্রেকফাস্টের যা বিরাট বহর তারপর লাঞ্চে এক বস্তা ঝিনুক, এক ডজন এলের বোতল আর দু এক বোতল হুইস্কি

সাবাড় করে তারপর আবার ডিনার ও নৈশভোজ সারা সত্যিই শক্ত কাজ। কিন্তু কাকার কাছে এসব ছেলেখেলা।

এক রাতে স্কটল্যাণ্ডের ওই শহরে বন্ধুর বাড়ী নৈশভোজ খেতে গেল কাকা। বন্ধুর নাম বেলী ম্যাক— তারপর চার অক্ষরের কি সব যেন। বেলীর বউ, তিন মেয়ে, বড় ছেলে এবং পুরু ভুরুওলা মোটাসোটা চারজন স্কটিশ ছিল নৈশভোজের আসরে। জমাটি আসর। স্যামন মাছ, হ্যাডক, ভেড়ার মাথা এবং স্কটল্যাণ্ডের নামজাদা রান্না 'হ্যাগিস'।

মেয়েরা সুন্দর, বেলীর বউ খুশমেজাজী, আমার কাকা হাসিখুশী। মেয়েরা খিলখিল করে হাসে, বেলীর বউ জোরে হাসে এবং পুরুষেরা হাসে আরও জোরে। ঠিক ক'বোতল হুইস্কি ওরা সাবাড় করেছিল আমরা জানিনা। কিন্তু আমার কাকা আর বেলীর বড় ছেলে ছাড়া সবাই বেহুঁশ। সেই ছেলেটা স্কটিশ গান গাইতে গাইতে বেহুঁস হয়ে গেল। তখন কাকার খেয়াল হল, এবার তার যাওয়ার সময় হয়েছে। যাতে সে সময়মত বাড়ী ফিরতে পারে তাই সন্ধ্যে সাতটায় মদ খাওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু এক্ষুনি আসন ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে সে প্রথমে জল মিশিয়ে এক গ্লাস মদ খেলো, নিজের স্বাস্থ্য পান করে ছোটখাট বক্তৃতা দিল, তাতেও কারো ঘুম ভাঙছে না দেখে একটু নীট মদ খেয়ে টুপি হাতে নিয়ে রাস্তায় বের হল।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। চাঁদের ওপর দিয়ে দ্রুত মেঘ ভেসে যাচ্ছে আকাশে। চাঁদ কখনো মেঘের আড়ালে কখনো বা আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছে চারপাশ। রাস্তার দুপাশে তাসের ঘরের মত ছয় সাত বা আটতলা উঁচু পুরোনো বাড়িরুক্ষ পথের ওপর তাদের কালো ছায়া রাতের অন্ধকার আরও বাড়িয়েছে। অনেক দূরে দূরে তেলের লম্ফ জ্বলছে। কোন বাড়ীর নোংরা ও সরু দরজায় কিম্বা উঁচু ঘোরানো সিঁড়ির মুখে। ওয়েষ্টকোটের দু'পকেটে দুহাতের বুড়ো আঙুল, কখনও প্রেমের গান কখনও অন্য কোন গান মাতাল গলায় চেঁচিয়ে গাইতে গাইতে পথ হাঁটছে কাকা। যে বেচারারা ঘুমুচ্ছে, তাদের ঘুম ভাঙছে। মাতালের কারবার বুঝে তারা আবার কম্বল টেনে ঘুমিয়ে পড়ছে। শিস দিতে দিতে নর্থ ব্রিজের দিকে হেঁটে যায় কাকা। দূরে দুর্গের আলোগুলো দেখাচ্ছে ঠিক যেন আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মত। লেইথ ওয়ারের শেষে ফাঁকা জমি। তারপর সরু একটা রাস্তা দিয়েএকটু হাঁটলেই কাকার বাসায় পৌঁছোনো যাবে। এই ফাঁকা জায়গায় খানিকটা বেড়া দিয়ে ঘেরা, পোষ্ট অফিসের সঙ্গে কনট্রাক্ট মারফত ওখানকার এক ব্যবসায়ী পুরোনো ভাঙা ডাকগাড়ীগুলো কিনে ওই ঘেরা জায়গায় রেখেছে। দরজাগুলো কব্জা ভেঙে ঝুলছে, লাইনিং ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, ল্যাম্প নেই, লোহায় মরচে ধরেছে এবং পেইন্ট চটে গেছে। কাঠের ফাঁক দিয়ে হাওয়া বইছে, ছাদের ফুটো দিয়ে জল ঝরছে। একটা গাড়ীতে বসে কাকা ভাবছিল, বছরের পর বছর এই গাড়ীগুলো রাতের পর রাত বয়ে নিয়ে গেছে খবর বা টাকা, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার

প্রতিশ্রুতি, অসুস্থতা ও মৃত্যুর দুঃসংবাদ। ব্যবসায়ী, প্রেমিক, স্ত্রী. বিধবা, মা, স্কুলের ছেলে, এমনকি পোষ্টম্যানের আওয়াজ পেলে যে বাচ্চা ছেলেটা টলমল করতে করতে দরজায় আসতো—তারা এখন কোথায়?

কাকা নাকি ভাঙাচোরা ডাক গাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে এইসব ভাবছিল। আমার কিন্তু মনে হয়, পরে বই পড়ে কাকা এসব জেনেছে। যাইহোক, তখন কাকার একটু ঝিম ধরেছিল।

হঠাৎ চার্চের ঘড়িতে রাত দুটোর ঘন্টা বাজলো। গির্জার ঘন্টার শব্দে জেগে উঠে চোখ ঘষে চারপাশে তাকায় কাকা!

এ কী ব্যাপার।

ফাঁকা জনহীন জায়গাটা ভীড়ে ভরে গেছে। চেঁচামেচি, হৈ হৈ ব্যাপার। গাড়ীগুলোর দরজার কব্জা ঠিক হয়ে গেছে, লাইনিং এখন যথাস্থানে, লোহার মরচে ঝড়ে গেছে, পেইন্ট একেবারে নতুনের মত জ্বলছে, প্রত্যেক গাড়ীতে কুশন, কুলীরা মাল তুলছে, পাহারাদাররা চিঠিভর্তি ব্যাগ তুলছে গাড়ীতে, অনেকে গাড়ির চাকা ধুচ্ছে, প্রত্যেকটা কোচে পোল্ লাগানো হচ্ছে, প্যাসেঞ্জাররা গাড়ীতে উঠছে। গাড়ীগুলোতে ঘোড়া জুড়তে ব্যস্ত কেউ কেউ। বোঝা যাচ্ছে, এখুনি গাড়ীগুলো যাত্রা শুরু করবে। আমার কাকা বিস্ফারিত চোখে দেখছিল। সে বলে, পরে যে সে চোখদুটো বন্ধ করতে পেরেছে, এটাই আশ্চর্য।

'এই যে!'

কে একজন কাকার কাঁধে হাত রেখে বললো—

'ভেতরের দিকে ওই গাড়ীটায় তোমার সীট বুক করা আছে। ভেতরে ঢুকে বসো।'

'আমার সীট বুক করা আছে?'

অবাক হয়ে জানতে চায় কাকা।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

কাকা তো অবাক। এতো লোক, নতুন নতুন মুখ, কোথা থেকে আসছে এরা? মাটি ফুঁড়ে না আকাশ থেকে? কোচে মাল তুলে পয়সা নিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে যাচ্ছে কুলী। আবার আধডজন কুলী মাল নিয়ে হাজির। প্যাসেঞ্জারদের পোষাক কী অদ্ভুত! মাথায় বিরাট পরচুলা, পেছন দিকে টাই, কোটে লেস লাগানো, ঠোটের নীচের দিকটা চওড়া স্কার্টের মত, মস্ত হাতা, শার্টে কলার নেই।

'তুমি ভেতরে ঢুকবে না?'

যে লোকটা কাকার সঙ্গে কথা বললো, তার পরণে মেইল গার্ডের পোশাক, মাথায় পরচুলা, এক হাতে লণ্ঠন, আর ওর হাতে বিরাট একটা গাদা বন্দুক—'জ্যাক মার্টিন, তুমি গাড়ীতে উঠবে না?'

'হ্যালো।'

কাকা পিছিয়ে চেয়ে বলে—

'আমার নাম জানো তুমি?'

'হ্যাঁ, বিলে লেখা আছে।'

'নামের আগে মিষ্টার নেই?'

আমার কাকার মতে, ভদ্রলোকের নামের অগে 'মিষ্টার' না বলে পোষ্ট অফিসের আইন ভাঙছে গার্ড।

গার্ড কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় বললো—

'না, নেই।'

'ভাড়া দেওয়া হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে উঠি।'

'দাঁড়াও। অন্য যাত্রীদের আগে উঠতে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয় অন্য যাত্রীরা। পাউডার লাগানো পরচুলো মাথায়, তার উপর তিনকোণা টুপি, আকাশী রঙের কোটে রূপোর কারুকাজ, ব্রীচেস, সিল্কের মোজার উপর ন্যাকড়ার মত কি যেন জড়ানো তোমার তরোয়াল, জুতোয় বক্‌লস লাগানো। কোচের দরজায় গম্ভীভাবে দাঁড়িয়ে, টুপি খুলে, ডান হাতের কড়ে আঙুলটা বাঁকিয়ে হাওয়ায় দুলিয়ে, অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা ঝুকিয়ে বাঁ হাতটা বাড়ালো যুবক ভদ্রলোক। কাকা হ্যাণ্ডশেক করতে যাচ্ছিল। ঠিক সে-সময় সিঁড়ির নীচে দেখা দিল এক যুবতী। তার পরণে পুরোনো ফ্যাশনের সবুজ মখমলের পোষাক। যুবতী কোচে ওঠার সময় পা দুটো দেখা গেল। কোন যুবতীর পা এতো সুন্দর হতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতো না কাকা। যুবতী যেন আতংকিত, মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে, সাহায্যের আশায় কাকার দিকে তাকাচ্ছে। পাউডার লাগানো পরচুলা মাথা সেই যুবক যতোই ভদ্রতা দেখাক, সে যুবতীর হাতটা শক্ত করে ধরে ওর পেছনে গাড়ীতে উঠেছে। ওদের দলের তৃতীয়জনও পুরুষ। তার মাথায় বাদামী রঙের পরচুলো, পরণে বেগুনী রঙের পোষাক, কোমরে মস্তবড় তরোয়াল, টপবুট প্রায় কোমর অবধি। যুবতীর পাশে বসলো লোকটা। কাকার মনে হয়, ব্যাপারটা ভালো নয়, রহস্যজনক, কোথায় কারো ইস্ক্রুপ ঢিলে আছে। কাকা ঠিক করলো, যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে যুবতীকে সাহায্য করবে।

'ব্লাড অ্যাণ্ড থাণ্ডার!'

ওর সঙ্গী ভদ্রলোক তরোয়াল বার করে কাকার দিকে উঁচিয়ে ধরলো?

কাকার কাছে অস্ত্র ছিল না। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি ছিল। সে ওই বিচ্ছিরি চেহারা

ভদ্রলোকের মাথার তিনকোণা টুপিটা ছিনিয়ে নিয়ে তরোয়ালের ডগায় ধরলো এবং টুপি ফুটো হতেই ওটা দিয়ে ফলাটা শক্ত করে ধরে রাখলো।

'ওকে পেছন থেকে চেপে ধরো।'

সঙ্গীকে উপদেশ দিল বিচ্ছিরি চেহারার লোকটা।

'আমার জুতোর হীলটা দেখেছো। এক লাথিতে ওর মাথার হাড়ে ফ্র্যাকচার করে দিতে পারি। মগজে যদি ঘিলু তাকে, সব বেরিয়ে যাবে।'

কাকা গায়ের জোরে লোকটার তরোয়াল ছিনিয়ে গাড়ীর জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গের ছোকরা চেঁচালো—'ব্লাড অ্যাণ্ড থাণ্ডার!' কিন্তু হিংস্র ভঙ্গীতে তরোয়ালের হাতলে হাত রাখলেও তরোয়াল বার করে না ছোকরা। বোধহয় সঙ্গের সুন্দরী যুবতীর কথা ভেবেই।

মেজাজে সীটে বসে কাকা বললো—

'শুনুন, মশায় ডেথ অর্থাৎ মৃত্যু আমার পছন্দ নয়, সঙ্গে লাইটনিং বা বিদ্যুৎ থাক আর না থাক। কারণ সঙ্গে মহিলা আছেন। ব্লাড অর্থাৎ রক্ত আর বজ্র অর্থাৎ থাণ্ডার? এ যাত্রায় ওসব যথেষ্ট হয়েছে। এখন শান্তিতে বসা যাক। গার্ড, এই ভদ্রলোকের মাংস কাটা ছুরিটা গাড়ীর বাইরে পড়ে গেছে।'

বলতে না বলতেই ঘোড়ায় টানা ডাকগাড়ীর জানলায় দেখা দিল ডাক বিভাগের প্রহরী। লণ্ঠন তুলে আলোয় কাকার মুখ দেখলো লোকটা। জানলার চারপাশে ওর বেশ কয়েকজন সহকর্মী। সবাই হাঁ করে দেখছে কাকাকে। ফ্যাকাসে মুখ, লাল পোষাক, চোখের দৃষ্টিতে ঔৎসুক্য—আমার কাকা ঘাবড়ে গেল।

ভদ্রলোকের তরোয়ালটা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল গার্ড। কাকা ভদ্রলোককে তিনকোণা টুপিটা ফিরিয়ে দিতে ভদ্রলোক টুপির ফুটোটা দেখলো, পরচুলাপরা মাথায় টুপি লাগালো, সেই সময় ওর হাঁচিতেআমার টুপিটা আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল।

'সব ঠিক আছে!'

লণ্ঠন হাতে পেছনের সীটে উঠে বললো ডাকবিভাগের প্রহরী। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কাকা দেখলো, ঘোড়ায় টানা ডাকগাড়ীগুলো কোচম্যান, গার্ড ও প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে ঘন্টায় মাত্র পাঁচ মাইল স্পীডে চলেছে। কাকার রাগ হচ্ছিল। লণ্ডনে গিয়ে ডাকবিভাগে এই ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে হবে।

অবশ্য সেই মুহূর্তে কাকার মন জুড়ে ছিল সেই সুন্দরী যুবতী, যে হুডে মুখ ঢেকে গাড়ীর দূরতম কোণে বসে আছে। আকাশী রঙের কোটপরা যুবক বসেছে তার উল্টোদিকে। বেগুনীরঙের কোটপরা বিচ্ছিরি চেহারার ভদ্রলোক বসেছে যুবতীর পাশে। যুবতী একটু নড়াচড়া করলে এমন কি পোষাকের ভাঁজে একটু শব্দ হলে তরোয়ালের হাতলে হাত রাখছে বিচ্ছিরি চেহারার লোকটা। আর যুবক তো এমন

ভাবে নিঃশ্বাস ছাড়ছে যে পারলে ও বোধহয় যুবতীকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলে। এইসব দেখে আমার কাকা ঠিক করল যাই হোক না কেন, সে ব্যাপারটার শেষ দেখে যাবে।

কেননা মিষ্টি মুখ, চকচকে চোখ এবং সুডৌল পা—এই সব কাকার খুব পছন্দ। অর্থাৎ মেয়েদের ওপর, বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের ওপর কাকার বড্ড দুর্বলতা। এটা আমাদের পরিবারের সব পুরুষেরই গুণ বলতে পারেন। আমারও এই দুর্বলতা আছে।

মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে বা বহু সময় দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করলো কাকা। ভদ্রলোক দুজনের কথা কইবার ইচ্ছে নেই। মহিলার কথা কওয়ার সাহস নেই। অগত্যা কাকা গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জানতে চায়, গাড়ী আরও জোরে চালানো হচ্ছেনা কেন? বেকার চেঁচামেচি। কেউ জবাবই দেয় না। অগত্যা গাড়ীতে বসে বসে রূপসী যুবতীর সুডোল পা দুটোর কথা ভাবতে ভাবতেই সময় কাটিয়ে দেয় কাকা।

হঠাৎ গাড়ী থামে। গার্ড বলে, 'এখানে নামো।'

কাকা বলে—

'এখানে নামবো কেন?'

'তাহলে নেমোনা।'

দুই ভদ্রলোক ও যুবতী নেমে যায়। নামবার সময় হাতের দস্তানাটা কাকার হাতে ফেলে সেটা তুলে নেবার অছিলায় যুবতী ফিসফিস করে বলে যায় 'আমাকে সাহায্য করো।'

কাকা এক লাফে গাড়ী থেকে নামে।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক বিভাগের গার্ড বলে—

'মত বদলালে তাহলে?'

কাকা ভাবে, প্রহরীর গাদা বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে তরোয়াল হাতে-ওই বিচ্ছিরি চেহারার লোকটাকে গুলিতে উড়িয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু ধান্দাটা বড্ড বেশী অতিনাটকীয় হয়ে যাবে ভেবে সে ওসব কিছু না করে রহস্যময় সেই ভদ্রলোক এবং সেই যুবতী পেছন পেছন একটা পুরোনো বাড়ীতে ঢোকে। বাড়ীটা দেখে মনে হয়, এককালে এখানে ফুর্তিটুর্তি হত। অনেক জায়গায় ছাদ ফুটো, সিঁড়ি এবড়ো খেবড়ো। ওদের পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে যে ঘরে পৌঁছোয় কাকা, সেখানে চুল্লিতে আগুন জ্বলছেনা, ঘরটা ঠাণ্ডা ও অন্ধকার। কাকা চারপাশে তাকাতে তাকাতে আপন মনেই বলে—'ডাকবিভাগের গাড়ী ঘন্টা সাড়ে ছ'মাইল স্পীডে চলে এবং এ রকম অদ্ভুত জায়গায় থামে, এইসব ব্যাপার আমি খবরের কাগজে চিঠি লিখে জানাবো। কাকার চেঁচিয়ে এইসব কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল রহস্যময় সেই ভদ্রলোক দু জনের সঙ্গে

আলাপ জমানো। কিন্তু ওরা ভুরু কুঁচকিয়ে কটমট করে তাকালো কাকার দিকে এবং ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বললো। ঘরের এক প্রান্তে সেই যুবতী যেন কাকার দিকে হাত তুলে সাহায্য চাইলো। শেষে দুই ভদ্রলোক এগিয়ে এলো এবং আকাশী কোটপরা যুবক বললো—

'এটা প্রাইভেট ঘর, তুমি জানোনা?'

'না, জানিনা। তবে পাবলিক ঘর এর থেকে বেশী আরামদায়ক।

'এই ঘর ছেড়ে যাও।'

'অ্যাঁ?'

'এই ঘর ছেড়ে না গেলে মারা পড়বে।'—একজন বললো।

'ওকে খতম করো'—আর একজন চেঁচালো।

যুবতী আর্ত চীৎকার করে উঠলো। দুই ভদ্রলোকই তরোয়াল বার করলো। চিমনীর কোণে দেয়ালে, মরচে ধরা খাপে তরোয়াল ঝুলছিল। এক লাফে সেটা বার করে মাথার ওপর দুলিয়ে যুবতীকে তফাতে যেতে বলে চেয়ারটা আকাশী রঙ কোটগুলো লোকটার দিকে আর তরোয়ালের খাপটা বেগুনী-রঙ কোটগুলো লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিল কাকা।

এখন মজার ব্যাপার হল, আমার কাকা তরোয়াল যুদ্ধের কিচ্ছু বোঝেনা। একবার শুধু তরোয়ালের ধার কাছে এসেছে সে। যখন সে সখের থিয়েটারে রিচার্ড দ্য থার্ড-এর পার্ট করে এবং স্টেজে রিচমন্ড তার পিঠে তরোয়াল বসিয়ে দেয়। সুতরাং স্টেজেও তাকে তরোয়াল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়তে হয়নি। অথচ আজ সে অভিজ্ঞ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দিব্যি পুরুষের মত দ্রুতগতিতে তরোয়াল নিয়ে আক্রমণ করছে, ওদের তরোয়ালের মার ঠেকাচ্ছে। মানুষ কি পারে আর কি যে না পারে, সে চেষ্টা না করলে বলা যায় না—এই প্রবাদটা কতো সত্যি এবার বোঝা গেল।

তিনটে তরোয়ালের ঝন্-ঝন্-ঝনাৎ। এরই মধ্যে যুবতী বোধহয় আমার কাকাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যেই ঘোমটা খুলে এমন সুন্দর মুখ দেখালো যে কাকা তো ওর হাসিমুখ দেখার জন্যে পঞ্চাশজন শত্রুর সঙ্গে লড়ে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এদিকে যুবতী মুখের ঢাকা খুলেছে দেখে তার সঙ্গের সেই যুবক রাগে হিংসায় জ্বলে উঠে তরোয়াল উঁচিয়ে ধরলো, যুবতী দেখে সরে গেল এবং যুবক ব্যালান্স ফিরে পাবার আগেই তার তরোয়াল কেড়ে নিয়ে তার বুকে বসালো। তরোয়ালটা ওর বুক চিরে হাতল অবধি গেঁথে গেল, যুবককে আটকে রাখলো কাঠের দেয়ালের সঙ্গে। দৃষ্টান্তটা দেখে কাকা চেঁচিয়ে উঠলো, প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাড়া করে দেয়ালের দিকে নিয়ে গেল এবং নিজের হাতের তরোয়ালের ফলা আমূল গেঁথে দিল ওয়েস্টকোটের বুকের একটা লাল ফুলের ডিজাইনের মাঝামাঝি। বিচ্ছিরি চেহারার লোকটা তখন দেয়ালের সঙ্গে আটকে

রইলো। দুজনেই যন্ত্রণায় হাত-পা ছুঁড়ছে। কাকার গলাটা সুডৌল দুহাতে জড়িয়ে ধরে যুবতী বললো—

'ডাকগাড়ী ধরতে হবে! আমরা এখনো হয়তো পালাতে পারি।'

আমার কাকা দুঃখ পেলো। বেচারা ভাবছিল, খুন-টুনের পর একটু প্রেম-টেম মন্দ লাগবে না। কিন্তু যুবতী তাড়া দিচ্ছে। কাকা বললো—

'পারি মানে? মাই ডীয়ার, আর কাউকে খুন করতে হবে নাকি?'

'এখানে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। এই ছোকরা ফিলেটোভিলের মারকুইসের একমাত্র ছেলে। মারকুইস খুবই ক্ষমতাশালী।'

'মাই ডীয়ার, তুমি যেভাবে ওর বুকে তরোয়াল বসিয়েছো, ও বোধহয় কোনদিনই মারকুইস হতে পারবেনা।'

'এই শয়তান দুটো আমায় বাড়ী থেকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে। আর এক ঘন্টা পরে ওই ছোকরা আমায় জোর করে বিয়ে করতো। আমি কারও সাহায্য চাইতে গেলে ওরা আমায় খুন করতো। আর দু'মিনিট দেরী হলে ওদের লোকেরা এসে পড়বে। উত্তেজনা এবং তরুণ মারকুইসকে খতম করার পরিশ্রমে অজ্ঞান হয়ে পড়লো যুবতী একেবারে আমার কাকার বুকের মধ্যে। কাকা ওকেধরে দরজার দিকে নিয়ে যায়। সেখানে ডাকগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা লেজ ও ঘাড়ে ফুলের মত লোম ওলা ঘোড়া জোড়া আছে গাড়ীতে। কিন্তু কোচম্যান, গার্ড— কেউই নেই।

আমার কাকা যদিও বিয়ে করেনি, মেয়েদের আলিঙ্গনে বাঁধার অভিজ্ঞতা তার কাছে নতুন নয়। সে বারের মেয়েদের চুমু খায়, একবার নাকি এক বাড়ীউলিকে জড়িয়ে ধরেছিল। এখন যুবতীর দীঘল কালো চুল তার হাতের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে এবং জ্ঞান ফিরতে যুবতী যখন সুন্দর কালো চোখ দুটো মেলে কাকার দিকে তাকালো, কাকা তো নার্ভাস, তার পা দুটো কাঁপতে শুরু করলো। সুন্দর নরম কালো দুটো মেয়েলী চোখের চাউনিতে ভয় পাবার কি আছে? জানিনা, মশায়। আমিও এরকম চোখের দিকে তাকাতে ভয় পাই।

যুবতী বললো—

'তুমি আমায় কোনদিন ছেড়ে যাবে না।'

'কোনদিন না'—কাকা বললো।

'আমার প্রিয়, আমার বীর, আমার রক্ষাকর্তা—'

'ওসব বলোনা। কথা বললে চোখদুটো তোমার এতো সুন্দর দেখায়, আমি চুমু খেতে বাধ্য হবো।'

যুবতী হাসলো এবং সুন্দর ঠোঁটে হাসি ফুটলে সঙ্গে সঙ্গে চুমু খাওয়া উচিত। সুতরাং আমার কাকা যুবতীর ঠোঁটে চুমু খেল। সেই মুহূর্তে দূর থেকে ভেসে এল ঘোড়ার ও ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ। যুবতী বললো—

'ওরা আমাদের তাড়া করে আসছে। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।'

কাকা যুবতীকে গাড়ীতে তুললো এবং ওকে সাহস হারাতে মানা করে কোচোয়ানের বক্সে উঠতে গেল।

যুবতী বললো—

'একটু দাঁড়াও, প্রিয়তম, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালো কাকা। যুবতীও ঝুঁকেছে সামনের দিকে। এই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতে ওকে আগের চেয়েও সুন্দর দেখায়।

'কি কথা, মাই ডীয়ার?' কাকা বললো।

'কথা দাও, তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসবেনা, কাউকে বিয়ে করবেনা?'

কথা দিলো কাকা। তারপর লাফিয়ে কোচোয়ানের বক্সে উঠে কালো ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে গাড়ী ছোটালো ঘন্টায় পনেরো মাইল স্পীডে। ঘোড়া ছুটছে। গাড়ী ছুটছে। পেছনে ছুটে আসছে মারকুইসের দলবল, তাদের মানুষ, ঘোড়া, কুকুর। যুবতী চেঁচাচ্ছে—

'জোরে! আরো জোরে!' গাছ, বাড়ী, গেট, চার্চ, খামার সব এতো জোরে সরে যাচ্ছে, যেন জলপ্রপাতের জল হঠাৎ মুক্তি পেয়েছে।

'জোরে! আরো জোরে!'—যুবতী চেঁচাচ্ছে। ঘোড়া চারটেকে চাবুক মারছে কাকা। ঘোড়ার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। তবু যুবতী চেঁচায়—'আরো জোরে।'

বক্সে পা ঠোকে কাকা।

এবং সেই মুহূর্তে—

কাকা দেখে : সকালের ধূসর আলোয় সে পুরোনো একটা ডাকগাড়ীর বক্সে বসে হিমে কাঁপছে ও পা ঠুকছে। তাড়াতাড়ি নেমে সে গাড়ীর ভেতরের সেই যুবতীর সঙ্গে কথা বলতে যায়।

হায়! গাড়ীর দরজা ভাঙ্গা, সীটও নেই! কাঠামোটা শুধু আছে।

কাকা বলতো ও ঘটনাটা রহস্যজনক হলেও ওই ভাবেই সবকিছু ঘটেছিল।

কাকা যুবতীকে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিল। সে বিয়ে করেনি। অবিবাহিত অবস্থাতেই মারা যায় আমার কাকা।

কাকা বলতো, ঘটনাচক্রে সে জানতে পেরেছিল, রোজ রাতে ভৌতিক ডাকগাড়ী, ঘোড়া, গার্ড, কোচোয়ান ও প্যাসেঞ্জারেরা নৈশ-যাত্রায় বেরোয়। কাকাই হয়তো একমাত্র জীবিত মানুষ, যে ওইরকম ভৌতিক ডাকগাড়ীতে চড়েছিল। আমার ধারণা, কাকা ঠিকই বলেছিল। কারণ অন্য কারো এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি অন্তত শুনিনি।"

মূল কাহিনী □ দি ষ্টোরী অফ দ্য ব্যাগম্যানস আংকল

জেমস জয়েস

জন্ম ১৮৮২, মৃত্যু ১৯৪৯। বিংশ শতাব্দীর যে তিনজন প্রতিভাধর কথাসাহিত্যিক আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিক ও বর্ণনা-রীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন—তাঁরা হলেন যথাক্রমে জয়েস্, মার্সেল প্রুস্ত ও ফ্রান্জ কাফকা। জন্ম আয়ারল্যাণ্ডে, দৃষ্টিশক্তি অতি দুর্বল বলে জয়েস শ্রুতির ওপর নির্ভর করেছেন বেশী এবং উপন্যাসেও তার ছাপ পড়েছে। তাঁর লেখা 'ইউলিসিস' উপন্যাসটি ব্রিটিশ ও অ্যামেরিকান সেন্সরশিপ কর্তৃপক্ষের পছন্দ না হলেও এই একটিমাত্র উপন্যাস আধুনিক বিশ্বসাহিত্যকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে, তার কোন তুলনা সমকালে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই উপন্যাসের একটি অধ্যায়ে ইংরাজী সাহিত্যের বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে চসারের সমকালীন ভাষায়, অধ্যায় শেষ হয় আধুনিক ভাষায়। পরবর্তী ও শেষ উপন্যাস 'ফিনিগ্যানস ওয়েক' তন্দ্রাচ্ছন্ন একটি পরিবারের স্বপ্নাচারণ। এই উপন্যাসে দেখা যায়, ঘুমন্ত মানুষকে ঘিরে আছে ইতিহাস, অতীত ও বর্তমান, লোকগাথা ও প্রতীক। এই উপন্যাসে অভিজ্ঞতার প্রভাবে শব্দ পরিবর্তিত হয়। যেমন 'ব্যাটলফিল্ড' শব্দটি হয়ে ওঠে 'ব্লাডসফিলথ।' কারণ, যুদ্ধ মানেই রক্ত ও কলুষ। জয়েসের অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ 'ডাবলিনার্স' এবং 'এ পোর্ট্রেট অফ অ্যান আর্টিষ্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান'।



রাগ অনুরাগ

জেমস জয়েস

মিসেস মুনী কসাইয়ের মেয়ে। চাপা স্বভাবের এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেয়েমানুষের পর্যায়ে পরে মিসেস মুনী। সে তার বাবার কসাইখানার কর্মচারীকে বিয়ে করে স্প্রিংগার্ডেনের কাছে নতুন কসাইখানা খুলেছিল। কিন্তু শ্বশুর মারা যাওয়ার পর থেকেই উচ্ছন্নে যেতে শুরু করলো মিষ্টার মুনী। সে মদ খেতো, টাকাপয়সা গাপ করতো আর না ভেবেচিন্তে ধাব করতো। ওর কাছ থেকে ভালো থাকার প্রতিশ্রুতি আদায় করে কোনো ফল হতো না। ক'দিন পরেই আবার যথারীতি ঝামেলা শুরু করে দিতো মিসেস মুনীর স্বামী। ক্রেতাদের উপস্থিতিতে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেও খারাপ মাংস সরবরাহ করে সে নিজের ব্যবসার বারোটা বাজালো। একদিন রাতে সে প্রকাণ্ড মাংসকাটা ছুরি দিয়ে বউকে জবাই করতে গেল। বউ বাধ্য হয়ে সে রাতে আশ্রয় নিল প্রতিবেশীর বাড়ীতে।

তারপর থেকে আলাদা থাকতো মিষ্টার ও মিসেস মুনী। চার্চে ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা করে আলাদা থাকার ও ছেলেমেয়েদের নিজের কাছে রাখার অনুমতি আদায় করলো মিসেস মুনী। স্বামীকে সে টাকা বা খাবার বা ঘরে জায়গা দিতে রাজী নয়। তার স্বামীকে বাধ্য হয়ে শেরিফের অধীনে চাকরী নিতে হল। এখন লোকটার পোষাক অগোছালো, ছোটখাটো চেহারা, কোলকুঁজো, মাতাল, ফ্যাকাসে মুখ, সাদা গোঁফ, সাদা ভুরু—লালচে চোখদুটোর ওপরে ভুরুজোড়া যেন পেন্সিলে আঁকা। সারাদিন শেরিফের অধীনে পেয়াদার অফিসে বসে থাকে মিষ্টার মুনী, যদি কোন কাজ জোটে, তারই আশায়।

এদিকে কসাইখানার ব্যবসায় যা টাকাপয়সা বেঁচেছিল, তাই দিয়ে হারডউইক ষ্ট্রীটে বোর্ডিং-হাউস খুলেছে মিসেস মুনী। এখন সে বেশ জমকালো চেহারার মেয়েমানুষ।

তার বোর্ডিং-হাউসে থাকে লিভারপুল এবং আইল অফ ম্যান থেকে আসা ট্যুরিষ্টরা এবং কখনও কখনও মিউজিক হলের আর্টিষ্টরা। এরা সবাই আসে যায়। সারা বছর বোর্ডিং-হাউসে থাকে শহরের কেরানীরা। চাতুর্য্য এবং দৃঢ়তা আছে শ্রীমতি মুনীর। কখন ধার দিতে হয়, কখন কড়া হতে হয়, কখন ঝামেলা এড়াতে হয় সে জানে। তার বোর্ডিং হাউসের বাসিন্দা ছোকরাটা তাকে বলে, 'দ্য মাদাম।'

এই ছোকরা বাসিন্দারা প্রত্যেকে খাওয়া-থাকার খরচা হিসেবে ফি হপ্তায় পনেরো শিলিং দেয় মিসেস মুনীকে। ডিনারে বীয়ার বা ষ্টাউট মদ খেলে আলাদা পয়সা দিতে হয়। চাকরী এবং রুচিব দিক থেকে মিল থাকায বোর্ডিং-হাউসের ছোকরা বাসিন্দাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে। মাদামেব ছেলে জ্যাক মুনী ফ্লীট ষ্ট্রীটে কমিশনে এজেন্টের কাজ করে। সে সৈনিকদের মত মুখখিস্তি করে, সচরাচর বেশী রাতে বাড়ী ফেরে এবং কোন ঘোড়ার ওপর বাজী ধরলে বা মিউজিক হলের কোন আর্টিষ্ট মেয়ের পেছনে লাইন দিলে সুবিধে হবে, সে বলতে পারে। সে বাজনা বাজাতে পারে ও কমিক গান গাইতে পারে। ববিবার রাতে মিসেস মুনীর ড্রয়িংরুমে গানের আসর বসে। মিউজিক-হলের আর্টিষ্টরা আসে শেরিড্যান ওয়ালজ ও পোলকা নাচের সুর বাজায় এবং মাদামের মেয়ে পলি মুনী গান গায়—

'আমি যে দুষ্টু মেয়ে তুমি তো জানো।'

পলির বয়স উনিশ, চেহারা শ্লিম, মাথায় নরম ও হাল্কা রঙের চুল, ছোট ভরাট মুখ। চোখ দুটোয় ধূসবের আড়ালে সবুজের ছোঁয়া, কারও সঙ্গে কথা বলার সময় ওপরের দিকে তাকাবার অদ্ভুত অভ্যাসের জন্যে তাকে ভারজিন মেরীর মত দেখায়— অর্থাৎ কুমারী মেরী বিপথগামিনী হলে তাঁকে যেমন দেখাতো। প্রথমে মেয়েকে অফিসে টাইপিষ্টের কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন মিসেস মুনী। কিন্তু ওর বাবা প্রায়ই সেখানে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইতো বলে মেয়েকে বাড়ীতে এনে রেখেছে মাদাম। পলি খুবই প্রাণবন্ত, এখানে সে ছেলেছোকরাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পাবে। তাছাড়া কাছাকাছি কোন যুবতী মেয়ে জানলে যুবকেরা খুশী হয়। পলি অবশ্য বোর্ডিং হাউসের সব যুবকের সঙ্গেই প্রেমের অভিনয় করে। কিন্তু ধূর্ত মিসেস মুনী জানে, এইসব যুবকেরা স্রেফ সময় কাটাবার তাগিদেই প্রেমের খেলা খেলছে, ওদের কারোরই বিয়ে করার ধান্দা নেই। মেয়েকে আবার অফিসে টাইপিষ্টের কাজ করতে পাঠাবে বলে ভাবছিলো মিসেস মুনী। ইতিমধ্যে তার খেয়াল হল, বোর্ডিং হাউসের বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে পলির অন্তরঙ্গতা বাড়ছে। যুবক-যুবতীর দিকে নজর রাখলো মিসেস মুনী, মুখে যদিও চুপচাপ রইলো।

মা তার দিকে নজর রাখছে, পলি জানতো। কিন্তু মা যখন মুখ খুলছেনা, ব্যাপারটা বোঝাই যাচ্ছে। মা ও মেয়ের মধ্যে খোলাখুলি বোঝাবুঝি হয়নি। যখন বোর্ডিং

হাউসের অন্য যুবকেরা পলির প্রেমের ব্যাপাবটা নিয়ে কানাঘুষো শুরু করলো, তখনও মুখ খুললোনা পলির মা। পলির ব্যবহাবে একটু অস্বাভাবিকতা দেখা দেঁওয়ায় স্পষ্টতঃ বিব্রত হল ওর প্রেমিক যুবক। অবশেষে ঠিক সময়ে, ব্যাপারটায় মাথা গলালেন পলির মা। কসাই যেভাবে মাংস কাটে, নৈতিক সমস্যার সমাধান সেইভাবেই করে পলির মা। এবং পলির প্রেমের ব্যাপারে সে এখন মনস্থির করেছে।

প্রথম গ্রীষ্মের এক রবিবারেব উজ্জ্বল সকাল। উষ্ণতার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। বোর্ডিং হাউসের সব জানলা খোলা। জানলায় লেস লাগানো পর্দাগুলো বাইরের দিকে উড়ছে। জর্জেব গির্জার ঘন্টা-ঘরে ঘন্টা বেজে চলেছে। উপাসকেরা একে একে বা দলে দলে যাচ্ছে চার্চের সামনের ছোট্ট সার্কাসটা পেরিয়ে। ওদের তন্ময় ভাবে এবং ওদের হাতের বাইবেল দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওরা চার্চে যাচ্ছে। বোর্ডিং হাউসে ব্রেকফাস্টের পালা শেষ হয়েছে। প্লেটে ডিমের হলুদ টুকরো, চর্বি ও বেকনের টুকরো শুধু পড়ে আছে। খড়ের তৈরী আর্মচেয়ারে বসে মিসেস মুনী দেখছে, ঝি মেরী প্লেট সাফ কবছে। রুটিব গুঁড়োগুলো জমিয়ে রাখা হল। মঙ্গলবারের ব্রেড-পুডিংএ কাজে আসবে। টেবিল সাফ হল, চিনি ও মাখন নিরাপদে রাখা হল চাবিতালা দিয়ে; এবার গতরাতে পলির সঙ্গে তার যেসব কথা হয়েছে, সেগুলো মনে মনে আর একবার ভেবে নেয় পলির মা। মা খোলাখুলি প্রশ্ন করেছে, মেয়ে খোলাখুলি জবাব দিয়েছে। অবশ্য দুজনেই ছিল অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ। পলির মা সংবাদটা খুব সহজে নিচ্ছে বা এ-ব্যাপারে তার মত ছিল, এটা সে জানাতে চায়নি। তাই তাকে অপ্রস্তুত মনে হয়েছে। এ ধরণের কথা বলতে পলির অপ্রতিভ লাগারই কথা এবং তার মায়ের এতোদিন চুপচাপ থাকার উদ্দেশ্য যে পলি জানে, সে কথা সে প্রকাশ করতে চায়নি বলে তাকে আরও অপ্রতিভ মনে হয়েছে।

স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই ম্যান্টেলপীসে গিল্টির তৈরী ছোট্ট ঘড়ির দিকে তাকায় মিসেস মুনী। জর্জের গির্জায় ঘন্টধ্বনি থেমেছে। ...এখন বেলা এগারোটা বেজে সতেরো মিনিট। মিষ্টার জোরান-এর সঙ্গে ব্যাপারটার মোকাবিলা করে তাকে মার্লবরো ষ্ট্রীটে যেতে হবে। সে যে জিতবে, সে ব্যাপারে মাদাম নিঃসন্দেহ। প্রথমতঃ, সামাজিক অভিমত তারই পক্ষে। কারণ সে মেয়ের মা এবং তাকে এক হিসেবে অপমান করা হয়েছে। মিষ্টার জোরান্ সম্মানিত লোক বলে তাকে বোর্ডিং হাউসে ঠাঁই দিয়েছে মাদাম। তার আথিতেয়তার অন্যায় সুযোগ নিয়েছে মিষ্টার জোরান। তার বয়স চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ। সুতরাং বয়স কম বলে জোরান্ ভুল করেছে, এই যুক্তি চলবে না। জীবনের সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে মিষ্টার জোরানের। অতএব অজ্ঞানতার দরুণ ভুল হয়েছে, এই যুক্তি চলবে না। সে পলির যৌবন ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে, এটা খুবই স্পষ্ট। প্রশ্ন হলো : লোকটা কিভাবে ক্ষতিপূরণ করবে?

এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দরকার আছে। পুরুষের আর কি? যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে চলতে পারে পুরুষ। ঝামেলা মেয়েদেরই। ফুর্তি করলো পুরুষ। ঝামেলা মেয়েমানুষের। অনেক মা কিছু টাকা পেলে এসব ব্যাপারে চেপে যায়। কিন্তু মাদাম তা করবে না। তার মেয়ের সম্মান গেছে। সুতরাং তার মেয়েকে বিয়ে করে ক্ষতিপূরণ করতে হবে মিষ্টার জোরানকে।

একটু পরে মেরীকে মিষ্টার জোরানের ঘরে পাঠিয়ে ছোকরাকে ডেকে আনবে ও কথা বলবে মাদাম। হাতের তাসগুলো জেতার মতো। ছোকরা একটু সীরিয়াস টাইপের, অন্যদের মত বদমাস নয়, চেঁচামেচি করে না। যদিও না হয়ে মিষ্টার শেরিডান কিম্বা ব্যানটম লায়নস কিম্বা মিষ্টার মীড হতো, মাদামের কাজটা শক্ত হত। পাবলিসিটি'র ভয় নেই। মিষ্টার জোরান্ ও মিস পলির প্রেমের ব্যাপারটা অন্য সব বোর্ডাররা অনেক গুজব ছড়িয়েছে। তাছাড়া গত তেরো বছর ধরে নামজাদা এক ক্যাথলিক মদ্যপায়ীর অফিসে কেরানীর চাকরী করছে মিষ্টার জোরান্। ব্যাপারটা চাউর হলে ওর চাকরী যাবে। অন্যদিকে বিয়েতে রাজী হলে লোকটার কোন ক্ষতি হবে না। লোকটার যৌনসঙ্গমের ব্যাপারে এলেম আছে, দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া, মাদামের ধারনা, লোকটা কিছু পয়সাও জমিয়েছে।

প্রায় আধঘন্টা বাকী। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে নেয় মিসেস মুনী। প্রকাণ্ড মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাবটা দেখে সে সন্তুষ্ট হয়। যেসব মা এখনও যুবতী বয়সের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে পারছে না, তাদের কথা ভাবছে মাদাম।

এই রবিবার সকালে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মিষ্টার জোরান্। দুবার দাড়ি কামাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হাত কাঁপছে বলে সাহস হয়নি। এখন তার চোয়ালে তিনদিনের না কামানো লালচে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। দু'তিন মিনিটি অন্তর চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, রুমাল দিয়ে কাচ মুছে সাফ করতে হচ্ছে। গতরাত্রে চার্চে ধর্মযাজকের কাছে পাপ স্বীকার করেছে মিষ্টার জোরান্। প্রেমকাহিনীর প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শুনেছে ধর্মযাজক এবং সবশেষে যুবকের পাপটা বড়ো করে দেখিয়ে এমন বক্তৃতা দিয়েছে যে এখন ক্ষতিপূরণের এই সুযোগটুকু যে আছে, এজন্যেই কৃতজ্ঞ জোরান। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। এখন জোরান কি করতে পারে? হয় পালাতে হবে নয়তো মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে। ব্যাপারটা চাউর হয়ে যাবে। অফিসে বড়সাহেব জেনে যাবে। ডাবলিন্ এতো ছোট্ট সহর যে কে কী করছে, অন্য সবাই জানে। উত্তেজিত কল্পনায় জোরান যেন শুনতে পায়, তার অফিসের বড়সাহেব মিষ্টার লিওনার্ড চড়া গলায় ডাকছে—'মিষ্টার ডোরানকে ডাকো।'

তার বুক কেঁপে ওঠে।

এতো দীর্ঘদিনের চাকরী, অধ্যাবসায়, পরিশ্রম—সব নিস্ফল হবে? প্রথম যৌবনে

ফুর্তিটুর্তি করেছে বইকি জোরান। স্বাধীন চিন্তা করে বলে গর্ব করেছে, মদের আড্ডায় বন্ধুদের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। কিন্তু সেসবই এখন অতীত, প্রায় অতীত, এখনও অবশ্য সে প্রত্যেক সপ্তাহে 'রেনল্ডস নিউজপেপার'-এর কপি কেনে, কিন্তু সে এখন নিয়মিত চার্চে যায় এবং বছরের শতকরা নব্বই ভাগ সময় নিয়মিত জীবনযাপন করে। বিয়ে ও ঘরসংসার করার মত যথেষ্ট পয়সাও সে জমিয়েছে।

কিন্তু সেটা তো প্রশ্ন নয় । প্রশ্ন হলো, পালিয়ে বিয়ে করলে জোরানের পরিবার ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখবে না।

কেননা পলির বাবার এতো বদনাম, মায়ের বোর্ডিং হাউসের কথাও সবাই জেনে গেছে। জোরান আন্দাজ করে যে তাকে বোকা বানানো হচ্ছে। তার বন্ধুরা এই নিয়ে হাসাহাসি করবে। মেয়েটা শিষ্টাচার জানেনা, ওর ইংরেজীতে গ্রামারের ভুল, 'আই সীন কিম্বা 'ইফ আই হ্যাড হ্যাভ নোন,'—এই ধরণের কথা বলে কখনও কখনও। কিন্তু ভালোবাসলে প্রেমিকার গ্রামারের ভুলে কী এসে যায়? যে কাজটা ও এখন করছে, তার জন্যে পলিকে পছন্দ করা উচিত না ঘেন্না করা উচিৎ, ঠিক বুঝতে পারছেনা মিষ্টার জোরান্। অবশ্য কাজটা তো পলি একা করেনি, জোরান্ও করেছে। তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে বলে, জোরান, পালাও, স্বাধীনতা হারিওনা, বিয়ে কোরোনা, বিয়ে মানেই পুরুষের সর্বনাশ।

অসহায়ের মত শার্ট ট্রাউজার পরে খাটের ধারে বসেছিল জোরান্। পলি টোকা দেয় দরজায়, ভেতরে ঢুকে জানায়, কালরাতে সে মাকে সব খুলে বলেছে এবং আজই মা জোরানের সঙ্গে কথা বলবে। পলি কাঁদে এবং দুহাতে জোরানের ঘাড় জড়িয়ে ধরে বলে—

'ওঃ, বব, আমি কি করবো?'

পলি আত্মহত্যা করবে বলে।

ওকেসান্ত্বনা দেয় বব জোরান। বলে, 'কেঁদোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ওর বুকের ধুকপুকুনি টের পায় জোরান।

যা ঘটেছে, তার জন্যে ববই শুধু দায়ী নয়। পলির পোষাক, তার নিঃশ্বাস, তার আঙুলের আকস্মিক ছোঁয়া প্রথম দিকে তাকে আনন্দ দিয়েছে। তারপর একরাতে যখন জোরান পোষাক ছাড়ছে, তার দরজায় মৃদু টোকা দিল পলি। ওর মোমবাতিটা হাওয়ায় নিভে গেছে বলে ও নাকি মোমবাতি জ্বালাতে এসেছিল, পরনে ছিল ছাপা ফ্লানেলের বুক খোলা জ্যাকেট। ও স্নান করে এসেছিল। পশুচর্মের তৈরী স্লিপারের ওপর সাদা গোড়ালি দেখা যাচ্ছিল, ওর সুগন্ধি চামড়ার আড়ালে বইছিল তপ্ত রক্তের ধারা। ও বাতি জ্বালছিল। ওর হাত ও মণিবন্ধ থেকে ভেসে এসেছিল সুগন্ধের ঘ্রাণ।

রাতে দেরীতে ফিরলে খাবার গরম করে দিতো পলি। খাওয়ার সময় কি খাচ্ছে,

তার মনে থাকতোনা। ঘুমন্ত বাড়ীতে পাশে বসে থাকা পলির অস্তিত্বই শুধু তার মনে থাকতো।

মেয়েটার বিবেচনা আছে। শীতের রাতে কিম্বা বৃষ্টি হলে এক গ্লাস পান্চ তৈরী রাখতো। হয়তো বিবাহিত জীবনে আমরা সুখী হবো। পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় যেতো দু'জনে। যেন একান্ত অনিচ্ছায় শুভরাত্রি জানিযে ওরা বিদায় নিতো। ওরা পরস্পরকে চুম্বন করতো। পলির চোখদুটো, ওর আঙুলের ছোঁয়া এবং নিজের প্রবল উত্তেজনা ববের মনে পড়ে।

কিন্তু উত্তেজনা শেষ হয়। এখন পলি বলছে—আমি কি করবো? সহজাত প্রবৃত্তি তাকে বলে, বিয়ে করোনা, বিয়ে মানেই সর্বনাশ। কিন্তু এক্ষেত্রে বিয়ে না করা পাপ। এবং যেহেতু তার আত্মসম্মান আছে, তাকে পাপের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

যখন পলির পাশে খাটের ধাবে বসে আছে বব, তখন ভেতরে এলো পরিচারিকা মেরী এবং জানালো, মাদাম এখন নীচে বসার ঘরে । জোরানের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। অসহায়ভাবে কোট ও ওয়েস্টকোট পরে বব, পলিকে বলেঃ 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' বব যখন ঘর ছেড়ে যায়, তখনও পলি কাঁদছে ও বলছেঃ 'ও মাই গড্!'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চশমার কাচদুটো এতো ঝাপসা লাগে যে চশমা খুলে রুমালে কাচ মুছতে হয়। ববের ইচ্ছা হয়, ছাদ থেকে হওয়ায় ভেসে এমন কোন দূরদেশে চলে যায়, যেখানে এসব ঝামেলা নেই। তবুও অদৃশ্য কোনো শক্তি তাকে নীচের তলায় দিকে নিয়ে যায়। মাদাম ও বড়সাহেবের ভাবলেশহীন মুখের কথা ভেবে আরও খারাপ লাগে। সিঁড়ির নীচে জ্যাক মুনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ভাঁড়ার-ঘর থেকে দু'বোতল মদ বগলে নিয়ে সিঁড়ির দিয়ে উঠে যাচ্ছে জ্যাক। ওরা পরস্পরকে অভিবাদন জানায়। প্রেমিক বব জোরানের হঠাৎ খেয়াল হয়, তার প্রেমিকের ভাই জ্যাকের মুখটা বুলডগের মত এবং হাতদুটো শক্ত ও মাংসল। সিঁড়ির নীচে নেমে সে দেখে, জ্যাক তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ে বিশেষ একটা রাতের কথা। মিউজিক হলের আর্টিষ্ট বেঁটেখাটো ফর্সা লণ্ডননিবাসী এক ছোকরা পলির সম্বন্ধে কি একটা ঠাট্টা করেছিল। আর একটু হলে মারামারি শুরু করে দিতো জ্যাক। সবাই মিলে জ্যাককে ঠাণ্ডা করছিল। মিউজিক হল আর্টিষ্ট আরও ফ্যাকাসে হয়ে বলছিল, সে খারাপ কিছু ভেবে বলেনি। কিন্তু জ্যাক চেঁচাচ্ছিল, কেউ তার বোনের পেছনে লাগলে জ্যাক সেই লাকের গলায় দাঁত বসাবে...

একটু সময় খাটের ধারে বসে কাঁদে পলি। তারপর চোখ মুছে আয়নার সামনে যায়। তোয়ালেটা জলে ভিজিয়ে সে চোখ মোছে। প্রোফাইলে কেমন দেখাচ্ছে? কানের ওপরে চুলের একটা কাঁটা ঠিক করে পলি। তারপর পলি খাটে বসে বালিসগুলোর

দিকে তাকায়। তার মনে গোপন সুখের প্রিয় স্মৃতি জেগে ওঠে। ঠাণ্ডা লোহার রেলিং-এ ঘাড় এলিয়ে স্বপ্ন দেখে পলি। এখন আর তার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন নেই।

ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে পলি। আর ভয় নেই, দুশ্চিন্তার বদলে মনে জাগছে ভবিষ্যতের আশা ও স্বপ্ন। সে স্বপ্ন এতই জটিল যে চোখের সামনের বালিসগুলোকেও সে এখন দেখছেনা এবং সে যে কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে, তাও তার মনে থাকেনা।

মায়ের ডাকে চমকে ওঠে পলি। সে সিঁড়ির দিকে ছোটে।

'পলি! পলি!'

'কি মা?'

'নীচে এসো। মিঃ জোরান তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।'

তখন, শুধু তখনই পলির মনে পড়ে, সে কিসের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মূল গল্প □ দ্য বোর্ডিং হাউস

জ্যাক লন্ডন

জ্যাক লন্ডনের যে প্রেমেব গল্পটি বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হল, তার পটভূমি হাওয়াই। তাঁর অধিকাংশ গল্পের পটভূমিই রোমাঞ্চকর ও বর্ণাঢ্য। 'দ্য হোয়াইট সাইলেন্স' গল্পে উত্তর মেরু তুষারঝড়ের বিভীষিকা, 'টু বিল্ড এ ফায়ার' ও 'অ্যান অডিসি অফ দ্য নর্থ' গল্পেও তুষারের আতংক জাগানো পটভূমি , 'দ্য উইট অফ পরপুট্যাক' গল্পে রেড ইণ্ডিয়ান জীবনের এবং 'দ্য মেক্সিকান' গল্পের মেক্সিকান বিপ্লবীদের সংগ্রামের শিল্পসম্মত ছবি ফুটে ওঠে। এই অ্যামেরিকান লেখক একদিকে যেমন বিরূপ, রুক্ষ ও ভয়ংকর প্রকৃতির সঙ্গে নির্মম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের সংগ্রামের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নানা গল্পে, তেমনি মেহনতী মানুষের জন্যে তাঁর ভালোবাসা এবং শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণাও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নানা রচনায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হোয়াইট ফ্যাঙ্ক ও 'দ্য সী-উলফ' এবং শ্রেষ্ঠ চরিত্র এই উপন্যাসের ভিলেন উলফ লারসেন—সাক্ষাৎ শয়তান, ভয় ও করুণা যাকে স্পর্শ করে না। সে বলে—'তুমি কোনো কিছু উৎপাদন না করেও নরম বিছানায় শোও, ভালো শোষাক পড়ো, ভালো খাবার খাও। অথচ যারা খাদ্য উৎপাদন করে, তারা অনাহারে মরে। যারা কাপড় তৈরী করে, তারা পুরোনো ছেঁড়া কাপড়জামা পরে। পৃথিবীতে প্রচুর নাবিক আছে, ততো জাহাজ নেই। যতো শ্রমিক আছে, তাদের চাকরী দেবার মত যথেষ্ট সংখ্যায় ফ্যাক্টরী নেই। আজ মানুষের জীবন সব থেকে অযৌক্তিক; সব থেকে সস্তা।'



হাওয়াই দ্বীপের রূপসী

জ্যাক লন্ডন

অন্যান্য গ্রীষ্ম প্রধান এলাকার সঙ্গে হাওয়াইয়ের একটা তফাৎ, এখানে বয়স বাড়লেও মেয়েদের সুন্দর দেখায়। মেক-আপ বা মুখে বয়সের ছাপ লুকোনোর কোনো কৌশলের সাহায্য নেয়নি ওই মহিলা, যে এখন 'হাউ' গাছের ছায়ায় বসে আছে। হাওয়াই ছাড়া পৃথিবীর যে কোন দেশের মানুষ বলবে, ওই মহিলার বয়স বড়জোর পঞ্চাশ। কিন্তু ওর ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনী এবং ওর স্বামী রসকো স্ক্যানডওয়েল, যে চল্লিশ বছর আগে ওকে বিয়ে করেছিল—ওরা সবাই জানে, এই মহিলার বয়স চৌষট্টি, আগামী বাইশে জুন ও পঁয়ষট্টিতে পা রাখবে। কিন্তু ওকে দেখলে অতো বয়স মনেই হবে না। যদিও ম্যাগাজিন পড়ার সময় ও চশমা পড়ে এবং দূরে যেখানে ঘাসঢাকা লনে আধডজন বাচ্ছা ছেলেমেয়ে খেলা করছে, সেদিকে তাকানোর সময় চশমা খোলে।

এখানে পরিবেশের মধ্যে ও পরিস্থিতির মধ্যে একটা মাহাত্ম্য আছে। প্রাচীন 'হাউ' মহীরুহ মস্ত বড় একটা বাড়ীর মত, যার ছায়ায় মহিলা বসে আছে। যে সবুজ লন এখান থেকে দূর অবধি ছড়িয়ে আছে, তার এক ফুটের দাম হয়তো দুশো ডলার। বাংলোটাই দেখার মত, বিরাট ও দামী। একশোফুট জুড়ে নারকেল গাছ, তার আড়ালে সমুদ্র। প্রবাল প্রাচীরের ওপাশে সমুদ্র ঘন নীল, দূরে তুঁতে রং প্রবাল-প্রাচীরের এধারে পান্না ও জেডপাথরের মসৃণ রং।

এবং মারথা স্ক্যানডওয়েলের সবশুদ্ধ ছ'টা বাড়ী আছে। এটা তার একটা। কয়েক মাইল দূরে হনলুলুতে নুউআনু ড্রাইভে প্রথম ও দ্বিতীয় ফোয়ারার মাঝখানে ওর শহুরে বাড়ীটা প্রাসাদের মত। ট্যান্টলাসে পাহাড়ের ওপর ওর বাড়ীতে থাকার আরাম ও আনন্দ ওর অনেক অতিথি জেনেছে। এছাড়া আছে ওর 'মাউকা' বা পাহাড়ের দিকের

বাড়ী, আগ্নেয়গিরির মুখোমুখি বাড়ী, হাওয়াইয়ের বড় দ্বীপে 'মাকাই' বা সমুদ্রের ধারের বাড়ী। কিন্তু ওয়াইকিকির এই বাড়ীটাও সৌন্দর্যে, মহিমায় এবং সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার খরচ কম নয়। হিবিকাস-এর ঝোপে ছুটছে দুজন জাপানী ইয়ার্ড-বয়; রাতে ফুল ফোটাবে যে সিরয়স গাছের দীর্ঘ সারি, সেগুলো ছাটছে আর একজন। নিখুঁত পরিচ্ছন্ন সাদা পোষাকে প্রজাপতির মত সুন্দর জাপানী ঝি মারথা চায়ের আসরে দেখাশুনো করছে। আর একজন জাপানী ঝি একগাদা টার্কিশ তোয়ালে হাতে নিয়ে যাচ্ছে বাথহাউসগুলোর দিকে, যেখানে স্নান সেরে সুইমিং স্যুটপরা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে। দূরে সমুদ্রসৈকতে নারকেল-বীথির ধারে সাদা ঈশন ও ট্রাউজারপরা দুজন চীনা আয়ার মাথার চুল থেকে পিঠে বিনুনি ঝুলছে, তারা দুটো পেরাম্বুলেটরে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছে।

এইসব—ঝি চাকর, আয়া, নাতিনাতনী—এসবই মারথা স্ক্যানডওয়েলের। তার নাতিনাতনীর চামড়ায় হাওয়াইয়ের আদিম অধিবাসীদের স্বাভাবিক গায়ের রং; হাওয়াইয়েব রোদে চামড়ায় যেমন রঙ ধরে, ঠিক তেমনি। অথচ ওরা এক-অষ্টমাংশ এবং এক ষোড়শাংশ মাত্র হাওয়াইয়ান। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্বেতকায় রক্তধারাই ওদের ধমনীতে বেশী বইছে উত্তরাধিকারের সূত্রে। তবু পলিনেশিয়ার অধিবাসীদের চামড়ায় স্বাভাবিক সোনালী-বাদামী রঙ ওদের চামড়া থেকে মুছে যায়নি। তবে অভিজ্ঞ দর্শক বুঝতে পারবে, মারথার নাতিনাতনীরা প্রায় বিশুদ্ধ শ্বেতকায়। ওদের ঠাকুর্দা রাসকো স্ক্যানডওয়েল ছিল পাক্কা সাহেব, বিশুদ্ধ শ্বেতকায়। ওদের ঠাকুরমা মারথা শতকরা পঁচাত্তর ভাগ শ্বেতকায়। দুজনেরই ভালো বংশ। রসকো ন্যু ইংলণ্ডের পিউরিটানদের বংশধর। মারথার পূর্বপুরুষেরা ছিল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজা। যখন লিখিত ভাষার প্রচলন হয়নি, তখন, হাজার বছর আগে, গান গেয়ে শোনানো হতো ওদের বংশপরিচয়।

দূরে একটা গাড়ী থেকে নেমে আসে এক মহিলা। আপাতদৃষ্টিতে যার বয়স ষাট। যার হাঁটাচলার সাবলীলতা চল্লিশে মানায়। যার আসল বয়স আটষট্টি। হাওয়াইয়ান কায়দায়, হাত বাড়িয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট রেখে, শরীর ও মুখে আন্তরিকতা ও আবেগের আতিশয্য ফুটিয়ে তোলে মারথা। ওকে অভ্যর্থনা জানায়। 'বেলা দিদি' এবং মারথা বোন' পরস্পরের সম্বন্ধে অমুক কাকা, ওমুক দাদা, অমুক মাসী ইত্যাদির সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয় এবং প্রথম দেখার আবেগ একটু কমলে ভালোবাসার স্নিগ্ধ জলভরা চোখে বসে থাকে। হাতে চায়ের কাপ, দৃষ্টি পরস্পরের দিকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, অনেক বছর পরে ওদের দেখা হল। আসলে, মাত্র ছ'মাস ওদের দেখা হয়নি। একজনের বয়স চৌষট্টি, অন্যের আটষট্টি, কিন্তু আবেগের আতিশয্যের কারণ, ওদের দুজনেরই আড়ালে হাওয়াইয়ের সূর্যতপ্ত প্রেমমধুর হৃদয় জেগে আছে।

ছেলেমেয়েরা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ছুটে আসে বেলা ঠাকুমার চারপাশে। তাদের জড়িয়ে ধরা হয়, চুমু খাওয়া হয়। তারপর আয়ারা তাদের নিয়ে যায় সমুদ্রসৈকতে।

'ভেবেছিলাম, সমুদ্রসৈকতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসি। ট্রেডউইণ্ড আর বইছে না।'—মারথা বলে।

'তুমি এখানে দুসপ্তাহ কাটিয়েছো।'

ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসে বেলা।

'এডওয়ার্ড ভাই আমায় বলেছে। ষ্টিমারে দেখা হয়েছিল।'

'লুইসে, ডরোথী, এডওয়ার্ডের প্রথম নাতি—ওদের না দেখিয়ে আমায় ছাড়লো না এডওয়ার্ড। নাতি হয়েছে বলে লোকটার খুশীতে পাগল হবার জোগাড়।'

'দু' হপ্তা? এতোদিন রয়েছি এখানে, খেয়ালই করিনি।'

'মেয়েরা কোথায়? অ্যানি? মারগারেট?'

বিশাল কাঁধ দুটো ঝাঁকানোর ভঙ্গী করে মারথা। 'তার মেয়েরা মায়ের কাছে রেখে বিকেলে বেড়াতে গেছে।'

'মারগারেট গেছে আউটডোর সারকেলের মিটিং-এ। ওরা কালাকাউ এভিনিউয়ের দু'পাশে গাছ রোপন করবে। অ্যানি আশি ডলারের টায়ার ক্ষইয়ে সত্তর ডলার চাঁদা তুলবে রেডক্রুসের জন্যে।'

'রসকো নিশ্চয়ই মেয়েদের জন্যে খুব গর্বিত'। বেলা বলে।

স্বামীর নাম শুনে মারথার চোখে গর্ব ফুটে ওঠে।

'সানফ্রানসিসকোর খবর পেলাম, হুলা প্রথম ডিভিডেণ্ড দিয়েছে। বেচারা অ্যাবির বাচ্চাদের জন্যে যখন পঁচাত্তর সেন্ট দামে ওই কোম্পানীর শেয়ার কিনেছিলাম, বলেছিলাম, দশ ডলার দাম উঠলে ওই শেয়ার বেচবো।'

'তুমি বা অন্য কেউ ওই শেয়ার কিনলে সবাই হাসতো। কিন্তু রসকো ঠিক জানতো। আজ ওই শেয়ারের দর চব্বিশ ডলার।'

'ষ্টিমার থেকে ওয়্যারলেসে খবর দিয়ে আমার শেয়ার আমি কুড়ি ডলার দামে বিক্রী করেছি। এখন অ্যাবি পোষাক তৈরী করতে ব্যস্ত। সে মে ও টুটসীর সঙ্গে প্যারীতে যাচ্ছে।'

'আর কার্ল?'

'সে ইয়েল ইউনিভার্সিটির কোর্স ঠিকই করবে।'

'তা তো তুমি জানোই।'

স্কুলের বান্ধবীর ছেলের কলেজে পড়ার খরচা মেটানোর ইচ্ছেটা স্বীকার করে বেলা। তারপর বলে—

'তবু হুলা-র শেয়ার বিক্রী খরচ মেটানোর সময় মনে হচ্ছিল যেন রসকোই খরচটা

দিচ্ছে। আমাদের সব বোনেদের স্বামীকে আমরা তাদের যে টাকা দিয়েছি, তাই দিয়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছে—'

এবং আমাদের সুখ দিয়েছে...

হঠাৎ নেমে যায় মারথা।

'এবং সবাই সুখী হয়েছে, শুধু বেলা দিদি ছাড়া।'

ওর ভাবনাটা সম্পূর্ণ করে দেয় বেলা নিজেই।

'অতো কম বয়সে ওই বিয়েটা না দিলেই হ'ত। রবার্ট কাকা কাজটা ঠিক করেনি।'

'বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল উনিশ। কিন্তু দোষটা আমার স্বামী জর্জ ক্যাসনারের নয়। আজ সে নেই, কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা যে এতো ভালো , সে তো তার জন্যেই। রবার্ট কাকার বুদ্ধি ছিল। সে জানতো, জর্জ ক্যাসনারের দূরদৃষ্টি আছে, আছে সহনশীলতা ও শ্রমের শক্তি।'

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, যখন নাহালার সমুদ্রে মাছ ধরে অধিকারের দাম কেউ বুঝতোনা, সে বুঝেছিল। লোকে ভাবতো, সে ওখানে সমুদ্র তীরে র‍্যাটল-র‍্যানচ গড়বে বলে দরাদরি করছে। এখন আমার আয় কতো, ভাবলে আমার লজ্জা হয়। না, আমার অসুখী দাম্পত্য জীবনের জন্যে সে দায়ী নয়। আজ সে বেঁচে থাকলে আমি হয়তো আজও তার সঙ্গে সুখে জীবন কাটাতে পারতাম। দোষ যদি কারো থাকে, সেটা আমার জন কাকার।'

'জন কাকা? কিন্তু তোমার বিয়েটা তো দিয়েছিল রবার্ট কাকা।'

'সত্যি। কিন্তু প্রসঙ্গটা, স্বামীর নয়, ঘোড়ার। জন কাকার কাছে আমি একটা ঘোড়া চেয়েছিলাম। সে দিয়েছিল। তাই এইসব—'

...অর্থবহ এক নৈশব্দ নেমে আসে। সৈকত থেকে ভেসে আসে বাচ্চাদের চেঁচামেচি। তাদের আহ্লাদের মৃদু প্রতিবাদ। মারথা বলে—

'বাচ্চারা, তোমরা এখন যাও। আমরা কথা বলবো।'

বাচ্চাদের মিষ্টি গলার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যায়। মারথা তার দিদির মুখে অর্ধশতাব্দী ধরে যে বিষাদ দেখেছে, তার উৎস জানতে চায়।

'বেলা, আমরা কখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। আমরা ভেবেছি—'

'কিন্তু তোমরা কখনো প্রশ্ন করোনি।'

বেলার স্বরে কৃতজ্ঞতার রেশ।

'কিন্তু আজ জীবনের গোধূলিতে আমি জানতে চাই। ওই শোনো, ওই বাচ্চারা আমার নাতিনাতনী—ভাবতে কেমন ভয় লাগে না। ওই তো সেদিন আমি, ছোট্ট মেয়ে, ঘোড়ায় চড়েছি, সমুদ্রে সাঁতার দিয়েছি, এক ডজন প্রেমিকের সঙ্গে হেসেছি। এখন জীবনের গোধূলিতে সব ভুলে শুধু মনে রাখা যাক তুমি আমার, আমি তোমার বোন।

আমরা ভেবেছিলাম, জর্জ ক্যাসনার তোমায় দুঃখ দেয়। লোকটা ছিল ঠাণ্ডা। তুমি হাওয়াইয়ের মেয়ে, উষ্ণ ও তপ্ত তোমাব হৃদয। ওয়ালকট ভাই বলতো, তোমার স্বামী তোমাকে মারে।'

'না, না! জর্জ ক্যাসনার যদি নিষ্ঠুর হত, যদি পশু হত, আমি খুশী হতাম। না, সে কখনও চেঁচিয়ে কথা বলতো না। কখনো না, ভাবতে পারো? আমাদেব কখনো ঝগড়া হয়নি। কিন্তু নাহালায় ওর বাড়ীটার রং ছিল ধূসর। আমার স্বামীর মতন। তুমি তো তাকে দেখেছো, মারথা। স্কুলে এমার্সনের যে ধূসর ছবি ঝুলতো, তার মতো ধূসর। রোদ, আবহাওয়া, ঘোড়ায় চড়া— কোন কিছুই তাব চামড়ার ধূসর রঙ বদলাতে পারেনি। তার মনের ভেতরটায় ছিল ধূসর।

তখন আমার বয়স উনিশ। ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাড়লো রবার্ট কাকা। আমায় বোঝালো, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অর্থসম্পদ ক্রমশঃ স্থানীয় অধিবাসীদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে শ্বেতকায় 'হাওল'দের হাতে। হাওয়াইয়ের স্থানীয় সর্দাররা সম্পত্তি বেঁচে দিচ্ছে। তাদেব মেয়েরা শ্বেতকায়দের বিয়ে করলে স্বামীদের চাতুর্যে তাদের সম্পত্তি বাড়ছে। আমাদের ঠাকুর্দা রোজার উইলটন কিভাবে ঠাকুমার 'মাউকা' জমিগুলো কাজে লাগিয়ে কিলোহানা র‍্যানচ গড়ে তুলেছিল—'

'তখনই পারকার র‍্যানচ ছাড়া আমাদের কিলোহানা র‍্যানচের জুড়ি ছিলনা।' গর্বের সঙ্গে বলে মারথা।

'এবং রবার্ট কাকা বোঝালো, আমার বাবা যদি ঠাকর্দার মত বুদ্ধিমান হত, কিলোহানা র‍্যানচ যদি হত পার্কার র‍্যানচের চেয়ে বড়। কাকা বলতো, গরুর মাংসের দাম ক্রমশঃ পড়ছে, এখন চিনি উৎপাদনই হাওয়াইয়ের ভবিষ্যত। পঞ্চাশ বছর আগে কথাগুলো বলেছিল রবার্ট কাকা। আজ তার কথাই সত্যি হয়েছে। সে বলেছিল, এই শ্বেতকায় যুবক জর্জ ক্যাসনার-এর দূরদৃষ্টি আছে, ও জীবনে অনেক ওপরে উঠবে। আমাদের পরিবারে অনেক মেয়ে। ছেলেরাই কিলোহানার জমির মালিক হবে। সুতরাং জর্জকে বিয়ে করলে আমার ভবিষ্যৎ ভালো হবে।

আমার বয়স তখন মাত্র উনিশ। রয়্যাল চীফ স্কুলের ছাত্রী ছিলাম আমি। মেয়েরা তখন ষ্টেটসে পড়তে যেতোনা। প্রথম যারা ষ্টেটসে পড়তে যায়, মার্থা বোন, তুমি তাদের একজন। আমি তখন প্রেম, প্রেমিক বা বিয়ের ব্যাপারে কিই বা জানি? মেয়েরা বিয়ে করে। বিয়ে করতে হয়। মা-ঠাকুমা বিয়ে করেছে। আমি জর্জ ক্যাসনারকেবিয়ে করবো। রবার্ট কাকার বুদ্ধি আছে, সে বলেছে, এই বিয়েতে আমার ভালো হবে। তাই বিয়ে হল, আমি নাহালায় আমার ধূসর স্বামীর সেই ধূসর রঙের বাড়ীতে গেলাম।

বাড়ীটা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মারথা। কোনো গাছ ছিল না। শুধু ঘাসঢাকা জমি। পেছনে উঁচু পাহাড়, নীচে সমুদ্র, সমুদ্রহাওয়া। নাহালা উইনড, ওয়াইমিয়া

উইনড, কোনা উইন্ড। এসবে আমার মন খারাপ হতো না। কিলোহানা বা মানায় কখনো মন খারাপ করেছি? কিন্তু নাহালায় আমার স্বামীর দেহমনের রংও ধূসর। আমরা ওখানে একা থাকতাম। নাহালায় গ্লেন পরিবারের এস্টেট দেখাশুনো করতো আমার স্বামী। বছরের আটারো'শ ডলার মাইনে পেতো, তাছাড়া গোমাংস, ঘোড়া, কাউবউদেব কাজ, বাড়ীভাড়া—এসব ছিল ফ্রী।'

'সে আমলের পক্ষে যথেষ্ট ভালো মাইনে।'

মারথা বলে।

'কিন্তু জর্জ ক্যাসনারের পক্ষে কিছুই না। আমি তিনটে বছর তার সঙ্গে জীবন কাটিয়েছি। ভোর সাড়ে চারটের আগে সে বিছানা ছেড়ে উঠতো। মালিকের কাজে ফাঁকি দিতে জানতো না, একপেনীর হিসেবের ভুল করতো না, সমস্ত সময় সমস্ত শক্তি ওদের কাজে লাগাতো। হয়তো তাই আমাদের জীবন হয়ে উঠেছিল ধূসর, রঙ ছুট। জানো মার্থা, যে আঠারো'শ ডলার ও মাইনে পেতো বছরে, তার থেকে ও বছরে ষোল'শ ডলার বাঁচাতো। দুজনের বছরের সব খরচা চলতো দুশ ডলারে। ভাগ্য ভালো, ও মদ খেতোনা, সিগারেট খেতোনা। আমার পোষাক আমি নিজের হাতে তৈরী করতাম। কাউবয়েরা শুধু রান্নার কাঠ চিরে দিতো। আমি রান্না করতাম, রুটি খেতাম, ঘর মুছতাম।'

'অথচ জন্ম থেকে তুমি ঝি-চাকর দেখতেই অভ্যস্ত', মার্থা বলে।

'কিলোহানায় আমাদের এক রেজিমেন্ট ঝি-চাকর ছিল।'

'ওঃ, কিন্তু এই যে নগ্ন, বিশ্রী, কঞ্জুসি—আমার সহ্য হতো না। এক পাউণ্ড কফিতে যতোদিন চালানো যায়! ঝাঁটাটা একেবারে মুড়িয়ে না গেলে নতুন ঝাঁটা কেনা যায় না। খাবার? সস্তা মাংস, সকাল দুপুর রাত। আর, যবের মণ্ড। আমি আর কখনও সস্তা মাংস বা যবের মণ্ড খাইনা।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় বেলা। সামনে এগিয়ে যেয়ে রঙ ঝলমলে প্রবালপ্রাচীরের দিকে তাকিয়ে মনটা যা তা করে। যখন সে ফিরে আসে, তার মুখে সেই নিশ্চিন্তি, সেই ঝলমলে ভাব, সেই উদারতা ও মহত্ব— যা শ্বেতকায় রক্তের কোন সংমিশ্রন হাওয়াই দ্বীপের রূপসীর অস্তিত্ব থেকে মুছে দিতে পারে না। বেলা ক্যাসনার শ্বেতকায়, 'হাওল্', সাদা চামড়ার মেয়ে। কিন্তু তার মাথা তোলার ভঙ্গীতে, রাজকীয় ভুরুজোড়ার নীচে দীঘল বাদামী চোখের দৃষ্টিতে, ছোট্ট মুখের নরম রেখায় প্রাচীন হাওয়াইয়ের কোনো রাণীর ছবি জেগে ওঠে। ও মার্থার চেয়েও লম্বা, তাই রাণীর মতো দেখায় ওকে।

অতিথি এলে ভালো খেতে দিই না বলে বদনাম ছিল আমাদের। নাহালা থেকে পরের বাড়ীটা অনেক দূরে, অনেক মাইল পরে। ঝড় উঠলে বা রাত্ত বেশী হলে পথিকেরা অনেক সময় আমাদের ওখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতো। বড়ো বড়ো র‍্যানচ

বা ক্যাটলফার্মের আতিথেয়তার কথা তুমি তো জানো। আমাদের নিয়ে ওরা হাসাহাসি করতো।

এসবে কিছু এসে যায় না—জর্জ বলতো—আজ থেকে কুড়ি বছর পরে আমাদের হাসবার দিন আসবে। ওরা যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে। আমরা সেদিন ওদের খাওয়াবো, ভালো খাওয়াবো। কেননা আমরা বড়লোক হবো। ও বাঁচলো না। কিন্তু কুড়ি বছর পরে আমার আয় হল বছরে হাজার পাউণ্ড। এখন কতো আমি নিজেই জানিনা। কিন্তু তখন আমার বয়স উনিশ। আমি বলতাম—জর্জ, আমি এখন বাঁচতে চাই। কুড়ি বছর পরে আমরা বেঁচে থাকবো কিনা, কে জানে। আমার নতুন একটা ঝাঁটা চাই। এই যে বিশ্রী কফিটা আমরা খাচ্ছি, পাউণ্ডে দু-সেন্ট মাত্র দাম বেশী দিলে এর থেকে ভালো কফি পাওয়া যায়। কেন আমি এখন মাখনে ডিম ভেজে খাবোনা? কেন আমি নতুন একটা টেবলক্লথ কিনবোনা? আমাদের চাদরগুলো কি বিশ্রী! অতিথিদের শুতে বলতে লজ্জা লাগে। এমনিতে কোনো অতিথি পারতপক্ষে আমাদের বাড়ী আসে না।

আমার স্বামী বলতো—ধৈর্য্য ধরো। আর কয়েক বছর পরে ওরা আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রিত হলে খুসীই হবে। ওদের মধ্যে যারা বাঁচবে, তারা। গত বছর ষ্টিভেনস মারা গেল। দুহাতে পয়সা ছড়াতো, সবার বন্ধু, নিজের স্বার্থ দেখতো না। গুচ্ছের ধার ছাড়া আর কিছুই রেখে যায়নি ষ্টিভেনস। কোহলার লোকেরা চাঁদা করে ওকে কবর দেওয়ার খরচা তুললো। আরও অনেকে মরবে। তোমার ছোট ভাই হল, এইভাবে দিন কাটালে ও পাঁচ বছর বাঁচবে না। এবং যুবরাজ লিলোলিলো—পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী যুবক 'কানাকা' সঙ্গী নিয়ে যে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়, ওর সঙ্গীরা কঠিন পরিশ্রম করলে ও ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তা করলে কতো ভালো হত— ওই যুবরাজ লিলোলিলো কোন-দিনই হাওয়াইয়ের রাজা হবে না। তার আগেই ও মরে যাবে।

জর্জ ঠিকই বলেছিল। আমাদের ভাই হল্ মারা গেল। যুবরাজ লিলোলিলোও বাঁচলোনা। কিন্তু সব ঠিক বলেনি আমার স্বামী। আমার স্বামী জর্জ, যে মদ খেতোনা, সিগারেট খেতোনা, রাতে আমার শরীর আলিঙ্গনে বেঁধে শরীরের শক্তি নষ্ট করতো না, চুম্বনের সময় এক সেকেণ্ডের বেশী ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতো না, যে মোরগ ডাকার আগে ভোরে বিছানা থেকে উঠতো, কেরোসিনের ল্যাম্পের তেল দশভাগের একভাগ ফুরোবার আগে যে ঘুমিয়ে পড়তো, যার মরার কথা নয়, সে হল্ ও লিলোলিলোর আগেই মরে গেল।

'বেলা, ধৈর্য্য ধরো'—রবার্ট কাকা বলতো—'তোমার স্বামী জর্জ ক্যাসনার অনেক বড় হবে। এখন কষ্ট করছো, পরে ফল পাবে। হাওয়াইয়ের স্থানীয় লোকেরা চিরদিন হাওয়াই শাসন করবে না। যেমন ওদের জমি ওদের হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তেমনি

ক্ষমতাও ওদের হাত-ছাড়া হয়ে যাবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ভূমিসত্ব একসঙ্গে যায় আগে। এখানে পরিবর্তন হবে, বিপ্লব হবে এবং শেষ অবধি ক্ষমতা ও জমি দুইই আসবে শ্বেতকায়দের হাতে। যেদিন জর্জ ক্যাসনার হবে এদেশের শাসক, তুমি তার স্ত্রী। বইয়ে তাই লেখা আছে। যেখানে সহজ জীবন ধারায় অভ্যস্ত কোনো মানব প্রজাতির সঙ্গে শ্বেতকায়দের সংঘর্ষ বাঁধে, সেখানে এই ঘটে। আমি তোমার কাকা রবার্ট, অর্ধেক হাওয়াইয়ান, অর্ধেক শ্বেতকায়—আমি কি বলছি, আমি জানি। ধৈর্য্য ধরো বেলা।'

'বেলা, বেচারা বেলা'—জন কাকা বলতো, আমি জানি, সে আমায় ভালোবাসতো। জন কাকার বুদ্ধি ছিল, সঙ্গে ছিল হৃদয় ও মানবিকতা। রবার্ট কাকা ও জর্জ ক্যাসনারের চাইতে জ্ঞান বেশী ছিল ওর। ও বস্তুর বদলে আত্মাকে খুঁজতো। আর জর্জ হৃদয়ের স্পন্দন না শুনে, স্ত্রীকে আলিঙ্গনে না বেঁধে, স্ত্রীর সঙ্গে ভালোবাসার কথা না বলে লেজারে হিসেব লিখতো, তুমি তো জানো, প্রিন্সেস নাওমির প্রেমিক ছিল জন কাকা। নাওমির মৃত্যুর পর ও কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। কিলোহানায় ওর ভেতরের দিকের ঘরটায় ওর জীবৎকালে আমরা কেউ ঢুকিনি। ওর মৃত্যুর পর দেখেছি—সেখানে ছিল ওর প্রেমিকা নাওমির স্মৃতিচিহ্ন। 'বেচারা বেলা'—জন কাকা বলতো। আমার দুঃখ ও বুঝতো।

তখন আমার বয়স উনিশ। যদিও রক্তে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ শ্বেতকায় উত্তরাধিকার, তবু আমি হাওয়াইয়ান, আমার রক্তে সূর্যের উজ্জ্বলতা। আমার শুধু স্মৃতি ছিল। কিলোহানার র‍্যানচে ছোটবেলার উজ্জ্বল স্মৃতি। হনলুলুর রয়্যাল চীফ স্কুলের স্মৃতি। আর পাশে ছিল ধূসর পুরুষ, যে আমার স্বামী, তার ধূসর উপদেশ, অসহ্য কঞ্জুসী। আর দুই সন্তানহীন কাকা—একজন শীতল, দূরদর্শী, অন্যজন ভগ্নহৃদয়, প্রিন্সেসের স্মৃতি নিয়ে যে বেঁচে আছে।

যে আমি ছোটবেলায় কিলোহানা, মানা, পুওয়ায়ার র‍্যান্চে সুখ, সমৃদ্ধি, আনন্দ দেখেছি সামন্ততান্ত্রিক ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বেঁচেছি—তুমি কি ভাবতে পারো মারথা নাহালায় আমার একটা মাত্র পুরানো সেলাইকল ছিল, প্রথম যুগের মিশনারীদের কেনা, হাত দিয়ে চালাতে হত।

বিয়ের সময় দুই কাকা রবার্ট ও জন প্রত্যেকে আমার স্বামীকে পাঁচহাজার ডলার দিয়েছিল। কথাটা গোপন রাখতে বলেছিল আমার স্বামী।

আমি, আমার পুরোনো সস্তা ভাঙা-মেসিনে নিজের জন্যে 'হোলোকু' সেলাই করতাম। আমার স্বামী সেই দশ হাজার ডলার দিয়ে জমি কিনতো। উত্তর নাহালার জমি। দরদাম করতো এমনভাবে, যেন ওর পয়সা নেই। আজ শুধু নাহালা ডিচ্-এর ভূমিসত্ব থেকেই বছরে আমার চল্লিশ হাজার ডলার আয় হয়।

কিন্তু তাতে কি লাভ? আমি তো ছিলাম ক্ষুধার্ত। ও যদি আমার দুহাতে পাগলের মত জড়িয়ে ধরতো, পিষে ফেলতো! একবার, অন্ততঃ একবার! ও যদি নিজের কাজ, মালিকের কাজ ভুলে পাঁচ মিনিটও আমার সঙ্গে কাটাতো! এক সময় মনে হত, আমি চীৎকার করে উঠবো, সেলাইকলটা ভেঙে ফেলে হুলা নাচ নাচবো, যবের মণ্ড ওর মুখে ছুড়ে দেবো। তাতে যদি ও রেগে ওঠে, যদি ও মেজাজ গরম করে। তাতে যদি ওকে মানুষের মত মনে হয়। মানুষের মত, ধূসর জমাট কোনো অর্ধ-দেবতার মত নয়।

এবং আমি যখন চটে উঠতাম, ও গম্ভীর হয়ে আমায় দেখতো, আমার নাড়ী গুণতো, আমার জিভ দেখতো, আমায় ক্যাস্টর অয়েল খাওয়াতো, আমায় গরম বিছানায় তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিয়ে বলতো, সকালে তোমার ভালো লাগবে। তাড়াতাড়ি শোও! কোনদিন আমরা রাত নটা অবধি জাগিনি। রাত আটটায় শুতে হত। কেরোসিন বাঁচাবে যে। ডিনার খাওয়া হতনা, শুধু সাপার। তারপর একঘন্টা অন্যের কাছ থেকে ধার করা পুরোনো ম্যাগাজিন পড়বে আমার স্বামী। আমি ওর সস্তা ছেঁড়া মোজা-গেঞ্জি-আণ্ডার উইয়্যার সেলাই ও রিপু করবো। তারপর ও শোবে, আমাকেও শুতে হবে। কেরোসিন নষ্ট করা চলবেনা। শোবার আগে ঘড়িতে দম দেবে আমার স্বামী, ডায়েরীতে আবহাওয়া কেমন তাই লিখে রাখবে, জুতো খুলবে, প্রথমে ডান পা তারপর বাঁ পা, মেঝেয় খাটের পায়ার কাছে পাশাপাশি রাখবে জুতো জোড়া। রোজ একই রকম।

ও খুব পরিচ্ছন্ন ছিল। নোংরা আণ্ডারউইয়্যার কখনো পরতো না, আমাকে ধুতে হত। এই পরিচ্ছন্নতা যেন একটা বাতিক! দিনে দুবার দাড়ি কামাতো। অতো স্নানের বাতিক কোনো লোকের নেই। দুটো শ্বেতকায় মানুষের সমান কাজ করতো একা জর্জ। এবং নাহালার সমুদ্র তীরবর্তী জমির গুরুত্ব সে বুঝেছিল।'

'এবং সে তোমায় ধনী করেছে, সুখী করেনি।'

মারথা বলে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেলা জবাব দেয়—

'মারথা বোন, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ প্রেমিক, স্বামী, প্রিয় পুরুষের পাশে কিছু নয়। যে পুরুষের পাশে থেকে দুঃখ ও আনন্দ, সে সঙ্গী, প্রেমিক, স্বামী—'

তার কণ্ঠস্বর দূরে মেলায়। এবং প্রাচীনা এক বৃদ্ধা, কোলকুঁজো, কোঁকড়ানো চামড়া, হাতে লাঠি, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসে, বেলার পায়ের কাছে বসে এবং তার পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে হাওয়াইয়ান্ ভাষায় ফোকলা মুখে গান গাইতে গাইতে বেলার সিল্কের মোজা পরা পায়ে হাত বোলায়। বেলাও মারথার চোখ জলে ভিজে ওঠে। হাওয়াইয়ান ভাষায় বুড়ীর স্বাস্থ্য, বয়স ও তার নাতিনাতনীরা কেমন আছে তার সম্বন্ধে

খোঁজ নেয় দুই বোন। কিলোহানার বাড়ীতে দুই বোনকেই মানুষ করেছে এই বুড়ী আয়া। বাংলোয় যেয়ে ওর হাতে টাকা দেয় মারথা, জাপানী ঝি'দের বলে, বুড়ীকে 'পোই' দিতে। 'পোই' তৈরী হয় পদ্মফুলের মূল, ইয়ামাকা বা কাঁচা মাছ, 'কুকুই' বাদামের গুঁড়ো আর নরম সমুদ্রগুল্ম 'লিমু' দিয়ে—যা ফোকলা দাঁতে খাওয়া যায়, সহজে হজম করা যায়, যার সুগন্ধ ভালো লাগে।

এই সেই প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন—প্রজার সঙ্গে রাজার—শতকরা পঁচাত্তর ভাগ শ্বেতকায় ও মাত্র পঁচিশ ভাগ হাওয়াইয়ান হয়েও পুরোনো দিনের সে প্রথা মারথা ভুলতে পারেনি। লন পেরিয়ে হাউ মহীরুহের ছায়ায় ফিরে আসে মারথা। বেলা মারথাব থেকে লম্বা, মারথা বেলার চেয়ে একটু মোটা। কিন্তু চেহারাটা দুজনেরই সমান, বয়স এখানে ধ্বংস আনেনি, এনেছে শুধু স্বাভাবিক পরিবর্তন। পলিনেসিয়ার রানীর মত শরীবে কালো সিল্কের কালো লেস্ লাগানো হোলোকু—যা প্যারীতে কেনা সেরা গাউনের চেয়েও দামী। এখানে কোন দর্শক এখন থাকলে দুই বোনের মুখের সরল প্রোফাইল, গালেব চওড়া হাড়, চওড়া ও উঁচু কপাল, মিষ্টি ঠোঁট, মুখভঙ্গীতে অভ্যস্ত ও পরিশীলিত অহংকারের ছাপ, সুন্দর দীঘল চোখ দুটোর ওপর সুন্দর পাতলা ভুরু দুটো এসবের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পেতো। দুজনেরই হাতের আদল বয়সের দরুণ বদলে আছে, কিন্তু এখনও ওদের আঙুলের ডগাগুলো সূচোলো ও সুন্দর, হাওয়াইয়ান্ বুড়ী আয়ারা মালিশ করে আঙুলগুলো সুন্দর করে গড়ে তুলেছে। যে আয়া এখন পোই আর ইয়ামকা আর লিমু খাচ্ছে, তারই মতো বুড়ী আয়ারা।

'এক বছর গেল।'

আবার নিজের জীবনের গল্প শুরু করে বেলা।

'আর কিছুদিন গেলে হয়তো আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসতাম। মেয়েদের এমনি নিয়ম। অন্ততঃ আমি এই ধরণের মেয়েমানুষ। আমার স্বামী ভালোমানুষ ছিল, সৎ ছিল, পিউরিটান নীতিবাগিশদের প্রত্যেকটা গুণ তার মধ্যে ছিল। আমি তার দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করছিলাম। হয়তো আমি তাকে ভালোবেসে ফেলতাম। যদি না জন কাকা ঘোড়াটা আমায় ধার দিতো, আমি হয়তো স্বামীকে ভালোবেসে চিরদিন ওর সঙ্গে সুখে জীবন কাটাতাম।

কেননা তুমি তো জানো, আমি তখনও ওর থেকে ভালো, ওর থেকে আলাদা ধরণের পুরুষ দেখিনি। ও রাতের খাওযা শেষ করে কাগজ পড়তো, তাই দেখতেই আমার ভালো লাগতো। ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ জানাতো, ও র‍্যানচ ঘোরা শেষ করে বাড়ী আসছে। তাতেই আমি খুসী হতাম। ও সামান্য একটু প্রশংসা করলে খুশীতে আমার শরীরে শিহরণ জাগতো। আমি ভালো বা ঠিক কিছু করলে ও স্বল্প কথায় প্রশংসা করতো। তাতেই আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠতাম।

সব কিছু ঠিকই চলছিল। হঠাৎ ও বললো, ও ষ্টীমারে দুসপ্তাহের জন্যে হনলুলু যাবে। প্রথমতঃ গ্লেনদের ফার্মসংক্রান্ত কিছু কাজ ছিল। দ্বিতীয়তঃ নিজের জন্যে নাহালার কিছু জমি ও কিনবে। জঙ্গলভর্তি জমি, যার কোন দাম নেই, তবু জলের ধারে জমির অবস্থান এই ছাড়া আর কোন গুণ নেই—দামও খুব কম—হয়তো পাঁচ বা দশ সেন্টে এক একর জমি। আমি বলেছিলাম, আমি ওর সংগে হনলুলু যাব। ও বললো, না, তোমার চেঞ্জ দরকার, তুমি কিলোহানায় বাপের বাড়ী যাও। আমি বাপের বাড়ী গেলে ওর পয়সা খরচ হবে না। নাহালায় বাড়ীতে একা থাকতে যেটুকু সস্তা খাবার আমি খেতাম, সেটুকুব খরচ বাঁচিয়ে ও নাহালার জমি কিনবে। এবং কিলোহানায় জন কাকা আমার ঘোড়াটা ধার দিলো।

প্রথম কদিন বাপের বাড়ী স্বর্গের মত লাগলো আমার। ইস এখানে এতো খাবার নষ্ট হয়। কেননা, ততোদিনে স্বামীর কাছ থেকে আমিও কঞ্জুসি শিখেছি। চাকরদের বুড়ো অথর্ব আত্মীয়স্বজনদের এবং চাকরদের খুব দূর সম্পর্কের লোকদেরও যে খাবার দেওয়া হয়, তার থেকে খারাপ খাবার খাই আমি ও জর্জ। কিলোহানার নিয়ম তুমি তো জানো। এক দিন অন্তর বাচ্চা একটা ষাড় কাটা হয়, ওয়াইপিও এবং কিহোলো থেকে পুকুরের মাছ আনে রানাররা। সব সেরা খাবার, সেরা রান্না।

এবং ভালোবাসা। জন কাকা, ওয়ালকট ভাই, এডওয়ার্ড ভাই, ছোট বোনেরা। তুমি ও স্যালী শুধু ইস্কুলে ছিলো। এলিজাবেথ কাকী, জ্যানেট কাকী, ওদের ছেলেমেয়ে কেউ জড়িয়ে ধরছে, কেউ আমায় আদর করছে। আমার এতো ভালো লাগছিল। যেন সমুদ্রে জাহাজ ডুবির পর লাইফবোটের যাত্রী তীরের বালি ছুঁয়েছে, নারকেলবীথির নীচে ঝর্ণার জল খাচ্ছে।

...এবং তারপর ওরা এলো।

রাজকীয় প্রমোদপোত থেকে নেমে ওরা ঘোড়ায় চড়েছে। জোড়ায় জোড়ায় ওরা এলো। গলায় ফুলের মালা। সুখী ও হাসিখুশী যুবক। সংখ্যায় ওরা তিরিশ জন। সঙ্গে পারকারদের ফার্মের একশোজন কাউবয়। প্রিন্সেস লিহুকে নিয়ে ওরা যাচ্ছে। প্রিন্সেসের টি, বি, হয়েছে, আমরা জানতাম। কিন্তু তার সঙ্গে ছিল তার ভাইপোরা। প্রিন্স লিলোলিলো, যার রাজা হওয়ার কথা। তার দুই ভাই—প্রিন্স কাহোকিলি আর প্রিন্স কামালাউ। প্রিন্সের সঙ্গে ছিলো এলা হিগিন্সওয়ারথ যে রয়্যাল চীফ স্কুলের বোর্ডিং-এ আমার রুমমেট ছিল, আর ছিল ডোরা নাইলস আর এমিলি লোক্রাফট। আমাদের র‍্যানচে ওরা একঘন্টা বিশ্রাম করলো। 'লুআউ' পার্কার র‍্যাঞ্চে খাবে বলে এখানে খেলোনা, ছেলেরা খেলো বীয়ার ও মদ, মেয়েরা তরমুজ, লিমোনেড আর কমলালেবু। এলা আমায় জড়িয়ে ধরলো। প্রিন্সেস আমায় আমন্ত্রণ জানালো মানায় তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে। দুদিন পরে ওরা মানায় যাবে। আমি জানতাম, ওদের

সঙ্গে যোগ দেওয়া মানে দুসপ্তাহ স্বর্গে থাকা। তারপর আবার তো আমায় নাহালার সেই কারাগারে ফিরে যেতে হবে। আমি জন কাকার কাছে একটা ঘোড়া চাইলাম। আসলে তিনটে ঘোড়া। তখন তো রাস্তা ছিলনা, মোটরগাড়ীও ছিলনা। একটা ঘোড়া নিজের জন্যে, একটা মাল বওয়ার জন্যে, একটা দেহরক্ষী কাউবউয়ের জন্যে। আমার জন্যে আমি বেছে নিলাম হিলো নামের সেই ঘোড়াটা, যেটা এক বছর পরে আরোহী সমেত মারা যায়। দুজনেরই ঘাড় ভাঙে মৌনাকীতে বুনো ষাড় তাড়া করতে গিয়ে। সেই আরোহী ছিল অ্যামেরিকান নেভীর একজন অফিসার।'

'হ্যাঁ, লেফটেন্যান্ট বোজফীল্ড।'

মার্থা ঘাড় নাড়ে।

'কিন্তু আমিই প্রথম মহিলা যে হিলোর পিঠে সওয়ার হয়েছি। বয়স মাত্র তিন বছর, নিকষ কালো, লোমে রূপোলী দাগ—র্যানচের সবচেয়ে বড় ঘোড়া—গোল ও গভীর তার বুকের ছাঁচ, শক্ত শরীর, মেজাজী, মাথা ও ঘাড় ভালো জাতের ঘোড়ার মতো, রোগা অথচ ভরাট, কান দুটো সুন্দর ও সজাগ, বদমায়েস ঘোড়াদের মত ছোট নয়, একগুঁয়ে খচ্চরদের মত মস্ত বড়ও নয়। পাগুলোর কোন দোষ নেই, সবল, কঠিন, লাফিয়ে চলার ভঙ্গী এমনই স্বচ্ছন্দ যে ওর লাগাম ধরে ওর পিঠে বসা অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা।'

'হ্যাঁ, প্রিন্স লিলোলিলো জন কাকাকে বলেছিল, তুমি হাওয়াইয়ের সেরা মহিলা ঘোড়সওয়ার'।

মারথা বাধা দিয়ে বলে।

'তখন তুমি নাহালায় ফিরে গেছ। দুবছর পরে আমরা স্কুল থেকে ফিরেছি।'

'লিলোলিলো বলেছিল?'

বেলার মুখে লজ্জার লাল ফুটে ওঠে, তার বাদামী চোখদুটো ঝিলমিল করে, যেন সে অর্ধশতাব্দী আগে মরে যাওয়া প্রেমিকের কাছে পৌঁছে যায় সময়ের দীর্ঘ সেতু পেরিয়ে, তারপর হাওয়াইয়ের মহিলাদের স্বাভাবিক ভঙ্গীতে তার প্রেমের প্রশংসা ঢাকতে সে হিলো নামের ঘোড়াটার প্রশংসা শুরু করে।

'হিলো যখন ঘাসঢাকা চড়াইউৎরাই বেয়ে উঠতো নামতো, মনে হত, স্বপ্নের মধ্যে ছুটে চলেছি। হরিণ কিম্বা খরগোস কিম্বা ফক্স টেরিয়ারের মত লাফিয়ে চলতো হিলো। প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিল ঘোড়াটা। নেপোলিয়ঁ বা কিচেনার ওর সওয়ার হলে মানাতো। আমি যখন জন কাকার কাছে ঘোড়াটা চাইলাম, ও আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালো, মনে হল, ও যেন আমার মধ্যে ওর বিগত দিনের প্রেমিকা প্রিন্সেস নাওমিকে দেখছে। হ্যাঁ, জন কাকা রাজী হল। কি ঘটবে, তা কাকা হয়তো জানতো না। আমি কি জানতাম? ঘোড়ায় চড়ে আমি মানায় প্রিন্সেসের কাহিনীর সংগে যোগ

দিলাম। সে ছিল উৎসবের লগ্ন। পারকারদের আতিথেয়তার ধরণ তুমি তো জানো। বন-শূয়োর আর বুনো ষাঁর শিকার, বুনো ঘোড়া পোষ মানানোর খেলা। ঝি চাকর ভর্তি র‍্যানচ। কাউবয়রা সর্বত্র রয়েছে। ওয়াইমীয়া, ওয়াইপীও, হনোকাকা ও পাওউইলো থেকে মেয়েরা এসেছে। পাথরের দেয়ালে বসে তারা কাউবয়-প্রেমিকদের জন্যে 'লেই' তৈরী করতো। এবং সেইসব রাত, সুগন্ধি রাত, যখন হাওয়াইয়ান ভাষায় গান গাইতো ছেলেমেয়েরা, হুলা নাচ নাচতো এবং মানার বিশাল ময়দানে গাছের ছায়ায় জোড়ায় জোড়ায় ঘুরতো প্রেমিক প্রেমিকারা।

এবং প্রিন্স...।

বেলা থামে, ছোট্ট সুন্দর দাঁতে ঠোঁট ঢাকা, নিজের সংযম ফিরিয়ে আনার জন্যে দূরের নীল দিগন্তের দিকে তাকায়।

'মার্থা, সে ছিল রাজার কুমার। তুমি তো তাকে দেখছো। সে যে কোন রমনীর চোখ ভরিয়ে দিতো। তার বয়স ছিল পঁচিশ। পুরুষের দীপ্ত যৌবনের প্রতীক, প্রিন্সের মতোই সুন্দর তার শরীর, প্রিন্সের মতই মহৎ ও বিরাট তার মন। খেলা যতো বন্য হোক, যতো বিপজ্জনক হোক, যে অংশ নিতো। সে ভুলে যেতো না যে তার পূর্বপুরুষরা জোড়া ডিঙিতে হাওয়াই থেকে সমুদ্রপথে তাহিতি যেতো এবং ফিরে আসতো। সে ছিল মিষ্টি, দয়ালু, বন্ধুর মত, কমরেডদের মত। কেউ তাকে আঘাত দিলে সে হয়ে উঠতো রুক্ষ ও কঠোর। আমি কি বলতে চাইছি ঠিক বোঝাতে পারব না। সে ছিল পুরুষ, পুরুষ, পুরুষ এবং সে ছিল প্রিন্স, কিছুটা হাসিখুশী বাচ্ছা ছেলের মত, কিছুটা ইস্পাতকঠিন সেই শাসকের মত, হাওয়াইয়ের রাজা হলে যে ভূমিকায় তাকে দেখা যেতো।

আমি প্রথম দিন তাকে দেখে তার হাত ছুয়ে কি যেন বলেছিলাম। লজ্জাজড়ানো কিছু কথা। যা ধূসর নাহালায় এক বছর বিবাহিতা এক স্ত্রী তার ধূসর শ্বেতকায় স্বামীকে বলতে পারে না। অর্ধশতাব্দী আগে সেই আনাদের প্রথম দেখা। তোমার মনে আছে, সে আমলের হাওয়াইয়ান যুবকরা কি ধরণের পোষাক পরতো। সাদা সার্ট, সাদা ট্রাউজার। সাদা সিল্কের সার্টের মাঝখানে কাটা, রঙচঙে, স্পেনিস শ্যাশ্‌—এবং অর্ধশতাব্দী ধরে সেই স্মৃতিই আমার বুকে জেগে আছে।

ওর দৃষ্টি হঠাৎ আমাকে ছুঁয়ে গেল। আমি লজ্জা পেলাম। আজও আমি কল্পনায় ওকে দেখতে পাই। মাথাটা ওর পেছন দিকে একটু হেলানো, উচ্ছল, সম্রাটের খেয়ালী উজ্জ্বল ভঙ্গিমা। আমাদের চোখে চোখে কথা হয়। সে কি আদেশ করেছিল? আমি কি আদেশ মেনেছিলাম? আমি জানিনা। আমি শুধু জানি, আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল, জন-কাকার ধার-দেওয়া প্রিন্সেস নাওমির 'হোলোকু' আমায় চমৎকার মানিয়েছিল।

আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। সে সঙ্গীদের পেছনে ফেলে এগিয়ে এল। যেন এক জীবনের দূরত্ব পেরিয়ে আমাদের দেখা হল।

মার্থা বোন, আমি কি সুন্দর ছিলাম? যখন আমি যুবতী, আমাকে কি সুন্দরী বলা যেতো? আমি জানিনা। সত্যিই জানি না। কিন্তু হয়তো সেই মুহূর্তে প্রিন্স লিলোলিলোর সৌন্দর্য্য ও রাজকীয় পৌরুষ আমার হৃদয়কে ছুঁয়েছিল, হয়তো আমাকেও সুন্দর করে তুলেছিল।

আমার কথা বলিনি। আমি শুধু জানি, অকথিত তার ভাষা ছিল বজ্রের মত এক আহ্বান, যার জবাবে আমি মুখ তুলে চেয়েছিলাম। সেই দৃষ্টি বিনিময়ের প্রতিদানে সেই মুহূর্তের পর যদি মৃত্যু হত, তবু আমি আমার মুখ, আমার দৃষ্টি, আমার শরীর তাকে উপহাব না দিয়ে পারতাম না।

মারথা বোন, যখন আমার বয়স ছিল উনিশ, যখন আমি কুড়িতে পা দিতে চলেছি, আমি সত্যিই খুব সুন্দরী ছিলাম?

এবং মার্থা, যার বয়স চৌষট্টি, আটষট্টি বছরের বেলার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। সেই মুহূর্তে সে দেখতে পায় যুবতী বেলাকে—বেলার ঘাড় হাওয়াইয়ের অন্য মেয়েদের চেয়ে দীঘল, যার ওপর উঁচু কপাল, উঁচু ভ্রু, সম্রাজ্ঞীর মত মুখটা মানায় এবং বৈপরীত্যের ইঙ্গিত আসে কালো ভুরুজোড়া ও বাদামী রঙের চোখদুটোর মধ্যে। মার্থার দৃষ্টি নীচে নামে, সুন্দর স্তনদুটো ছুঁয়ে শরীরের রেখা ছুঁয়ে সিল্কের মোজায় ঢাকা হাইহীল জুতো পরা ছোট ও ভরাট পায়ের নিখুঁত গোড়ালিতে তার দৃষ্টি নেমে আসে।

'যৌবন, ভালোবাসার লগ্ন জীবনে একবারই আসে।'

'লিলোলিলো ছিল রাজার কুমার। আজও আমার মনে পড়ে তার মুখের রেখা, তার শরীর। আশ্চর্য সেইসব দিন ও আশ্চর্য সেইসব রাত, যখন সমুদ্র গান গাইতো, সৈকতে ও পাহাড়ের ছায়ায় আমি দেখতাম তার সুন্দর ও সাহসী চোখদুটো, তার কালো ও সরল ভুরুদুটো, তার নাম যা নিঃসন্দেহে 'কামেহামেহা'র নাকের মত এবং তার মুখের সেই বাঁক. যা না ভালোবেসে পারা যায় না, মার্থা পৃথিবীতে কোনো পুরুষ হাওয়াইয়ান্ পুরুষের মতো সুন্দর নয়।

এবং তার শরীর। সে ছিল অ্যাথলীটের রাজা। মাথায় মানে না মানা দুষ্টু চুল থেকে ইস্পাতের মত শক্ত গোড়ালি অবধি—সে ছিল পুরুষ। সেদিন কে যেন বলছিল, ওয়াইল্ডারদের এক নাতিকে হাভার্ড য়ুনিভার্সিটিতে প্রিন্স বলে ডাকা হয়। ওরা আমার লিলোলিলোকে দেখলে কি বলতো?

তুমি—তুমি তো সব বুঝতেই পারছো? ঘোড়ায় চড়ে আমরা চলেছিলাম। খুসীতে

ভরা মন। তারপর আগ্নেয়গিরি লাভার তৈরী পথ বেয়ে কি হলো। সাঁতার কাটা, মাছ ধরা, ভোজ ও নারকেলবীথির ছায়ায় তপ্ত বালির ওপর শোয়া। তারপর পুওয়াওরা। আরও শূয়োর মারা, বুনো ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই, তৃণভূমিতে বুনো ভেড়ার মাংস খাওয়া। তারপর কোনা, কৈলুয়ার রাজার প্রাসাদ, কিউয়াইয়ে সাঁতার কাটা তারপরে কীয়ালাকেকুয়া উপসাগর, নাপপু ও হোনাউনাউ। সব জায়গার লোকে আসছে। উপহার দিচ্ছে ফলফুল, মাছ, শূয়োর। ভালোবাসছে, গান গাইছে। প্রিন্সদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। পুরোনো দিনের হাওয়াইয়ান্ ভাষায় গান শোনাচ্ছে ওরা।

তুমি তো জানো, মার্থা বোন, আমরা হাওয়ার্থরা স্বভাবে কি রকম! পঞ্চাশ বছর আগে কেমন ছিলাম আমরা। প্রিন্স লিলোলিলো ছিল আশ্চর্য পুরুষ। আমি কি ঝুঁকি নিতে ভয় পাইনি। কেননা ভবিষ্যৎ বলতে কি ছিল আমার? সেই ঠাণ্ডা, ধূসর নাহালা। আমার কোন সংশয় ছিল না, কোন আশা ছিল না। সে আমলে ডিভোর্স হত না। জর্জ ক্যাসনারের স্ত্রী কখনও হাওয়াইয়ের রাণী হতে পারে না। যদি রবার্ট কাকার আশা অনুযায়ী বিপ্লব হত, তাহলেও নয়। যদি লিলোলিলো নিজে রাজা হত, তাহলেও নয়। আমি কখনও লিলোলিলোর রাণী হবার আশা করিনি। যা অসম্ভব তা সম্ভব হয় না। আমি অসম্ভবের আশা করিনি।

তখন চারপাশে ছিল ভালোবাসার পরিবেশ। এবং ভালাবাসা জানতো লিলোলিলো। সে আমায় মাথায় পড়াতো ফুলের স্তবক। আমার জন্য তার রানাররা মানার গোলাপবাগান থেকে তুলে আনতো লিওপোলিটান প্রবালের ছোট্ট লাল কুঁড়ির মত নিশিতে ভেজা তাজা গোলাপ, এবং আমি বসে থাকতাম প্রিন্সের 'মাকালোয়া' মাদুরে, যেখানে আর কেউ বসতো না। খাওয়ার আগে প্রিন্স যে পাত্রে গরম জলে হাত ধুতো, সেখানে ভাসতো ফুলের সুগন্ধি পাপড়ি, সেই পাওয়াই হোলোই-এ আমার আঙুল ছোঁয়াতে হতো; ওর 'পা পাকাই'-এর পান থেকে তুলতে হত নুন, মশলা, লিমু ও কুকুই বাদামের গুঁড়ো; কৌ কাঠে তৈরী ওর সসের পাত্র, যা থেকে খেতেন হয়তো মহান্ কামেহামেহা তখনি কোন দীর্ঘ যাত্রাপথে যেতে যেতে, তাতেও হাত দিতাম আমি। বিশেষ কোন খাদ্য-পানীয়, যা শুধু প্রিন্স ও প্রিন্সেসের জন্যে, তারও অংশ নিতে হতো আমাকে। তার নেলু, এক্, পালু বা আলালা। তার পরিচারকেরা আমার কথা শুনতো। সে ছিল আমার। ফুলে ঢাকা আমার চুল থেকে সুখ আমার পা অবধি সবকিছু সে ভালোবাসতো।

যেন একটা জীবন দুটো সপ্তাহের মধ্যে সংকুচিত হয়ে এসেছিল। ফুল একবারই ফোটে। আমিও ফুটে উঠেছিলাম সেই একবার—লিলোলিলো আমার পাশে, হিলোর পিঠে সওয়ার আমি, হাওয়াইয়ের রাণী নই, কিন্তু ভালোবাসার এবং লিলোলিলোর

মনের রাণী। সে বলতো, তুমি ঘোড়ার কালো পিঠে রঙ ও সৌন্দর্য্যের এক বুদ্বুদ, তুমি আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের ধোঁয়াওঠা বুকে ঝরে-পরা শিশিরকণা, তুমি মেঘের বুকে রামধনু...

সে যা কিছু বলতো, তার আড়ালে ছিল ভালোবাসার আগুন, রূপের তিয়াস। সে আমার উদ্দেশে গান লিখতো, গান গাইতো। সেইসব রাতে, যখন তারাভরা আকাশের নীচে লিলোলিলোর ম্যাকালোরা মাদুরে আমরা শুয়ে থাকতাম।

এমনি করেই এসে পৌঁছলাম কিলাউইয়ায়। স্বপ্ন শেষ হয়ে আসছিল। কালাপানার মিষ্টি জলের পুকুরে আমরা স্নান করলাম।

এবারে স্বপ্ন শেষ। এই সমাপ্তির কথা আমি বা প্রিন্স কেউ মুখে বলিনি। আমরা জানতাম রাজকীয় প্রমোদপোত অপেক্ষা করছে। হনলুলু থেকে ডাক এসেছে। রাজা পাগল হয়ে গেছে, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজকেরা ষড়যন্ত্র করছে, ফ্রান্সের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধছে। দুহপ্তা আগে ওরা যেমন হাসতে হাসতে ফুল ও গানের মাঝখানে কাওয়াইহীতে নেমেছিল, আজ তেমনি ওরা হাসতে হাসতে ঠাট্টা করতে করতে মজা ও আনন্দের মধ্যে প্রমোদপোতে উঠছে। বিদায়সংগীত গাইছে লিলোলিলোর এক পরিচালক। নোঙর তোলা হচ্ছে। বড় বড় ডিঙিতে উঠে আমরা দেখছি।

এইসব উত্তেজনার মধ্যে রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে সবাইকে বিদায় জানাচ্ছে লিলোলিলো। তার মাথায় আমার দেওয়া ফুলের স্তবক। আমার দিকে সোজা সরলভাবে তাকালো প্রিন্স, আমার দেওয়া সুন্দর পুষ্পস্তবকটা মাথা থেকে তুলে নিল, তারপর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জলে ফেলে দিল। আমি তার কথা শুনতে পেলাম না। শুধু ঠোঁট দুটো যেন বললো—'পাউ। এই শেষ।'

নাহালায় যেদিন ফিরে এলো আমার স্বামী, আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে গম্ভীরতায় আমাকে আলিঙ্গন করলো, নিয়ম মতো একটা চুমু খেলো, গম্ভীরভাবে আমার জিভ দেখলো, আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে, আমায় ক্যাস্টর অয়েল খাওয়ালো ও নরম বিছানায় শুতে বললো। নাহালার সেই ধূসর জীবন। ভোর চারটেয় ওঠে আমার স্বামী জর্জ, ভোর পাঁচটায় ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে যায়। সেই যবের মণ্ড, সস্তা কফি, সস্তা মাংস। সেই রান্না, ঘর মোছা, ভাঙা মেশিনে পোষাক সেলাই করা, রাত আটটা অবধি ওর আনডারউইয়্যার সেলাই করা, যখন ও ধার করা ম্যাগাজিন পড়ে ও অবশেষে তাড়াতাড়ি শুতে যাওয়া। কেরোসিনের খরচা বাঁচাতে হবে তো। এবং আমার স্বামী ঘড়িতে দম দেবে, আবহাওয়ার কথা লিখে রাখবে রোজনামচায়, প্রথমে ডান পায়ের জুতো খুলবে, তারপর বাঁ পায়ের জুতো...

না, আমার স্বামী যখন মারা যায়, আমি দুঃখ পাইনি। আমি যে খুশী হয়েছিলাম, তাও না। সুখ তো সেদিনই মরে গেছে, যেদিন হিলোয় প্রিন্স লিলোলিলো আমার দেওয়া পুষ্পস্তবক ছিঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। আমার স্বামী জর্জ মারা যাওয়ার ঠিক এক মাসের মধ্যে মারা যায় প্রিন্স লিলোলিলো। হিলোয় সেই বিদায়ের পর আর আমাদের দেখা হয়নি। তারপর...

প্রেমিক আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু আমি জন কাকার মত, প্রেম জীবনে একবারই আসে। কিলোহানার একটা ঘরে প্রিন্সেস নাওমির স্মৃতি জন কাকা জমিয়ে রেখেছিল। প্রিন্স লিলোলিলোর স্মৃতি আমি ধরে রেখেছি আমার বুকের আড়ালে। মার্থা বোন, সেই ঘরে আজ তোমাকেই প্রথম ঢুকতে দিলাম...।

মূল গল্প □ অন্ দ্য মাকালোয়া ম্যাট

এমিল জোলা

জন্ম ১৮৪০, মৃত্যু ১৯০২। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ঃ "ডক্টর পাসকাল" এবং খনি-শ্রমিকদের সামাজিক জীবনের নানা সমস্যার পটভূমিতে লেখা "জারমিন্যাল"। তাঁর "দ্য ড্রাম শপ' এবং 'নানা' উপন্যাস দুটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। 'মাদাম বোভারী'র রচয়িতা গুস্তাভ ফ্ল্যবেয়ার-এর 'রীয়্যালিজম' বা বাস্তববাদের ধারা অনুসরণ করে ফরাসী কথাসহিত্যে 'ন্যাচার্যালিজম' বা প্রকৃতিবাদ নামের ভাবধারার প্রবর্তন করে ছিলেন জোলা। ১৮৮০তে প্রকাশিত 'দ্য এক্সপেরিমেণ্ট্যাল নভেল' নামক নিবন্ধে প্রকৃতিবাদ সম্বন্ধে জোলা বলেছেন, লেখকের কল্পনাশক্তি, আদর্শবাদ এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের বদলে বাস্তবকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে বৈজ্ঞানিক ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উত্তরাধিকার, পরিবেশ, মনস্তত্ব ও সমাজতত্ত্বের পটভূমিতে উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশ ও উত্তরণ দেখানোই এই সাহিত্য আন্দোলনের লক্ষ্য। কিন্তু জোলা তার শ্রেষ্ঠ রচনায় নিজের সাহিত্য-তত্ত্বকে অতিক্রম করেছিলেন এবং বস্তুবাদী যান্ত্রিকতার আড়ালে তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে এক কবি-হৃদয়ের আর্তি। শেষ জীবনে 'দ্রোফু মামলায়' দ্রেফুর সমর্থনে জোলার বক্তব্য তাঁকে, ফ্রান্সের জাতীয় বীরের মর্যাদা দেয় এবং বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী কথাসাহিত্যক আনাতোল ফ্রাঁসের মতে সেই মুহূর্তে এমিল জোলা ছিলেন 'মানবজাতির বিবেকের মূর্ত প্রতিচ্ছবি।' ১৮৮১তে প্রকাশিত এমিল জোলার শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্পটি সংকলনের পরিসরের প্রয়োজনে সামান্য সংক্ষেপীকরণের জন্য আমরা মার্জনা চাইছি।



অশ্রু যার নিয়তি

এমিল জোলা

পাহাড়ের ওপরে তৈরী হয়েছে ছোট্ট সহর 'পি—'। পুরোনো সহরের দেয়ালের বাইরের উঁচু দুই পারের মাঝখানে বয়ে গেছে পাহাড়ী নদীর শীর্ণ ও গভীর জলরেখা। নদীর নাম 'শাঁতেইক্ল্যের'। স্বচ্চ স্ফটিকজলের কুলুকুলু গানের জন্যেই নদীর এই নাম। ভেয়ারসেই থেকে কোন পথিক এলে নগরীর দক্ষিণের গেটে পৌঁছায়। একটি মাত্র খিলান-ওলা পাথরের সেতু বেয়ে সে নদী পার হয়। অন্যদিকে চওড়া, নীচু, গোল প্রাচীর। আশেপাশের বুড়োমানুষেরা সেখানে বসে থাকে। একটু এগোলে রী ব্যো সলী-র উৎরাই শেষ হয়েছে চৌমাথায়ঃ জলে-ক্ষয়ে-যাওয়া অনেক গোল নুড়িতে বাঁধানো প্লাস-দেই কীয়াতর ফেই-মেই-তে ঘাস গজিয়েছে, লনের মত সবুজ দেখায় চৌমাথাটা। প্রত্যেক আধঘণ্টা অন্তর কোন পথচারীর পায়ের শব্দ শুনে আস্তাবলের দরজার আড়াল থেকে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। এই নির্জন জায়গায় একটু উত্তেজনা দেখা দেয়, যখন দিনে দুবার বোর্ডিং হাউসে খেতে যায় সেনাবাহিনীর একদল অফিসার।

জীলিয়্যা মির্শঁ থাকে বাঁ-ধারের বাড়ীতে। দোতলার বড় ঘরটা সে ভাড়া নিয়েছে। বাড়ীর অন্যদিকে থাকে বাড়ীওলা। সুতরাং সিঁড়ি ও প্রবেশপথ একাই ব্যবহার করে জীলিয়্যা। নিম্ন-মধ্যবিত্ত অবিবাহিত পুরুষ, বয়স পঁচিশ একা থাকে। হুজুগপ্রবণ ও নঙর্থক তার জীবনের ধারা। ছোটবেলায় সে বাবা-মাকে হারিয়েছে। তার এক কাকা তাকে বোর্ডিং-স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। এমন কাকাও মারা গেছে। গত পাঁচ বছর শহরের পোষ্ট অফিসে কেরানীর চাকরী করছে জীলিয়্যাঁ। মাসে সে পনেরো'শ ফ্রাঁ মাইনে পায়। কখনো এর থেকে বেশী পাওয়ার আশা নেই। ওই মাইনেতেই সে পয়সা বাঁচায়। এর থেকে সুখী ও সম্পন্ন জীবন তার কল্পনায় আসেনা। তার

চেহারাটা দীঘল শক্ত-সমর্থ। নিজের মস্ত বড় হাতদুটো নিয়ে তার লজ্জা হয়। তার মনে হয়, সে কুৎসিৎ, কদাকার। তার চৌকোণা মাথাটা দেখলে মনে হয়, কোনো ভাস্কর অযত্নের সঙ্গে কাজ শুরু করে কাজটা অসমাপ্ত রেখেছে। যুবতী মেয়েদের সঙ্গে মিশতেও তার লজ্জা। একদিন লণ্ড্রিতে কাজ করে এমন একজন যুবতী তাকে বলেছিল, সে দেখতে অতো খারাপ নয়। শুনে আরও ঘাবড়ে গিয়েছিল জীলিয়্যাঁ। নিজেকে কুতসিৎ, কদাকার ভাবে বলেই জীলিয়্যাঁর নিজের সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক আছে এবং সবার দৃষ্টির আড়ালে অখ্যাত, নগণ্য হয়ে থাকার রুগ্ন একটা বাসনা তাকে ঘিরে আছে। তার বন্ধু নেই, প্রেমিকা নেই। তার অভ্যাসগুলো খৃষ্টান সন্ন্যাসীর মত। হয়তো এইভাবেই সে একদিন বুড়ো হবে। রোজ সকালে সে অফিসে যায়, আগের দিন যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে কাজ শুরু করে, লাঞ্চে একটা রোল খায়, আবার সারাদিন কেরাণীর কাজ করে, বাড়ী ফেরে, ডিনার খায়, শুতে যায়। পরের দিন সূর্য উঠলে আবার একই রকম একটা দিন। কখনও কখনও সান্ধ্যভোজ সেরে সে নদীর সেতুর ওপর বসে পা দোলায়। নীচে বয়ে যায় নদীর রূপোলী জলধারা। নদীর দুধারে উইলো গাছের সারি। আকাশ থেকে নেমেছে গোধুলির ধূসর ছাই-রং আলো। জীলিয়্যাঁ সম্মোহিতের মত দেখে। সে ভাবে, নদীও তার মতো সুখী। একই শ্যাওলার বুক ছুঁয়ে একই শান্ত সঙ্গীত গেয়ে নদী চিরদিন বয়ে যায়। সপ্তাহ শেষের ছুটিতে একা একা মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে সে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে। নক্সা খোদাইয়ের কাজ করে, এমন একজন বোবা-কালা বন্ধুর সঙ্গে সে কাফেতে বসে দাবা খেলে।

সন্ধ্যাবেলা কোন মেয়ের সঙ্গে জীলিয়্যাঁকে বেড়াতে কেউ কখনও দেখেনি। ফ্যাক্টরীর মেয়েগুলো বেহায়া, বেশ্যার মত। কিন্তু ওরা খিলখিল হেসে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলে জীলিয়্যাঁ ভাবতো, মেয়েরা তাকে ঠাট্টা করছে। ওরাও হাল ছেড়ে দিয়েছিল। সহরের আর সবাই ভাবতো, লোকটা বোবা। কেউ কেউ আবার বলতো, এই ধরণের যুবক যারা একা থাকে, তাদের বিশ্বাস করা যায় না।

জীলিয়্যাঁ-র স্বর্গ তার নিজের ঘর। সেখানে সে নিরাপদ। মস্ত বড় ঘর। গোল টেবিল, দুটো চেয়ার, একটা আর্ম-চেয়ার। তবু গা ছড়ানোর জায়গা আছে। বোর্ডিংহাউসের বুড়ী তার জ্ঞান বাড়াবার জন্যে তাকে অনেক উপন্যাস পড়তে দেয়। উপন্যাসের প্লটের মাথামুণ্ডু সে বুঝতে পারে না। সে ছবি আঁকে। একটাই ছবি। একটা মেয়ে-মানুষের প্রোফাইল, কড়া চাউনি, চুলের মাঝখানে সিঁথি, খোঁপায় মুক্তো গোঁজা।

একটাই সখ লোকটার। বাঁশী বাজানো। হলুদ রঙের কাঠের তৈরী পুরোনো একটা বাঁশী কিনে জানালা দরজা বন্ধ করে একলা ঘরে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বইয়ের

দোকান থেকে কেনা বই পড়ে বাঁশী বাজাতে শিখেছে জীলিয়্যাঁ। এখন সে রাতে সাহস করে জানলা খোলে। পুরোনো, শ্লথগতি, গ্রাম্য, সরল সুরগুলোই সে বাজাতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেমের গানের সুর। গ্রীষ্মকালের রাতে প্রতিবেশীরা ঘুমোলে মোমের আলোয় সে বাঁশী বাজায়। মনে হয়, যেন কোন প্রেমিকের কাঁপা-কাঁপা নীচু গলার স্বর রাতের নির্জনতায় সেইসব গোপন কথা বলছে, যা দিনের আলোয় কখনও বলা যায় না। রাতের পথে কোন পথিক ভাবে, কোথা থেকে ভেসে আসছে এই সুর? দূর থেকে ভেসে আসা বুলবুলের গানের মত। যেন অন্ধকারের আপন সংগীত, যা রাতের নৈঃশব্দের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

জীলিয়্যাঁর ভয়, প্রতিবেশীরা হয়তো আপত্তি করবে। প্রতিবেশীদের মধ্যে উকীল মসিয় সাভুরনি এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিস-ইনস্পেক্টর মসিয়ঁ পিদ্যু রাত নটার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু এই চৌমাথার উল্টো দিকে এক অভিজাত পরিবারের প্রাসাদ। মারসানেই-দের প্রাসাদ দেখতে ধূসর নিঃশব্দ কোন মঠের মত। পাথরের তৈরী সিঁড়ির পাঁচটা ধাপ উঠে গেছে প্রকাণ্ড-সব-গজাল বসানো মস্ত বড় দরজার দিকে। দশটা জানলার শাটার নিয়মিত খোলা ও বন্ধ করা হয়। কিন্তু ভারী পর্দার জন্যে কিছুই দেখা যায় না। পর্দা সবসময় টানা থাকে। জীলিয়্যার ধারণা, ওরা সামান্যতম আপত্তি জানালে তার বাঁশী বাজানো বন্ধ হয়ে যাবে। মারসানেই পরিবারের বিরাট প্রাসাদের দিকে প্রায়ই তাকিয়া থাকে জীলিয়্যা। এদিকের গেটটা সবসময় বন্ধ থাকে রী স্যাঁ-আন্-এর ওপর প্রাসাদের অন্য একটা গেট আছে। সেটাই ব্যবহার করে ওই অভিজাত পরিবারের লোকজন। ওদের ঝি বা চাকর যখন সকাল সন্ধ্যা জানলার শাটার খোলে ও বন্ধ করে, তার হাতটা শুধু দেখা যায়। বাদাম গাছগুলোর শাখাগুলো এতোই নিবিড় যে বাগানে কেউ ঘোরাফেরা করলেও দেখা যায় না। প্রকাণ্ড বাড়ীটা যেন কবরখানার বিষাদ ভাবনাভরা নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মহান ও বিষণ্ণ একটা কবর। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই অভিজাত পরিবারের অহংকারী ও নিঃশব্দ অস্তিত্বের কথা ভাবলে জীলিয়্যার ভয় বাড়ে। তাহলে ঐশ্বর্য্যের এই কি তাৎপর্য্য? শূন্য ও বিশাল এক গীর্জার শান্ত শীতল আবহাওয়ার মত ভয়াল এক শান্তি? রাতে মোমবাতি নিভিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এই অভিজাত পরিবারের প্রাসাদের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা রহস্য জানতে চায় জীলিয়্যা। সাহস করে বাঁশী বাজায় জীলিয়্যা। সামনের শূন্য প্রাসাদ থেকে বাঁশীর সুরের প্রতিধ্বনি ভেসে আসে। বাগানের অন্ধকারে মিশে যায় সুরের মূর্ছনা। সেখানে নৈঃশব্দ্য ভাঙতে পাখীর ডানার শব্দের মত কোন মৃদু আলোড়নও জাগেনা। যেন 'ঘুমন্ত সুন্দরী'র দুর্গের সামনে সুর ছড়াচ্ছে পুরোনো হলুদ বাঁশীটা।

এক রবিবারে গির্জার বাইরে মসিয়ঁ ও মাদাম মারসানেই-কে চিনিয়ে দিয়েছিল

জীলিয়্যার এক বন্ধু। বুড়ো-বুড়ী, শান্ত, গম্ভীর, লোকে অভিবাদন জানালে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে প্রতি-অভিবাদন জানাচ্চে ওরা। জীলিয়্যাঁর বন্ধু বললো, ওদের একমাত্র মেয়ে মাদমোয়াজেল থেরেজ দা মারসানেই এখন কনভেন্ট-বোর্ডিং-স্কুলে পড়ছে, তার সৎ ভাই কলবেইল উকীল মসিয়ঁ সাভুরনিঁর অফিসে কেরানীর চাকরি করে। কর্লঁবেইলের বয়স প্রায় কুড়ি, চোখের দৃষ্টি ধারালো, মুখের ভাবে বিদ্রূপ মেশানো এবং জীলিয়্যার লাজুক স্বভাবের জন্যে তাকে প্রায়ই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে এই কলঁবেইল। একবার ঘুঁষোঘুষিও হয়েছে। উকীলের কেরানী ঘুঁষি মেরে পোষ্ট-অফিসের কেরানীর চোখদুটো ফুলিয়ে দিয়েছিল। থেরেজ ও কলঁবেইল সম্বন্ধে সব তথ্য শোনার পর এখন রাতে আরও আস্তে বাঁশী বাজার জীলিয়্যাঁ।

ওই ভাড়া-বাড়ীতে পাঁচবছর থাকার পর জুলাই মাসের এক সন্ধ্যায় এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যা জীলিয়্যাঁর সমস্ত জীবনটা বদলে দিলো। গ্রীষ্মের তারাজ্বলা রাতে খোলা জানলার ধারে অন্ধকারে খুব আস্তে বাঁশী বাজাচ্ছিল জীলিয়্যাঁ। হঠাৎ সামনের সেই অভিজাত পরিবারের প্রাসাদের একটা জানলা হাট হয়ে খুলে গেল। আলোয় দেখা গেল, কার্ণিসের ওপর ঝুঁকে মাথা তুলে যেন বাঁশীর শব্দ শোনার চেষ্টা করছে এক তন্বী রূপসী যুবতী। জীলিয়্যাঁ বাঁশী বাজানো বন্ধ করে। যুবতীর সুরেলা হাল্কা গলার স্বর নৈঃশব্দ ভেঙে বলে—

'শুনেছো, ফ্রাঁসোয়া, যেন গানের সুর'—ভেতর থেকে রুক্ষ গলার মেয়েলী স্বর বলে—

'বোধহয় বুলবুল গান গাইছিল। জানলা বন্ধ করো। নইলে বাইরের মশা আর পোকা ভেতরে ঢুকবে।'

জানলা বন্ধ হয়ে যায়। জীলিয়্যাঁ কেঁপে ওঠে। ওই প্রাণহীন কালো দেয়ালে চকিতের জন্য দেখা দিয়েছিল আলো। সেই আলোয় চোখ ঝলসে গেছে জীলিয়্যাঁর।

এক ঘণ্টা পরে সে আবার আস্তে, খুব আস্তে বাঁশী বাজাতে শুরু করে। যুবতী ভেবেছে, বাদাম গাছের ডালে কোন বুলবুল গান গাইছে। কথাটা ভেবে জীলিয়্যাঁ হাসে।

॥ দুই ॥

পরের দিন পোষ্টঅফিসে খবর শোনা গেল। মাদমোয়াজেল্ থেরেজ কনভেন্ট-স্কুল থেকে ফিরেছে। জীলিয়্যাঁ বিব্রত। থেরেজ-এর জন্যে তার বাঁশী বাজানোর অভ্যাসটা হয়তো বদলাতে হবে। এখন থেকে কিভাবে সে রাতে বাঁশী বাজাবে? সামনের ওই প্রাসাদের জানলা যে কোন সময় খুলে যেতে পারে। অভিজাত পরিবারের ওই রূপসী বিদুষী যুবতী নিশ্চয়ই সঙ্গীত সম্বন্ধে পড়াশুনো করেছে।

তার উপস্থিতিতে কি করে বাঁশী বাজাবে জীলিয়্যাঁ? থেরেজের ওপর তার রাগ হয়।

এখন চোরের মত ঘরে ঢোকে জীলিয়্যাঁ। সে মোমের আলো জ্বালায় না। জানলা খোলে না। রোজ দশটা নাগাদ প্রাসাদের শাটারের আড়ালে আলোর রেখা দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে বাড়ীটা আগের মতই অন্ধকারে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু জীলিয়্যাঁর অভ্যস্ত চোখে পরিবর্তনটা ধরা পড়ে। কখনো জানলা থেকে জানলায় শাটারের আড়ালে ঘোরে আলোয় রেখা। কখনো পর্দা সরে দেখা যায় মস্ত একটা ঘর। কখনও বাগানে হাল্কা পায়ের শব্দ। কখনো বা পিয়ানো ও গানের শব্দ।

যদিও কথাটা সে নিজে স্বীকার করেনা, আসলে থেরেজকে আবার দেখতে চায় জীলিয়্যাঁ। কল্পনায় সে দেখে—গোলাপী গাল, বিদ্রূপ-মেশানো ভঙ্গী, উজ্জ্বল দুটি চোখ। তারপর একদিন সকালে নিজের ঘরের জানলা বন্ধ করার সময় সে দেখে, নিজের ঘরে একলা দাঁড়িয়ে আছে থেরেজ। কি যেন ভাবছে এই যুবতী। দীঘল, ফর্সা, সুন্দর, সুশ্রী চেহারা। মুখের হাঁটা একটু বড়। ঠোঁটদুটো টকটকে লাল। কালো চোখদুটোয় হাসিখুসী ভাব নেই। নিষ্ঠুর এক সম্রাজ্ঞীর মত দেখাচ্ছে রূপসীকে। জানলার কাছে এলেও জীলিয়্যাঁকে যেন দেখেও দেখলোনা থেরেজ। সে মুখ ঘোরালো। যুবতীর ঘাড়ের পেশীর সবল, সুন্দর, ছন্দোময় গতি দেখে নিজেকে শিশুর মত দুর্বল মনে হয় জীলিয়্যাঁর। সে আতংকিত হয়, ভয় পায়। তার অস্তিত্বের গভীরে ছড়ায় এক ধরণের বিষাদ। এই যে অভিজাত পরিবারের গম্ভীর ও রূপসী যুবতী তার এতো কাছে বাস করেও তার দিকে তাকায় না, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সে অচেতন—ওর কথা ভাবলে তার ভয় হয়। হয়তো ওকে দেখলে বিদ্রূপ করবে ওই যুবতী। তার লাজুক স্বভাবের দরুণ তার ধারণা হয়, ওই রূপসী যুবতী হয়তো তার প্রতিটি গতিবিধি দেখছে। সে চুপিচুপি নিজের ঘরে ঢোকে। নিজের ঘরের মধ্যেও সে এখন বেশী ঘোরাফেরা করেনা। অথচ মাসখানে কেটে গেলেও যুবতী যখন তাকে অবহেলা করে, সে দুঃখ পায়। তার মনে প্রশ্ন জাগে, কেন ও আমার দিকে তাকায়না? যুবতীব কালো চোখ দেখে জনশূন্য চৌমাথার দৃশ্য। কিন্তু উল্টোদিকের বাড়ীতে জীলিয়্যাঁর সন্ত্রস্ত অস্তিত্বের কথা থেরেজ জানেনা। যুবতী তাকে দেখছে ভাবলে তার ভয় হয়। অথচ যুবতীর দৃষ্টি তাকে দেখুক, এই কামনা তার শরীরে কাঁপন ধরায়। তার অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তে জুড়ে আছে ওই যুবতী।

সকালে থেরেজকে দেখবে বলে নিজের নিয়মানুবর্তী স্বভাব সত্ত্বেও কাজের কথা ভুলে যায় জীলিয়্যাঁ। যুবতীর ফর্সা ফ্যাকাশে মুখ এবং ওর গাঢ় লাল ঠোঁট দুটো তার ভয় জাগায়। তবু এই ভয়ে যেন এক আনন্দ মিশে আছে। পর্দার আড়াল থেকে সে যুবতীকে দেখে, ভয়ে তার পা দুটো কাঁপে। সে স্বপ্ন দেখে, যুবতী হঠাৎ তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

তারপর জীলিয়াঁ্যার মনে হল, বাঁশীর সুরে সে যুবতীকে তার ভালোবাসা জানাবে। গরমের দিনে সন্ধ্যাবেলা সে আবার বাঁশী বাজায়। অন্ধকারে নিজের ঘরের জানলা খুলে সে বাঁশী বাজায়। পল্লীগীতির প্রাচীন, সরল, মিষ্টি সুর বাঁশীতে বাজে। ছোট মেয়েরা যখন গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে, সেই নাচ যেমন মিষ্টি, সরল, নির্দোষ, তেমনি সুর। বাঁশীর সুর কখনও কাঁপে, দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে। কখনও বা পুরোনো দিনের প্রেমিকা পল্লীবালাদের ছড়ানো স্কার্টের মত সরল ছন্দে বেজে ওঠে বাঁশী। যে রাতে আকাশে চাঁদ ওঠে না, চৌমাথা অন্ধকার থাকে, বাঁশীর সুর কোথা থেকে আসছে ঘুমন্ত বাড়ীগুলোর পটভূমিতে যখন বোঝা যায়না, তখন মনে হয় এই সুর রাতপাখীদের ডানার শব্দের মত, তখনই বাঁশী বাজায় জীলিয়াঁ্যা।

প্রথম সন্ধ্যাতেই প্রাসাদের জানলা খুললো। শুতে যাওয়ার আগে সাদা রাত-পোষাক পরেছে থেরেজ। যে সুর ও প্রথমদিন বাড়ী ফিরে শুনেছে, সেই সুর আবার শুনে অবাক হয়ে জানলা খুলে ঝুঁকে দেখে থেরেজ।

'শোনো, ফ্রাঁসোয়া, এ তো পাখীর গান নয়—'

বুড়ী ঝিকে দেখা যায়না, তার ছায়াটা শুধু দেখা যায়। সে বলছে—

'হয়তো দূরের কোন বাড়ীতে কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, বাঁশীর সুর যেন অনেক দূর থেকে আসছে।'

তারপর প্রতি সন্ধ্যায় আরো জোরে বাঁশী বাজায় জীলিয়াঁ্যা। শব্দের স্রোত দুলে ওঠে। ঠোঁটের উত্তেজনা ছুঁয়ে যায় পুরোনো বাঁশীর হলুদ কাঠ। প্রতি সন্ধ্যায় বাঁশীর শব্দ শুনে অবাক হয় থেরেজ। বাঁশী যেন স্ফটিকের মত শব্দের মূর্ছনা জাগায়। অন্ধকারে জীলিয়াঁ্যার সাহস জাগে। সুরের আকর্ষণে আকৃষ্টা হবে যুবতী, তার মনে আশা জাগে। জানলা থেকে ঝুঁকে দেখছে থেরেজ। তাকে মুগ্ধ মনে হচ্ছে।

'ভেতরে চলো'। বুড়ী ঝি বলে।

'আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তুমি দুঃস্বপ্ন দেখবে।'

সারারাত ঘুমুতে পারেনা জীলিয়াঁ্যা। সে কল্পনা করে, থেরেজ নিশ্চয়ই বুঝেছে, কে বাঁশী বাজাচ্ছে। আবেগতপ্ত পুরুষ-শরীর বিছানায় শুয়ে আছে। নিজের পরিচয় জানানো উচিত কিনা সে বুঝতে পারছেনা। এভাবে লুকিয়ে থাকা হয়তো হাস্যস্কর। তবু নিজেকে যুবতীর দৃষ্টির আলোয় আনতে তার সাহস হয় না। সকাল ছটায় জানলায় দাঁড়িয়ে বাঁশীটা খাপে ভরছিল জীলিয়াঁ্যা। সচরাচর সকাল আটটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠে না থেরেজ। কিন্তু আজ হঠাৎ থেরেজ-এর প্রাসাদের জানলা খুললো। পরণে ড্রেসিং-গাউন, মাথার চুল এলোমেলো—থেরেজ জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলো জীলিয়াঁ্যাকে। সম্রাজ্ঞীর স্থির দৃষ্টি রূপসীর চোখে। বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে জীলিয়্যা। ওর ভারী শরীর, কুৎসিৎ, কদাকার অথচ লাজুক এক দৈত্যের মত।

থেরেজ দেখে, কালরাতের সেই উৎসাহিনী শ্রোতী নয়। এক রমণীর চোখে উদ্ধত দৃষ্টি, রং ফ্যাকাসে, চোখদুটো কালো ও ঠোঁট দুটো টকটকে লাল।

জীলিয়্যার হাঁটুদুটো দুর্বল মনে হয়, সে আর্মচেয়ারে বসে, আপন মনে বলে—'ও আমায় পছন্দ করে না। আমি ওকে ভালোবাসি।.....আমি মরে যাবো।'

সে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কেন সে যুবতীর দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালো? সে কুৎসিৎ, কদাকার, তার উচিত সুন্দরী যুবতীর দৃষ্টির আড়ালে থাকা। সে নিজেকে, নিজের কদাকার শরীরকে অভিশাপ দেয়। তার উচিত ছিল রাতের আঁধারে বাঁশী বাজানো। সেইসব রাতপাখীদের মত আঁধার নামলে যারা গান গেয়ে মানুষের হৃদয় জয় করে, কিন্তু দিনের আলোয় যাদের মানুষ দেখতে পায় না। যদি সে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতো, থেরেজের কাছে সে হত রহস্যময় প্রেমের বার্তা-বয়ে-আনা দূরাগত এক প্রাচীন সংগীতের সুর। থেরেজের কাছে সে হত দূরের এক রহস্যময় প্রেমিক রাজপুত্র, যে তার জানলার নীচে ভালোবাসার সুরে বাঁশী বাজায়। কিন্তু নির্বোধ জীলিয়্যা দিনের আলোয় দেখা দিয়ে সেই সম্মোহ ভেঙে দিয়েছে। যুবতী জেনেছে, জোয়াল-কাঁধে বলদের মতই কদাকার জীলিয়্যা। এখন তার বাঁশীর সুরও যুবতীর ভালো লাগবে না। •

বাস্তবেও তাই ঘটলো। রাতের উষ্ণ বাতাসে ভাসে সুগন্ধি ফলের, বৃক্ষলতার গন্ধ। বাঁশীতে প্রেমের সুর বৃথাই বাজায় জীলিয়্যা। থেরেজ শোনেনা, যেন তার কানে আর পৌঁছোয় না বাঁশীর সুর। একদিন সে শুনলো, থেরেজ বলছে—'বেসুরো বাঁশী বাজলে শুনতে এতো বিশ্রী লাগে।'

হতাশায় বাঁশীটা ড্রয়ারে রেখে দিল জীলিয়্যা। সেদিন থেকে সে আর বাঁশী বাজাতো না।

কর্লাঁবেইলও জীলিয়্যাকে ঠাট্টা করে। উকীলের অফিসে যাবার সময় জীলিয়্যাকে বাঁশী বাজাতে শুনে সে বিদ্রূপের হাসি হাসে। সে জানে, থেরেজ-এর প্রাসাদে কর্লাঁবেইলের অবাধ যাওয়া-আসা। ও আসলে থেরেজ-এর সৎ ভাই নয়। ওর মা ফ্রাঁসোয়া দীর্ঘদিন ওই অভিজাত পরিবারে ঝি-র কাজ করেছে, থেরেজ-কে বুকের দুধ খাইয়েছে এবং এখন ও থেরেজ-এর ফাইফরমাস খাটে। অভিজাত যুবতী থেরেজ এবং চাষীর ছেলে কর্লাঁবেইল একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। এখনও সেই অন্তরঙ্গতার রেশ বজায় থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তবুও কর্লাঁবেইলকে ঈর্ষা করে জীলিয়্যা। ও খেয়াল করেছে, তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর চেহারাটা কুৎসিৎ নয়। বেড়ালের মত গোল মাথা, তবুও সুন্দর। সৌন্দর্য্য এবং শয়তানী মেশানো। ওর চোখদুটো সবুজ, নরম গোল চিবুকে সুন্দর কোঁকড়ানো দাড়ি। সেবারের মত শহরের পুরোনো দেয়ালের কাছে আবার মারামারি বাঁধলে থেরেজ-এর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার

খেসারৎ দিতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাধ্য করতো জীলিয়্যা।

এক বছর কেটে যায়। জীলিয়া খুবই অসুখী। থেরেজ ছাড়া তার অস্তিত্বের আর কোনও তাৎপর্য্য নেই। তার হৃদয় ওই অনুভূতিহীন শীতল প্রাসাদে, যার ছায়ায় তার লাজুক ভাব ও ভালোবাসা তাকে শীর্ণ করে রেখেছে। মাসের পর মাস ধরে সে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে। ওই প্রাসাদের অন্তরালের রহস্যময় জীবন সম্বন্ধে সে আজও কিছু জানে না। অস্পষ্ট শব্দ এবং দৃশ্য তার অপ্রতিভ ভাব আরও বাড়িয়ে দেয়। ওখানে কি উৎসব হচ্ছে? না মৃতের জন্যে শোক প্রকাশ করা হচ্ছে? থেরেজ এবং কর্লবেইল পরস্পরকে আনন্দ দিচ্ছে। বাদাম গাছের ছায়ায় হাঁটছে যুবতী। ড্যান্সফ্লোরে নৃত্যসঙ্গী পুরুষের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে থেরেজ। অথবা কখনও দুঃখে অভিভূত হয়ে বিষণ্ণ ঘরে একলা কাঁদছে থেরেজ। এইসব কল্পনা করে জীলিয়্যা। ওই রহস্যময় দেয়ালে থেরেজ-এর ঘরের জানলা দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, সেইটুকুই তাব সম্বল। জানলাটা খোলা থাকলে সে আনন্দ পায়। থেরেজ ঘরে না থাকলে সে উঁকি মেরে দেখে, ওর ঘরের কোণগুলো। দুমাস পরে সে আবিষ্কার করেছে থেরেজের রেশমী লাল পর্দাঘেরা বিছানাটা ঘরের বাঁদিকে। আরও দুমাস পরে সে জেনেছে, বিছানার কাছে চেস্ট অফ ড্রয়ারস-এর ওপরে পোর্সেলিনে বাঁধানো আয়না আছে এবং শ্বেতপাথরের তৈরী চুল্লীটা জানলার মুখোমুখি। থেরেজ-এর ওই ঘরটা তার স্বপ্ন, তার স্বর্গ।

তারপর একদিন শরতের সন্ধ্যাবেলা থেরেজ-এর ঘরের জানলাটা বিশ্রী কর্কশ শব্দ তুলে আচমকা বন্ধ হয়। হঠাৎ আবার সশব্দে খুলে গেল থেরেজের ঘরের জানলাব দুটো কপাট।

থেরেজকে দেখা গেল। ফ্যাকাসে, বড় বড় চোখ, এলোচুল কাঁধের ওপর পড়েছে। জানলার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রক্তলাল দুই ঠোঁটে দুহাতের আঙ্গুল ছুঁয়ে চুম্বনের ভঙ্গিমা দেখায় থেরেজ। স্তম্ভিত জীলিয়্যা বুঝতে পারেনা, এই চুম্বন তার উদ্দেশ্যে কিনা। থেরেজ ভাবে, জীলিয়্যা পিছিয়ে যাচ্ছে। থেরেজ জানলা দিয়ে আরও ঝুঁকে রক্তিম ঠোঁটে আঙুল ছুইয়ে চুম্বনের ভঙ্গিমা জানায়। দুবার, তিনবার। স্তম্ভিত, অভিভূত জীলিয়্যা দেখে, গোধুলি আলোয় জানলার পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে থেরেজকে। চৌমাথার চারপাশে চকিত দৃষ্টি হেনে থেরেজ চাপা গলায় বলে—'এখানে এসো।'

জীলিয়্যা যায়। প্রথমে নীচের তলায় এবং তারপর সামনের প্রাসাদের সেই গেটের সামনে। অর্ধশতাব্দী বন্ধ থাকার পর এই গেটটা প্রথম খুললো ঃ যেন স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছে জীলিয়্যা। সিঁড়ি করিডর, ঘর। থেরেজ-এর সেই ঘর, যেখানে রেশমী লাল পর্দা ঝুলছে। দিনের আলো নিভে আসছে। জীলিয়্যার হাঁটু দুটো কাঁপছে।

থেরেজ সোজা হয়ে, হাত দুটো জোড় করে আছে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সে নিজের শরীরের কাঁপন থামিয়েছে। থেরেজ নীচু গলায় বলে, 'তুমি আমায় ভালোবাসো?'

'ওহ্, হ্যাঁ, হ্যাঁ—'

উদ্ধত ভঙ্গীতে ওর কথায় বাধা দিয়ে থেরেজ বলে 'আমি যদি এই শরীর তোমাকে দিই, তুমি আমার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত?'

উত্তর দিতে পারেনা জীলিয়্যা। থেরেজ-এর একটি চুম্বনের বিনিময়ে সে যাবজ্জীবন বন্দীদশা মেনে নিতে প্রস্তুত। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে থেরেজ, 'কথা দাও! শপথ করে বলো! আমি আমার কথা রাখবো, তুমি শপথ করে বলো—'

'শপথ করলাম....তুমি যা বলবে, তাই করবো।'

ঘরের হাওয়ায় সুগন্ধ ভাসে। অ্যালকোভ-এর পর্দা টানা। রেশমী লাল পর্দার আড়াল থেকে কুমারীর বিছানায় এসেছে নরম আধো-আলো। যে আলো জীলিয়্যার মনে ধর্মীয় উন্মাদনার মত আবেগ জানায়। এবং রুক্ষ হাতে পর্দা সরায় যুবতী থেরেজ। বিচানাটা এলোমেলো। চাদর একদিকে ঝুলে পড়েছে। বালিসটা মেঝেয়। কে যেন ওটা কামড়েছে, ছিঁড়ে ফেলেছে। এবং লেসলাগানো কোঁচকানো চাদরের ওপর শুয়ে আছে একটা মানুষের শরীর। তার পায়ে জুতো-মোজা নেই।

এমন স্বরে কথা বলে থেরেজ যেন কেউ ওর গলা টিপে ধরেছে—

'ও আমার প্রেমিক। আমি ওকে ধাক্কা দিয়েছিলাম, ও পরে গেল। তারপর কি হল, আমি জানিনা। ও মরে গেছে। ওর মৃতদেহটা এখান থেকে সরাতে হবে তোমাকে।'

॥ তিন ॥

থেরেজ যখন ছোট মেয়ে, তখন থেকেই কলবেইল-এর ওপর তর্জন-গর্জন করে নিজের কর্তৃত্ব ফলানো ওর অভ্যাস। কলবেইল থেরেজ-এর থেকে দুমাসের বড়। কলবেইল-এর মা ফ্রাঁসোয়া থেরেজকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছে। বোতলের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে তার নিজের ছেলে কলবেইল। কিছুটা ভৃত্য হিসেবে এবং কিছুটা থেরেজে-র খেলার সঙ্গী হিসেবে তখন থেকে প্রাসাদে ওর যাওয়া-আসা।

থেরেজ ছিল ভয়ংকর এক শিশু। অতিথিদের সামনে সে এতো সুন্দর ব্যবহার করতো, সবাই ভাবতো, কতো ভদ্র। কিন্তু একা থাকলে কখনো কখনো অদ্ভুত ব্যবহার করতো মেয়েটি। হঠাৎ চেঁচানো, অকারনে পা ঠোকা, আচমকা রেগে যাওয়া, পাগলামি করা, বাগানের রাস্তায় শুয়ে থাকা, মারধোর করলেও উঠতে না চাওয়া। ছোট মেয়েদের চোখ সচরাচর আয়নার মত, যার ভেতর দিয়ে তাদের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। কিন্তু থেরেজের চোখ দুটো যে বালির মত কালো

দুটি ক্ষুদ্র জলাশয়, যার গভীরে কোন কিছুই দেখা যায় না।

যখন ওর ছ'বছব বয়েস, তখন থেকেই কলবেইলের সঙ্গে বিশ্রী ব্যবহার কবে থেরেজ। কলবেইল দেখতে বেঁটেখাটো ও দুর্বল। বাদাম গাছের নীচে, ছায়া যেখানে ঘন, কলবেইলকে সেখানে নিয়ে যেয়ে ওর পিঠে চেপে বসতো থেরেজ। এক ঘণ্টা ঘোড়ার মত ছুটতে হতো কলবেইলকে এবং তার পিঠে সওয়ার থেরেজ জুতোর হিল দিয়ে চাপ দেয় কলবেইলের বুকে। থেরেজ কলবেইলকে ভয় দেখাতো, এ'ব্যাপারে বড়দের কিছু বললে সে কলবেইলকে আর প্রাসাদে ঢুকতে দেবেনা। এক ঘর লোকের চোখ এড়িয়ে কলবেইলকে লাথি মারে বা ওর হাতে পিন ফুটিয়ে দেয় থেরেজ। ওর কালো দু'চোখেব দিকে চেয়ে সম্মোহিতের মত চুপ করে থাকে কলবেইল। শহীদের মত সব সহ্য করে কলবেইল, কিন্তু মাঝে মাঝে তার বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা হয়। কলবেইল অপেক্ষা করে। এক দিন তারও দিন আসবে।

এদিকে থেরেজ-এর বাবা মারকুইস মেয়ের বিশ্রী মেজাজ দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন! থেরেজ-এর এক কাকা বিশৃঙ্খল জীবন কাটাতো এবং শহরের দূরের এলাকায় এক বেশ্যাবাড়ীতে সে খুন হয়। থেরেজ নাকি স্বভাবে ওর কাকার মত। থেরেজকে কনভেণ্ট-স্কুলে পাঠানো হল এই আশায় যে ওদের কড়া নিয়মানুনের দরুণ সামলে চলবে থেরেজ।

আঠারো বছর অবধি কনভেন্টে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলো যুবতী থেরেজ, ওব ধার্মিক ভাব, গির্জায় দীর্ঘ সময প্রার্থনা করা এবং ওর চার পাশে সরলতা ও শান্তির আবহ দেখে ওর বাবা-মা ভাবলো, থেবেজ সত্যিই বুঝি বদলে গেছে। থেরেজ-এর বিয়ে দেওয়া হবে বলে ডিনার পার্টিব আয়োজন করলেন মারকুইস ও তাঁর স্ত্রী। অভিজাত পরিবারের যুবকদের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হল। বাবা-মার ইচ্ছা অনুযায়ী পোষাক পরলো ও নাচলো থেরেজ। যে যুবকবা ওর প্রেমপ্রার্থী ছিল, তারা ওর শীতল ব্যবহার ও ফ্যাকাসে মুখ দেখে আতংকিত হল।

ইতিমধ্যে মারকুইসের সাহায্যে পড়াশোনা করেছে কলবেইল। সে এখন উকীলের অফিসে কেরাণীর চাকরী করছে। ফ্রাঁসোয়া ছেলেকে একদিন প্রাসাদে নিয়ে এলো। থেরেজ-এর ছোটবেলার ক্রীড়াসঙ্গী কলবেইল গানের স্বরলিপি, বই এবং ছবির অ্যালবাম নিয়ে প্রায়ই প্রাসাদে আসে। এখনও থেরেজ রাণী, কলবেইল তার ভৃত্য।

একদিন রাতে যখন গাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর, বাগানে হঠাৎ ছোটবেলার মতই লাফিয়ে কলবেইলের পিঠে উঠে ওকে ঘোড়ার মত ছুটতে বলে থেরেজ। থেরেজকে পিঠে নিয়ে ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে বাগানের যন্ত্রপাতি রাখার একটা শেডে ঢোকে কলবেইল। ওর নখের আঁচড় ও বেতের মার অগ্রাহ্য করে কলবেইল

খড়ের স্তূপের ওপর ফেলে দেয় থেরেজকে। থেরেজকে সে ধর্ষণ করে। এখন কলবেইলের প্রভু হওয়ার পালা এসেছে। কয়েকদিন পরে আবার একই ঘটনা ঘটে। খড়ের গাদায় থেরেজকে ফেলে ওর শরীরের স্বাদ নেয় কলবেইল। লোকের সামনে কলবেইলকে অবহেলা করে থেরেজ। কিন্তু বাগানের ছোট্ট শেডের চাবি থেরেজ দিয়েছে কলবেইলকে। প্রকাশ্য দিবালোকে জানলা বন্ধ করে ওরা শরীরে শরীর মেলায়। হিংস্র এবং মলিন এই প্রেম। ওরা পরস্পরকে গালাগালি দেয়, ঝগড়া করে, চেঁচামেচি করে। সেদিন সন্ধ্যায়...ডিনারের আগে এসেছিল কলবেইল। থেরেজের কোমর ধরে তুলতে চাইলো কলবেইল। থেরেজ হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসলো। ওকে কাছে টেনে এনে কলবেইল বললো—'তোমার গায়ের জোর আমার থেকে কম।' থেরেজ রেগে যায়, রাগে কেঁপে ওঠে। ধরাধরি জড়াজড়ি খেলাটা ক্রমশঃ আর খেলা থাকে না। জোরে ধাক্কা দিয়ে কলবেইলকে ফেলে দেয় থেরেজ। কলবেইলের মাথাটা চেস্ট অফ ড্রয়ার-এ ঠুকে যায় এবং তার চেতনাহীন দেহ মেঝেতে শুয়ে পড়ে। চুল ও স্কার্ট ঠিক করে পা দিয়ে কলবেইলকে খোঁচায় থেরেজ। কলবেইল ওঠে না। তার মুখ এখন মোমের মত সাদা, চোখ দুটো ঘসা কাঁচের মত এবং তার ঠোঁট বাঁকা! ডানদিকের রগে, যেখানে চেস্ট অফ ড্রয়ারস্-এর কোণে ধাক্কা লেগেছিল, সেখানে একটা ফুটো!

কলবেইল মরে গেছে! না, না, ওকে সে খুন করতে চায়নি! ওর বেডরুমে...খুন...ভাবা যায়না...

করিডরে কলবেইল-এর মা ফ্রাঁসোয়ার পায়ের শব্দ। ডিনার-পার্টির উদ্যোগ-আয়োজন চলছে। এখুনি হয়তো কেউ আসবে। মৃতদেহটা কোথায় লুকোবে থেরেজ? জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেবে? কিন্তু তাহলেও তো সবাই বুঝে যাবে...

সামনের বাড়ীর জানলায় সেই নির্বোধ যুবক, যে বাঁশী বাজিয়ে প্রেম নিবেদন করে।

থেরেজ-এর ঠোঁটে হাসি জাগে। প্রহরী কুকুরের মত বিশ্বস্ত এই যুবক তাকে ভালোবাসে। থেরেজ-এর জন্যে যে কোন অপরাধ করতে পারে এই যুবক।

জানলায় দাঁড়িয়ে তিনবার জীলিয়্যার উদ্দেশ্যে চুম্বনের ভঙ্গিমা দেখায় থেরেজ।

॥ চার ॥

যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে হাঁটছে জীলিয়্যা। অ্যালকোভে নিহত শরীর, রগে ফুটো, পা দুটো অশ্লীল ভঙ্গীতে ছড়ানো—এসবে সে অবাক হয়নি। থেরেজ ফিসফিস করে বলছে, মধ্যরাত অবধি ডিনার পার্টি চলবে, সবাই পার্টিতে ব্যস্ত থাকবে, সেই

সুযোগে কলবেইলের নিহত শরীর নদীতে ফেলে দেবে জীলিয়্যা।

'তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো।'

'আমাকে চুমু খাও।' থেরেজের শীতল ভ্রু-পল্লবে ঠোঁট রাখে জীলিয়্যা। 'আমি পোষাক বদলাচ্ছি। কেউ এলে তুমি অ্যালকোভে লুকোবে।'

একটু পরেই অ্যালকোভে লুকোতে হয় জীলিয়্যাকে। নিজের অন্তর্বাস দিয়ে কলবেইলের লাস ঢেকে রেখেছে থেরেজ। এবং কোন কথা না বলে থেরেজকে পোষাক বদলাতে সাহায্য করছে কলবেইলের মা ফ্রাসোয়া। থেরেজ হাসছে। পরণে তার সাদা রেশমের পোষাক, পোষাকটা সাজানো অজস্র সাদা বন-গোলাপ দিয়ে, প্রত্যেকটা গোলাপের মাঝখানে লাল রং। 'তোমাকে যীশুমাতার মত দেখাচ্ছে'— ফ্রাসোয়া বলে। মোমেব আলো নিভিয়ে চলে যায় ফ্রাসোয়া ও থেরেজ। অন্ধকারে জীলিয়্যা শোনে, অতিথিদের কথা ও গানের শব্দ। সে কল্পনা করে, কুমারীর সাদা পোষাকে নৃত্যসঙ্গীর আলিঙ্গনে ওয়ালজ নাচ নাচছে থেরেজ। ওর পরিত্যক্ত কাঁচুলিতে মুখ গুঁজে শবীরেব ঘ্রাণ নেয় জীলিয়্যা।

বাঁশীর সুরে লাজুক এক প্রেমিকের মত থেরেজকে ভালোবাসা জানিয়েছিল জীলিয়্যা। অপরাধ যখন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যোগসূত্র গড়ে, তারা এমন উষ্ণ আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে যে তাদের হাড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। হ্যাঁ, লাসটা নদীতে ফেলে দিয়ে প্রেমিকার কাছে আজ রাতেই ফিরে আসবে জীলিয়্যা।

রাত দশটা বাজে। ঘরে ফিরে মোমের অলো জ্বালে থেরেজ। পাশের ঘরে ফ্রাসোয়া ঘুমিয়ে পড়েছে! কলবেইলের বেঁটেখাটো শরীর কাঁধে তুলে নিয়েছে জীলিয়্যা। থেরেজ আগে আগে হাঁটছে। থেরেজ ঘরে চেয়ারে ধাক্কা খায় পা দুটো। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে ফ্রাসোয়া। সাবধানে করিডরে পা রাখে থেরেজ। গেটটা সে খুলে দেয়। লাস কাঁধে নিয়ে নীচে নেমে যায় জীলিয়্যা। সিঁড়ির মাথায় তার জন্যে অপেক্ষা করছে থেরেজ।

ঘুমন্ত নগরী। একটা দরজায় উকীলের বউয়ের শিলুট ছায়া মিলিয়ে যায়। ইনস্পেক্টর তাকে দেখছে নাতো?

নদীর কালো জলে ছোট ছোট ঘূর্ণি। লাসটা জলে ফেলার সময় তার কাঁধে টান লাগে। বাঁধের ওপর বসে জীলিয়্যা এখন দেখছে, গাছের মখমল-মসৃন ছায়ায় নদীর রূপোলী জল। অসীম শান্তি, গোপন আনন্দ। এবং...সাদা রেশমী পোষাক গায়ে অপেক্ষা করে আছে থেরেজ। কিম্বা হয়তো বিছানায় শুয়েছে, দরজা খোলা রেখেছে, ফুলশয্যার রাতে নববধূর মত।

কিন্তু না, ভালোবাসা মরে গেছে। কামনা-বাসনা মরে যাচ্ছে। চারপাশে শুধু

মৃত্যুর ঘ্রাণ। ওই ঘরে থেরেজকে সে জড়িয়ে ধরলে ছাদ ভেঙে পড়বে তার মাথায়। তার চেয়ে অনেক ভালো ঘুম, চিরনিদ্রা। জেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। সকালে পোস্ট অফিসে যেতে হবে না, রাতে বাঁশী বাজাতে হবে না। জলের বুকে এখানে ওখানে ঘূর্ণি জাগে। নদী তার আপন সংগীত গাইছে। থেরেজ-থেরেজ-থেরেজ-তিনবার বলে জীলিয়্যা। তারপর সে মাথা নীচু করে। তার শরীর নদীর বুকে খসে পড়ে। ঘাসের বুকে গান গেয়ে বয়ে যায় নদী।

দুটো লাস যখন এক সংগে পাওয়া গেল, লোকে ধরে নিল, জীলিয়্যাকে কলবেইল বিদ্রূপ করতো বলে তার মাথায় মেরে খুন করেছে জীলিয়্যা, লাসটা নদীতে ফেলে দিয়েছে, তারপর নদীর বুকে ঝাঁপ দিয়ে ও আত্মহত্যা করেছে।

তিন মাস পরে মাদমোয়াজেল থেরেজ-এর সঙ্গে বিয়ে হল কাউন্ট দ্য ভেতাই-র। সাদা পোষাক পরেছিল থেরেজ। তার শান্ত সুন্দর মুখে কঠিন ও মহান্ পবিত্রতা ফুটে উঠেছিল।

মূল গল্প □ জীলিয়্যা।

আইজ্যাক ব্যাসেভিস সিংগার

নোবেলপুরস্কার বিজয়ী অ্যামেরিকানিবাসী ইহুদী কথাসাহিত্যিক সিংগার তাঁর প্রথম যুগের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস লিখেছেন ইদ্দিশ ভাষায়। সিংগার একালের সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ লেখকদের অন্যতম যারা একালের জটিল জীবনযন্ত্রণা ও সংশয়-শঙ্কুল অস্তিত্বের সব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেও প্রেম মানবিকতার বিজয়ে আস্থা রাখেন। তাঁর গল্পে প্রবঞ্চিত ও আপাতনির্বোধ মানুষ তার বিশ্বাসের মহিমায় ঈশ্বরিত হয়ে ওঠে এবং চুরি যার পেশা, সেই চোরও যখন বোঝে যে তার স্ত্রী একই পথের পথিক সে দুঃখ পায়, কিন্তু চুরির পথ ছেড়ে সে সুস্থ জীবনের পথে পা বাখে। যে যুগের অধিকাংশ আধুনিক বিদেশী গল্পের নঙর্থক, সেই যুগের সদর্থক পরিণতির গল্প লিখে সিংগার একালের অ্যামেরিকান সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন এক নতুন ধারা। বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভূক্ত গল্পটি প্রথমে লেখা হয় ইদ্দিশ ভাষায়। পরে অ্যালমা সিংগার ও এলিজাবেথ পলেটের অনুবাদের শিকাগো রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে কাউন্সিল অফ ম্যাগাজিন-এর সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে পুরস্কৃত হয়।



সংশয়

আইজ্যাক ব্যাসেভিস সিংগার

যখনই উলফ বার বাড়ী ফেরে, সে তার স্ত্রী সেলিয়া ও মেয়েদের জন্যে উপহার কিনে আনে। এবার উলফ বার-এর ভাগ্য ভালো। সে একটা সিন্দুক ভেঙে ৭৪০ রুবল চুরি করেছে। তাছাড়া রেলের সেকেণ্ড ক্লাসে আসার সময় পয়সাওয়ালা এক রাশিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাসের জুয়ায় সে ১৫০ রুবল জিতেছে। অনেকদিন আগেই উলফ বার এই ধারণায় পৌঁছেছে যে সবকিছুই নিয়তির ওপরে নির্ভর করে। এবারের যাত্রাটা প্রথম থেকেই শুভ ছিল। সিন্দুক ভাঙা যার পেশা, পকেট মারা তার কাজ নয়। তবু স্রেফ মজা করবে বলে সে একজনের পকেট মেরেছে এবং ব্যাংকোটে ভর্তি একটা পার্স পেয়েছে। তারপর সে টার্কিশ বাথে যেয়ে একটা সোনার ঘড়ি পেয়েছে। 'ব্যবসা' ভালো চললে সে ভগবানের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ দেয় ও গরীবদের সাহায্য করার জন্যে যে বাক্সে পয়সা ফেলতে হয়, সেই বাক্সে একটা মুদ্রা ফেলে দেয়। উলফ বার কোনো গ্যাং-এর সদস্য নয়। সে সম্মানজনকভাবে কাজকর্ম করে। সে জানে যে চুরি করা পাপ। কিন্তু ব্যবসায়ীরাই বা কম কিসে? ওরাও কি সস্তায় জিনিষ কিনে চড়া দামে বেচে না? ওরাও কি গরীবদের রক্ত শুষে নেয়না? ওরাও কি কয়েক বছর অন্তর অন্তর দেউলিয়া হয়ে যায়না? একসময় লাবলিনের ট্যানারীতে কাজ করতো উলফ বার। কিন্তু ধুলো, গরম চামড়ার দুর্গন্ধ তার অসহ্য লেগেছিল। বেশী কাজ করতে বলে চেঁচাতো ফোরম্যান। আয়ও হতো সামান্য তার থেকে জেলে পচে মরাও ভালো।

চোরের জীবিকায় অনেকদিন ধরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে উলফ বার। কয়েকবার ধরা পড়েও সহজে ছাড়া পেয়েছে সে। শাস্তিটা একই হয়েছে। পুলিস-ম্যাজিস্ট্রেটের সংগে কিভাবে কথা বলতে হয়, সে জানে। স্যার...আমার বউ-ছেলেমেয়ে আছে...।

উলফ বার কখনও মুখের ওপর জবার দেয়না বা গুণ্ডামি করে না। ভালো পরিবারের ছেলে উলফ। তার বাবা খুব ধার্মিক ছিল, বাড়ীতে রঙ লাগানোর কাজ করতো। তার মা মাংস বেচতো।

ওদের পরিবারে উলফ বারই একমাত্র ছেলে যে চোর হয়েছে। এখন তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তার উচ্চতা মাঝামাঝি, কাঁধ চওড়া, চোখের রং বাদামী, হলুদ গোঁফজোড়া পোলিশ কায়দায় মোচড়ানো। তার পরণে শিকারের পোষাকের মতো আঁটসাঁট প্যান্ট, বুটের ওপরটা ওপরদিকে আঁটা। হাতকাটা জামার সামনে ঝোলে ঘড়ির চেন, তার প্রান্তে কানের ময়লা সাফ করার কাঠি। অন্য চোরেদের সঙ্গে থাকে বন্দুক বা স্প্রিংনাইফ। উলফ বারের সংগে কোন অস্ত্র থাকেনা। সে জানে, বন্দুক একদিন না একদিন গুলি ছুড়বে, ছোরা একদিন না একদিন রক্ত ঝড়াবে। রক্তপাতে লাভ কি? শাস্তিটা গুরুতর হবে, তাতেই বা কি লাভ? উলফ বার সংযত ও সাবধানী মানুষ। সে ভাবনাচিন্তা করে, গল্পের বই পড়ে, এমন কি খবরের কাগজও পড়ে। মেয়েটি প্রায়ই তাকে রূপের ফাঁদে জড়াতে চায়। কিন্তু উলফ বারের ঈশ্বর এক, স্ত্রীও এক। অন্য মেয়েরা তাকে কি দেবে, তার বউ সেলিয়া যা দিতে পারবে না? হাফগেরস্ত মেয়েমানুষরা তার বড্ড অপছন্দ। সে কখনও বেশ্যাবাড়ীর চৌকাট মাড়ায় না। সে কখনো মদ খায় না। কোজলো-তে তার বাড়ী আছে, বাগান আছে। তার মেয়েরা ইস্কুলে যায়। পিউরিস উপলক্ষ্যে সে র‍্যাবিকে (ইহুদী ধর্মযাজক) উপহার পাঠায়। পাসওভারের বার্ষিক উৎসবের আগে সমাজের বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় গরীবদের জন্যে সাহায্য চাইতে তার বাড়ী আসে।

এবার বাড়ী আসার সময় লুবিন-এর এক স্যাকরার দোকানে একজোড়া সোনার ইয়ারিং বউ সেলিয়ার জন্যে কিনেছে উলফ বার, দুই মেয়ের জন্যে দুটো বড় পদক। রেইভিজ অবধি সে ট্রেনে এসেছে। তারপর ক্যারেজ-ওয়াগনে ড্রাইভারের পাশে বসে।

বছরে চারবার বাড়ী ছেড়ে যায় উলফ বার। কোনো ঝামেলা না বাঁধলে সে ছ'হপ্তার মধ্যেই বাড়ী ফেরে। সে একই শহরে প্রত্যেকবার যায় এবং একই মেলায়। কোজলো শহরে তার জীবিকার কথা সবাই জানে। কিন্তু এই শহরে কখনও চুরি করেনা উলফ বার। ও যখন থাকেনা, দোকানদারেরা সেলিয়াকে ধারে মালপত্র দেয়। ফিরে এসে পাইপয়সা ধারও চুকিয়ে দেয় উলফ। একবার বেশ কয়েকমাস ইয়ানো জেলে ছিল উলফ। কিন্তু কোজলোর ব্যবসায়ীরা সেলিয়াকে ডোবায়নি, তারা কয়েক'শ রুবলের মাল ধারে দিয়েছে। সেলিয়া অবশ্য মাঝে মাঝে বলে, দোকানদাররা ওজনে কম দেয় ও বিলের টাকা বাড়িয়ে লেখে। কিন্তু ওদের সঙ্গে তর্ক করতে রাজী নয় উলফ বার। পৃথিবীর এমনি নিয়ম, সে জানে।

প্রত্যেকবারের মতো এবারও সে বাড়ী ফিরছে সেলিয়া ও মেয়েদের জন্যে বুকভরা প্রতীক্ষা নিয়ে। সেলিয়ার মত রান্না কেউ রাঁধতে পারেনা। সেলিয়ার বিছানার মত নরম বিছানা কোনো সরাইখানায় মেলেনা। বালিশের ওয়াড় আর চাদরগুলো কি পরিষ্কার, রেশমের মতো মসৃণ, ল্যাভেন্ডারের গন্ধ ছড়ানো। সেলিয়া সদ্য স্নান করে চুল আঁচড়ে ফ্যান্সি নাউটগাউন গায়ে জড়িয়ে শোয়ার ঘরে আসে, নতুন-বিয়ে-করা বৌয়ের মত চুমু খায় ও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তার কানে কানে। মেয়েরা বড় হচ্ছে। একজনের বয়স এগারো, আর একজনের দশ। তবু ওরা বাচ্ছা মেয়ের মতো বাবার ঘাড়ে পড়ে, চুমু খায়, স্কুলের খাতা, বই, ড্রয়িং, লেখা, পরীক্ষার নম্বর সব দেখায়। মেয়ে দুটো খৃষ্টানদের মত মাড়-দেওয়া পোষাক, আলপাকার অ্যাপ্রন পড়ে, চুলে রিবন বাঁধে, পায়ে চকচকে জুতোজোড়া চাপায়। ওরা 'ইদ্দিশ' ভাষা ছাড়াও রাশিয়ান ও পোলিশ ভাষা শিখেছে। ওরা এমন সব দেশ ও এমন সব নগরীর গল্প বলে, যাদের নাম ওদের বাবার কাছে অজানা। ওরা রাজারাজড়া ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস পড়ে। ওরা ছড়া ও কবিতা মুখস্থ বলতে পারে। এতো ছোটো মাথায় এতো জ্ঞান ঢোকে কি করে, উলফ বার অবাক হয়ে বলে। বাবার জীবিকার সম্বন্ধে মেয়েরা কিছু বলেনা। ওদের ধারণা, ওদের বাবা একজন ভ্রাম্যমান সেলসম্যান।

চার্চ স্ট্রীটে ব্রিজের কাছে ওর বাড়ী। ওর খ্রষ্টান প্রতিবেশীরা জানেনা কিম্বা না জানার ভান করে যে উলফ বারের জীবিকাটা কি ধরণের। ক্রিস্টমাস ও ইস্টার উপলক্ষ্যে ওদের উপহার পাঠায় উলফ বার।

বাজারের কাছে থামে ক্যারেজ ওয়াগনটা। পিউরিমের উৎসবের পর বেশীদিন যায়নি, কিন্তু মিশরবাসীদের প্রথম সন্তানকে হত্যা করে ঈশ্বর যখন ইহুদীদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, সেই ঘটনার স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত ইহুদীদের বার্ষিক উৎসব পাসওভারের উষ্ণতার ছোঁয়া এখনই লেগেছে রোদের উত্তাপে। কাদার মাঝে মাঝে সোনালী জলধারা। ঘোড়ার মল থেকে শস্যকণা খুটে খাচ্ছে পাখীরা। জলকাদার ভেতর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে চাষীর মেয়েরা মুলো, শাক, বীট আর পেঁয়াজ বেচছে। ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানের পাওনা মিটিয়ে দেয় উলফ বার, এমন একটা ভঙ্গীতে যেন সে বড়ো শহরের বড়ো বাবু। সঙ্গে বীয়ারের দাম হিসেবে দেয় কুড়ি 'গ্রোসজী'। তামার তালা লাগানো সাইড পকেটওলা চামড়ার স্যুটকেসটা তুলে সে হাঁটতে থাকে চার্চ স্ট্রীটের দিকে। দোকানদাররা তাকে দেখছে। মেয়েরা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছে, দেখতে দেখতে কাচ ঘসে কুয়াশার জল সাফ করছে। কোথা থেকে যেন উদয় হয় 'বোকা' চ্যাজকেল, তাকে কয়েকটা পয়সা ভিক্ষে দেয় উলফ বার। কসাইয়ের দোকানের পাশে কুকুরগুলো পর্য্যন্ত খুশী হয়ে লেজ নাড়ছে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! পাসওভার উৎসবে বাড়ী থাকবে উলফ বার। সেলিয়া উৎসবের আয়োজন করবে। প্যানকেক ও মাছ খাওয়া হবে। এবার পকেটে পয়সা আছে, পরিবারের সবার জন্যে নতুন পোষাক তৈরী করাতে হবে। তার জীবিকায় পয়সা কামানোর সঙ্গে সঙ্গে খরচা করাই ভালো। বেকারীর পাশ দিয়ে যাবার সময় চেনা একটা গন্ধ তার নাকে আসে। 'মাজো' কেক তৈরীর জন্যে জল দিয়ে ময়দা মাখছে মেয়েরা। তাদের মুখ পরিশ্রমে লাল, তাদের পরণে সাদা অ্যাপ্রণ, তাদের মাথার চুল রুমালে বাঁধা। একজন জল ঢালছে আর একজন ময়দা মাখছে। চুল্লিতে সদ্যশেকা রুটি কোদাল দিয়ে বার করতে ব্যস্ত একজন পুরুষ। লম্বা-জুলফি, মাথায় স্কালক্যাপ—ওভারসীয়র চেঁচাচ্ছে দাঁতমুখ খিঁচোচ্ছে।

হঠাৎ বাবা-মার কথা মনে পড়ে যায় উলফ বারের। মা-বাবা এখন কোথায়? নিশ্চয়ই স্বর্গের নন্দনকাননে। তাদের সন্তান ধর্মের পথ নেয়নি। তবে সে মা-বাবার কবরের ওপরে একটা পাথরের ফলক লাগিয়েছে। প্রত্যেক বছর সে মা-বাবার স্মৃতির উদ্দেশে মোমবাতি জ্বালে, ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করে, ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্যে একজন ইহুদীকে পয়সা দেয়। হ্যাঁ, উলফ বার পাপী। কিন্তু ঈশ্বর পাপীদের করুণা করেন। নাহলে, নোয়ার সময় যেমন হয়েছিল, তেমনি আর এক বন্যায় অনেক আগেই নিজের সৃষ্টিকে ভাসিয়ে দিতেন ঈশ্বর।

চার্চ স্ট্রীটে ঢুকতেই তার মনে হঠাৎ ভয় জাগে। মানুষের জ্ঞানের অতীত কোনো শক্তি তাকে যেন সাবধান করে দেয়, অতো খুশী হয়োনা। পাসওভারের উৎসবের সময় এখনও আসেনি। উলফ বাব থামে। তবে কি তার বউ সেলিয়া অসুস্থ? তবে কি মেয়েদের শরীর খারাপ? তবে কি তাকে জেলে যেতে হবে? কিন্তু কেন? সে তো অপরাধের কোনো প্রমাণ রাখেনি। ভয়টা মন থেকে সরাতে চেয়ে সে দুসারি বাড়ীর মাঝের রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে যায়। বাড়ীগুলো নীচু, যেন বামনদের থাকার জন্যে তৈরী, বেড়ায় কাঁটাতার লাগানো। আধগলা বরফের মাঝে মাঝে চালুনির মতো অজস্র ফুঁটো, তার ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে গত বছরের সূর্যমুখী ফুলের শুকনো ডাল। সব ঠিক আছে। নিজেকে সান্ত্বনা দেয় উলফ বার। সে দরজা খোলে ভেতরে আছে পরিবারের সবাই। রান্নাঘরের স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তার বউ সেলিয়া। পরণে খাটো শায়া, মাথার সোনালী চুল ঝুটিবাঁধা, মুখটা ফরসা, বাচ্চা মেয়ের মতো। কোমর সরু, পায়ে লাল রঙের চপ্পল, চওড়া উরু, সরু গোড়ালী। বউকে আগে কখনও এতো সুন্দর মনে হয়নি উলফ বারের। মেয়েরা টুলে বসে কি যেন খেলছে। ওরা সবাই হৈচৈ করে তার দিকে ছুটে আসে। উনুনের পাত্রটা আরেকটু হলে উল্টে ফেলতো সেলিয়া। মেয়েরা তার গায়ে ঝুকে পড়ে, চুমুতে চুমুতে তার মুখটা ভরিয়ে দেয়। পাশের ঘরে কাকাতুয়াটা যেন প্রভুর গল্পা

শুনেই চেঁচাতে শুরু করে। সেলিয়ার ঠোঁটে চুমু খেতেই উলফ বারের শরীরে কামনার দাহ জেগে ওঠে। সে বারবার বউকে চুমু খায়। দুই মেয়ে মাশা ও আনকা বাপের ঘাড়ে উঠবে বলে মারামমারি করছে। স্যুটকেশ খুলে ওদের উপহারগুলো দিতে আবার একদফা চেঁচামেচি হয়। পাশের ঘরে কাকাতুয়াকে দেখতে যায় উলফ বার। পাখীটা ডানা ঝাপটে তার কাঁধে উঠে বসে। শীতের পালক ঝরে পাখীটার গায়ে নতুন চকচকে পালক গজাচ্ছে। পাখী বলে--'বাবা, বাবা, বাবা।

'তুই বাবাকে ভালোবাসিস?'

'ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা'।

নাঃ, ভয়ের কোন কারণ নেই। অভিজ্ঞের চোখে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে উলফ বার।

'আমার বউয়ের মতো ভালো বউ পৃথিবীতে আর কারো নেই'। উলফ বার চেঁচিয়ে বলে।

আগে ঘোড়ার গাড়ীতে আসার সময় তার ক্লান্তি লাগছিল, চোখ বুজে আসছিল। এখন আর তার ঘুম পাচ্ছেনা, মেজাজটাও হাসিখুশী। সেলিয়া মিষ্টি কুকী আর এক গ্লাস পানীয় দিয়ে গেছে। ওকে একা পেয়ে জিজ্ঞসা করেছে, 'ব্যবসা কেমন চললো?'

'যতোক্ষণ তুমি আমার পাশে আছো, সব ভালোই হবে।'

আসলে উলফ বার তার নিজের জীবিকার জন্যে লজ্জিত। সচরাচর সেলিয়া তার পেশাগত ব্যাপারে কিছু জানতে চায়না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, স্বামীর জীবিকা মনে মনে মেনে নিয়েছে সেলিয়া। বউ আর মেয়েদের নতুন পোষাক তৈরী করাতে হবে উৎসব উপলক্ষে। কোনো দর্জি এতো দেরীতে অর্ডার নেবে কিনা সন্দেহ। এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়াই ভালো। শুতে না শুতেই তার ঘুম আসে।

ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে, সে লাবলিন শহরে রয়েছে। আধো অন্ধকার ঘরে একটা গামলা থেকে জল নিয়ে স্নান করছে। তার শরীরে এখন বিশ্রী গন্ধ। সে যেন আবার ট্যানারীতে কাজ করছে। হঠাৎ একটা দরজা খুলে যায়। মাথায় বিশ্রী একটা পরচুলা পড়ে আছে বিশ্রী চেহারার বুড়ী। সে রেগেমেগে চেঁচাচ্ছে—'আর কতোক্ষণ ধরে চান করবে তুমি? সেডারের সময় হয়ে গেছে।' চমকে জেগে ওঠে উলফ বার। এ কী বিশ্রী স্বপ্ন? কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধ এখনও তার নাকে লেগে আছে। জামার পকেট থেকে হ্যাভানা চুরুটটা বার করে উলফ বার। যে রাশিয়ান ভদ্রলোকের কাছে দেড়শো রুবল জুয়োয় জিতেছে সেই ভদ্রলোকই চুরুটটা দিয়েছিল ওকে। সচরাচর সিগারেটই খায় সে। কিন্তু আধ রুবল দামের চুরুট খেতে কেমন লাগে, দেখাই যাকনা। তার মনে পড়ে, হলুদ আর সোনালীতে মেশানো একটা সিগার-হোল্ডার সে কোথায় যেন রেখেছিল। হ্যাভানা চুরুট খাবে যখন, মেজাজে

হোল্ডার লাগিয়ে খাওয়াই ভালো।

কিন্তু সিগার-হোল্ডারটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোন কিছু হারানো তার পছন্দ নয়। সে সবকটা ড্রয়ার খোলে, আনাচ-কানাচ খোঁজে, কাঠের সিন্দুক হাতড়ায়। পোষাকের আলমারীর ড্রয়ারে টিনের একটা বাক্সে বার্থ সার্টিফিকেট, বিয়ের সার্টিফিকেট, মর্টগেজের কাগজ এবং যে সব দলিল সচরাচর দরকার হয়না সেগুলো বাখা হয়েছে। সিগারহোল্ডার ওখানে থাকার চান্স কম, তবু বাক্সটা খোলে উলফ বার। সে স্তম্ভিত হয়ে যায়! এ কী?

সিগার-হোল্ডারটা নেই। কিন্তু বিয়ের সার্টিফিকেটের ওপর রাখা আছে হীরে-বসানো ব্রোচ। মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ আঁটার জন্যে এই ধরনের কারুকার্য্যখচিত দামী পিন্ ব্যবহার করা হয়। উলফ বার পেশায় চোর, সে গয়নার দাম বোঝে। হীরেগুলো আসল হীরে, ইমিটেশন নয়। ব্রোচটা দেখলে পুরোনো আমলের জিনিষ বলেই মনে হচ্ছে। ওটা এখানে এলো কোথা থেকে? ওটা সে আনেনি, ওরকম কোনো দামী গয়না ছিল না। তাহলে সেলিয়া কি পয়সা বাঁচিয়ে ওটা কিনেছে? না, কোজলা শহরে এতো দামী গয়না পাওযা যায় না। ব্রোচের উল্টোদিকে দুটো নাম খোদাই করা আছে। 'অ্যালেফ' এবং 'গিমেল'। ব্রোচটা পকেটে রাখে উলফ বার। তার মন খারাপ লাগছে। ধাঁধাটা সমাধানের চেষ্টায় সে চোখ বোঝে। আবার ঘুম নামে। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে, সে লাবলিন্ শহরের সেই অন্ধকার ঘরে স্নান করছে। চারপাশে কাঁচা চামড়া এবং ট্যানারীতে ব্যবহৃত নানা কেমিক্যালের দুর্গন্ধ। মুখের চামড়া কোঁচকানো, এলোমেলো পোষাক— সেই বুড়ী আবার তাকে সাবধান করে দেয়, চান করতে এতো দেরী করলে ধর্মানুষ্ঠানে যেতে দেরী হয়ে যাবে। তার ঘুম ভেঙে যায়।

ধাঁধাটার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেলিয়া অসতী? তার প্রেমিক তাকে দামী ব্রোচটা উপহার দিয়েছে?

ব্রোচে অ্যালেফ ও গিমেল নাম দুটো খোদাই করা ছিল। ও দুটোর মানে কি? কোজলো শহরে এমন একজন ইহুদী যুবক আছে, যে বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে? এবং সেলিয়া অসতী? ঘরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কাকাতুয়ার সঙ্গে কথা বলে উলফ বার। 'পাখী, তুমি সব জানো। সত্যি বলো!'

'বাবা, বাবা, বাবা! ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা!'

গোধূলী নামে। জানলার কাঁচ সবুজ হয়ে যায়। সূর্যাস্তের বেগুনী প্রতিফলন দেয়ালে কাঁপে। খাঁচায় ঢুকে যায় কাকাতুয়া। অন্ধকারে একা বসে সিগার টানে উলফ বার। তার বউ ফিরতে এতো দেরী হচ্ছে কেন? মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ার আগে বউকে কিছু বলা যাবে না। একটু পরে বাইরে গলার শব্দ ও পায়ের শব্দ হয়।' সেলিয়া

ফিরে এসেছে। বউ ও দুই মেয়ের হাতে অনেকগুলো প্যাকেট। ওরা লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢোকে। বউ খুসী হয়ে বলছে—'উলফ বার, তুমি এখানে অন্ধকারে বসে আছো? সিগার টানছো?'

এক রাশিয়ান ভদ্রলোক ট্রেনে আসার সময় এটা দিয়েছে।' 'চুরুটের গন্ধে আমার মাথা ঘোরে। আমরা দোকান উজাড় করে জিনিষ কিনেছি। দাঁড়াও, আলো জ্বালাই।'

'আমার একটা তৈলস্ফটিকের তৈরী সিগার-হোল্ডার ছিল। ওটা গেল কোথায়, বলতে পারো?'

'কি জানি।'

প্যাকেট হাতে মেয়েরা লাফালাফি করছে। টেবিল ল্যাম্প ও ছাদ থেকে ব্রোঞ্জের চেনে ঝোলানো আলো জ্বালে সেলিয়া।

* * * খাওয়ার টেবিলে বসে বউয়ের রান্নার প্রশংসা করে উলফ বার, মেয়েদের সঙ্গে হাসিঠাট্টাও করে, কিন্তু এখন আর সে আগের মত হাসি খুশী নয়। সে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারে, বেশী খায়না, মাঝে মাঝে আড়চোখে বউয়ের দিকে তাকায়। চা, জ্যাম ও কেকগুলো খাওয়া শেষ হলে সে মেয়েদের শুতে বলে।

সেলিয়া স্বামীকে সমর্থন করে বটে, তবে একটু একটু হাসে স্বামী তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে শুতে চাইছে, সে জানে। বড্ডো তাড়া তোমার, তাই না? ওর চোখদুটো যেন বলতে চাইছে। উলফ বার বেডরুমে ঢুকে পোষাক খুলে ফিটফাট বিছানায় বসে। রান্নাঘরে চুল খুলে স্নান করছে সেলিয়া। স্বামীর সঙ্গে শুতে যাওয়ার আগে রোজ যেমন করে। সে চুল আঁচড়ায়, নতুন নাইটগাউন গায়ে চড়ায়, গায়ে সুগন্ধী লোশন স্প্রে করে এবং টুথপেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজে—বড় শহরের মেয়েরা যেমন করে। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে সে ভাবে, আমার শরীর এখন কোনো বিষ নেই।

সেলিয়া আশা করেছিল, তার স্বামী এক্ষুণি আলো নিভিয়ে তার শরীরে শরীরে মেলাবে। কিন্তু স্বামী বিছানায় বসে আড়চোখে তার দিকে তাকালো।

'দরজা বন্ধ করো।'

'দরজা তো বন্ধই আছে।'

ব্রোচটা বালিসের তলা থেকে বের করে উলফ বার বলে—'এটা তুমি কোথা থেকে পেলে?'

সেলিয়া চোখ তোলে। তার মুখের ভঙ্গী বদলে গেছে। সে আশ্চর্য্য এবং গম্ভীর।

'ওটা অনেকদিন ধরে আমার কাছে আছে।'

'কোথায় পেলে?'

সেলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর কথাটা কেউ বিশ্বাস করবেনা

জেনেও বলে—'কুড়িয়ে পেয়েছি।'

'কোথায়?'

'সিনাগগের মহিলা-বিভাগে।'

'তুমি প্রায়ই প্রার্থনা করতে সিনাগগে যাও?'

'রোশ হ্যাশানার উৎসব ছিল।'

'ওটা কার, তুমি জানতে চাইলেনা?'

'না।'

'আমাকেও বললেনা?'

'তোমাকে সবকিছু বলবো কেন?'

'ব্রুচে দুটোয নাম খোদাই করা আছে। অ্যালেফ আর গিমেল্। ব্রুচটা কার?'

সেলিয়া দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে, দরজাটা বন্ধ আছে। কথাগুলা যেন মেয়েদের কানে না যায়। এই প্রথম বউয়ের চোখে উদ্ধত চাউণি দেখে উলফ বার।

'তুমি তো অ্যার্টনী নও?'

'ওটা কার?'

'চেঁচিওনা। ওটা অ্যালফে গিমেলের।'

'মনে পড়ছে। হ্যানুক্কার উৎসবে সিনাগগে ব্রোচ হারিয়েছিল অ্যালফে গিমেল। তাই নিয়ে সারা শহরে চেঁচামেচি হয়। ওটা তুমি কোথায় পেলে?'

'রাস্তায়।'

'একটু আগে সে বললে, সিনাগগে?'

'তাতে কি হয়েছে?'

'ডেবোরা লীর বিয়ের উৎসব ছিল সেদিন। ব্রোচটা হারিয়েছিল অ্যালফে গিমেল। উৎসবে গিয়েছিল তুমি। সবাইকে সার্চ করা হয়েছিল। কোথায় লুকিয়েছিলে ওটা?'

'কিভাবে সওয়াল করছো আমাকে, দ্যাখো? উনি যেন কতো সাধু।'

'তুমি চোর, তাই না?

'তুমি যদি চোর হতে পারো, আমি চুরি করবোনা কেন? এতে এতো চেঁচামেচির কি আছে? সারা শহর জানে, তুমি চোর। আমাদের মেয়েদের সবাই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। ওদের মাষ্টাররা পর্য্যন্ত ঠাট্টা করে। কোন মেয়ে কিছু হারালে আমাদের মেয়ে মাশা ও অ্যানকাকে ওরা সন্দেহ করে। তুমি দুঃখ পাবে বলে এসব আমি কখনো তোমায় বলিনি। কিন্তু দিনে দশবার আমি তোমার জন্যে অপমানিত হই। এখন তুমি সাধুতা দেখাচ্ছো? আমি যদি সতীসাধ্বী হতাম, তোমায় বিয়ে করতাম না। কথাটা স্পষ্ট করেই বলছি।'

'ওটা কিভাবে চুরি করলে?'

'ওর টিলে জামার কলার থেকে খুলে নিয়েছিলাম। ভাঁড় তখন ভাঁড়ামি শোনাচ্ছে। সেই সুযোগে নিয়েছিলাম। কাজটা কেন করেছিলাম, আমি নিজেই জানিনা। অনেক বছর ধরে ওটা ড্রয়ারে পড়ে আছে। হঠাৎ তুমি আমার ড্রয়ারে হাতড়াতে গেলে কেন?'

'আমি আমার সিগার-হোল্ডার খুঁজছিলাম।'

'তোমার সিগার-হোল্ডার আমি নিইনি।'

সব চুপচাপ। বিছানায় সোজা হয়ে বসে আছে উলফ বার। তার মুখটা গম্ভীর। সে রাগেনি, দুঃখ পেয়েছে। যেন নিকটাত্মীয় কারো মৃত্যুর সংবাদ সে দেরীতে জানলো। এতোদিন সে জানতো, সেলিয়া বড়ো ভালো মেয়ে। সে চোর, ভালো পরিবারের ভালো মেয়েকে বিয়ে করে ওদের পবিবারের লজ্জার কারণ হয়েছে বলে সে নিজেকে দোষ দিতো। মাঝে মাঝে বউ বলেছে, তার জীবিকার এই ধরণটা ভালো নয়, শহরের লোকেরা তাকে পাত্তা দেয়না, মেয়েরা ভালো শিক্ষা পেয়ে যেন ভালো বড়ো হয়............তারপর কয়েক বছর আগে ইয়ানোতে ধরা পড়ে ছিল উলফ বার, তার দীর্ঘমেয়াদী শাস্তির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেলিয়া ইয়ানোতে যেয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে। সে বলছে, সে নাকি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নীর সঙ্গে দেখা করে কান্নাকাটি করেছিল। অ্যাটর্নী নাকি বলেছিল—'ওঠো, সুন্দরী, তোমার কান্না আর আমি দেখতে পারছিনা।' কিন্তু আজ উলফ বার বুঝেছে, আসল ব্যাপারটা তাকে বলেনি তার বউ। বড়ো বড়ো শহরে ঢিলেঢালা স্বভাবের অনেক মেয়েমানুষ উলফ বারকে রূপের ফাঁদে জড়াতে চেয়েছে। কিন্তু সে বলছে, কোজলো শহরে তার সতীসাধ্বী বউ আছে, খুব ভালো মেয়ে, তার সন্তানের জননী। সে বারবার জেলে যাওয়ার ঝুকি নিয়েছে, যাতে বউয়ের কোন অভাব না হয়। হঠাৎ যেন তার বয়স বেড়ে ওঠে। সেলিয়া বলছে—'আলো নিভিয়ে দেবো?'

আলো নিভিয়ে নিজের বিছানায় ওঠে সেলিয়া। অনেকক্ষণ সব চুপ-চাপ। আশ্চর্য্য শীতল একটা অনুভূতি ঠাণ্ডা পুলটিসের মত তার বুকে চেপে বসে।

'তুমি কি সেই ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নীর সঙ্গে শুয়েছিল?'

'কী যে বলছো তুমি?'

'কি বলছি, তার মানে তুমি ভালো করেই জানো।'

'তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে উলফ বার। পাশের ঘরে মেয়েরা ফিসফিস করছে, হাসাহাসি করছে। বাইরে বসন্তের হাওয়া বইছে। শাটারগুলো কাঁপছে। জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসছে ঘরে। সেলিয়ার খাটে শব্দ হচ্ছে

মাঝেমাঝে। তার স্বামী যখন বাড়ী ফিরেছিল, স্ত্রীর শরীরে শরীর মেশাবার উদগ্র কামনা ছিল তার। এখন কামনা মরে গেছে। সব শেষ। সাতটা বছর, সুখের দিন হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। আত্মার গভীরে কে যেন শোক জানায়। কে বলতে পারে হয়তো মেয়েরা তার ঔরসজাত সন্তানই নয়? ট্রেনে ঘুরে বেড়ানো, সস্তা সরাইখানায় শোয়া, মেলায় নিজের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া—এসব কার জন্যে?

সে ফিসফিস করে নিজেকে বোঝায়—'আমার বউ চোর। তাই আমাকে ভালোমানুষ হতে হবে। এক পরিবারের দুটো চোরের ঠাঁই নেই।'

অদ্ভুত ভাবনাটা মাথায় আসতে ঘাবড়ে যায় উলফ বার। কিন্তু সে বুঝতে পারে, আর কোনো উপায় নেই। একটু সময় চুপ করে শুয়ে থেকে সে মেঝেয় পা রাখে।

'কোথায় যাচ্ছো?'

'লাবলিন্ শহরে।'

'লাবলিনে তুমি কি করবে?'—সেলিয়া জানতে চায়। এবং উলফ বার জবাব দেয়—'আমি ট্যানারীতে কাজ করবো।'

মূল গল্প □ দি ব্রোচ।

ম্যাকসিম গোর্কি

জন্ম ১৮৬৮, মৃত্যু ১৯৩৬। প্রোলেতারিয়ান পরিবারের সন্তান, সাত বছর বয়সে মাতৃপিতৃহীন। বারো বছর বয়স থেকে জীবিকার সন্ধানে ঘুরতে হয়েছে গোটা রাশিয়ায়। ১৯০৫ এর ব্যর্থ বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ফলে জারের রাশিয়া থেকে পালাতে হয়েছে পশ্চিম ইউরোপে। ১৯০৫ এ লেখা 'মা' উপন্যাসে রাশিয়ার বিপ্লবী পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক সমস্যার নিপুণ রূপায়ন ও বিশেষতঃ বিপ্লবের অগ্নিশিখায় পরিশুদ্ধ মানুষের নবজন্মের কাহিনী সর্বকালের সর্বদেশের সর্বহারা বিপ্লবীর কাছে প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে। শ্রেষ্ঠ নাটক ঃ দ্য লোয়ার ডেপথস্। শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প ঃ চেলকাস্। সমাজের নীচের তলার এই একজন মানুষ—যিনি কাজ করেছেন রুটির কারখানার মজুর হিসেবে, কুলী হিসেবে, খেতমজুর হিসেবে, সমাজতান্ত্রিক চেতনার উজ্জীবন যাঁকে পৌঁছে দিয়েছে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কাছাকাছি এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের শিল্প-সম্মত অথচ বাস্তব ছবি এঁকে যিনি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরনীয় হয়ে রইলেন।



হে বন্ধু বিদায়

ম্যাকসিম গোর্কি

ইয়েগরের হিক্কা উঠছিল।
ও বলছিল—

'লুদমিলা ভাসিলিয়েভনা, আমি পিতৃলোকে চলেছি। এই লোকটা জেল থেকে পালিয়ে আসছে। আগে ওকে খেতে দিন তারপর লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন।'

'ইয়েগর, লোকটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে ডাকলেন না কেন? তার ওপর দুবার ওষুধ খাননি! কমরেড, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। ইয়েগরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে এখুনি লোক আসবে।'

'লুদ্‌মিলা, তুমি সত্যিই আমায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—'

'হাসপাতালেও? হায় ভগবান—'

'থামোতো।'

কথা বলতে বলতে ইয়েগরের বুকে কম্বলটা ঠিক করে দিচ্ছে লুদ্‌মিলা। ওষুধের শিশির দিকে তাকিয়ে দেখে, কতোটা বাকী আছে খেতে। মোলায়েম গলা, চলার ভঙ্গী সহজ। মুখটা ফ্যাকাসে মেয়েটার। ঘন কালো ভুরু নাকের ওপর এসে পড়েছে। ওর মুখটা পছন্দ নয় মায়ের। বড্ড কাঠখোট্টা। চোখ কখনো হাসিতে ঝলমল করে ওঠেনা। কথাগুলো অর্ডারের মত।

আমরা আসি এখন।

জেল পলাতক নিকোলাইকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আগে বলে যায় লুদমিলা।

যাবো আর আসবো। এই ওষুধটা বড় চামচের এক চামচ খাওয়াবেন ওকে। আর দেখবেন, ওর কথা বলা কিন্তু বারণ।

ও চলে যেতে ইয়েগর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

'অদ্ভুত মেয়ে, সত্যি ভালো মেয়ে। বেচারা বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ে।'

আপনি ওর সঙ্গে থাকলে ভালো হবে, মা।

'চুপ, তোমার কথা বলা বারণ, ওষুধটা খাওতো।'

মায়ের গলাটা নরম।

ওষুধটা খেয়ে চোখ কুঁচকে বলে ইয়েগর।

'চুপ করে থাকলেই আমার মৃত্যু আটকানো যাবে?'

মায়ের চোখে জল আসে।

ইয়েগর হাসে, বলে।

'তাতে কি হয়েছে। এ তো প্রকৃতির নিয়ম। বেঁচে থাকার সুখের জন্যে মরতেই হবে।

তুমি কথা বলোনা, কেমন?'

'চুপ করে থাকার কোনো মানে হয়না, মা। তাতে লাভ কি? মৃত্যু যন্ত্রনা বাড়বে। অথচ ভালো লোকের সঙ্গে কথা বলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাও পাবে না। পৃথিবীতে কতো ভালোমানুষ আছে, তেমন মানুষ মৃত্যুর পরপারে আছে বলে মনে হয় না।'

'ভালো ছেলে, তুমি চুপ করো, নইলে ওই ভদ্রমহিলা এসে যদি দেখেন, তুমি কথা বলছো উনি আমায় বকবেন।'

'ভদ্রমহিলা নয়। ও কে জানো? ও বিপ্লবী মেয়ে। আমার কমরেড, খুব ভালো। তা বকবে বইকি তোমাকে। সবাইকে বকে ও।'

......লুদমিলা ফিরে আসে। মাকে বলে।

এখন তাহলে আসুন.....।

বারান্দায় এসে ফিসফিস করে বলে।

'আপনাকে এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছি বলে রাগ করবেন না, কি করবো বলুন? কথা বললে ওর শরীরটা আরও খারাপ হবে। এখনও আমি আশা ছাড়তে পারিনি যে ও ভালো হয়ে উঠবে......'

মাকে দেখে নিকলাই বলে।

ইয়েগরের অবস্থা খারাপ। ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। লুদমিলা আপনাকে যেতে বলেছে।

মায়ের মাথার মধ্যে হাতুড়ির মত একটা কথাই ঘা মারছিল।

ইয়েগর মরে যাবে।

কিন্তু দেখা গেল, ছোট্ট পরিচ্ছন্ন ঘরে ধবধবে বালিসের গাদায় মাথা রেখে জোরে

হাসছে ইয়েগর।

ডাক্তারকে বলছে।

ডাক্তার মায়ের চেনা লোক। নিকোলাইয়ের বন্ধু ইভান্ দানিলভিচ। ইয়েগরের বুকে কফের ঘড় ঘড় শব্দ। দম বন্ধ করে হাঁফাচ্ছে, ইয়েগর মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ফোলা গালের মধ্যে বসে-যাওয়া চোখ দুটো শুধু-মিষ্টি হাসছে।

ওহে ডাক্তার, বড্ড ক্লান্ত লাগছে, একটু শোবো?

না শোবেনা।

তুমি চলে গেলেই আমি শোবো।

মা, ওকে শুতে দিওনা। বালিশগুলো ঠিক করে দাও। ওর সঙ্গে কথা বলোনা কিন্তু তাহলে খারাপ হবে।

মা মাথা নাড়ে। ডাক্তার চলে যায়। সাদা দেয়াল থেকে উঠে আসছে শুকনো হিম হাওয়া, মলিন বিষাদ। জানলার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে লাইম গাছের কোঁকড়ানো চূড়ো। ধুলোয় ঢাকা ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে হলুদের ছোপ।

হেমন্ত আসছে।

ইয়েগর বলছে।

মৃত্যু খুব অনিচ্ছায় আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। এতো শক্ত ছিলাম, তাই বোধহয় ওর মায়া হচ্ছে।

কথা বোলোনা, ইয়েগর।

মা, তুমি আমাদের সঙ্গে, ভাবতে এতো ভালো লাগে। কিন্তু কি হবে তোমার? তোমাকেও তো আমাদের মত জেলে পচতে হবে। আচ্ছা, তোমার জেলে যেতে ভয় হয় না?

না।

আমি জানি। কিন্তু জেল নরকের চেয়েও খারাপ। আমার এই বস্থা কি করে হল? জেলে গিয়েই। সত্যি, আমি মরতে চাইনা। না, না, এখন মরব র কি হয়েছে।

এখনও আমি কাজ করতে পারি। যখন কাজ করা যায় না, তখন বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। তখন বেঁচে থাকা বোকামি।

শ্লেষ জড়ানো চাপা গলায় কথা বলছে ইয়েগর। ঘরের হাওয়া ভারী হয়ে উঠছে। জানলার বাইরে লাইম গাছগুলোর চূড়ো নীচু মেঘের মত। এত বিষণ্ণ কালো, দেখলে আশ্চর্য লাগে। চারিদিক অদ্ভুত শান্ত নিঃশব্দ। রাত্রির প্রতীক্ষায় রয়েছে কালো সন্ধ্যা।

বড্ড খারাপ লাগছে, মা।

ঘুমোও, হয়তো ভাল লাগবে।

এক সময় মায়ের চোখে তন্দ্রা নামে। দরজার কাছে চাপা শব্দে তার ঘোর কেটে

যায়। সে দেখে, ইয়েগর তার দিকে ঘুমিয়ে আছে।

ছি, ছি, ঘুমিয়ে পড়লাম। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

তুমিও আমার ক্ষমা কোরো, না।

খোলা জানলা। গোধূলি আলো ঘরের দিকে চেয়ে আছে। ঝাপসা, ঠাণ্ডা, নিস্তেজ। কালো ছায়া। রোগীর মুখটাও কালো।

লুদমিলা ঘরে আসে, বলে—।

বাঃ, অন্ধকারে গল্প করছো তোমরা। সুইচটা কোথায়?

হঠাৎ উজ্জ্বল সাদা আলোয়-ঘর ভরে যায়। ইয়েগরের সারা শরীর কেঁপে উঠে। তার হাতটা সে তুলে আনে বুকের ওপর।

কি হল?—লুদমিলা চেঁচিয়ে ওঠে।

আর পারি না.......চলি......।

....আস্তে আস্তে লুদমিলা সরে গেল বিছানার পাশ থেকে, জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর অস্বাভাবিক গলায় বললো।

মরে গেল....।

আমরা একসঙ্গে জেল খেটেছি.......একসঙ্গে নির্বাসনে কাটিয়েছি......মাঝে মাঝে অসহ্য লাগতো......।

জোর করে কান্না চেপে বলছে লুদমিলা, চোখে জল নেই, শুকনো ফোঁপানিতে শরীর কাঁপছে।

কতো হাসিখুশি ছিল। ভেতরে কতো কষ্ট, সব চেপে রাখতো? হাসি-ঠাট্টা করতো। যাদের মন দুর্বল, তাদের সাহস দিতো। বড্ড দরদ, বড্ড মায়া ছিল ওর। সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে কাজকর্ম থাকে না, মানুষ খারাপ হয়ে যায়, তার স্বভাবের মন্দ দিকটা দেখা যায়। ও জানতো কেমন করে মানুষকে মানুষ রাখতে হয়। নিজের জীবনে কতো দুঃখ কত কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু কোনদিন কেউ ওর মুখে কোন নালিশ শোনেনি। আমিই ছিলাম ওর সবচেয়ে বড় বন্ধু। তবু যখন এলো, যখন ও ক্লান্ত, তখনও ও আমার কাছে কিছু চায়নি। না একটু আদর, না একটু ওর দিকে মন দেওয়া—।

ইয়েগরের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে ওর হাতে চুমু খেয়ে বলে লুদমিলা—কমরেড, বন্ধু আমার, আমার বড় প্রিয় আপনজন! বিদায়। আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমারই মতো কাজ করে যাবো। তোমারই মত আমার বিশ্বাস অটুট থাকবে। বিদায়!

মূল গল্প □ দি ড্রাই টিয়ার্স

ফিয়োদর দস্তয়েভস্কি

জন্ম ১৮২১, মৃত্যু ১৮৮১। একদা রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন এবং পরে শেষ-মুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড পরিবর্তিত হয় সাইবেরিয়ায় পাঁচ বৎসর মেয়াদের নির্বাসনদণ্ডে। জন্ম থেকে মৃগীরোগী। রাশিয়ান জীবন ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমের প্রভাব পছন্দ করতেন না। রাশিয়ার অর্থোডক্স ক্রিশ্চিয়ানিটি মানুষের মুক্তি এনে দেবে এমন একটা বিশ্বাস তাঁর ছিল। জুয়ো খেলে হাজার হাজার টাকা নষ্ট করেছেন এবং উপন্যাস লিখে পাওনাদারদের দেনা শোধ করতেন। শেষ জীবনে রক্ষণশীল রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করে রাশিয়ার জারের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ঃ ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট, দ্য ব্রাদার্স অফ কারমাজভ, দ্য ইডিয়ট এবং দ্য ইনসালটেড অ্যাণ্ড ইনজিওরড। অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা এবং দুঃখের মধ্য দিয়ে মুক্তি— তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্রীয় ভাবনা। তিনি মানবচরিত্রের অন্তরালে ডুব দিয়ে মানুষের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে। রাশিয়ান সাহিত্যে তাঁর আসন শেখভ, তুর্গেনিভ, তলস্তয় ও গোর্কির পাশাপাশি। যদিও বক্তব্যে ও আঙ্গিকে তাঁর সমকালীন লেখকদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য কম।



জুয়াড়ীর ভালোবাসা

ফিওদর দস্তয়েভস্কি

কখনো কখনো আমি ঘণ্টা চারেক ধরে পার্ক ও বনের মধ্যে হাঁটতাম। তারপর ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হয়ে শহরে ফিরতাম। একদিন বাগান পেরিয়ে পার্কে ঢুকতেই দেখলাম, একটা সীটে বসে আছে মিষ্টার অ্যাশলী।

এই অদ্ভুত ধরণের ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ প্রুসিয়াগামী একটা ট্রেনে। তারপর ফ্রান্সে ও সুইজারল্যাণ্ডেও দেখা হয়েছে। কিভাবে জেনারেলের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়েছিল আমি জানি না। তবে জেনারেলের সৎ মেয়ে পোলিনা অ্যালেকজ্যান-ড্রোভনাকে উনি ভালোবেসেছিলেন। যদিও ওকে পাওয়ার আশা তার ছিল না। পোলিনা ঘরে ঢুকলে অস্তসূর্যের মত আলো হয়ে উঠতো এই ইংরেজ ভদ্রলোক। অথচ ভালোবাসার কথা উনি মুখ ফুটে বলতে পারেন নি। এবং আমি বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছি, আমি কি পোলিনাকে ভালোবাসি? আমি জবাব খুঁজে পাইনি। অথবা শতবার বলেছি, ওকে আমি ঘৃণা করি। ওর সঙ্গে কথা শেষ করার পর প্রত্যেকবারই এমন একটা মুহূর্ত আসে, যখন আমি ওর গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি, যখন আমি ওর বুকে ধারালো ছোরা বসিয়ে দিতে পারি। অথচ আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি, ল্যানজেনবার্গের পাহাড়চূড়োয় উঠে ও যদি বলে, ঝাঁপিয়ে পরো, আমি আনন্দের সঙ্গে নিচে লাফাবো।

এখন পার্কে বসে আছে মিষ্টার অ্যাশলী। যে মানুষটা কখনো মুখ ফুটে বলতে পারেনি যে সে পোলিনাকে ভালোবাসে। আমাকে দেখে ও কাছে ডাকে। ওর ব্যবহারে মেজাজী ভাব দেখে আমার আনন্দটা একটু কমলো। যদিও ওকে দেখে আমি খুশী হয়েছিলাম।

তুমি এখানে! আমি ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তোমার জীবনে

কি ঘটেছে, সেই গল্প আমাকে শোনাবার কোন দরকার নেই। এক বছর ও আট মাস তোমার জীবন কেমন কেটেছে, আমি সবই জানি।

লোকটা বলে।

যাঃ, পুরোনো বন্ধুদের ওপর দারুণ নজর রাখতো! আমাকে যে ভুলে যাওনি, সেটাই আশ্চর্য। ভালো কথা মনে পড়েছে।

রুলেটেনবার্গে দুশো মুদ্রা ধার শোধ করতে না পেরে যখন জেলে যাই, অচেনা কেউ ধারটা শোধ করে দেওয়ায় আমি ছাড়া পাই। সে কি তুমি?

না। তবে, তুমি ধার শোধ করতে না পেরে জেলে গিয়েছিলে, আমি জানি।

আশ্চর্য, আমি অন্য কোন রাশিয়ানকে চিনি না। তাছাড়া ওরা আমার সাহায্য করবে কেন? রাশিয়ার একজন অর্থোডক্স ক্রিশ্চিয়ান আর একজনকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে। আমি তো ভেবেছিলাম, খ্যাপাটে কোনো ইংরেজের দয়াতেই।

একটু অবাক হল অ্যাশলী। আমাকে নিরাশ ও বিষণ্ণ দেখবে, ও বোধহয় আশা করেছিল।

তুমি তোমার সত্বার স্বাধীনতা ও হাসিখুশী ভাবটা রাখতে পারছো? দেখে খুশী হলাম।

ওর কথার ভাবে মনে হল, ও খুশী হয়নি।

তার মানে নিরাশ ও অপমানিত অবস্থায় আমাকে না দেখতে পেয়ে তুমি বিরক্ত?

আমি হেসে উঠি।

তোমার এই কথার মধ্যে আমি আমার চতুর, উৎসাহী ও সীনিক প্রকৃতির রাশিয়ান বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে খুশী হলাম।

আমার কথার মানে বুঝে ও হাসে।

শুধুমাত্র রাশিয়ানদের মধ্যেই এতসব পরস্পর বিরোধী গুণ একসঙ্গে দেখা যায়। সব মানুষই তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে অপমানিত, হতাশ, বিষণ্ণ রাখতে চায়। বন্ধুত্বের অনেকটা অংশ এর ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তুমি নিরাশ ও বিষণ্ণ নও বলে আমি সত্যিই খুসী হয়েছি। তুমি কি জুয়াখেলা ছেড়ে দেবে?

ওঃ, ড্যাম! যতো তাড়াতাড়ি.......

যে টাকাটা তুমি জুয়ায় হেরেছো, কতো তাড়াতাড়ি তা ফিরে পাবে, তাই না? আমি তাই ভেবেছিলাম। জুয়াখেলা ছাড়া তুমি অন্য কোনো কাজ করো?

না, না......

ও আমাকে জেরা করে। আমি খবরের কাগজ খুলি না, বইয়ের পাতা ওল্টাই না। সুতরাং কোনো জবাব দিতে পারি না।

তোমার দেহমনে মরচে ধরেছে। তুমি তোমার ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, নাগরিক হিসাবে তোমার দায়িত্ব এবং তোমার বন্ধুদের, তোমার সত্যিকার বন্ধুদের ছেড়ে দিয়েছো। সব কিছু বিসর্জন দিয়েছো, শুধু জুয়াখেলা ছাড়া। তুমি তোমার স্মৃতিও হারিয়েছো। তোমার সঙ্গে আমার যখন এর আগে দেখা হয়, তোমার জীবনের একটা উদ্দীপ্ত বাসনার মুহূর্তে তোমায় দেখেছিলাম। সেই অনুভূতি আজ হয়তো তুমি ভুলে গেছ। এখন তোমার স্বপ্ন, তোমার সত্যিকার বাসনা যা কিছু সব রুলোহুইলের সংখ্যাগুলো ঘিরে—।

যথেষ্ট হয়েছে, মিষ্টার অ্যাশলী, আমায় আর ওসব কথা মনে করিয়ে দিওনা। আমি তোমায় বলছি, আমি কিছুই ভুলিনি, আমি সবকিছু, এমনকি স্মৃতিকেও আমার মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমি জুয়াখেলায় জিতবো, আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, তারপর আমি কবর থেকে উঠে আসব।

দশ বছর পরেও তুমি এখানেই থাকবে। আমি যদি বেঁচে থাকি, এখানেই হয়তো আমাদের দেখা হবে। তখন আমি কথাটা তোমার মনে করিয়ে দেবো।

যথেষ্ট হয়েছে। অতীতের কথা আমি যে ভুলিনি তা প্রমাণ করার জন্যেই জানতে চাইছি, মিস পোলিনা এখন কোথায়? ওই কি আমায় জেল থেকে ছাড়িয়েছে? আমি ওর কোন খবর রাখিনা।

না, ও তোমায় জেল থেকে ছাড়ায়নি। ও এখন সুইজারল্যাণ্ডে। তুমি ওর সম্বন্ধে কথা না বললেই আমি খুশী হব।

তার মানে, ও আমাকে আঘাত দিয়েছে?

আমি হেসে উঠি।

মিস পোলিনাকে সব মানুষের চেয়ে বেশী সম্মান দেখানো উচিত। আমি আবার বলছি, ওর সম্বন্ধে তুমি কিছু জানতে না চাইলে আমি খুশী হবো। তুমি ওকে চিনতে না। তোমার মুখে ওর নাম শুনলে আমার নীতিবোধ আহত হয়।

তুমি ভুল বলছো। আমি আর কোন ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলবো? আমাদের স্মৃতি তো ওই নিয়েই। বিরক্ত হয়োনা আমি তোমার ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপার কিছু জানতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই, মিস পোলিনার বাইরের ব্যাপারগুলোর কথা, দু'কথা যা বলা যায়।

নিশ্চয়ই। তবে এই শর্তে যে দু'কথায় প্রসঙ্গটা শেষ হবে। মিস পোলিনা অনেকদিন অসুস্থ ছিল, তার শরীর এখনও ভালো নেই। সে উত্তর ইংল্যাণ্ডে আমার মা-বোনের কাছে কিছু দিন ছিল। তার দিদিমা, সেই পাগলীকে তোমার মনে আছে? সে মারা গেছে। উইলে সাত হাজার পাউণ্ড সে পোলিনাকে দিয়ে গেছে। এখন পোলিনা সুইজারল্যাণ্ডে আমার বিবাহিতা বোনের পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। দিদিমার উইলে ওর ছোট ভাইবোনকে টাকা দেওয়া হয়েছে। তারা লণ্ডনে পড়াশুনো

করছে। পোলিনার সৎবাবা জেনারেল শেষ সময় খুব সেবা করেছিল ব্ল্যাশে। একমাস আগে উনি সন্ন্যাস রোগে মারা গেছেন। পোলিনার দিদিমার উইলে জেনারেল যা পেয়েছিলেন, এখন তার মালিক হয়েছে ওই মেয়েটি।

আর দ্য গ্রুজ? সেই ফরাসী যুবকও বুঝি মিস পোলিনার সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে গেছে?

না। দ্য গ্রুজ সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে যায়নি। সে কোথায় আছে আমি জানিনা। কিন্তু এইভাবে কোনো মহিলার সঙ্গে তাৎপর্য্যপূর্ণ ও অভদ্রভাবে কোনো পুরুষের নাম তুমি জড়ালে ফল ভালো হবে না। তোমার সঙ্গে আমার অতীতের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও?

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার অতীতের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও।

আমি হাজারবার ক্ষমা চাইছি, মিষ্টার অ্যাশলী। কিন্তু আমি তো মিস পোলিনার সম্বন্ধে তাৎপর্য্যপূর্ণ, অভদ্র বা অপমানজনক কোনো ইঙ্গিত করিনি। তাছাড়া আপনি হয়তো বুঝবেনা না, ফরাসী যুবক ও রাশিয়ার যুবতীর মধ্যে যোগাযোগ খুবই স্বাভাবিক।

যদি তুমি ফরাসী যুবক দ্য গ্রুজের নামের সঙ্গে আর একজন মহিলার নাম না জড়াও, আমি জানতে চাই, ফরাসী যুবক ও রাশিয়ান যুবতীর যোগাযোগ বলতে তুমি কি বলতে চাও? যুবক ফরাসীই বা হবে কেন? যুবতী রাশিয়ানই বা হবে কেন?

প্রসঙ্গটা তোমায় উৎসাহ জাগিয়েছে, বুঝতে পারছি। এই প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলা দরকার, যা প্রথমে হয়তো আমি বুঝবোনা। মিঃ অ্যাশলী, ফরাসী পুরুষ এক সুন্দর ঐতিহ্যের পূর্ণাঙ্গ ফসল। আপনি ইংরেজ, হয়তো কথাটা মানবেন না। আমি রাশিয়ান, ঈর্ষার দরুণ কথাটা স্বীকার করবোনা। কিন্তু আমাদের যুবতী মহিলাদের মত অন্য রকম। ফরাসী সাহিত্যিকের রচনা আপনার মতে কৃত্রিম কিন্তু কবি হিসেবে ওঁরা মহৎ, কথাটা তুমি পছন্দ কর বা না কর। ফ্রান্স, বিশেষ করে প্যারীর ফরাসী পুরুষের মধ্যে বৈদগ্ধ্য ও সংস্কৃতির ছাপ। তুলনায় আমাদের এখনো ভাল্লুক বলা চলে। সবচেয়ে নীচুস্তরের ফরাসী পুরুষও ভদ্রতা জানে, কথা বলার ও নিজের ভাবধারা সুন্দরভাবে প্রকাশ করার চমৎকার কায়দা জানে। তার নিজের কৃতিত্বে, তার নিজের আত্মা ও হৃদয়ের কোন গুণে সে এগুলোর অধিকারী নয়। এগুলো উত্তরাধিকারের ব্যাপার। মিঃ অ্যাশলী, তোমাকে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে রাশিয়ান মেয়েদের মত সরল, পরিচ্ছন্ন ও বিশ্বাসী মেয়ে পৃথিবীতে নেই। দ্য গ্রুজ একটা অদ্ভুত ভূমিকায় অভিনয় করছে। সুতরাং সে খুব সহজে একজন রাশিয়ান মহিলার হৃদয় জয় করেছে। তার বাইরেটা সুন্দর। তাই যুবতীরা ভাববে, তার হৃদয় ও আত্মাও সুন্দর। বাইরেটা যে পোষাকের মতো, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, মেয়েরা

তা বুঝবেনা। তুমি হয়তো শুনে খুশী হবে না, তোমাদের ইংল্যাণ্ডের পুরুষদের মধ্যে বাইরের স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য্যের অভাব আছে। অন্যদিকে রাশিয়ান মেয়েরা সৌন্দর্য্যের পিয়াসী। পুরুষের স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও মৌলিকতা খুঁজে পেতে হলে চিন্তার যে স্বাধীনতা প্রয়োজন, তা আমাদের মেয়েদের কাছ থেকে, বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। এবং তার জন্যে অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। ওই বদমাস দ্য গ্রুজের চেয়ে তোমাকে ভালো লাগতে মিস পোলিনার দীর্ঘ সময় লাগবে। তোমার সম্বন্ধে ওর উঁচু ধারণা আছে, ও তোমার বান্ধবী, ও মনের কথা তোমাকে খুলে বলে। কিন্তু ওই নীচ অর্থলোভী শয়তান দ্য গ্রুজ ওর মন জুড়ে আছে। একগুঁয়েমি এবং অহংকার, বলতে পার। এক সময় দ্য গ্রুজের সম্বন্ধে পোলিনার ধারণা ছিল, ওই ফরাসী ভদ্রলোক সুন্দর চেহারার অভিজাত মারকুইস, নিজের বিশ্বাসে আস্থা হারিয়েছে তখন একজন উদারনৈতিক, যে পোলিনার পরিবার ও পোলিনার খামখেয়ালী সৎ বাবাকে সাহায্য করতে যেয়ে নিজের সর্বনাশ করেছে। এসব যে মিথ্যে, তা প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু মিস পোলিনা এখনও দ্য গ্রুজের মধ্যে দেখে তার স্বপ্নের সেই প্রেমিককে। এবং স্বপ্নের প্রেমিককে, কল্পনার দ্য গ্রুজকে ভালোবাসে বলে সে বাস্তবেব লোকটিকে ঘৃণা করে। মিঃ অ্যাশলী তোমার কোম্পানী বোতলে চিনি প্যাক করে—

হ্যাঁ, আমি লভেল অ্যাণ্ড কোম্পানীর পার্টনার।

সুতরাং দেখো, মিঃ অ্যাশলী, একদিকে তুমি বোতলে চিনি প্যাক করো, অন্যদিকে তুমি হতে চাও প্রেমের দেবতা অ্যাপোলো। এক সঙ্গে দুটো ভূমিকা ঠিক মানায় না। আমি বোতলে চিনি ভরিনা, আমি র‍্যুলো-হুইলের অল্প পয়সার জুয়ো-খেলার সামান্য জুয়াড়ী, চাকরেরও কাজ করেছি আমি, মিস পোলিনা তা নিশ্চয়ই জানে, কারণ সে ভালো গোয়েন্দা লাগিয়েছে আমার পেছনে।

তুমি রেগে গেছো। তাই তুমি এইসব আজেবাজে কথা বলছো। যতো পুরোনো, বস্তাপচা, ফালতু হোক, এগুলো সত্যি! যাইহোক, তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না।

ননসেন্স! আমি তোমায় বলছি- -

মিঃ অ্যাশলীর চোখে জ্বলে ওঠে, গলার স্বর কাঁপে—

তুমি অকৃতজ্ঞ, অপদার্থ, অগভীর স্বভাবের অসুখী পুরুষ। তবু শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমায় পাঠিয়েছে মিস পোলিনা। তোমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার জন্য। তুমি কি ভাবছো, কি আশা করছো এবং.........সব কিছু জানার জন্যে।

তাও কি সম্ভব?

আমি চেঁচিয়ে উঠি। আমার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে। আমি নিজেকে সামলাতে পারিনা। জীবনে এই প্রথম আমি কাঁদি।

হ্যাঁ, অসুখী পুরুষ, পোলিনা তোমাকেই ভালোবাসে। কিন্তু তুমি সব হারিয়েছো! পোলিনা তোমাকে আজও ভালোবাসে, একথা জেনেও তুমি এখানেই থাকবে। তুমি নিজেকে নষ্ট করেছো। তোমার কিছু ক্ষমতা ছিল, প্রাণবন্ত স্বভাব ছিল, তুমি খারাপ মানুষ ছিলেনা। তোমার দেশে তোমার মত পুরুষকে প্রয়োজন এবং তুমি তোমার দেশের কাজে আসতে পারতে। কিন্তু তুমি এইখানেই থাকবে এবং এইভাবে জুয়ো খেলে তোমার জীবনটা নষ্ট করবে। তোমায় আমি দোষ দিইনা। তোমাদের রাশিয়ানদের স্বভাবটাই এই রকম। রাশিয়ান পুরুষ যদি রুয়লে-হুইলের জুয়োয় আসক্ত না হয়, তার এইরকম অন্য কোন নেশা থাকবে। এর ব্যাতিক্রম খুবই কম। তুমিই একমাত্র রাশিয়ান পুরুষ নও যে শ্রমের মর্যাদা বোঝোনা। অবশ্য আমি রাশিয়ান কৃষকদের কথা বলছিনা। রুয়লো হুইলের জুয়োখেলা বিশেষ করে রাশিয়ানদের জন্যেই এ পর্যন্ত তুমি সৎ থেকেছো এবং চুরি না করে বরং চাকরের কাজ করেছো। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে, ভাবতে আমার ভয় হয়। যথেষ্ট হয়েছে, বিদায়। নিশ্চয়ই তোমার খুব টাকার দরকার? দশটা স্বর্ণমুদ্রা রইলো। এর বেশী দেবোনা। কারণ তুমি তো সবই জুয়ো খেলে উড়িয়ে দেবে। টাকাটা নাও। বিদায়। টাকাটা নাও—

না, মিঃ অ্যাশলী, তুমি যা বলেছো, তারপর টাকা নেওয়া যায় না।

নাও। আমি বিশ্বাস করি যে তোমার এখনও মর্য্যাদাবোধ আছে এবং এই টাকাটা আমি সত্যিকার বন্ধু হিসেবে বন্ধুকে দিচ্ছি। যদি জানতাম, তুমি জুয়োখেলা ছেড়ে দেবে এবং এই শহর ছেড়ে রাশিয়ায় ফিরে যাবে, নতুন জীবন শুরু করার জন্যে তোমায় আমি এক হাজার পাউণ্ড দিতাম। কিন্তু তোমাকে আমি এক হাজার পাউণ্ড দেবোনা। তোমাকে আমি শুধু দশটি স্বর্ণমুদ্রা দেবো, কারণ তোমার কাছে এও যা এক হাজার পাউণ্ডও তাই। তুমি জুয়ো খেলে সব উড়িয়ে দেবে। টাকাটা নাও। বিদায়!

যাওয়ার আগে আমাকে আলিঙ্গন করতে তুমি যদি রাজী থাকে, টাকাটা আমি নেবো।

ওহ্, আনন্দের সঙ্গে—

আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতির সঙ্গে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরি। তারপর মিঃ অ্যাশলী চলে যায়।

*　　　*　　　*

না, ও ভুল বলেছে! আমি পোলিনার সম্বন্ধে যেমন অমার্জিতভাবে এবং অবিমৃষ্যকারীর মত কথা বলেছি মিঃ অ্যাশলী।

কিন্তু এখন সেটা মূল প্রশ্ন নয়। শুধু কথা, কথা আর কথা। এখন কাজ চাই।

সুইজারল্যাণ্ড। আগামীকাল। যদি.....যদি কালই সুরজারল্যাণ্ডে যাওয়া যেতো। যদি নতুন করে জীবন শুরু করা যেতো। যদি পতন থেকে উঠে আসা যেতো। আমি ওদের দেখিয়ে দেবো, পোলিনা দেখবে, আমি এখনও মানুষ হতে পারি। ইচ্ছে করলে আমি এখনই......

* * *

কিন্তু এখন বড় দেরী হয়ে গেছে। আগামীকাল.....ওহ্, আমার মন বলছে, এবার আমি জিতবো। এখন আমার কাছে পনেরোটি স্বর্ণমুদ্রা। আমি সুরু করেছিলাম পনেরোটা কমদামী মুদ্রা নিয়ে। যদি সাবধানে খেলা যায়—আমি কি এতোই বোকা! আমি কি বুঝতে পারছিনা যে আমি হেরে-যাওয়া মানুষ! কিন্তু আমি আবার উঠতে পারবোনা কেন? হ্যাঁ! জীবনে একবার আমাকে বুদ্ধিমান ও ধৈর্যবান হতে হবে। ব্যাস! আমি আমার ভাগ্য এক ঘণ্টায় মধ্যে বদলে ফেলবো। সবচেয়ে বড় জিনিস হল ইচ্ছাশক্তি। জুয়োয় সর্বস্ব হারার ঠিক সাতমাস আগে রুলেটেনবার্গে আমার ভাগ্য কি হয়েছিল, মনে আছে? ওহ্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় কি না হয়! আমি তখন আমার সর্বস্ব হারিয়েছি। আমি জুয়োর আসর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। দেখলাম, ওয়েস্টকোটের পকেটে একটি মাত্র মুদ্রা। ভাবলাম, কিছু খাওয়া যাবে। কিন্তু একশ কদম যেতেই আমার মন বদলে গেল। আমি ক্যাসিনোয় ফিরে এলাম। ওই একটি মুদ্রা দিয়ে আমি জুয়ো খেললাম। অদ্ভুত একটা অনুভূতি, বিদেশে, স্বদেশ ও বন্ধুদের থেকে দূরে যখন খাবার জুটবে কিনা, তারও স্থিরতা নেই, তখন তুমি তোমার শেষ মুদ্রাটি দিয়ে জুয়ো খেলছো! আমি জিতলাম এবং কুড়ি মিনিট পর আমি যখন ক্যাসিনো থেকে বের হলাম, আমার পকেটে একশ সত্তরটি মুদ্রা। এটা সত্যি। শেষ মুদ্রা দিয়ে, একটি মুদ্রা দিয়ে কখনো কখনো এভাবে জেতা যায়। কিন্তু আমি যদি তখন আশা হারাতাম? আমি তখন যদি ঝুঁকি না নিতাম?—

আগামীকাল—আগামীকাল সবকিছু শেষ হবে।

মূল কাহিনী ☐ দ্য গ্যাম্বলার

গী দ্য মোপাসাঁ

জন্ম ১৮৫০, মৃত্যু ১৮৯৩। ছোট গল্পে বিশ্বসাহিত্যের সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ রূপকার। সাহিত্য জীবনের প্রথম সাত বছর কেটেছিল মাদাম বোভারীর অমর স্রষ্টা ফ্ল্যবেয়ার এবং সমকালের অন্য দুই মহান কথাসাহিত্যিক এমিল জোলা ও তুর্গেনিভের রচনাশৈলী অনুধাবনে। এমিল জোলার অনুরোধেই প্রথম ছোটগল্প লেখেন 'বাটার-বল্'। প্রথম গল্পটিই একটি মাস্টারপীস্। নৈব্যক্তিক আঙ্গিক, মানুষের স্বার্থ-পরতার সম্বন্ধে নিপুণ স্যাটায়ার। তিনশ ছোট গল্প, ছটি উপন্যাস কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন ১৮৮০ থেকে ১৮৯০, এই দশ বছরের মধ্যে। ফরাসী মধ্যবিত্ত সমাজের নৈতিক ধ্যান-ধারনার অন্তঃসারশূন্যতা, নরম্যাণ্ডির কৃষকদের ও জমিদারদের জীবন, নরনারীর যৌনজীবনের নানা দিক— অভিজ্ঞতার আলোয় যেমন দেখেছেন, তেমনি লিখেছেন মোপাসাঁ। এবং ফরাসী বারবধূদের জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে। প্রথমে সিফিলিস ও পরে পক্ষঘাতে আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। প্রেমের আনন্দবেদনা, ব্যভিচার ও দাম্পত্য প্রণয়ের নানা দিক এবং কখনও হাল্কা হিউমারের ছোঁয়ার লেখা, প্রেমের গল্প—মোপাসাঁ তাঁর নায়কনায়িকাদের সবসময়ে দেখেছেন নিরাসক্ত দর্শকের চোখে, তিনি বিচারক হতে চাননি।



নিষিদ্ধ ফল

গী দ্য মোপাসাঁ

বিয়ের আগে নক্ষত্রের আলোয় তারা পরস্পরকে ভালোবেসেছিল। সেই ভালোবাসা ছিল পবিত্র। প্রথম দেখা হয়েছিল সমুদ্রের ধারে। পুরুষ ভেবেছিল, সমুদ্রের পটভূমিতে এই যে গোলাপ-রমনী চকচকে উজ্জ্বল রঙের ছাতা খুলে নতুন পোষাক পরে তার পাশে হাঁটছে, সে অদ্ভুত সুন্দরী। সে এই স্বর্ণকেশী রোগা মেয়েটিকে ভালোবেসেছিল নীল সমুদ্র আর বিশাল আকাশের পটভূমিতে। এবং এই রমনী তার বুকে যে অনুভূতি জাগিয়েছিল, তার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল তার আত্মার গভীরে, তার হৃদয়ের আড়ালে, তার শিরায় রক্তধারায় নোনা হাওয়া, রোদ, জল, সমুদ্রের ঢেউ দেখে জেগে ওঠা তীব্র আবেগ।

রমনীও পুরুষকে ভালোবেসেছিল। কেননা পুরুষ তার দিকে নজর দিচ্ছে, পুরুষ যুবক ও ধনী, ভদ্র ও সভ্য। এবং যুবকরা যুবতীদের প্রেমের কথা বললে যুবতীরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভালোবাসে। তারপর তিন মাস ধরে তারা পাশাপাশি কাটালো। চোখে চোখ রেখে হাতে হাত রেখে। সকালে সমুদ্রস্নানের আগে দেখা হলে তারা পরস্পরকে যে সম্বোধন করতো, সেই আহ্বানে মিশে যেতো নতুন দিনের তাজা সৌরভ। সন্ধ্যায় তারা যখন তারাজ্জ্বলা আকাশের নীচে বালির উপর দাঁড়িয়ে পরস্পরকে বিদায় জানাতো, আসন্ন শান্তি রজনীর উষ্ণ পটভূমিতে তাদের ফিসফিস স্বরে মিশে থাকতো চুম্বনের স্বাদ। যদিও তখনো তারা পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট মেলায়নি। রাতে ঘুমের মধ্যে তারা পরস্পরকে স্বপ্নে দেখতো। ঘুম ভাঙলেই একে অন্যের কথা ভাবত। আর মুখে কোন কথা না বলেও তারা সমস্ত শরীর সমস্ত হৃদয় দিয়ে একে অন্যকে চাইতো।

বিয়ের পর তারা পরস্পরকে পৃথিবীর অন্য সব কিছুর চাইতে ভাল-বাসতো।

প্রথমে সেই ভালোবাসা ছিল উন্মাদ দেহজ কামনার ক্লান্তিহীন দাহ। তারপর জন্ম নিল মৃদু, কোমল ও শান্ত এক আনন্দ—যাকে স্পর্শ করা যায়, এমন এক কবিতার মত— তখন তাদের আদরে কমনীয়তার ছাপ এবং তারা এমন সব উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকতো, যা কখনো কোমল কখনো কঠিন। তাদের চাউনিতে ছিল অশ্লীল কামনার ইঙ্গিত। তাদের অঙ্গভঙ্গীতে ছিল গত রজনীর দেহমিলনের স্মৃতি। তারপর একদিন, যদিও তারা স্বীকার করলো না, যদিও তারা কথাটা বুঝতেও পারলোনা, তারা পরস্পরের সম্বন্ধে ক্লান্ত হয়ে উঠলো। এখনো তারা একে অন্যকে ভালোবাসে। কিন্তু আর তো নতুন কিছু প্রকাশ করার নেই, এমন কিছু করার নেই আগে যা করা হয়নি, পরস্পরের কাছে নতুন শেখার নেই, ভালোবাসার কথা নতুন করে কিছু বলার নেই। অথচ এক কথা বারবার বলার থেকে আগে থেকে অনুমান করা যায়নি এমন কোন অঙ্গভঙ্গী কিম্বা কোন শব্দ কতো বেশী ব্যঞ্জনা বয়ে আনে।

ওরা চেষ্টা করে। প্রথম আলিঙ্গনে শরীরে যে অগ্নিশিখা জ্বলেছিল, সে আগুন আবার জ্বালাতে। ওরা চেষ্টা করে কল্পনা দিয়ে এমন নতুন কিছু সরল বা জটিল পরিস্থিতি তৈরী করতে যেন প্রথম ভালোবাসার সেই অতৃপ্ত পিপাসা ওদের হৃদয়ের গভীরে আবার জেগে ওঠে, যেন ওদের শিরায় জ্বলে ওঠে শয্যার কামনাবহ্নি।

কখনও কখনও, কামনাকে চাবুক দিয়ে জাগিয়ে এক ঘণ্টায় জন্যে ওরা কাল্পনিক উত্তেজনা খুঁজে পায়। কিন্তু তারপরই আসে ক্লান্তি, বিরক্তি মেশানো ক্লান্তি।

ওরা চেষ্টা করে। মিষ্টি রাতে চাঁদের আলোয় পাতার ছায়ায় হাঁটতে। যখন কুয়াশাঘেরা পাহাড় কবিতার মত। যখন বাতাসে উৎসবের উত্তেজনা।

তারপর একদিন সকালে হেনরিয়েটা পলকে বলে—।

'তুমি আমায় সরাইখানায় ডিনার খেতে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, ডীয়ার।'

'তোমার চেনা সরাইখানায়?'

'হ্যাঁ।'

পুরুষ সপ্রশ্ন চোখে তার দয়িতার দিকে তাকায়। সে জানে, তার স্ত্রী এমন কিছু ভাবছে, যা সে মুখে বলেনি।

সরাইখানা—মানেত কিভাবে তোমায় বোঝাবো?—যেখানে পুরুষ ও মেয়েমানুষ অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে দেখা করে।

বুঝেছি, বড় কাফেতে একটা প্রাইভেট ঘর।

তাই, কিন্তু এমন একটা কাফেতে, যেখানে সবাই তোমায় চেনে, যেখানে তুমি আগে ডিনার খেয়েছো—না, নৈশভোজ সেরেছো—

যেখানে তুমি—না, কথাটা বলতে আমার সাহস হয় না।

বলোনা। তোমার আমার মধ্যে গোপন তো কিছু নেই—।

না, আমার সাহস হয় না।

ওহ! বলেই ফেলোনা।

আমি—আমি চাই, সবাই ভাবুক—আমি—আমি তোমার রক্ষিতা। ওয়েটাররা জানবেনা যে তোমার বিয়ে হয়েছে। তারা ভাববে আমি তোমার রক্ষিতা। এবং এক ঘণ্টার জন্যে, ওই জায়গায় যেখানে তুমি আগে—যাকগে, থাক সে কথা, এক ঘণ্টার জন্যে তুমিও ভাববে, আমি তোমার রক্ষিতা। আমি নিজে, আমিও কল্পনা করবো যে আমি তোমার রক্ষিতা, আমি মস্ত বড় একটা পাপ করছি, খারাপ কাজ করছি, তোমাকে ঠকাচ্ছি। যদিও তোমরই সঙ্গে থাকবো। বলতে আমার লজ্জা লাগছে। এমন একটা জায়গা, যেখানে রোজ সন্ধ্যায় পুরুষমানুষেরা মেয়েমানুষের সঙ্গে মেশে, স্ফূর্তি করে, সেইরকম একটা জায়গা।

পুরুষ মজা পেয়ে হেসে ওঠে, বলে।

আজ সন্ধ্যায় আমরা আমার চেনা এইরকম একটা জায়গায় যাবো।

□ □ □

সেদিন সন্ধ্যে সাতটে নাগাদ ব্যুলেভার্দের মস্ত বড় একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল দম্পতি। পুরুষের মুখে বিজয়ীর হাসি। মেয়েমানুষ লাজুক, ওড়নার আড়ালে মুখ ঢাকা কিন্তু হাসিখুশী। একটু পরে ওরা যে ছোট্ট ঘরটায় ঢুকলো, সেখানে চারটে আর্মচেয়ার আর লাল ভেলভেটে ঢাকা মস্ত বড় একটা সোফা। কালো পোষাক পরা স্টুয়ার্ড ভেতরে ঢুকে মেন্যুটা সামনে ধরে।

তুমি কি খাবে?

জানিনা, এখানে ভালো খাবার কি আছে?

মেন্যুটা পড়তে পড়তে ওভারকোট খোলে পল, ওভারকোটটা ওয়েটারের হাতে দেয়। তারপর অর্ডার দেয়—বিস্ক্ স্যুপ, ডেভিলড চিকেন, খরগোসের মাংস, অ্যামেরিকান স্টাইলে রাঁধা হাঁস, ভেজিটেবল স্যালাড আর ডেসার্ট।

মসিঁয় পল কি করডিয়্যাল নেবেন না শ্যাম্পেন?

ওয়েটার হাসে।

শ্যাম্পেন, একেবারে শুকনো।

ওয়েটার স্বামীর নাম জানে দেখে খুশী হয় হেনরিয়েটা। ওরা সোফায় পাশাপাশি বসে খেতে থাকে। ঘরে দশটা মোমবাতি জ্বলছে। মস্ত বড় আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে আলো। আয়নার কাচে হাজার হাজার নাম হীরের ফলায় লেখা স্বচ্ছ কাচের ওপরে মস্ত বড় মাকড়সার জালের মত দেখাচ্ছে।

গ্লাসের পর গ্লাস শ্যাম্পেন গলায় ঢালছে হেনরিয়েটা। প্রথম থেকেই যদিও তার ঘোর লাগছে। অতীতের কিছু স্মৃতি মনে আসায় পলও উত্তেজিত। সে স্ত্রীর হাতে বারবার চুমু খাচ্ছে। তার চোখ দুটো ঝকঝকে, উজ্জ্বল। পরিস্থিতিটা রোমাঞ্চকর। হেনরিয়েটাও উত্তেজিত ও সুখী, তবে সে যেন পাপ করছে এই অনুভূতিটা তার আছে। ওয়েটাররা গম্ভীর, নীরব, অনেক কিছু দেখতে এবং সবকিছু ভুলে যেতে অভ্যস্ত তারা, শুধু প্রয়োজনের সময় তারা ঢোকে, নায়ক নায়িকার আবেগের মুহূর্তে তারা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়।

ডিনারের মাঝামাঝি সময় নাগাদ মাতাল হয়ে যায় হেনরিয়েটা। হাসিখুশী পল তার হাঁটুটা জোরে টিপে দেয়। এখন তার স্ত্রীর গাল দুটো লাল, চোখে ঘোর লেগেছে, সে নেশার ঘোরে কথা বলছে—।

পল, এবার সত্যি কথা বল। আমি সব শুনতে চাই। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তোমার অনেক রক্ষিতা ছিল, তাই না? কতো জন ছিল, বলনা—।

তা কি বলা যায়?

সংখ্যায় গোনা যায় না, এতো বেশী! বছরে কতো জন?

কোনো বছর কুড়ি-তিরিশ জন, কোনো বছর চার-পাঁচ জন।

তার মানে একশরও বেশী!

তা কাছাকাছি হবে।

কি বিশ্রী!

বিশ্রী কেন?

বিশ্রী—মানে ওইসব মেয়ে, উলঙ্গ, সবারই সঙ্গে একই কাজ করা। একশরও বেশী মেয়ের সঙ্গে।

যদিও একশো মেয়ের সঙ্গে কাজটা করা বিশ্রী হয়, তাহলে একজনের সঙ্গে কাজটা করাও তো খারাপ। না। কারণ একটি মেয়ে ব্যাপার হ.ল ভালোবাসার বাঁধনের প্রশ্ন ওঠে। একশো মেয়ে মানে নোংরামি।

না, ওই মেয়েরা খুব পরিস্কার।

বেশ্যারা কখনও পরিষ্কার হয়?

ব্যবসার খাতিরেই ওরা পরিষ্কার থাকে।

কিন্তু অন্য লোকেও ওদের সঙ্গে রাত কাটায়। সেকথা ভাবলে ঘেন্না হয় না।

একটা গ্লাস থেকে আগে কে জল খেয়েছে জানিনা, ভালো করে ধোয়া হয়েছে কিনা, তাও জানিনা, তবু তো সেই গ্লাস থেকে জল খাই।

আচ্ছা তোমার রক্ষিতারা, মানে একশো জনই বেশ্যা ছিল?

না, কেউ ছিল অভিনেত্রী, কেউ চাকরী করতো, কেউ বা ভদ্রমহিলা?

ভদ্রমহিলা কজন ছিল?

· দু'জন।

বেশ্যাদের থেকে সুন্দর?

না।

তুমি কাদের পছন্দ করো? বেশ্যাদের না ভদ্রমহিলাদের?

বেশ্যাদের।

ইস, কি নোংরা!

এমেচারের চেয়ে পেশাদারই ভালো।

আচ্ছা, একটা মেয়ে ছেড়ে আর একটার কাছ যেতে তোমার মজা লাগতো? কেন? সব মেয়েমানুষই তো একরকম?

না, কারো সঙ্গে কারো মিল নেই।

শরীরের দিক থেকে?

হ্যাঁ, শরীরের দিক থেকেও।

আর কিসে?

ধরো, জড়িয়ে ধরা, কথা বলা, এমনকি তুচ্ছ কথা বলা—সব কিছুই আলাদা।

এবং সঙ্গিনী বদলাতে ভালো লাগে?

হ্যাঁ।

তাহলে কি এক পুরুষের থেকে অন্য পুরুষও আলাদা?

তা আমার জানার কথা নয়।

ওরাও নিশ্চয়ই আলাদা।

হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই।

হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস, কি যেন ভাবে হেনরিয়েটা। তারপর একচুমুকে শ্যাম্পেনটা খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা টেবিলে রেখে সে স্বামীকে দুহাতে জড়িয়ে বলে— আমি তোমায় ভালোবাসি। তার স্বামী তাকে কামনামধুর আলিঙ্গনে বাঁধে—

ওয়েটার ঢুকতে যেয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়। পাঁচ মিনিট আর কোনো ওয়েটার আসে না।

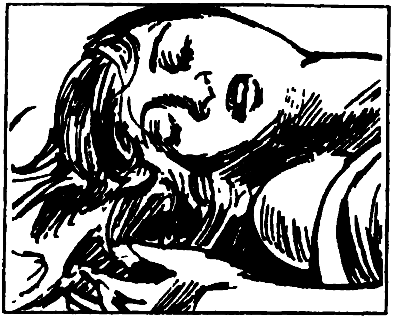
তারপর গম্ভীরভাবে ফলের প্লেট হাতে ভেতরে আসে স্টুয়ার্ড।

তখন হেনরিয়েটার হাতে আর এক গ্লাস মদ।

সে গ্লাসের স্বচ্ছ হলুদ পানীয়ের তলার দিকে তাকিয়ে আছে যেন সে অজানা, স্বপ্নে-দেখা কিছু জিনিষ সেখানে দেখতে পাচ্ছে। ভাবনা জড়ানো গলায় সে ফিসফিস করে বলে—

ওহ্। হ্যাঁ। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব মজার—

মূল গল্প □ দ্য ফরবিডেন ফ্রুট



জোয়েত

গী দ্য মোপাসাঁ

কাফে রিচি থেকে বেরিয়ে এসে জাঁ দ্য সারভিনি লিঅঁ সেভেলকে বলল, "এখন এক্কা ভাল লাগবেনা। যদি আপত্তি না থাকে, চল হেঁটেই যাই।"

বন্ধু বললোঃ বেশ তো আমার বরং ভালোই লাগছে"।

তরুবীথিতে অশান্ত জনতার কলগুঞ্জন। এ দৃশ্য গ্রীষ্মের প্রতিটি রাতের। মাঝখানে ছোট গোল টেবিল—বোতল ও পানপাত্রে ঠাসাঠাসি।

দুই বন্ধু চলেছে ধীরে ধীরে। তাদের পরণে সান্ধ্য পোশাক, হাতে ওভারকোট, ভোজন শেষে পরিতৃপ্ত, ধূমপানে রত বন্ধু যুগল মোলায়েম বাতাসের সুখ-স্বাদ নিয়ে জনতার ভিড় কাটিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাচ্ছে। স্কুল জীবনের দুই বন্ধু। অন্তরঙ্গ, বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত। জাঁ দ্য সারভিনি চেহারায় ছোট, ছিপছিপে, দুর্বল কিন্তু ভারী সুশ্রী। স্বভাবে সহানুভূতিশীল অথচ বেপরোয়া। সুখ সন্ধানের জন্য বিভিন্ন প্রবৃত্তির স্রোতে গা এলিয়ে ভেসে যাওয়াই তার স্বভাব ধর্ম।

তার বন্ধু লিঅঁ সেভেলও ধনী। অত্যুজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী। পথে ঘাটে মেয়েরা তার দিকে এক নজর না তাকিয়ে থাকতে পারে না। প্রতিটি বিষয়ে বাড়াবাড়িটুকু তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য। অনেক হৃদয় বিদীর্ন করার গৌরবের সে অধিকারী।

বাঁদভিলে পৌঁছে সেভেল প্রশ্ন করলো, "মেয়েটি জানে তো যে আমি যাচ্ছি; মেয়েটি সত্যিকারের কে?"

"একজন ভুঁইফোঁড়" বন্ধুর জবাব, "মস্ত ঠগ, লোভনীয় এক শয়তানী। কোথা থেকে এবং কি করে ঈশ্বর জানেন, এই ভুঁই চাপাটি হঠাৎ একদিন পৃথিবীতে গজিয়ে উঠে অস্বাভাবিক দক্ষতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। লোকে বলে তার কুমারী জীবনের নাম ছিল ওকতেভি বারদিন। নামের আদ্যাক্ষর রেখে আর পদবীর

শেষ অক্ষর বাদ দিয়ে এখন নাম দাঁড়িয়েছে ওবারদি। কামনা করার মতোই মেয়ে। বছর তিনেক আগে সবুজ ছায়ার দেশ কোয়ারতিয়ার দ্য ইতোইলে সে বাসা নিয়েছে। আর গোটা মহাদেশের যত অপদার্থ—তাদের সকলের অবারিত দ্বার।

তার বাসায় আমি যে কি করে গিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। বোধহয় সেখানে জুয়ার আড্ডা জমে বলে, বোধহয় পুরুষ স্বভাতই বদ আর মেয়েরা সুগম বলে। এই জমকালো দস্যুদের আমার ভালোই লাগে। ওদের অর্ধাঙ্গিনীরাও প্রায়ই রূপসী। কিছু বিজাতীয় অসংযমের ছাপ, মনে ধরার মতো নিটোল দেহ, জৌলুষে মাথা ঘুরে যায়, মন মাতানো, নেশা-ধরানো সৌন্দর্যে বুকে তুফান ওঠে। শ্রীমতিদেরও আমি সমীহ করি।

মারসিঅনেস ওবারদি এই মোহিনী যাদুকরীদের একজন। একটু ভাঁটার টান ধরেছে, কিন্তু গোল্লায় দেবার পক্ষে যথেষ্ট—মজ্জায় মজ্জায় দুষ্টুমি। তার ঘরে মজা লুটবার অঢেল উপকরণ।"

"তুমি কি ওর প্রেমে পড়েছ? সেভেল জিজ্ঞেস করলো। সারভিন জবাব দিলো, "না পড়িনি, পড়বোও না। তার মেয়েটির জন্য আমি ওখানে যাই।"

এখন সেই মধ্যমণি, দীর্ঘাঙ্গী, অপূর্ব রূপ, কিশোরী—সবেমাত্র আঠার, লাস্যময়ী, রসিকা, প্রাণবন্ত নাচের নেশায় মশগুল, ওবারদির কাছে এখন মেয়ে সম্পত্তি। এই সম্পত্তি দখল করা সহজ নয়, তবে ভাগ্যক্রমে সুযোগ যদি মেলে ছাড়বো না।

মেয়েটির নাম জোয়েত। ওকে দেখলে আমি দিশেহারা, ও এক রহস্য। সে অনন্যা, যেন কোন দুঃসাহসিকা যাত্রিনীর সঙ্কট মুহূর্তে জন্মলাভ করে উর্বর জমির ওপর সুন্দর সতেজ চারা গাছটির মতো স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠেছে। ও আমার মধ্যে আলোড়ন জাগায়, আমাকে অস্থির করে। ওর আকর্ষণ যেমন দুর্বার, ওর প্রতি আমার শঙ্কাও তেমনি প্রবল। ওর আসন আমার মনে পাকা হয়ে গেছে, সত্যিই বোধহয় ভালোবেসে ফেলেছি। চারিদিক থেকে ওর ছায়া আমাকে ঘিরে রেখেছে এমন কি অন্তরের মধ্যে ও। তবু আমার প্রেম প্রাচীন পন্থী। ওকে ব্যাকুল প্রত্যাশায় ধরে রাখতে চাই, তবু ওকে বিয়ে করা বোকামি বলেই মনে হয়। এক এক সময় মনে হয় আমাকে ভালোবাসে। আবার বিদ্রূপ করতে ও ছাড়ে না। গল্পের বইয়ের অসম্ভব ঝোঁক, আপাতত আমি ওর পুস্তক সংগ্রাহক।

অপেক্ষা করে আছি, সত্যি এমন করে আর কারও জন্যে কোনদিন প্রানের টান অনুভব করিনি। আরও কয়েকজন আছে, প্রেমের দৌড়ে এরা প্রত্যেকেই অংশ নিয়েছে।

এদিকে মারসিঅনেস সদা সতর্ক। মনে হয় আমার ওপর কিছুটা প্রসন্ন। কেননা আমি যে ধনী তা জানে। ওদের বাড়ির মতো এত সুন্দর স্থান আমি আর দেখিনি।

ওটা যেন রূপের হাট। পসারিনী মারসিঅনেস যত সব সুন্দরীদের সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে উচ্চমূল্যের আশায়।"

সারভিনি বলল যে সেখানে গিয়ে বন্ধুকে সে কাউন্ট সেভেল বলে পরিচয় দেবে। তারা রূ দ্য বেরির দিকে এগিয়ে এসে একটি সুন্দর অট্টালিকার দ্বিতলে উঠে এলো। ফুল আর রমনী দেহের সুবাসে বাতাস রীতিমত ভারী। প্রথম ঘরটিতে প্রমীলাকুলের সমাবেশ। উন্মুক্তবক্ষের প্রদর্শনীতে নয়নের পরিতৃপ্তি—শ্বেত জালি বস্ত্রের আবেষ্টনীতে যেন অনন্তসমুদ্র তরঙ্গায়িত। গৃহকর্ত্রী তিনজন বন্ধুর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। সুদীর্ঘ লাবন্যময় অবয়ব, স্বাস্থ্যবতী। দেহের ভাঁজে সামান্য শিথিলতা এলেও প্রকৃত সুন্দরী—কমনীয় অথচ মাদকতায় ভরা। তার মধুর বচন পুরুষ-হৃদয় জয় করবার উপযুক্ত। তার প্রসারিত করপদ্মের ওপর সারভিনি চুম্বন করলো। অন্যান্য নামকরা অভ্যাগতদের আগমন শুরু হয়েছে। মহিলা এবার মায়ের গাম্ভীর্য নিয়ে সারভিনির দিকে ফিরে বললো, "পাশের ঘরে আমার মেয়ে রয়েছে, আপনারা ওখানে গিয়ে গল্পগুজব করুন। সারভিনি বন্ধুর হাত ধরে বললো, "এখানে তোমাকে পরিচালনার দায়িত্ব আমার। দেখতেই পাচ্ছ এখানে বাসী, তাজা সব রকম মাংসের হরেক রকম বাজার। আর ঐ কোনে নাচের আসর, পবিত্রতার মন্দির। যদি বিশ্বাস কর, এখানকার সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কন্যারাই ওখানে আছে। সবচেয়ে কোন থেকে দ্বিতীয় ঘরটির দরজায় এসে তারা থামলো। নাচের বাজনা বাজছে, প্রায় পনেরো জোড়া স্ত্রী পুরুষ জোড় বেঁধে নেচে চলেছে। পুরুষেরা গম্ভীর কিন্তু সঙ্গিনীর ওষ্ঠে হাসির রেশ। মায়েদের মতো কন্যাদেরও দেহের অধিকাংশই অনাবৃত।

হঠাৎ এক দীর্ঘাঙ্গী তরুনীর চমক ভাঙলো। সুদীর্ঘ পরিচ্ছদের ভূলুণ্ঠিত প্রান্ত ভাগ বাঁ হাতে সামলে নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো, দ্রুত পায়ের তরঙ্গ তুলে। এগোতে এগোতে সে চেঁচিয়ে উঠল, "ওঃ, এই যে মাস্কেদ। তুমি কেমন আছ মাস্কেদ?" তার সোনার বরণ শরীরে তাম্রবর্ণের অতি ক্ষুদ্র রোমের আচ্ছাদন। উজ্জ্বল আগুন রংয়ের নরম রেশমের মতো একরাশ চুল ললাট বেয়ে নেমে এসে সুকোমল গ্রীবা বেষ্টন করেছে। ওর এই সচল গতিভঙ্গী, মস্তকের হিন্দোল এক অনাস্বাদিত আনন্দ ও দেহসুখের আমেজ এনে দেয়।

সারভিনি এমন প্রচণ্ড আবেগে তার করমর্দন করলো যেন সে নারী নয়, পুরুষ। পরে বললো, "মামজেল জোয়েত, এ আমার বন্ধু—ব্যারন সেভেল।" নবাগতকে অভিনন্দন জানিয়ে জোয়েত সারভিনিকে অনুরোধ জানালো নাচের জন্য। সারভিনি মুখে কিছু না বলে তার কটিতট বেষ্টন করে দমকা ঘূর্ণি বাতাসের মতো এক ঝটকায় সামনে এগিয়ে গেল। এঁকে বেঁকে, নানা অঙ্গভঙ্গী করে তারা মাদকতায় সকলের

চেয়ে দ্রুতলয়ে নেচে চললো; সবল নিষ্পেষণে দু'টি দেহ এক হয়ে গেল। যেন পদতলে লুক্কায়িত কোন যন্ত্রের অমোঘ শক্তিবলে তাদের দেহের উর্ধাঙ্গ দৃঢ় সম্পৃক্ত, আর পদযুগল সচল, একে একে সবাই বসে পড়লো কিন্তু তারা যেন ক্লান্তিহীন— বাজনার তালে তালে নেচেই চললো। মনে হলো তাদের চেতনা বিলুপ্ত।

জোয়েতের মুখে লজ্জার আবির, নিঃসঙ্কোচ ভাবটি অন্তর্হিত। দৃষ্টি উজ্জ্বল অথচ স্তিমিত। গাঢ় কৃষ্ণ আঁখি পল্লবের ছায়ায় নীল নয়নতারা। ক্লান্ত সারভিনি ধাতস্থ হবার জন্য দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

এদিকে সেভেলও নিঃসঙ্গ ছিলনা, মারসিঅনেস ওবারদি তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল। তার সুধা-ঢালা কণ্ঠস্বরে যত সব তুচ্ছ বস্তুর আলোচনায় সেভেলের কানে মায়াজাল বিস্তার করছিল। সারভিনিকে দেখে সে হেসে বলল : "ওহে ডিউক, শুনেছ আমি কয়েক মাসের জন্য বোগিভাতে একটা বাংলো ভাড়া নিয়েছি, তুমি মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে আমাদের খোঁজ খবর নেবে, তোমার বন্ধুটিরও নিমন্ত্রন রইল। আগামী সোমবার আমরা যাচ্ছি।"

সারভিনির ব্যাকুল দৃষ্টি জোয়াতের মুখে এসে পড়লো। অতি নিশ্চিত ও প্রশান্ত হাসি হেসে খুব জোর দিয়ে জোয়েত বলে উঠলো, "শনিবার ডিনারে মাস্কেদ আসবেই, আর জিজ্ঞেস করতে হবে না।" সারভিনি দেখলো, ওই হাসিতে অস্ফুট প্রত্যয় আর কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা।

সারভিনি সেভেলের হাত ধরে বললো, "চল খানিকক্ষণ গ্রীকদের দেখে আসি।" তারা জুয়ার আড্ডার দিকে চলল।

প্রত্যেকটা টেবিলের চারপাশে বহু লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কারো মুখে কথা নেই। মাঝে মাঝে শুধু নিক্ষিপ্ত মুদ্রার ঝনৎকার। বড় ঘরটা পেরিয়ে তারা বাইরে বেরিয়ে এলো। সারভিনি বললো, "এখানকার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হলো?

"চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। তবে লোকগুলোর চেয়ে মেয়েরাই বেশী আকর্ষনীয়।' সেলুনের সামনে দিয়ে হাঁটলে যেমন এক বিশেষ ধরণের প্রসাধনীর গন্ধ নাকে আসে, এদের সামনে গেলেও তেমনি ভালোবাসার এক ধরণের আমেজ আসে।"

সাঁজেলিজেতে যখন তারা ফিরে এলো, তারায় ভরা উন্মুক্ত আকাশ-তলে আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি জোড় পড়েছিল। সারভিনি বিড়বিড় করে বলে উঠলো, "মানুষের জীবনে অপরিহার্য হলেও ভালোবাসা ব্যাপারটা নেহাৎ জঘন্য। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি অথচ প্রতিবারেই নতুন। আমি ওবারদির মতো কারও কাছ থেকে দশ হাজারের বিনিময়ে যা পেতে চাই, ওই মেয়েটিকে এক ফ্রাঁ দিয়েই কুষ্মাণ্ডটা তাই পেয়ে যাচ্ছে।" একটু থেমে আবার বললো, "তবে যাই বলো না কেন, জোয়েতের প্রথম প্রেমিক হওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়।" রয়েলের মোড় এসে পড়তে সেভেল শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

□ ২ □

ছোট একটা পাহাড়ের কোলে মারসিঅনেস ওবারদির নতুন বাংলো ভিলা প্রিতেমস। বাগানের পাঁচিলের পা ছুঁয়ে স্যেন নদী বাঁক নিয়ে সোজা চলে গেছে মার্লির অভিমুখে। নদীমুখী বারান্দায় একটি টেবিল পাতা। এমন শান্ত সন্ধ্যায় চারিদিকে অনুচ্চার সুখের পরশ। নদীর বুকে রক্তরাগ ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল। ধীর প্রশান্ত পদে রাত্রি ঘনিয়ে এলো। নিস্তব্ধ নিঝুম পরিবেশ।

ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে এসে খাবার টেবিলে বসে তাদের মনে আনন্দধারা বয়ে গেল। নদীবক্ষের ওপর অতুলনীয় সন্ধ্যায় মুখোমুখি বসে খাওয়ার পরম সুখ তাদের মন মাতিয়ে দিলো।

চারজনের ছোট পার্টি। মারসিঅনেস সেভেলের হাতে হাত রেখেছে, জোয়েত রেখেছে সারভিনির হাতে। মহিলা দুটির স্বভাবসিদ্ধ শহুরে ভাব অন্তর্হিত। পরিবর্তনটা জোয়েতের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতো। সে বিষন্ন, গম্ভীর, কথা বলছিল খুবই কম। তার পরণে সাদা পশমের পোশাক। বিভিন্ন অলঙ্কারে আপাদমস্তক সজ্জিত। সুপরিসর শিথিল বক্ষ-আবরণীতে দৃঢ়তার পরিবর্তে তার স্বাভাবিক তরঙ্গায়িত সুডোল উরোজযুগল রেখায় রেখায় উদ্ভাসিত। দীর্ঘ কোমল মৃণাল গুচ্ছের মতো গ্রীবাদেশে অপূর্ব দ্যুতি।

অনেকক্ষণ মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থেকে সারভিনি বললো, "আজ রাতে তুমি অপরূপা, প্রতিদিন যেন তোমায় এই রূপেই দেখি।"

মারসিঅনেস আজ বড় সুখী। তার আগাগোড়া কালো পোশাকের ভাঁজে ভরা দেহের প্রতিটি কারুকার্য সুস্পষ্ট, সুন্দর। আজ রাতে যেন তার তনুমনে আগুনের পরশ লেগেছে। তার জ্বলন্ত দৃষ্টি সেভেলের ওপর ন্যস্ত হলো এবং কিছুক্ষণ চারচক্ষু এক হয়ে থাকলো। টেবিলের নিচে অলক্ষ্যে এক মৃদু আলোড়ন ঘটে গেল।

দ্বীপের পরপারে সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু আকাশ জুড়ে যেন হোলি খেলা। নদীর বুকেও রংয়ের ছোপ। জোয়েতের দৃষ্টি দিগন্তে প্রসারিত। তার মায়ের একটি হাত সেভেলের হাতে যেন আনমনে এসে পড়েছে। কন্যার চোখ পড়তেই মারসিঅনেস দ্রুত হাত সরিয়ে পোশাকের মধ্যে গুটিয়ে নিল। সারভিনির দৃষ্টি এড়ায়না কিছুই। সে বললো, "মামজেল তোমার ইচ্ছা থাকলে আমরা খাওয়ার পর ঐ দ্বীপে বেড়াতে যাব।" খুশীতে নেচে উঠে জোয়েত রাজী হলো। আবার সব চুপচাপ। জীবনের কোন দুর্লভ মুহূর্তে হৃদয় হয় মূক।

অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ঘরে বাতি দেওয়া হলো। অদ্ভুত বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়লো। সারভিনির প্রস্তাব জোয়েত ভুলে যায়নি। বললো, "এবার তাহলে দ্বীপ থেকে ঘুরে আসা যাক।"

মৃদু গলায় তার মা বললো, "খেয়াঘাট পর্যন্ত আমরাও যাচ্ছি, তোমরা কিন্তু বেশি দেরি কোরো না, বুঝেছ?"

চতুর্দিকে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। সরু পায়ে চলা পথে দু'জন দু'জন করে হাঁটছে। নদী তীর বরাবর ভেককুলের অবিরাম উল্লাসধ্বনি আর উর্ধ্ব আকাশে অসংখ্য নাইটেঙ্গেলের মধুর ঐকতান হোলো তাদের পথের সাথী।

হঠাৎ একসময় জোয়েতের খেয়াল হলো পেছনে ওরা আর আসছে না। সামনে সরাইখানার আলো দেখা গেলো। ঘাটে বেশ চওড়া একটা নৌকোয় উঠে বসে তারা হাঁকডাক শুরু করে দিল। ঘর থেকে মাঝি বেরিয়ে এলো। দাঁড় আর লগির ঠেলায় তরতরিয়ে তরী এগিয়ে চললো। ওপারে নেমে বিশাল বিশাল গাছের তলা দিয়ে তারা হাঁটতে শুরু করলো। ঘন পাতার আড়ালে অসংখ্য নাইটিঙ্গেল। সারভিনি জোয়েতের হাত ধরলো, আলতো করে তার কোমর জড়িয়ে একটু চাপ দিয়ে বললো, 'কি ভাবছো?'

'আমি? কিছুই না, বড় ভালো লাগছে।' সারভিনি ধীরে ধীরে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো। জোয়েতও বাধা দিল, নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। তার নরম পশমী পোশাকের ওপর দিয়ে মোলায়েম ও মসৃন স্পর্শে যেন উত্তপ্ত দেহের স্বাদ। সারভিনি জোয়েতকে জানালো যে, সে তাকে ভালোবাসে এবং অনেক দিন থেকে।

জোয়েত পৃথক হতে চেষ্টা করলো। দুটি দেহের মাঝে বন্দী তার হাতটিকে মুক্তি দিতে চাইলো। পুরুষের নিষ্পেষনে আর নারীর বিচ্ছিন্ন হবার প্রয়াসে তারা মাতালের মতো এঁকে বেঁকে হেলে দুলে পথ চলতে লাগলো।

সারভিনি দ্বিধাগ্রস্ত, এমন পরিবেশে একজন অভিজ্ঞা রমনীকে যে কথা বলা চলতো, এই তরুনীকে সেভাবে বলা যায় না। সে বুঝতে পারলো না তার উষ্ণ, ঘনিষ্ঠ ও অথপূর্ণ রসিকতায় জোয়েত সম্মতি দিয়েছে অথবা আদৌ বুঝতে পারেনি। সে ক্রমাগত অনুরোধ জানালো, "জোয়েত, কথা বল জোয়েত।" তারপর কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ একটি দুঃসাহসিক চুম্বন মুদ্রিত করে দিল তার কপালে। তাকে রাগ করতে না দেখে সারভিনির সাহস বেড়ে গেল। জোয়েতের ঘাড়ে গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল, কতদিনের আকাঙ্খিত সেই দুর্লভ স্থানটিতে সে তার ঠোঁট দুটি নামিয়ে আনলো। হিতে বিপরীত, জোয়েত সবটুকু শক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো। কিন্তু দৃঢ় বেষ্টনে তাকে বেঁধে ফেললো সারভিনি। অপর হাতে তার গলা জড়িয়ে জোর করে তার মাথা নিজের বুকে চেপে ধরে সুদীর্ঘ সময় ধরে আকণ্ঠ চুম্বন সুধা পান করে মাতাল হয়ে গেল।

শরীরটাকে দুমরে মুচড়ে এক সময় তার হাতের ফাঁক দিয়ে জোয়েত সারভিনির

বলিষ্ঠ বন্ধন থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর এক ঝাঁক উড়ন্ত পাখার ঝট্‌পটের মতো পোশাকের শব্দ তুলে ছোট ছোট ক্ষিপ্র পদে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে সারভিনি হতভম্ব। নিশ্চিদ্র অন্ধকারে কেবল নদী তীর জুড়ে একটানা দাদুরীর বিষণ্ণ আর্তনাদ। সে তন্নতন্ন করে জোয়েতকে খুঁজে চললো। কাফে লা গ্রেনোইলের কাছাকাছি এসে তার কানে এলো ঘন্টাধ্বনি। মধ্যরাত্রির সময়-সংকেত। ভাবলো, এতক্ষণে নিশ্চয় জোয়েত বাড়ি ফিরে গেছে, পুল পেরিয়ে দুরুদুরু বক্ষে সে ঘরে ফিরলো এবং খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে রাত দশটার আগেই জোয়েত বাড়ি ফিরে এসেছে। সারভিনি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম এলো না। সেই ছিনিয়ে নেওয়া চুমুটিই ওবে এমন বিগড়ে দিয়েছে। কি জ্বালাময় সৌন্দর্য। এ যাবৎ সারভিনি যত মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে তাদের দৈনন্দিন একঘেয়েমিতে জীবনের সব বৈচিত্র্য হারাতে বসেছিল। এই লাবন্যময়ী চঞ্চলা মেয়েটি তার জীবনে নতুন স্বাদ এনে দিল, সে বাঁচার অর্থ খুঁজে পেল। ঘড়িতে একটা বাজলো, দুটো বাজলো। সে বুঝলো আজ আর ঘুমের আশা নেই। নিশ্চুপ থমথমে কালো রাত্রি। হঠাৎ সেভেলের গলার স্বর ভেসে এলো। সারভিনি সেভেলকে অভিনন্দন জানিয়ে কাছে বসিয়ে তার ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা বিবৃত করে বললো, "দেখ ওই কিশোরী আমায় বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। বয়স্ক প্রাজ্ঞ প্রেমিকাকে বোঝা সহজ কিন্তু কিশোরীর মন দুর্বোধ্য। এখন তো মনে হচ্ছে আমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে।"

নড়ে চড়ে বসে সেভেল বললে, "সাবধান বৎস। ও তোমাকে বিয়ে করেই ছাড়বে।" গেট খুলে তারা নদীতীর ধরে মার্লির দিকে এগিয়ে চললো। প্রশান্ত গম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্ত। প্রকৃতি বিশ্রামের কোলে শায়িত, গভীর নিদ্রায় অভিভূত। সারাভিনি দার্শনিকের মতো ভাবে বিভোর হয়ে এক সময় বলে উঠলো, " দেখ এই তরুনী আমায় পাগল করে দিয়েছে। কোন একটি রমনী সত্তায় মিলে মিশে একাকার হয়ে নিজের হৃদয় মন উজাড় করে দিয়ে তার সত্তার গভীরে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া, শুধু দৈহিক আলিঙ্গন নয়—দুটি হৃদয়ের ঐহিক ও পারমার্থিক মিলনের কথাই বলছি। অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পরও তার নিভৃত অন্তরের সামান্যতম রহস্যের সন্ধানও মিলবে না, তার বারি বিন্দুর মতো স্বচ্ছ চক্ষুর অন্তরালবর্তী গোপনতা অনুদঘাটিতই থেকে যাবে। জোয়েত এক অপার রহস্য, কাল সকালে আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে কে জানে।" মার্লির কাছাকাছি আসতে আকাশ পরিষ্কার হলো। সেভেল বললো, "চলো ফেরা যাক।" সারভিনি যখন ঘরে পা দিল, খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পেলো পুব দিগন্ত জুড়ে গোলাপী আভা। বিছানায় ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না। সারাক্ষণ জোয়েতের স্বপ্ন।

একটা অদ্ভুত স্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ জানালার পাল্লায় অবিশ্রান্ত বিকট আওয়াজ হতে থাকায় সে গিয়ে জানালা খুলে দিল। বাগানের পথে দাঁড়িয়ে জোয়েত তার জানালায় পাথরের নুড়ি ছুড়ছিল। তার পরনে হলদে পোশাক, মাথায় সেপাইয়ের মতো পালক-গোঁজা চওড়া ঘাসের টুপি, মুখে দুষ্টুমি ভরা বিদ্রূপের হাসি। কয়েকটি কথা বলার জন্য সে সারভিনিকে কাছে ডাকলো।

বাগানে নেমে সারভিনি দেখলো যে হাঁটুর ওপর একটা গল্পের বই খুলে সে বসে আছে। যেন গত রাতে কিছুই হয়নি এমনি সহজ সহৃদয়তায় খুশী হয়ে জোয়েত সারভিনির একটি হাত নিজের মুঠোয় ভরে নিয়ে বাগানের কোনের দিকে এগিয়ে চললো। জোয়েতের সারা দেহ ঘিরে এক হালকা মধুর স্নিগ্ধ সুবাস। সারভিনির মুখের খুব কাছে তার মুখ। তার নির্মল প্রশ্বাসে সারভিনির মুখ তৃপ্ত, বুক কানায় কানায় ভরে উঠলো। ওরা গ্রেনোইলেরে খাবে বলে ঠিক করলো।

রাস্তা-ধারে ওরা ধীরে ধীরে হাঁটছে। স্যেন নদীর ধারে একটি গেট। শান্ত নদীর বুকে অথৈ আলোর বন্যা। টুং টাং ঘন্ট বাজতে ওরা ফিরে আসলো। ব্রেকফাস্ট সমাধা হলো চুপচাপ।

জোয়েত আর সারভিনি বেরিয়ে পড়লো। এখনও গ্রেনোইলেরে খাবার সময় তারা এলো দ্বীপের ভেতর, ঝরনার ধারে উইলো গাছের ছায়ায় বসলো আরাম করে। জোয়েতের পকেট থেকে বেরলো একটা বই, হাসতে হাসতে সারভিনির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে পড়তে বললো। সারভিনি দেখলো বইটি একটি কীট তত্ত্বের বই। সে পড়তে শুরু করলো, একটানা বিরক্তিকর সুরে সারভিনি পড়ে যাচ্ছে। জোয়েতের হাতে একটি ঘাসের শীষ। তার ওপর সঞ্চরমান একটি পিঁপড়ের দিকে সোৎসাহে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে পিপীলিকার গতিবিধির পর্যবেক্ষনে ব্যস্ত। কথা বলার ফুরসত নেই।

দ্বীপের এই মনোরম উদ্যানটিতে ঘন সমাচ্ছন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে উপস্থিত হয়ে তারা দেখলো স্যেন নদীর নয়নাভিরাম উপকূল জুড়ে ইতিমধ্যেই কপোতকপোতীর ভীড়। নদীতে তরনীর আনাগোনা। হঠাৎ প্রকাণ্ড এক বজরা এসে তীরে ভিড়লো, মস্ত ছাউনির ভেতরটা অগনিত মেয়ে পুরুষে ঠাসা। টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে অথবা বসে তারা সুরাপান করছে। সুঠামাঙ্গী সুকেশী বামাকুল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাদভাগের সঞ্চরণশীল উন্নত দেহাংশ যতদূর সম্ভব প্রস্ফুটিত করে সতৃষ্ণ নয়নে মদে আর আহ্লাদে নিজেদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নদীর বুকে সারিবদ্ধ নৌকোর মিছিল। নৌকোর ওপর মেয়েরা চুপচাপ অলস ভঙ্গীতে বসে, যেন তন্দ্রার আমেজে ডালের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে।

এই গড্ডালিকার মধ্য দিয়ে সারভিনির বাহুলগ্ন জোয়েত সানন্দে ভিড় ঠেলে

এগিয়ে চললো। এই রকমারী লোকের মেলায় পিষ্ট মহাসুখী মেয়েটি অন্যান্য মেয়েদের প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। নাচের বাজনা বেজে উঠতেই স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় সঙ্গীর কোমর জড়িয়ে ধরে জোয়েত নাচের আসরে অবতীর্ন হলো। তাদের একটানা উন্মত্ত মাদকতা সমগ্র জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বাদ্যকর যেন জ্ঞানহারা। অকস্মাৎ বাজনা থামিয়ে শ্রান্ত বাদক তার মস্ত টুপিসহ মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো, সকলের উল্লাস ধ্বনিতে কাফে ফেটে পড়বার যোগাড়।

সারভিনি গম্ভীর। জোয়েতও নির্বিকার। "মাস্কেদ আমরা স্নান করবো। চলো নদীর মাঝখানে যাই।"

"যো হুকুম", সারভিনির উত্তর। স্নানের পোশাক আনতে তারা কেবিনের দিকে গেল। চট্‌পট্ তৈরী হয়ে জোয়েত নদীর পাড়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো, আর যে কেউ তার দিকে তাকালো, সবাইকে মিষ্টি হাসি বিতরন করে চললো।

নদীর খানিকটা তারা পাশাপাশি হেঁটে পার হলো। তারপর স্রোতে গা ভাসিয়ে পরম আয়াসে সাঁতার কাটলো জোয়েত, ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া রীতিমতো কঠিন। জোয়েত তলিয়ে গিয়ে অনেক দূরে সহজ ভঙ্গীতে ভেসে উঠলো জলের বুকে। তার হাত দুটো আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রাখা, চোখদুটো স্থির হয়ে আছে নীল আকাশের দিকে। সারভিনির দৃষ্টি তার প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো কোমল চিক্কন তনুদেহের দিকে। ওই বরণীয় দেহের প্রতিটি রেখা তার চোখে ধরা দিলো। যেন প্রলুব্ধ করার জন্যে নিজেকে উজাড় করে দেবার জন্যে অথবা প্রতারণা করার জন্যে জোয়েত এভাবে নিজেকে মেলে ধরেছে। প্রতিটি অঙ্গ একান্ত করে পাবার জন্যে তার চিত্ত আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো। অকস্মাৎ ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে জোয়েত সহাস্য বদনে বলে উঠলো, 'তোমার মাথাটি ভারী সুন্দর তো!"

কৌতুকময়ী নারীর এই বিদ্রূপবানে সারভিনি আহত হলো। সারভিনি জোয়েতকে সরাসরি জানালো যে, সে তাকে ভালোবাসে। জোয়েতের মুখ অন্ধকার। সোজা সারভিনির চোখে চোখ রেখে বললো, "শোনো মাস্কেদ, তুমি যদি সত্যিই ভালবেসে বিয়ে করতে চাও, তো আগে মাকে বল, তারপর আমার মত জানাব।"

রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে রুক্ষ গলায় সারভিনি বললো, "দেখ জোয়েত, খুব ভালো করেই জান যে তোমায় বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না—কথাটা হচ্ছে প্রেমের আগেও বলেছি; এখনও বলছি—তোমায় ভালোবাসি, আর এ কথাটা বিশ্বাস করতে পার। এখন আর না বোঝার ভান কোরো না, আর আমাকেও বোকা বানাতে চেষ্টা কোরো না।"

হাত দিয়ে জল কেটে কেটে তারা মুখোমুখি ভেসে উঠলো। সেই অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থেকে যেন জোয়েত কথাগুলির অর্থ উদ্ধার করতে চেষ্টা করলো,

তারপর হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সমর্থ তালুর দ্রুত সঞ্চালনে সে তীরের দিকে ছুটে চললো। কূলে উঠে জোয়েত তার পোশাক নিয়ে সোজা কেবিনে ঢুকে গেল—একবার ফিরেও তাকালো না। সারভিনি মনমরা হয়ে চিন্তা করতে লাগলো কি করবে; ক্ষমা চাইবে না, রাগ পড়া অবধি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে। কিন্তু সে তৈরী হয়ে দেখলো জোয়েত একাই চলে গেছে। বিরক্ত ও চিন্তাগ্রস্থ সারভিনি ফিরে চললো।

সেভেলের বাহুবন্ধনে সারসিঅনেস উদ্যানের বৃত্তাকার পথে পায়চারী করছিল। গতরাত থেকেই সারসিঅনেস বেশ সাহস সঞ্চয় করেছে। সারভিনিকে দেখতে পেয়ে বেশ সাহস ভরেই বললো, "দেখতো রোদ্দুরে জোয়েতের শরীর খারাপ করেছে—চোখমুখ লাল টক্‌টক্ করছে, দেখগে বিছানায় পড়ে আছে। মেয়েটার যেটুকু জ্ঞান আছে, তোমার দেখছি তাও নেই।"

জোয়েত ডিনারে এলো না। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে জানিয়ে দিল তার ক্ষিদে নেই—আর সে একাই থাকতে চায়।

দশটার ট্রেনে যুবকদ্বয় ফিরে গেল। জানিয়ে গেল পরের বৃহস্পতিবার আবার আসবে। খোলা জানালার কাছে বসে রইলো মারসিঅনেস। ওস্তাদ ঘোড়সওয়ারের মতো প্রেমের ব্যাপারে অভিজ্ঞ মারসিঅনেসের মনেও মাঝে মাঝে জ্বরের মতো হৃদয়দৌর্বল্য উপস্থিত হয়। কামাভিলাষ তখন তাব তনুমন বিবশ করে দেয়। শুধু দেহের বেসাতির জন্যেই যেন তার জন্ম। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন ভালোবাসা মূলধন করে সমাজের নীচের তলা থেকে ওপর তলায় উঠেছে। তার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছে অসংখ্য প্রেমিক, কিন্তু কারও প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত বা বিরক্ত সে হয়নি কখনও।

কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটে। এক একজন তার দেহমনে বহ্নি প্রজ্বলিত করে দেয়, সে জ্বলতে থাকে। বিশেষ কোন প্রেমিকের স্পর্শে সে দিনের পর দিন মাসের পর মাস দগ্ধ হতে থাকে। সেইগুলোই তার জীবনে সুখের দিন। কতদিন কত ভিন্ন প্রকৃতির লোকের কথা ভেবে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে সারারাত ধরে স্বপ্ন রচনা করেছে।

এবারের স্বপ্ন সেভেলকে ঘিরে। তার উজ্জ্বল স্মৃতিতে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হৃদয়ে সুখের আবেশ। সেভেল তাকে জয় করে নিয়েছে, তার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছে।

পেছনে শব্দ শুনে সে ফিরে তাকালো। উল্টোদিকের খোলা জানালায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জোয়েত। সারাদিনের পরে-থাকা পোশাক মলিন। সে জানালো যে তার কয়েকটি কথা বলার আছে।

একটু অবাক হয়ে মা মেয়ের দিকে তাকালো। জোয়েত মায়ের পায়ের কাছে গুটিসুটি বসে আদুরে ভঙ্গীতে তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'ও আমায় বিয়ে করতে চায়।'

বিব্রত হয়ে সারসিঅনেস বলে উঠলো "এসব ধারণা মনে স্থান না দেওয়ার মতো যথেষ্ট বয়স আর বুদ্ধি তোমার হয়েছে বলেই আমার ধারণা ছিল। সারভিনি এ জগতের লোক, আর নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে খুবই সচেতন। ও সমাজ এবং অর্থকৌলিন্য দেখেই বিয়ে করবে। এটা নিশ্চিত জেনে রেখো ও কখনো তোমায় বিয়ে করবে না। ও শুধু তোমাকে চায়—একটা বোঝাপড়ার জন্যই চায়।"

অনেক চেষ্টায় মনের ভাব এই ভাবেই সে ব্যক্ত করতে পারলো। জোয়েত নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মাদাম ওবারদি আবার অতীত চিন্তায় ডুব দিলো।

দীর্ঘদিনের বিলাসবহুল উচ্ছল আনন্দময় জীবনে অভ্যস্ত মারসিঅনেস অযথা মন ভারাক্রান্ত করতে চায়না। পাছে দুঃখ পায় তাই নানারকম চিন্তা এতদিন জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছে। এইজন্য জোয়েতের ভবিষ্যৎ কখনও ভাবেনি। সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে সম্ভ্রান্ত ধনীর ঘরে তার মেয়ের বিয়ে হবে না। মেয়েকেও তারই পথ বেছে নিতে হবে। জীবনে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যথেষ্ট। মানুষ চিনতে ভুল করে কমই, বিশেষ করে সারভিনির মতো মানুষ। সারভিনির আসল উদ্দেশ্য ধরতে তার অসুবিধা হয়নি।

মানসিক উত্তেজনায় মারসিঅনেস কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অবসাদগ্রস্ত। এই জটিল পরিস্থিতিতে সে বিচলিত হয়ে পড়লো। অবশেষে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করলো, ঠিক আছে এবার থেকে এদের ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে, তারপর রোগ বুঝে চিকিৎসা। আপাতত দুরূহ সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছে মনে করে সে মহাসুখী। তাই আবার প্রিয়তম সেভেলের স্বপ্নে তলিয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে তার দৃষ্টি চলে গেল কুয়াশায় ঢাকা প্যারিসের দিকে।

জোয়েতের চোখেও ঘুম নেই। আঁখি ভরে গেছে জলে—তার জীবনের প্রথম বেদনার অশ্রুবিন্দু। দুঃখ বেদনাহীন সুখী পরিবেশে সে বড় হয়ে উঠেছে। সে ছিল আত্মপ্রত্যয়শীল উজ্জ্বল এক যৌবন। কেন এই দুঃখ, চিন্তা আর আত্মবিশ্লেষন! শিল্পী বা সঙ্গীতজ্ঞের বালক পুত্র যেমন শিল্প বা সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করে, তার প্রেম সম্পর্কে ধারণাও ছিল সেই ধরণের। তাছাড়া স্বভাবতই ও ছেলেমানুষ। কোন কিছু তলিয়ে দেখা তার ধাতে সয়না। লোক চরিত্র বুঝতে তার মায়ের মতো তার বিচক্ষণতা ছিল না। তার ছিল শান্তিময় দিন যাপন—কানায় কানায় ভরা পরিপূর্ণ এক জীবন। আর আজ সামান্য একটি মাত্র কথায়—অর্থ না বুঝে ও যার নিষ্ঠুরতা

তার বুকে বিঁধেছে। এক মুহূর্ত সারভিনি এমন এক অস্বস্তি এনে দিলো যা ক্রমেই এক যন্ত্রনাময় ভীতিতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

সারভিনির কথায় বিক্ষত-চিত্ত জোয়েত আহত জন্তুর মতো তার কাছে থেকে পালিয়ে এসেছিল। এ কথার অর্থ কি? কেন এই অপমান? এর পিছনে নিশ্চয় কোন লজ্জাকর গোপন সংবাদ আছে যা তার অজানা। যতই ভেবেছে, সংশয়, ত্রাস, দুঃখ এসেছে ভিড় করে, কান্না এসেছে বুক ছাপিয়ে। তার অনাবিল শিশু অন্তর এক সময় শান্ত হলো। বইয়ে পড়া যতো সব আজগুবি কাহিনীর সঙ্গে নিজের অবস্থার সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ালো। ক্রমে ব্যথা ভুলে সে স্বপ্নে মশগুল হলো। যত সব অলীক কল্পনায় মন মেতে উঠলো। তার কল্পলোকের নায়িকার ভূমিকা সে মনে মনে অভিনয় করলো।

সারা বেলা সে ভেবেছে কি করে মায়ের কাছে থেকে প্রকৃত সত্য জেনে নেওয়া যায়। এই সব বিষাদময় কাহিনীর উপযুক্ত পরিবেশ রাত। তাই রাত এলে পর সে ভেবে চিন্তে একটি ছোট্ট ফন্দি আঁটলো। সেই ফন্দি হচ্ছে—মারসিঅনেসকে কিছু ভাববার অবসর না দিয়েই বলে ফেলবে যে সারভিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। এতে মাদাম ওবারদি যদি বিস্মিত হয়ে কোন কথা বলে ফেলে তবেই জোয়েতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

পরিকল্পনা কাজে রূপান্তরিত কবতে দেরি হলো না। সে ভেবেছিলো তার মা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবে গদগদ চিত্তে প্রতিবাদ কববে, আর অশ্রুসজল কণ্ঠে সব বলে ফেলবে।

কিন্তু আশ্চর্য হলো সে নিজেই। একটু বিচলিত ভাব ছাড়া তার মায়ের আচরণে বিস্ময় বা দুঃখের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। বিরক্ত গলায় আমতা আমতা জবাব শুনেই জোয়েতের সদ্য জাগ্রত নারীমন স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বুঝে নিলো তার জীবনের রহস্য তার ধারণার চেয়েও গভীর লজ্জাময়। আর এও বুঝলো, জেদাজেদিতে কোন লাভ হবে না, বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে নিজেই সব উদ্ধার করতে হবে। এতক্ষণে দুর্ভাগ্যের বাস্তব দিকে তার নজর পড়লো। ভীত দুঃখিত জোয়েত নিজের ঘরে ফিরে এলো।

স্বপ্ন ভেঙে গেছে, রহস্য আবিষ্কারের বাসনা অন্তর্হিত, দীর্ঘ সময় শুধু নীরব কান্না। ধীরে ধীরে দুচোখের পাতায় শ্রান্ত ঘনিয়ে এলো। চোখ আপনিই বুজে এলো।

•

পরের দিন সারা দিনমান গম্ভীর, বিষণ্ন। কিন্তু চোখ কান খোলা রাখলো, সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করবার জন্য মন রইল সদা সতর্ক। এতদিন যাদের ওপর আস্থা

ছিল, এমন কি তার মায়ের ওপরও অবিশ্বাস ঘনিয়ে এলো। চিন্তা করতে থাকলো কি করে ওদের স্পষ্ট চেনা যায় আর হৃদয়ে খোদাই করে রাখা যায়।

সারভিনি ও সেভেল এলো দশটার গাড়িতে। কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে গাম্ভীর্য বজায় রেখে পরিচিত ভঙ্গীতে জোয়েত বললো, "সুপ্রভাত মাস্কেদ, কেমন আছো?"

"ধন্যবাদ, তুমি ভালো তো? মনে মনে ভাবলো—এখন আবার কি খেলা খেলবে কে জানে।"

মারসিঅনেস সেভেলের হাত ধরেছে, জোয়েত সারভিনির। উদ্যানের বৃত্তাকার পথ ধরে তারা পায়চারি করছে। কখনও যুগল মূর্তি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য আবার কখনও দেখা যাচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়।

জোয়েতের সঙ্গীটি বকে চলেছে, কিন্তু জোয়েত নিরুত্তর। যেন তার কানে কিছু ঢুকছে না। সে যেন গভীর মনোযোগে পথ দেখে চলেছে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসলো, "তুমি কি সত্যিই আমার বন্ধু, মাস্কেদ?"

"অবশ্যই, মামজেল।"

কিছুটা আরক্তিম জোয়েত স্পষ্ট স্বরে প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, তবে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?"

"জানাতেই হবে? ঠিক আছে, তবে শোনো, যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী। দক্ষতার সঙ্গে ছলনার মুখোশ পরতে জান, অন্যকে অপদস্ত করে মজা দেখ, টোপ ফেলে ধৈর্য ধরে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে জান।"

"তোমার এই ধারণাগুলো পাল্টাতে হবে মাস্কেদ," গম্ভীর গলায় এই মন্তব্য করে জোয়েত তার মায়ের কাছে রওনা হলো।

তার মা তখন মাথা নুইয়ে শ্লথ গতিতে এমন বিভোর ভাবে হাঁটছে যেন কোন মধুর গুঞ্জনে রত। শক্ত দৃঢ় বাহুর বন্ধনে দেহের একপাশে সজোরে তাকে বেঁধে রেখেছে সেভেল। সেদিকে নজর পড়তেই জোয়েতের মনে একটা সন্দেহ বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো। এ যেন অর্ধ উপলব্ধ কোন শারীরিক বেদনার অনুভূতি—যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

□ ৩ □

খাবার ঘন্টা বাজল। চারিদিক নিস্তব্ধ, বিষাদময়। বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস। দিগন্তে কালো মেঘের পাহাড় থমকে আছে, কিন্তু পেছনে ওৎ পেতে আছে ঝঞ্ঝা। সেভেলকে একা পাবার তাগিদে মাদাম ওবারদি সারভিনিকে বললো, "প্রিয় ডিউক,

তুমি তো জানই আজকের রাতটা তোমরা এখানে থাকবে। কাল সবাই মিলে শাতুর ফোরনাইজ রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাওয়া হবে।"

ইশারা বুঝতে পেরে সারাভিনি অভিবাদন করে সহাস্যে বলে উঠলো, "আপনার কথা মতোই হবে, মাদাম।"

আসন্ন ঝড়ের করাল ছায়াতলে ধীর অস্বস্তির মধ্যে দিন ফুরিয়ে এলো। ক্রমে ডিনারের সময় হলো। নিঃশব্দে সমাধা হলো সান্ধ্যভোজ। অকস্মাৎ বাঁকাচোরা বজ্র রেখায় দিগন্ত বিদীর্ন হোলো আর অন্ধকারের বুকে তীব্র আলোর ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। আকাশের উত্তাপ আরও বেড়েছে, বাতাস হয়েছে আরও স্তব্ধ, রাত্রি হয়ে উঠলো আরও নিথর নিবিড়। জোয়েত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আমি শুতে চললাম, ঝড় দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসে।" শুভরাত্রি জানিয়ে সে বিদায় নিল। সারভিনিও তার দৃষ্টান্ত অনুসরন করলো।

অন্ধকারে সেভেল আর মারসিঅনেস। ভুজপাশে ধরা দিতে দেরি হলো না, পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ, তন্ময়। এদিকে জোয়েত নিজের ঘরে বাতি নিভিয়ে দিয়ে খালি পায়ে ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলো। সকাল বেলার সেই বাগানের অনুভূতি নিয়ে সে নীচের কথা শুনতে চেষ্টা করলো। সারভিনি শুয়ে পড়েছে, নিচে সাথী সহ তার মা একা।

দ্বিতীয়বার তড়িৎ প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভূ-প্রকৃতি ক্ষণিক আলোকে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি স্বর কানে এলো, 'তোমায় ভালোবাসি।' আর কোন সাড়া নেই। জোয়েতের শরীরে শিহরণ খেলে গেল, তার দম আটকে গেল। এ স্বর জোয়েতের খুবই চেনা। এ স্বর তার মায়ের।

তপ্ত একটি জলের ফোঁটা পড়লো তার কপালে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল বৃষ্টি ধারায় স্নান করে উঠলো জোয়েত। দরজা বন্ধের আওয়াজ। নিঃসন্দেহ হবার দুর্বার বাসনায় যন্ত্রনাদায়ক উদ্দাম কামনার বশে ছুটে সিড়ি দিয়ে নেমে এসে বাইরে বেরিয়ে এলো জোয়েত। অঝোর বারিধারার মধ্যে জানলার নীচে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

শুধু মাত্র তার মায়ের ঘরেই আলো। সেই আলোয় দেখলো দুটো ছায়ামূর্তি ঘনিয়ে এলো পাশাপাশি। ক্রমে ছায়া দুটো ঘনিষ্টতর হতে হতে এক হয়ে মিশে গেল। ঠিক সময়ে বিদ্যুৎ চমকালো। জোয়েত দেখলো একে অপরের গলা জড়িয়ে এক হয়ে গেছে। জোয়েত কিছু না জেনে তার সর্বশক্তি দিয়ে চীৎকার করে উঠলো। তার তীক্ষ্ণ চীৎকার বাতাসে মিলিয়ে গেল, ছায়া দুটো আলাদা হয়ে গেল।

মায়ের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে জোয়েত দৌড়ে পালালো। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে

জলের ছাপ রেখে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিলো। দীর্ঘ সময় এইভাবে কেটে গেলো, তার অগোচরে কখন ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলো। কৃতকর্মের কথা আর বিন্দুমাত্র না ভেবে জোয়েত ভেজা জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। উষালোকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তার দুচোখ ঝাপসা হয়ে গেল। আবার ভাবনা এলো তার মনে। প্রেমিকের সঙ্গে তার মা। ঘেন্নার কথা। কিন্তু অনেক গল্পে সে পড়েছে—মেয়েরা এমনকি মায়েরাও মর্যাদা বৃদ্ধির লোভে গল্পের শেষের দিকে প্রেমের বন্যায় এইভাবে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে। নিজের মনেই বললো, 'আমার মাকে রক্ষা করবো।'

এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেবার পর মনে শান্তি ফিরে এলো। রোদ উঠে গেছে। জোয়েত জানে মা আসবে তাই প্রতীক্ষায় রইল। মারসিঅনেস দেখার পর মায়ের মুঠোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বালিকা কাঁদতে আরম্ভ করলো। কাঁদতে কাঁদতে জোয়েত তার মাকে বললো—আমরা এই শহর ছেড়ে দূর কোন পাড়াগাঁয়ে চলে যাব। সেখানে আমরা কৃষকদের সঙ্গে ওদের মতো হয়ে থাকবো—আমাদের এরা কেউ খুঁজে পাবে না। সে আরো বলল যে—গত রাত্রে সব কিছুই সে দেখেছে এবং বুঝেছে যে যতো সব বাজে লোক, যত খদ্দের তাদের ঘরে আসে, সেই জন্যই তাদের কোন সম্মান নেই। সে এসব আর সহ্য করবে না, তারা অনেক দূরে কোথাও সৎ মহিলাদের মতো জীবন যাপন করবে।

রাগে থমথমে মুখ মারসিঅনেস সংযত স্বরে বললো, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সুস্থ হয়ে বিছানা ছেড়ে এসো আমাদের সবার সঙ্গে বসে জলখাবার খাবে।' নাটকীয় ভঙ্গীতে মেয়ে বলে উঠলো যে তার কথার নড়চড় হবে না।

উত্তেজনায় মারসিঅনেস জ্বলছে। সে বলে গেল, 'হ্যাঁ, আমি গণিকা, তাতে কি হয়েছে? আমি এই না হলে তোমাকে আজ লোকের বাড়ি বাড়ি দাসীবৃত্তি করতে হোতো, একদিন আমাকে যা করতে হয়েছে। আমাদের দেহ ছাড়া আর কোন পথ নেই—এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।'

জোয়েত বড় অসহায় বোধ করলো। উপায় না পেয়ে মার খাওয়া বালিকার মতো হাউমাউ করে কাঁদতে থাকলো।

মারসিঅনেস নীরব দ্রষ্টা। মেয়ের কান্না দেখে দুঃখে বেদানায়, মমতা ও অনুশোচনায় হৃদয় গলে গেল। হাত ছড়িয়ে বিছানায় ওপর পড়ে সেও কেঁদে ফেললো। জোয়েতের কান্না থামলো না। এমন অপ্রত্যাশিত গভীর আঘাতে তার চিন্তা অসাড়। সে জানিয়ে দিল যে তার মতের পরিবর্তন হবে না। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে ঘর থেকে বের হবে না, ওদের মুখদর্শন করবে না।

মা'র অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সে দরজায় খিল এঁটে দিল। পরে মারসিঅনেসের অনেক অনুরোধে দরজা খুলে বাইরে এলো এবং ডিনারের আগে মা মেয়েতে নদীর ধার ধরে ঘুরে বেড়ালো দুনিয়ার যত তুচ্ছ কথা সব নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকলো।

□ ৪ □

পরদিন জোয়েত একা বেরিয়ে পড়লো। সে সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করছে আর মনে মনে মুক্তির উপায় খুঁজছে। তার মা যদি তার সঙ্গে যেতে রাজী না হয় সে একাই চলে যাবে বহুদূরে। সে একা দুর্দান্ত কিছু করতে চাইছে, একটা দুঃসাহসিক কাজ, এমন মহান কিছু যা নাকি চিরকাল উদাহরণ হয়ে থাকবে।

অনেক কিছু চিন্তাভাবনার করার পর সে ঠিক করলো যে আত্মহত্যা করবে। খুব শান্ত মনে সে এই সিদ্ধান্ত করলো।

এবার সে চলে গেল বগিভাতে। দাঁতের ব্যথার নাম করে একটু ক্লোরোফর্ম চাইলো। ঘুরে ঘুরে এই রকম আরও কিছু বড়ি সংগ্রহ করলো। বাড়ি ফিরে এসে খাওয়াদাওয়া করলো।

পরদিন খুব সুন্দর করে সাজতে সাধ হলো। সুন্দর দেখে একটি নীল রঙের জামা পরলো। আয়নায় নিজেকে নতুন করে দেখলো। বসে বসে ভাবলো এই পৃথিবী তার কাছে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাগান থেকে ভেসে এলো উতরোল হাসি, উচ্ছ্বসিত কলগুঞ্জন, আনন্দমুখর কলতান। খাবার ঘন্টা বাজলো। দৃঢ় পদক্ষেপে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসলো। সারভিনি জানতে চাইলো তার শরীর ভালো আছে কিনা উত্তরে জোয়েত বললো—'আজ আমার হৃদয়ে খুশীর জোয়ার।' তারপর মসিয়ে বেলভিনোর দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রিয় মলভসি আজ তুমিই আমার প্রিয়পাত্র। খাবার পর তোমাদের মার্লির মেলায় নিয়ে যাবো।'

মার্লিতে মেলা জমজমাট। খেতে বসে সে বিশেষ কথা বললো না। চারিদিকে উৎসবের কত আয়োজন। হাঁটতে হাঁটতে মেলার শেষ প্রান্ত, জোয়েতের বিকৃত দৃষ্টিতে বিচিত্র বিদ্বেষের ছাপ। হঠাৎ দুর্বার দুঃখের বাঁধ ভেঙে পড়লো, সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো। সারভিনি তাকে বাড়ি ফেরার জন্য অনুরোধ জানালো। বাড়ির দুয়ারে পা দিতেই জোয়েত এক ছুটে বাগান পেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিল।

ডিনারের আগে তার দর্শন পাওয়া গেল না। এলো যখন, বড় বিষণ্ণ গম্ভীর। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে চলে গেলো।

জোয়েত এখন স্থির প্রতিজ্ঞ। তার আত্মহত্যার কথা একটি চিঠিতে লিখে খামের মুখ আটকে দিলো। রাতের নির্মল বাতাসে গোলাপের সুমিষ্ট সুবাস। জোয়েতের মনে হলো আজই তার শেষ দিন। তার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। বোতলের ছিপি খুলে একটু তুলোর মধ্যে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে স্বাদ নিতেই তার কাশি এলো। আর একটু তুলো ভিজিয়ে নিয়ে সে নাকের কাছে ধরলো তারপর সেই সুমিষ্ট ঝাঁঝালো গন্ধটি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। সে যেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। জোয়েত এখন বিশাল তরীর যাত্রী। ক্লোরোফর্মের গুণে তার দেহ মনের জ্বালা প্রশমিত—আর ইচ্ছাটিরও হয়েছে অপমৃত্যু। জীবনটা তার কাছে অতি মনোরম, লোভনীয় ও সুন্দর মনে হলো।

জোয়েতের যেন ডানা হয়েছে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে, বন উপবনের ওপর দিয়ে সে উড়ে যাচ্ছে। আবার সে তুলো ভিজিয়ে নিল। তার মরবার সাধ নেই। তাই প্রাণভরে টাটকা বাতাস টেনে নিল। সে জানতো নিশ্চয় কেউ খোঁজ করতে আসবে, তাই ঘরটিতে ওষুধের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে দেবার জন্য হাত লম্বা করে সেই সিক্ত তুলো শূন্যে ধরে রাখলো। শায়িত এক অতি লোভনীয় ভঙ্গীতে দেহটিকে গুছিয়ে নিয়ে সে অপেক্ষা করে থাকলো।

জোয়েতের সাড়া না পেয়ে ওবারদি বললো, 'আমার ভাবনা হচ্ছে ওর কিছু হয়নি তো?' সারভিনি বারান্দার পাঁচিল বেয়ে উপরে উঠে দেখলো জোয়েত অজ্ঞান হয়ে আছে তখন সে চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকতে আরম্ভ করলো। মারসিঅনেস বিলাপ করতে করতে সিড়ির দিকে ছুটলো। চোখ বুজে পড়ে আছে মড়ার মতো। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেই মা ঝাঁপিয়ে পড়লো গায়ে। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো। ক্লোরোফর্মের শিশিটি মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সারভিনি বললো 'ইচ্ছে করে ওষুধ খেয়ে অজ্ঞানে হয়ে আছে।'

ওষুধে ভেজা রুমাল দিয়ে সারভিনি তার কপালের দুপাশ, গাল, গলা মুছে দিল। ঝিকে ডেকে বললো ওর পোশাক খুলে দিতে।

শিথিল অন্তর্বাস ছাড়া আর সব জামা কাপড় খুলে দেওয়া হলে সারভিনি দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল, ওই স্বল্পাবৃত দেহের মদির ঘ্রাণ, কোমল ত্বকে নরম ছোঁয়ায় সারভিনি তৃপ্তি পেল।

বিছানায় জোয়েতকে নামিয়ে রাখার পর তার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক দেখে সারভিনি বললো, 'বিপদ কেটে গেছে ভয়ের আর কারণ নেই।' এবং সবাইকে ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য অনুরোধ করলো। শুধু মারসিঅনেস ও সেভেলকে থাকার অনুমতি দিল।

পেছন ফিরতেই সারভিনি টেবিলের ওপর চিঠিটা দেখতে পেল। এবার আগাগোড়া ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরি হলো না। সে চিঠিটা পকেটে লুকিয়ে ফেললো। মারসিঅনেস ডাক্তার ডাকার কথা বললে সারভিনি বলল তার আর দরকার হবে না, সেভেল ও মারসিঅনেসকে একটু বাইরে যাবার জন্য অনুরোধ করলো। মাদাম ওবারদিকে উঠিয়ে নিয়ে সেভেল ঘর ছেড়ে চলে গেল।

জোয়েতের আঁখি পল্লব নিমীলিত, ওষুধের নেশায় তার চেতনা অর্ধজাগরিত। আর তার মৃত্যুর ইচ্ছা নেই, শুধু বেঁচে থাকবার বাসনা, আর প্রাণ ভরে তনুমন জুড়ে ভালোবাসা পাবার আকাঙ্খা। সারভিনি জোয়েতকে ডাকতে সে চোখ মেলে তাকালো। পকেট থেকে জোয়েতের চিঠিটা বের করে সারভিনি বললো এটা তার মাকে দেখাবে কি না। মাথা নেড়ে জোয়েত নিষেধ করলো।

সারভিনির চোখে পলক পড়ে না। জোয়েতের মমতা মাখানো চোখে সমর্পণের প্রতিশ্রুতি। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জোয়েত সারভিনিকে কাছে ডাকলো, সারভিনি তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো—ওষ্ঠাধরের মিলনে দুটি সত্তা এক হয়ে গেল। চোখ বুজে এভাবে থাকলো অনেকক্ষণ।

জোয়েতের মুখে ভালোবাসার মধুর হাসি, সারভিনির কাঁধ ধরে আবার নিজের মুখ নামিয়ে আনতে চেষ্টা করলো। সারভিনি বললো, 'তোমার মাকে নিয়ে আসি।' জোয়েত ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'আরও একটু, এত ভাল লাগছে।'

মুহূর্তের নীরবতার পর অতি মৃদুকণ্ঠে বললো, 'তুমি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে না?' জানু পেতে বিছানার পাশে বসে সারভিনি জোয়েতের হাতে চুমু আঁকলো, বললো, 'তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি।'

দরজার কাছে পায়ের শব্দ হতেই দেখলো সবাই এসে গেছে। বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারসিঅনেস সস্নেহে দুই বাহুতে কন্যাকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুতে তার মুখ সিক্ত করে দিল।

পায়ে পায়ে সারভিনি বেরিয়ে এলো উন্মুক্ত বারান্দায়। প্রাণ ভরে নির্মল বায়ু সেবন করলো তার হৃদয় পরিপূর্ণ—দেহ ভালোবাসার স্বাদে ভরপুর।

মূল গল্প ❑ জোয়েত

উইলিয়ম ফকনার

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কিণ কথা সাহিত্যিক উইলিয়ম ফকনার য়ুরোপীয় চেতনা-তরঙ্গধারা মার্কিণ সাহিত্যে সার্থকভাবে রূপ দেন তাঁর অনন্যসাধারণ ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দ্য সাউণ্ড অ্যাণ্ড দ্য ফিউরি'তে এবং ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে : সারটোরিস অ্যাজ আই লে ডাইং দ্য হ্যামলেট, লাইট ইন আগষ্ট এবং এ ফেবল-এ খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচার ও ধর্মীয় প্রতীকগুলি শিল্পের প্রয়োজনে এক অনুপম শিল্পসম্মত রূপ নেয়। অ্যামেরিকার দক্ষিণের ষ্টেটগুলিতে দরিদ্র নিগ্রো এবং দরিদ্র সাদা চামড়ার মানুষের মধ্যে অন্তহীন ও অর্থহীন সংঘাত, স্বীকৃতি, ভালোবাসা ও সম্মানের জন্যে নিগ্রোদের বুভুক্ষা—বারবার তাঁর কাহিনীর বিষয় হয়েছে। শেলী, কীটস, ভারলেইন, এলিয়ট ও এজরা পাউণ্ডের প্রভাবে প্রথম জীবনে কবিতা লিখেছেন ফকনার। পরবর্তী জীবনে ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েও নিজেকে কবি হিসেবে ভাবতে ভালোবাসতেন। প্রচলিত অর্থে কখনও জনপ্রিয় হতে পারেননি ফকনার। তাঁর রচনার আঙ্গিক অতি জটিল এবং বক্তব্য জটিলতায় ভরা। বিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তিনি সৃষ্টি করেছেন।



প্রথম প্রেম

উইলিয়ম ফকনার

সব জায়গাতেই কমপিটিশন। এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্যেই পৃথিবী আজও ঘুরছে। কেউ কেউ বলে, প্রেমের জন্যে। কথাটা ভুল। যে রমণীকে অন্য কেউ চায়না, তাকে তুমি চাইবেনা, আমি চাইবোনা, জনিও চাইবেনা। টাকার ব্যাপারেও তাই। যদি কেউ টাকা না চাইতো, তাহলে টাকার জন্যে এতো মারামারি হতোনা।

কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, নিজের লাইনে সবার সেরা হতে হবে। লাইনটা অ্যালুমিনিযমের বাসন বেচা বা মেয়েদের অর্ন্তবাস বিক্রী করা বা হুইস্কির চোরাইচালান—যাই হোক না কেনকেনিজেবটাাইনে সবার সেরা হও, নয়তো সরে যাও। ,

শোনো।

চেয়ারে বসে চেয়ারটা দেয়ালের দিকে ঝুঁকিয়ে বলছিল জনি।

আমাদের ব্যবসায় মানুষ তখনই সফল হয়, যখন সে সবার সেরা যে তার থেকেও সেরা হতে চায়, বুঝেছো ?

নিশ্চয়ই।

ওর বন্ধু অটো বলে। সে পাশেই বসে আছে। কিন্তু নড়েনি।

নিজে খুন না হওয়া, যে কেউ এটা করতে পারে। একটা স্ট্রীট গ্যাংএ ভিড়লেই হল। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তা হলো ওদের সবার থেকে বেশী এলেম দেখানো। তুমি তোমার পাওনাগণ্ডা পাচ্ছো, না পাচ্ছো না, তার থেকেই বোঝা যাবে, তোমার এলেম্ কতোটা আছে বা কতোটা হওয়া উচিত।

নিশ্চয়ই।

ওর বন্ধু অটো বলে! মাথার ডারবি টুপিটা সামনে টেনে নেয়, থুথু ফেলে।

শোনো, গুণ্ডা সর্দার ওপ-এর সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। কিন্তু ও বলছে, এ লাইনে ও সেরা। আমি বলেছি, এ লাইনে আমার জুড়ি নেই। একদিন আমাদের প্রমাণ করতে হবে, কে সেরা।

'হঁয়া'।

সরু সিগারেট পাকিয়ে বুড়ো আঙুলে দেশলাই ঘসে সিগারেট ধরায় অটো।

'কিন্তু অতো তাড়াহুড়ো করোনা। তোমার বয়স কম। ওপ এ লাইনে পুরোনো ঘুঘু। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। তোমার বয়স হোক। আমি বাজী রেখে বলছি, তুমিই জিতবে। গত সপ্তাহে যেভাবে তুমি ওর মাল ছিনিয়ে নিয়েছো তার জবাব নেই। কিন্তু আগে তোমার বয়স হোক, তারপর তুমি ওর মোকাবিলা করো। আমি তোমার দলে, তুমি তো ভালো করেই জানো।'

'নিশ্চয়ই'।

জনি বলে।

'আমি বোকা নই। পাঁচ বছর যাক, জনির চুল পাকুক, দেখবে ষাঁড়গুলোও ওকে ভুলে গেছে। পাঁচ বছর, বুঝলে ?'

'ঠিক বলেছো। অভিযোগ করার কিছু নেই। সময় যেমন কাটছে কাটুক। সময় এলে আমরা সবাইকে ঠাণ্ডা করে দেবো।'

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জনি ভাবে—

ও ঠিকই বলেছে। তাড়াহুড়ো করে ঝাঁপ দিলে কখনো ভালো হয় না। লাইনে সবার সেরা হতে শিখতে হয়, আমার বুদ্ধি আছে, যতোদিন না সময় আসে, ওপের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধাবো না। সময় আসলে দেখা যাবে।

জনি মুখ তুলে তাকায়, তার নাড়িভূঁড়িগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভয়ে নয়, একদিন যা ঘটবে সেই ভয়ংকর ঘটনার কথা ভেবে।

জনির মতই বেল্ট আঁটা কোট পরে আসছে গুণ্ডাসর্দার ওপ। জনির হিংসে হয়। সে মাথা নাড়ে। ওপ কিন্তু উদাসীন মেজাজী ভঙ্গীতে ওর দিকে একটা আঙুল উঁচিয়ে চলে যায়। এতো অহঙ্কারী যে পেছন ফিরে তাকায় না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটছে, হিপপকেট ফুলে আছে, ওখানে পিস্তল আছে। একদিন মোকাবিলা হবে! ফিসফিস করে শপথ নেয় জনি। দিনটা কবে আসবে ? তার যেন আর তর সয়না।

তারপর........

সে তরুণীকে দেখতে পায়।

রাস্তা দিয়ে আসছিল মেয়েটি। প্রথম যৌবনের অপরিশীলিত সৌন্দর্য্যে দুলছিল তার তরুণী শরীর। রোগা হাতদুটো দুলছিল। টুপির নীচে ওর চুলের রং ঠিক সোনালী নয় আবার বাদামীও নয়। চোখের রং পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্ন, তেজী ঘোড়ার মত দুলে দুলে হাঁটছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখছে জনি। তার যৌবনের অস্পষ্ট আকর্ষণে।

হঠাৎ ওর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে মেয়েটির পথ আটকে দাঁড়ায় ওপ।

মেয়েটি পিছিয়ে যায়। ওর হাতে হাত রাখে ওপ।

এবং জনি বুঝতে পারে, নিজের লাইনে ভালো হবার জন্যে অপেক্ষা করার সময় আর নেই। তরুণীর দুটো হাতেই যখন শক্ত করে ধরেছে ওপ, তখন জনি এগিয়ে যায়। জনিকে দেখে চমকে ওঠে ওপ।

'কেটে পড়ো।'

ঠাণ্ডা গলায় হুকুম দেয় জনি।

'অ্যাই ঠাণ্ডা মাছ, তুমি কি বলতে চাইছো ? তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছো?'

'আমি বলছি, কেটে পড়ো'।

জনি আবার বলে।

ওপ জনিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আবার মেয়েটির হাত ধরে। হাতের পেছনটা মুখে চেপে আছে মেয়েটি। ভয়ে ও নিশ্চল হয়ে গেছে। ওপ ওর গায়ে হাত দিতেই মেয়েটি আর্ত চীৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ওপের চোয়ালে ঘুঁষি মারে জনি। মেয়েটি রাস্তা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চীৎকার করতে করতে পালাচ্ছে। পিস্তল বার করেছে জনি। ওপ রাস্তায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। অটো ছুটে এসে চেঁচিয়ে বলে—

'মাই গড, কাজটা করেই ফেললে ?'

পকেট থেকে ভারী ওজনসমেত চামড়ার টুকরো বার করে বলে— 'এখানে ওকে খুন করা চলবে না। এইটা ওর মাথায় মারছি। ও ভালোমতো বেহুঁশ হয়ে যাবে। এই সুযোগে তুমি এই শহর ছেড়ে পালাও ঈশ্বরের দোহাই, তাড়াতাড়ি পালাও।'

জনি ততোক্ষণে মেয়েটির পেছনে ছুটতে শুরু করেছে। ভারিক্কী শরীর নিয়ে ছুটতে ছুটতে ঘটনাস্থলে দেখা দিয়েছে একজন পুলিশম্যান।

একটা অন্ধকার গলির সামনে তরুনীকে ধরে ফেলে জনি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে মুখটা হাতে গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটি। জনি ওকে ছুঁতেই ও চীৎকার করে, ঘুড়ে দাঁড়ায়, আর একটু হলে পড়ে যেত। ওকে ধরে রাখে জনি। অস্পষ্ট গলায় বলে—

'সেই লোকটা নয়, আমি। সব ঠিক আছে। আমি লোকটাকে মেরে বেহুঁশ করে দিয়েছি।'

মেয়েটা ওকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

জনি, বেচারা জনি চারপাশে তাকায়। সে যেন ফাঁদে পড়েছে। ক্রাইষ্ট, মেয়েমানুষ কাঁদলে কি করা যায় ?

'বেবী'।

ওর পিঠ চাপড়াচ্ছে জনি, যেমন করে লোকে পোষা কুকুরকে আদর করে।

'সব ঠিক আছে। ওই লোকটা তোমায় আর জ্বালাবে না। কোথায়, বাড়ী তোমার, তাই বলো। আমি তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেবো।'

'উঃ, ও আমায় কী ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।'

মেয়েটা জনিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মেয়েটা জানে না, আসলে জনিরই ভয় পাওয়ার কথা। কেননা জনির জীবন একটা অন্ধকার ও অজানা মোড় ঘুরতে চলেছে। তারপর জনির ভালো হবে না মন্দ হবে, দেবতারাই জানেন। এখনও শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় আছে। অটো ঠিক বলেছে। ও জানে। 'বোকা, এখনও এই মেয়েটাকে ছেড়ে পালাও!'

সাবধানতা তার কানে কানে বলে। 'ওকে বিপদের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যাবে? কখ্খনো না'—যৌবন জবাব দেয়।

তরুনীর শরীর ভয়ে কাঁপছে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা—জনি বুঝতে পারে।

'কেঁদোনা,' সে বলে। মেয়েমানুষ কাঁদল কি করে ভোলাতে হয়, সে জানেনা। সে শুধু জানে, ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই শহরের নামজাদা গুণ্ডাসর্দার ওপ্-এর হুঁশ ফিরেছে। সে হয়তো জনিকে খুঁজছে। শক্ত করে মেয়েটাকে ধরে জনি। ওর কাঁপুনি থেমে যায়। চারপাশে তাকিয়ে স্বস্তি পেয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে জনি। পুলিসের চাকরী করে বুড়ো রায়ান্। পনেরো বছর ধরে ও জনিকে চেনে। জনি যখন ছোট ছিল তখন থেকে। রায়ানের বাড়ীটা কাছেই।

'বাঃ এই তো, ভালো একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি। মিসেস রায়ান আমায় চেনে। আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি, তুমি এখানেই থাকো। রোগা হাতে জনিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধীরে মেয়েটি বলে—

'না, তুমি আমাকে ছেড়ে যেওনা। আমার ভয় করছে।'

'হানি, এক মিনিটের জন্যে যেতে হবে। গুণ্ডাটা কোথায় গেল দেখতে হবেনা? আমরা আর ওর পাল্লায় পড়তে চাই না।'

'না, না, ও তোমায় মারবে।' কান্নার নোনা জলে ভেজা মেয়েলী মুখ তার মুখ ধুঁয়ে যায়।

'তুমি যেওনা।'

'এক মিনিট, বেবী, এক্ষুণি আসছি।'

জনির মুখ ছুঁয়ে আছে তরুনীর মুখ। জনি তরুনীর ঠাণ্ডা চুমু খেল। মনে হল যেন গাছের আড়ালে ভোরের আলো ফুটলো, পাখীরা গান গাইলো। পুরুষ ও রমনী একে অন্যের দিকে তাকায়। 'তোমায় যেতেই হবে?'

তরুনীর গলার স্বর বদলে যায়। ওরা অন্ধকার দরজার কাছে যায়। পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে। যতোক্ষণ না ঘরের ভেতর থেকে পায়ের শব্দ দরজার কাছে আসে। জনির ঘাড়টা দুহাতে জড়িয়ে মেয়েটি বলে—

'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। সাবধানে থেকো। আমার বড় ভয় করছে!,

'বেবী!'

'প্রিয় আমার!'

দরজা খোলে। সংক্ষেপে মিসেস রায়ানকে সব বুঝিয়ে বলে জনি। তারপর মুখে তরুণীর চুম্বনের ভিজে স্বাদ নিয়ে সে তাড়াতাড়ি গলিপথ থেকে সরে যায়।

এখন মাথার ওপরে দূরের নক্ষত্রগুলো। কিন্তু পায়ের নীচে আলোজ্বলা বাঁধানো রাস্তা, নগরীর ঘ্রাণ—যে নগরীকে ভালোবাসে জনি! তাকে কিছুদিনের জন্য এ শহর ছেড়ে পালাতে হবে। আবার সে ফিরে আসবে। আলো, রাজপথ, নগরীর গন্ধ—আগের মতই থাকবে!

'না।'

সে বলে।

'এখন একটি মেয়ে আমায় ভালোবেসেছে। এখন পালিয়ে যাওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ভালো।'

কিন্তু আপতাতঃ যদি মৃত্যু এড়ানো যায়—

কি মিষ্টি এই মেয়েটি। এই কি ভালোবাসা। যাকে ভয় পেয়েছি বলেই ওর কাছে ফিরে যেতে চাইছি? ঘটনার মোকাবিলা করার বদলে ঘটনার শিকার হতে চলেছি?

যাই হোক, আমি যা করছি, তা এই মেয়েটির জন্যে। আমি গ্যাং-এর ছেলেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমি যা করেছি, আমার যা করা, এই হতো। সবাই বুঝবে।

'আমি আমার লাইনে যতো ভালো হতে চাই, ততোটা হইনি কিন্তু হতে পারি।'

সে রাতের আকাশের উড়ন্ত নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকায়, তার পকেটে পিস্তল। তার নাকে আসে খাবার ও স্যামলিনের গন্ধ। যে গন্ধ সে ভালোবাসে।

□□

একটা দরজার আড়াসে থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে আর একজন! 'একি?'

জনি ভাবে—

এই তো, সে আবার পাশে, তার তরুণী—শরীরে উজ্জ্বলতা, তার মাথার চুল বাদামীও নয় আবার সোনালীও নয়, তার চোখে ঘুমের ধুসর রং?'

কিন্তু তবুও........

মেয়েটি যেন বদলে গেছে।

'তুমি....মেরী?'

জনি বলে।

ওর ভুল শুধরে দেয় সেই রমণী—

'আমি মৃত্যু, তোমার ছোট্ট বোন।'

তারপর উজ্জ্বল সেই রমণী প্রেমিকের হাতে হাত রাখে।

মূল গল্প □ ফার্স্ট লাভ

নর্মান মেলার

জন্ম ঃ ১৯২৩, আধুনিক অ্যামেরিকান সাহিত্যের এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব নর্মান মেলার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পট ভূমিতে লেখা 'দ্য নেকেড অ্যাণ্ড দ্য ডেড' এবং হলিউডের জটিল জীবনের পটভূমিতে লেখা 'দ্য ডীয়ার পার্ক' রূঢ় বাস্তবতা এবং জটিল জীবন দর্শনের নিরিখে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দুটি স্মরণীয় উপন্যাস। মেলারের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রেম একালের জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল জীবনে মুক্তির সংকেত এনে দিলেও একালের অবক্ষয়সঙ্কুল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবি পুরুষ ও রমণীর আত্মিক সংকটের সমাধান প্রেম নয়। মেলারের নায়ক ও নায়িকা অবক্ষয় ও আত্মহননের যে বৃত্তে ঘোরে, সেখানে প্রেম বা ধর্মবিশ্বাস বা রাজনৈতিক প্রতীতি শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হতে বাধ্য। মেলারের রচনাভঙ্গীতে তাঁর সূর্বসূরী আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে ও জন ডস প্যাসসের প্রভাবে তিনি স্বীকার করেছেন। বর্তমান গল্পটি 'দ্য কর্ণহিল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।



লেখক যখন প্রেমিক

নর্মান মেলার

লেখকের সংগে ঝগড়া হয়েছে তার তরুণী প্রেমিকার। এখন প্রেমিকাকে তার বাড়ী পৌঁছে দিতে চলেছে লেখক। তর্ক যতো বাড়ছে। দুজনে একে অন্যের কাছ থেকে ততো দূরে সরে আসছে। ওরা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখে হাঁটছে।

বোঝাই যাচ্ছে যে মেয়েটিই বেশী চটেছে। মাঝে মাঝেই চড়া গলায় কথা বলছে। থেকে থেকে আবার ঘাড় বেঁকিয়ে লেখকের দিকে তাকাচ্ছে। যেন শুধু কথায় আর কুলোচ্ছেনা। আবার মাঝে মাঝেই ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। জুতোর হিলের খটখট আওয়াজেও বোঝা যাচ্ছে, ওর বড্ড রাগ হয়েছে।

লেখক সব সয়ে যাচ্ছে। বেশ মর্য্যাদার সঙ্গেই সইছে। এক পায়ের সামনে আর এক পা ফেলে সামনের দিকে হাঁটছে। মুখে বিষাদের ভাব ফুটিয়ে একটু একটু হাসছে। মাঝে মাঝে প্রেমিকার কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছে।

প্রেমিকা চেঁচাচ্ছে—

'তোমায় আমি সহ্য করতে পারি না। কেন জানো ? তুমি এমন ভাব করো তখন তুমি মস্তো বড়ো নামজাদা কেউকেটা লোক। ওইটাই আমার অসহ্য লাগে। কী এমন আছে তোমার মধ্যে, যার জন্যে তুমি নিজেকে এতো কেউকেটা ভাবো?'

'কিচ্ছু নেই।'

লেখক খুব শান্ত গলায় বললো।

এমনই মোলায়েম করে বললো, যেন ও বলতে চাইলো, ও যে এরকম নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা মেজাজে কথা বলছে, এই শুনেই ও সবার থেকে বড়ো।

প্রেমিক বললো—

'তুমি আমায় কখনো কিছু দাওনি। তোমার মতো হৃদয়হীন পুরুষ আমি আর

দেখিনি।'

লেখক নরম গলায় একটু প্রতিবাদ জানালো—

'না, না, তা ঠিক নয়।'

'ঠিক নয় মানে? লোকে তো ভাবে, তুমি কতো ভদ্র, সবাইকার বন্ধু। যারা তোমায় চেনে, তারাই জানে, তুমি কী চীজ!'

আসলে কিন্তু লেখক ঠিক অতোটা হৃদয়হীন নয়। প্রেমিকাকে সে সত্যিই ভালোবাসে। প্রেমিকা দুঃখ পেলে তার কষ্ট হয়। কিন্তু মুষ্কিলটা হল, এই মুহূর্তে তার মনের একটা অংশ খেয়াল রাখছে, মেয়েটি রাগের ঝোঁকে কেমন করে তার কথাগুলো সাজাচ্ছে, রাগের একটা অংশের শেষ শব্দ থেকে কেমন করে আর একটা নতুন শব্দ জেগে উঠছে। মেয়েটির প্রত্যেকটা কথা সে একমনে শুনছে।

'দ্যাখো, তুমি আমার ওপরে সুবিচার করছোনা'—লেখক বলে।

'থামো, তোমায় চিনতে আমার বাকী নেই। তুমি তো ভালোবাসতে চাওনা। ভালোবাসলে প্রেমের কথা বলতে হয়। তুমি সেই কথাগুলো বলতে চাওনা। প্রেমে পড়লে যেসব অনুভূতি আসে বলে লোকে বলে, সেইগুলো তুমি পরখ করে দেখে নিতে চাও।'

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবেনা জানি। তবু বলছি, আমি তোমায় ভালোবাসি—'

'তুমি একটা মিশরীয় মমি। মমি—মমি—মমি!'

লেখকের মনের যে অংশটা গল্প লেখে, সে ভাবছে, এই মেয়েটি রেগে গেলে ওর কথার মধ্যে উপমা-অলংকারগুলো তেমন জোরালো হয়না। লেখক মুখে বলছে—

'বেশ তো, আমি একটা মমি। হলো তো?'

ট্রাফিকের আলো কখন বদলাবে, তারই অপেক্ষায় ওদের দাঁড়াতে হয়। লেখকের মুখে বিষাদ-মেশানো মৃদু হাসি। সেই বিষণ্ণতা এতো গাঢ়, এতো শান্ত এবং এমনই অকৃত্রিম যে প্রেমিকা আর সহ্য করতে পারেনা। সে কেঁদে ফেলে। হাই-হীলে খটখট শব্দ তুলে সে রাস্তা পার হয়। লেখক ছুটে তার নাগাল পায়। প্রেমিকা বলে—

'তুমি বদলে গেছো। তুমি আর আমার কথা ভাবোনা। আগে ভাবতে। এখন আর ভাবোনা। আমার দিকে তাকাও, কিন্তু ভালো করে চেয়ে দেখোনা। তোমার কাছে আমার কোন অস্তিত্বই নেই।'

'আছে, তুমি তো জানো—'

'ছাই আছে! আমি ঝগড়া করলে আমাকে তোমার ভালো লাগেনা। তুমি তখন ভাবো, কী নোংরা আমি। বেশ, আমি নোংরা। তুমি জ্ঞানী, গুণী, লেখক। আমি

সোংরা বলে তোমার আপশোস হয় তাই না? আচ্ছা, তোমাব কি মনে হয়, এই দুনিয়াটার আদি অন্ত শুধু তোমাকে নিয়ে?'

'তুমি এতো চটছো কেন? তোমার মনে হয়েছে, আজ আমি তোমার কথায় মন দিইনি, তাই না? আমি বুঝতে পারিনি। বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই তোমায় ভালোবাসি।'

'ভালোবাসো! তুমি আমায় এমন আঘাত দাও, যা খুব নিষ্ঠুর মানুষও দিতে পারে না। কেন জানো? তুমি কোনো কিছু কখনও অনুভব করোনা, শুধু অনুভব করার ভান করো।'

হঠাৎ প্রেমিকার খেয়াল হয়, লেখক তার কথা শুনছেই না। সে রাগে ফেটে পড়ে—

'তুমি কী ভাবছো এখন, তাই শুনি?'

'কিছু না। শুধু তোমার কথা শুনছিলাম। তুমি অতো চটে না গেলে আমি খুশী হতাম।'

আসলে কিন্তু লেখকের মাথায় গল্পের একটা 'আইডিয়া' এসেছে, নোটবুকে এখুনি লিখে ফেললে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বুক পকেট থেকে নোটবুক বার করে না লিখে রাখলে ভুলে যেতে পারে। লেখক মনে মনে 'আইডিয়া'টা মুখস্থ করার চেষ্টা করছে! কিন্তু মুখস্থের ওপর ভরসা রাখা যায় না।

প্রেমিকা বলে—

'চটবোনা? মমিরা কখনো চটেনা, কোন কিছু অনুভব করে না, অবিচল থাকে। কী? কথা বলছোনা যে?'

'কী আর বলবো—'

পকেট থেকে নোটবুকটা বার করে রাস্তার আলোর নীচে দাঁড়ালো লেখক। পেনসিল চালালো মৃগীরোগীর মত। লেখক লিখলো—

'নোটবুকের উপস্থিতি পরিস্থিতির জটিলতা বাড়াচ্ছে। তরুণ লেখক। তরুনী প্রেমিকা। প্রেমিকা অভিযোগ করছে, লেখক জীবনের দর্শকমাত্র, জীবনে সে অংশ নেয়না। লেখকের মাথায় আইডিয়া আসে, লেখক তা নোটবুকে লিখে রাখতে যায়। ঝগড়া বাড়ে। মেয়েটি সম্পর্ক ভেঙে দেয়।'

প্রেমিকা বলে—

'এবার তাহলে গল্পের একটা আইডিয়া পেলে? আমি জানতাম, তুমি নোটবুকটা বার করবে। আমি জানি, তুমি জ্যান্ত একটা নোটবুক।' কাঁদতে কাদতে ছুটে চলে যাচ্ছে প্রেমিকা।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, বুঝিয়ে বলছি।'

লেখক বলে।

আসলে তার মনে হচ্ছে, গল্পের এই পয়েন্টটা একটু বদলানো দরকার।

লেখক নোটবুক বার করবে।

প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্কটা ভাঙার জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবেই দায়ী। দারুণ আইডিয়া।

হঠাৎ লেখকের মনে হল, তাই তো, সে নিজেও কি প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্কটা ভাঙতে চায়? লেখকের একটা বিষয়ে গর্ব আছে। নিজের কোনো ভাবনা, যতো বিশ্রী, যতো অপ্রীতিকরই হোক, নিজের কাছে স্বীকার করতে তার লজ্জা নেই।

নাঃ, সে তো সত্যিই মেয়েটিকে ভালোবাসে, খুব ভালোবাসে। সম্পর্কটা এভাবে শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছেও তার নেই।

হঠাৎ চমকে উঠে লেখকের খেয়াল হয়, প্রেমিকা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। লেখক তাকে ধরবে বলে ছোটে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও আমি তোমায় বুঝিয়ে বলছি।

লেখক ছুটছে। তার পকেটের মধ্যে নোটবুকটা ধাক্কা খাচ্ছে। নোটবুকটা যেন তার চিরদিনের সঙ্গী, খেলার সাথী, পোষা কুকুর। বড্ড অনুগত, স্নেহের কাঙাল ওই নোটবুক।

মূল গল্প □ দ্য নোটবুক

জন ও'হারা

একালের জনপ্রিয় অ্যামেরিকান কথাসাহিত্যিক জন ও' হারার রচনার একটি বৈশিষ্ট্য ঃ সমকালীন সমাজের বাস্তব ছবির পাশাপাশি এই বাস্তবতার মধ্যে যে অবাস্তবতা লুকিয়ে আছে, সেই বাস্তবতার সম্বন্ধে এক ধরণের আতংক-মেশানো আর্কষণ। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন্ সামারা'-য় মানবসমাজ এক অদ্ভুত অস্তিত্ব, যে নিজস্ব নিয়মে চলে এবং যে একবার চলতে শুরু করলে ব্যক্তিমানুষ তার বিরুদ্ধে একান্তই অসহায়। জন ও'হারা যাকে বলেন 'অ্যাবসারডিটি অফ সোসাইটি', প্রসিদ্ধ সমালোচক লায়নেল ট্রিলিং সেই ধারণার সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ফ্র্যানজ কাফকার 'দ্য ট্রায়াল্' নামের প্রতীকী উপন্যাসে উপস্থাপিত চিন্তাধারার সাদৃশ্য দেখেছেন। জন ও'হারা ছোটগল্পের নিপুণ রূপকার। তাঁর 'এ রেজ টু লিভ' এবং অন্য কিছু উপন্যাসে সামাজিক জীবনের ডিটেলস-এর বর্ণনার বাড়াবাড়ি কাহিনীর গতিতে কিছুটা বাধা দেয়। তাঁর ছোট গল্প পক্ষান্তরে অনেক বেশী সুখপাঠ্য। এখানে মানুষের জন্যে তাঁর নিবিড় মমতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই সমাজের সম্বন্ধে একটা আতংক, যে সমাজ প্রেমিক প্রেমিকাকে সুখী হতে দেয় না এবং মানুষকে জাতি, সংস্কার, সম্প্রদায় বা অর্থকৌলীন্যের কৃত্রিম বাঁধনে বেঁধে রাখে।



প্রেমিক প্রেমিকারা

জন ও'হারা

মেরী স্পেল্যাসী থিয়েট্রিক্যাল ম্যানেজারের অফিসে চাকরী করে, অফিসটা বেশ বড়, কিন্তু অফিসে নিয়মের কড়াক্কড়ি ততোটা নেই। মেরী অফিসে যায় বেলা সাড়ে দশটায়। তার আগে আর কেউ অফিসে আসেনা। অবশ্য বসের কাছে চাবী আছে। সুতরাং বড়সাহেব যদি মেরীর আগে অফিসে আসতে চায়, তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। পারমানেণ্ট কর্মচারী বলতে বড়সাহেব, প্রেস-এজেণ্ট, বুককীপার, বড়সাহেবের সেক্রেটারী এবং মেরী। মেরী নিজেকে বলে রিসেপশনিষ্ট। অবশ্য অন্য কাজের মধ্যে টাইপ করা, ছোট্ট টেলিফোন সুইচবোর্ড অপারেট করা এবং অন্য কাজ যা করতে তার ভালো লাগে, সেগুলো ধরা উচিত। এই চাকরীর অনেক কিছুই তার পছন্দ। মাইনে ভালো, বড় সাহেবের নেশা হলে কিম্বা ব্যবসায় হঠাৎ লাভ হলে বোনাস পাওয়া যায়। নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখে মেরী এবং তাদের সঙ্গে বড়সাহেবের সম্বন্ধটা ঠিক কোন্ পর্য্যায়ে আছে, সে জানে। বড় সাহেবের নাটক ষ্টেজে উঠলেই প্রথম রজনীর টিকিট পায় মেরী এবং অন্য অফিসের মেয়েদের সঙ্গে বোঝাবোঝি থাকায় অন্য নাট্য প্রযোজকদের নাটকের প্রথম রজনী দেখারও সৌভাগ্য হয় তার। বড়সাহেব তাকে কখনও জ্বালায়নি। প্রেসএজেণ্ট গত তিন বছরে তার পেছনে লাইন দেওয়ার কোনো চেষ্টা করেনি। কিন্তু চাকরীটার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো, সাতসকালে অফিসে আসতে হয় না। চুক্তি অনুযায়ী সকাল দশটায় তার অফিসে আসার কথা। কিন্তু সাড়ে তিন বছরে সময়টা একটু একটু করে এগিয়ে এখন এগারটার কাছাকাছি অফিস খোলে মেরী। বুককীপার এই নিয়ে প্রথম প্রথম পেছনে লাগতো। কিন্তু বড়সাহেব মেরীকে পছন্দ করে বুঝে সে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

মেরী যে খুব অলস স্বভাবের মেয়ে, তা নয়। কিন্তু মেরী আরামে থাকতে ভালবাসে। যেখানে মেরী থাকে, সেখান থেকে টাইমস স্কোয়ারে আসতে চার ডলার ট্যাক্সি-ভাড়া লাগে। সুতরাং শহরে বেশী রাত অবধি ডেট থাকলে রাতের ঘুম কম হবার সম্ভাবনা থাকে। মেরী রাতে আট ঘণ্টা ঘুমুতে চায়।

যেহেতু 'কুইনস'-এর দূর প্রান্তে, বাস লাইন যেখানে শেষ, সেখানে থাকে মেরী, যে বাসটা সাবওয়ের দিকে যায়, সে বাসে অনেক সময়ই মেরী প্রথম প্যাসেঞ্জার। বছর তিন ধরে সে অনেক ড্রাইভারের মুখ চেনে কিম্বা দেখা হলে 'হ্যালো' বলে।

কিন্তু বাস-ড্রাইভারদের মধ্যে একমাত্র হারবার্ট-এর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা হয়েছিল।

একদিন হারবারট বাসে বসে ষ্টার্টিং-এর সময় সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করছে। মেরী প্রায়ই ওর বাসে চড়েছে। দেখা হলে ওরা ঘাড় নাড়ে, হাসে, সুপ্রভাত বলে। কিন্তু সেদিন সকালে হারবারটের কি যেন হয়েছিল। এমনিতে ও বিষণ্ণ চোখের এক ইহুদী পুরুষ। রোন্যাল্ড কোলম্যানের মত দেখতে, যদিও অতো সুন্দর নয়। তার হাসিটা মিষ্টি, তবে সে হাসিতে বিষণ্ণতার ছোঁয়া। কিন্তু সেদিন সকালে ওকে যেন শয়তানীতে পেয়েছিল। মেরী বাসের কাছে এলে হারবারট এমন একটা ভাব করলো যেন ও মেরীকে দেখতেই পায়নি। মেরী কাঁচের দরজায় ধাক্কা দিল। হারবারট দরজা খোলার নিউমেটিক যন্ত্রে হাত দেওয়ার বদলে নিজের হাতের আঙুলগুলো ট্রাউজারে পালিশ করলো এবং পালিশটা কেমন হল, হাত তুলে দেখতে লাগলো। মেরী দরজায় আবার ধাক্কা দিল। কিন্তু হারবারট হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গীয়ার বদলে ইঞ্জিন ষ্টার্ট দিলো, কিন্তু ক্ল্যাচ ছাড়লো না। মেরী এবার আরো জোরে দরজায় ধাক্কা দিল। এবার এই যেন ওকে প্রথম দেখছে, এমন একটা ভাব করে দরজা খুলে দিলো হারবারট।

'তুমি।'

ওর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো মেরী।

'সুপ্রভাত।'

মিষ্টি হেসে বললো হারবারট। ও এমন বিনীত ও ভদ্রভাবে কথা বলছিলো যে মেরী নিজের সন্দেহ সম্বন্ধে সেদিন নিশ্চিত হতে পারলো না। কিন্তু পরের দিন হারবারট যখন আবার একই রকম ব্যবহার করলো, মেরী বললো—

'কোনো কোনো পুরুষের একচোখ কানা, আর একচোখেও ভালো দেখে না। তারা বাস ড্রাইভ করার চাকরী পায় কি করে?'

'তুমি কি আমার কথা বলছো?'

'যদি জুতোটা তোমায় ফিট করে, তাহলে হয়তো তাই। হ্যাঁ, কোন কোন লোক

আবার কানেও কম শোনে—'

'তুমি কি বলছো বুঝলামনাতো—'

তৃতীয় দিন সকালে মেরী বাসের দরজার কাছে যেয়ে দরজার ওপর হাত ঠোকে। হারবারট তাকে এক মিনিট দাঁড় করিয়ে হঠাৎ যেন এরোপ্লেন দেখছে এমন একটা ভাব করে আকাশের দিকে তাকায় এবং মেরী আকাশের দিকে তাকাতেই আচমকা দরজা খুলে দিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠে।

'ইয়ার্কি।' বাক্সে পয়সা ফেলে বলে মেরী।

পরের দিন মেরী ঠিক করলো, হারবারটাকে বোকা বানাতে হবে। বাসের দরজার কাছে না যেয়ে সে বাসের উইণ্ডশীল্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বাসের গায়ে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে লাগলো। পুরো দু'মিনিট ওকে নির্বিবাদে কাগজ পড়তে দিলো হারবারট, তারপর হঠাৎ হর্ন বাজাতেই মেরী লাফিয়ে উঠলো।

'ড্যাম ইউ।' মেরী চিৎকার করছিল। ওর ইচ্ছে করছিলো, বাসের ভেতরে ঢুকে হারবার্টকে মারে। কিন্তু লোকটা ভেতরে বসে হাসছে, দরজা খুলছেনা। রাগ পড়ে যেতে মেরী ঠিক করলো, আজ আর সে হারবার্টের বাসে যাবে না। বাসষ্টপের কাঠের বেঞ্চিতে বসে কাগজ পড়তে লাগলো মেরী। হারবারট বাসের দরজা খুললো। কিন্তু মেরী কাগজ থেকে মুখ সরালোনা। এবার হারবারট ঘাবড়ে গেল। ও ভাবলো, মেরী সত্যিই রেগে গেছে, তার বাসে উঠবে না। এদিকে ষ্টার্টিং টাইম থেকে এক মিনিট বেশী হয়ে গেছে। বাস থেকে নেমে হারবারট বললো—

'আমি ক্ষমা চাইছি।'

'আমি পরের বাসে যাবো। তোমার নামে রিপোর্ট করবো—'

'না, তুমি রিপোর্ট করবেনা। তুমি জানো, আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমি বোকা, তোমার নামে রিপোর্ট করবোনা, সেই সুবিধেটা নিয়েই তুমি আমায় জ্বালাচ্ছো। হর্ণ বাজাতে আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

'আমি দুঃখিত। আমায় ক্ষমা করো। দয়া করে বাসে ওঠো।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আর ইয়ার্কি মেরোনা। তোমার মত আমারও চাকরী করতে হয়।'

ওরা বাসে ওঠে। ব্যাগে পয়সা খুঁজছে মেরী।

'আজকের পয়সা আমি দেবো।'

'ভারী তো পয়সা। তাছাড়া আমি তোমার নাম জানিনা।'

'আমার নাম লুই, হারবারট লুই। এখন ইচ্ছে করলে তুমি আমার নামে রিপোর্ট করতে পারো।'

'তার মানে তুমি আবার আমায় জ্বালাবে? আমার সহ্যশক্তি কিন্তু ফুরিয়ে

আসছে।'

'দ্যাখো, একঘেঁয়ে লাগতো, তোমাকে দেখলে মনে হয়, তুমি খুব স্পোর্টিং, তাই ইয়ার্কি মারছিলাম। হয়তো বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি—'

'হয়তো।'

—ভাড়া দিয়ে একেবারে পেছনের দিকের সীটে বসলো মেরী। হারবারট যেন আর ওর সংগে কথা বলার সুযোগ না পায়। হারাবারট অন্য প্যাসেঞ্জারদের 'সুপ্রভাত' বলছেনা দেখে মেরীর খুব খারাপ লাগছে। সাবওয়ে স্টেশনে মাঝের দরজাটা দিয়ে না নেমে সামনের দরজা দিয়ে নামে মেরী এবং যাওয়ার আগে একগাল হেসে বলে যায়, 'গুডবাই!' রাস্তা পার হয়ে ষ্টেশনে ঢুকতে ঢুকতে মেরী ভাবে, হারবারটা হয়তো এখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে।

পরের ক'দিন আর কোন ইয়ার্কি মারলোনা হারবারট। কিন্তু দুজনের মধ্যে মিষ্টি হাসির বিনিময় হয়। মেরী বুঝতে পারে, তার মত হারবারটও সকালের এই দেখা হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে। এখন সামনের সীটে হারবারটের কাছে বসে মেরী। এমনি করেই তারা পরস্পরের সম্বন্ধে খবরগুলো শেষ পর্য্যন্ত জানতে পারে। যে হারবারট বিবাহিত, তার দুটো বাচ্চা আছে, সে জ্যাকসন হাইটে থাকে, শেভ্রলে গাড়ীর মালিক। সে ডাক্তার হতে চেয়েছিল ছোটবেলায়, দু'বছর পিয়ানো বাজাতে শিখেছিল, দুমাস সিগারেট না খেয়ে দারুণ মোটা হয়ে গিয়েছিল, তার এক ভাই কোন সিগারেট না খেয়ে দারুণ মোটা হয়ে গিয়েছিল, তার এক ভাই কোষ্ট গার্ডের চাকরী করে, সিনেমা দেখা তার মতে নিছক সময় নষ্ট করা, শালী আর ভায়রা ভাইয়ের সঙ্গে ব্রডওয়েতে 'সীটদ্য পীপল' থিয়েটার দেখার পর আর কোন থিয়েটার দেখেনি হারবারট। মেরী নিজের সম্বন্ধে যে খবরগুলো দিয়েছে, সে গুলো হল—মেরী জাহাজে কিউবা গিয়েছিল, মদের খোঁয়াড়ি ভাঙতে সে কোকাকোলার সঙ্গে অ্যামোনিয়া মিশিয়ে খায়, তার আইরিশ বন্ধুর চেয়ে ইহুদী বন্ধুর সংখ্যা বেশী, যখন সে ছোট ছিল সে দুবছর পিয়ানো বাজানো শিখেছিল, মাংসের ষ্টীকের বাইরেটা শক্ত ভেতরটা নরম হলে তার পছন্দ, বারো বছর বয়সে সে ধর্মযাজিকা হতে চেয়েছিল, এখন সে বাস লাইনের শেষ প্রান্ত থেকে দেখা যায়, এমন একটা বাড়ীতে মা আর তিন বোনের সঙ্গে থাকে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে যা কিছু জানার জেনে নিয়ে তারা একে অন্যকে ভালোবাসলো। অবচেতন সাবধানতার সময় সীমা কেটে গেলে প্রশ্ন রয়ে গেলো, কে প্রথম বলবে, সে ভালোবাসে।

একদিন মেরী বললো—

'মঙ্গলবার রাতের শোয়ে তুমি যদি থিয়েটারে যেতে চাও, আমি তোমায় দুটো

পাশ দিতে পারি। আমার বড়সাহেব চান. সমালোচকরা দেখার আগে দর্শকরা নাটক দেখুক। সুতরাং মঙ্গলবার রাতে ব্রুকলীন এডিসন কিম্বা বণ্ড ব্রেডের কর্মচারীরা নাটক দেখবে। প্রথম রজনীর মতোই। শুধু সমালোচকেরা থাকবেনা, দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখা হবে। ড্রেস রিহার্সালের মতোই, তবে সামনে দর্শক থাকবে। কোথায় দর্শক থাকবে কোন কোন জায়গাটা বাদ দিতে হবে, বোঝা যাবে। তুমি আর তোমার বউ যাবে নাকি?'

'শোনো, মেরী, আমি আমার বউকে ঘেন্না করি।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

'তোমার অফারের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু যখন কেউ থিয়েটার দেখতে যায়, সে সময়টা আনন্দে কাটাতে চায়, সে এমন কাউকে সঙ্গে নিয়ে যায়, যাকে সে ভালোবাসে, যাতে সময়টা আনন্দে কাটে। আমার বউ সে ধরনের মেয়ে নয়। ওর অনুপস্থিতিতে আমি ওর সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলতে চাইনা। সবাই জানে। আমি ওকে অপছন্দ করার আগেই ও আমাকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিলে। শুধুমাত্র বাচ্ছা দুটোর জন্যেই বিয়েটা টিকে আছে। আহ্! তুমি ভালো একটা প্রস্তাব দিলে আর অমনি আমি.....কিন্তু মেরী, আমি তোমায় ভালোবাসি। তাই আমি অন্য লাইনের বাসে ট্র্যান্সফার নিচ্ছি। তোমায় কিছু বলতে হবে না। আমি ভালোবাসি বলে তোমার কোন দায়িত্ব আছে, তুমি ভেবোনা। কিন্তু এভাবে যন্ত্রনা পাওয়া আর যন্ত্রনা ভুলতে মদের নেশা করা আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। তাই আমি অন্য বাস-লাইনে ট্র্যান্সফার নিয়েছি।'

'কবে থেকে?'

'সোমবার রাতে আমি ফরেষ্ট হিলের এক ড্রাইভারের সঙ্গে লাইন বদলাবদলি করে নেবো? ক্রাইষ্ট, সারা দিন আমি তোমার কথা ভাবি।'

'আমার বউ....তুমি কথা বলছোনা। তুমি কথা বলছোনা, কিন্তু কি ভাবছো, আমি জানি।'

'না, জানোনা।'

'না, তোমার কোন দায়িত্ব নেই এ ব্যাপারে। আমি তোমায় ভালোবাসি সেটা তো তোমার দোষ নয়।'

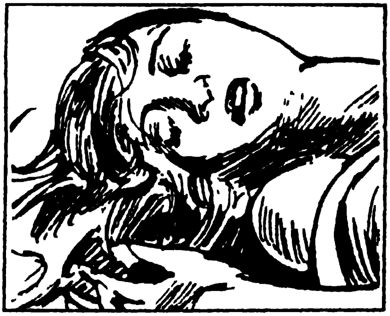
'তুমি ভুল বলছো, হারবারট। আমার দায়িত্ব এইখানে যে আমি তোমায় প্রথম মুখ খুলতে দিয়েছি। তুমি কিছু না বললে আমি বলতাম। বা কোনভাবে তোমাকে বোঝাতাম, আমি তোমায় ভালোবাসি। এখন কথাটা পরস্পর হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, হয়তো তাই। যে ভাবেই হোক, এখন আমরা জানি....

মূল গল্প □ দন্ত-লাভারস নো

জন আপডাইক

জন্ম ১৯৩২—একালের জনপ্রিয় অ্যামেরিকান কথা সাহিত্যিক জন আপডাইক পঞ্চাশের দশক ও উত্তরকালের অ্যামেরিকান সমাজ এবং বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব পেনসিলভ্যানিয়া, যেখানে আপডাইক বাস করেন, সেখানকার সমাজ ব্যবস্থার নিপুণ ছবি এঁকেছেন 'র‍্যাবিট রান, দ্য সেণ্টার', 'কাপলস' প্রমুখ উপন্যাসে। সমালোচকেরা তাঁর রচনায় দেখেছেন বুদ্ধিব দীপ্তি এবং কবির মানসিকতা। তাঁর উপন্যাসের এক মৌল বিষয় ঃ একালের মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা। মানুষ তার নিজের ভেতরে বন্দী, অথচ সে প্রেমের ভেতরে তার পরিপূর্ণতা, তার অস্তিত্ব এবং তার সুখকে খুঁজছে। আপডাইকের শিল্পজগতে নরনারী পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারেনা। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিতে প্রায়ই এই দার্শনিক প্রতীতির প্রকাশ দেখা যায় যে অমরত্বের জন্যে মানুষের পিপাসা তাকে প্রেম ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারেনা এবং প্রেমের জন্যে তার পিপাসাও অপূর্ণ থেকে যায়! 'অফ দ্য ফার্ম' উপন্যাসে সরল ও স্বল্পকথনভিত্তিক গদ্যভঙ্গীতে কবিতার আবহ এনেছেন আপডাইক এবং অন্যান্য উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনায় বার বার এনেছেন গ্রীক উপকথার সাযুজ্য। বর্তমান গল্পটি ১৯৩৫-য়ে 'ও হেনরী' স্মৃতি পুরস্কার পায়।



নগ্ন নির্জন

জন আপডাইক

'দ্যাখো, আমরা আক্রান্ত হতে চলেছি,' খুসী হয়ে বলে জোয়ান মেপল। তার স্বামী বালি থেকে মাথা তোলে।

সমুদ্র সৈকত বেয়ে হেঁটে আসছে যুবক যুবতী। মেপল দম্পতির চেয়ে বয়সে ছোট। যেন একজোড়া পশু মাথায় কেশর, রঙ বাদামী। ওদের চলাফেরায় মহিমান্বিত একটা ভাব আছে। আসলে নিজেদের ব্যাপারে অতি সচেনতা ঢাকার অদৃশ্য চেষ্টার ফল। ভালো করে দেখলে বোঝা যায়, যুবক যুবতী সম্পূর্ণ নগ্ন।

হাই চাপে রিচার্ড। নগ্ন যুবক-যুবতীর চারপাশে নৈঃশব্দ্য। যেন ওরা ছোট ছোট ঢেউয়ের মত এগিয়ে চলেছে পোষাকপরা পুরুষ ও রমণীদের দিকে। সমুদ্রে ঢেউয়ের ওঠাপড়া আলোর ঝিলিক এখন কেউ দেখছেনা। নগ্ন যুবক যুবতী যেন পোষাকপরা পুরুষ ও রমণীদের অপমান করতে এগিয়ে আসছে।

'বেশ!'—ছাতার নীচে শুয়ে থাকা এবং পোষাকপরা এক মহিলার মন্তব্য স্যাণ্ডউইচের কাগজের ঢাকনার মত সৈকত জুড়ে উড়ে যায়।

সমুদ্র সৈকতের ওপরে ভেসে যায়। একটা বুড়ো লোক, পিপের মত বুকটা বাচ্ছা ছেলের মত নাইলনের সুইমিং ট্রাংকে মিশেছে, আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ায়। তার অসহায় প্রতিপক্ষের ভঙ্গী ট্যাক্সি ডাকা ও ঘুঁষি দেখানোর মাঝামাঝি। রিচার্ডের নিজের বুকেও তীব্র অনুভূতির আলোড়ন।

তার স্ত্রীর রং বাদামী, হাসিখুশী, আধুনিক। সে বলে—'ওদের ঢিল ছুঁড়ে মারা হবে। কয়েক'শ গজ আস্তে আস্তে প্যারেড করে নগ্ন যুবক যুবতী হঠাৎ ছুটে পালায়। নগ্ন যুবতীকে এই মুহূর্তে হাস্যস্কর মনে হয়। পালাবার চেষ্টায় নিতম্বের দোলন, নারী-মাংসের দুলে ওঠা পুরুষের সঙ্গে সে তাল রাখার চেষ্টা করলেও পুরুষ ও রমণীর

মধ্যে ব্যবধান গড়ে ওঠে। পুরুষের চুল সমুদ্রের নীল পটভূমিতে ওড়ে।

যেন টেনিস ম্যাচ হচ্ছে! দর্শকেরা মাথা ঘুরিয়ে দেখে, কেন এরা পালাচ্ছে। কাঁকড়ার মত বোর্ডওয়াক ধরে এগিয়ে আসছে। তার য়্যুনিফর্ম তাকে বিশেষ একটা দলের প্রতিনিধি করে তুলেছে। কিন্তু যখন সে এগিয়ে আসে, তার জুতোজোড়া নিয়মিত পদক্ষেপে বালি মাড়িয়ে এগোয়, তখন বোঝা যায়, তাবও বয়স বেশী নয়, সে যুবক। 'মাই গড! ওদের একজন—' রিচার্ড আস্তে আস্তে বলে।

'শুয়োরটার বয়স কম, দেখতেও মন্দ নয়।' ঠাণ্ডা মেজাজে বলে জোয়ান। এই কথাটা রিচার্ডের পছন্দ নয়। সে একটা পছন্দমত কথা খুঁজছিল, শব্দহীন কোন বিষণ্নতা। সে চটে ওঠে, বলে—'তুমি বুড়ি, মার-খাওয়া উদারনৈতিক—'

'মাই গুডনেস! আমরা করেছিটা কি? ওরা তো তোমার পোষাক খোলার চেষ্টা করেনি।'

'হয়তো সেটাই আমার অভিযানের কারণ।' সে ঠাণ্ডা হয়ে বলে।

এবারের ছুটিতে মেপল দম্পতিকে দুজনের কাছাকাছি কিন্তু অন্যদের থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। এক মেয়ে আছে তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে। এক ছেলে চাকরী করে। অন্য ছেলে গেছে টেনিস ক্যাম্পে। সবার ছোট মেয়ে 'বীন্' তার ডাকনামটা অপছন্দ করে এবং এই তেরো বছর বয়সেই বাপ-মার কাছে থাকতে চায়না। পরিবার যেন দিন দিন ছোট হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীকে একে অন্যের কাছে বেশী সময় থাকতে হচ্ছে। মেজাজ আরও ঠাণ্ডা করে রিচার্ড বলে, 'চলো, ওর পেছন-পেছন যাওয়া যাক।'

পুলিসম্যানকে এখন দূরে নীল একটা বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। জোয়ান সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বালি তার শরীর থেকে ঝরে যায়। তার রাজী হওয়ার আনন্দ স্বীকৃতিটা ফাঁকা। কিন্তু তার শরীরের কামনা-জাগানো পরিসর, পুরুষের পাশে তার হেঁটে চলার ভঙ্গী এবং পুরুষের কাঁধে তপ্ত রোদের আলো—এই সবই বাস্তব, রিচার্ড ভাবে।

বেদিংসুট-পরা স্নানার্থীদের পেছনে ফেলে বাঁক ঘুরতেই তারা দেখে, নগ্ন স্নানার্থী ও স্নানার্থীনীরা বালি ও নোনা জল ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। লাল চুল, মুখে ব্রণ, মেয়েদের শিথিল ও দুধেল পেট। জিপ্সী মেয়েদের শক্ত শরীর। দাড়িওলা একটা পুরুষ মাথায় ভর দিয়ে আকাশের দিকে পা তুলে যোগাভ্যাস করছে। এবং এসবের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে বেল্ট-বন্দুক-সমতে পুলিসম্যান। ফিসফিস করে পুলিসম্যান কথা বলছে, প্রায় ছুয়ে যাচ্ছে নগ্ন মেয়ে-পুরুষের শরীর। ওরা জনে জনে, দলে দলে মাথা নাড়ছে। পোষাক পরে নিচ্ছে, যে নগ্ন যুবক যুবতী ভিন্ন এলাকায় ঢুকে ঝামেলা বাঁধিয়েছে, তাদের অন্য নগ্ন রমণী পুরুষের থেকে আলাদা করে চেনা যায়না। তাই সবাইকেই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি পুরোনো জীনস, হাতাবিহনী জামা, স্যান্ডেল ও অদ্ভুত ধরণের নরম টুপি পড়তে ব্যস্ত ছিল। জোয়ান তাদের কাছে যেয়ে বলে— 'তোমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে?' ছেলে দুটো সোজা হয়ে জোয়ানের বিকিনি, মোটাসোটা হাসিখুশী চেহারা, সহানুভূতিপূর্ণ হাসি দেখে কিন্তু মুখে কিছু বলে না। রিচার্ড খেয়াল করে, একটা ন্যুডিষ্ট ছেলের পুরুষাঙ্গ জোয়ানের হাতের এক ফুট দূরে ঝুলছে। স্বামীর পাশে ফিরে আছে জোয়ান।

'ওরা কি বললো?'

'কিচ্ছু না। ওরা শুধু আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি পৃথিবীর নয়, চাঁদের মেয়ে।'

'অ্যামেরিকায় গত দশ বছরে দুটো বিপ্লব হয়েছে। প্রথমতঃ মেয়েরা 'ফাক' ঃ এই অশ্লীল কথাটা ব্যবহার করতে শিখেছে। দ্বিতীয়তঃ নির্যাতিতেরা তাদের যারা সহানুভূতি দেখাতে যায়, তাদের ঘৃণা করতে শিখেছে।

জোয়ান আঘাত পেয়েছে বোঝা যায়। পরে সে স্বামীকে পাল্টা আঘাত দেবে। ঘা'টা নরম করার জন্যে রিচার্ড বলে—'হয়তো প্যান্ট পরার সময় কথা বলেছিলে বলেই বিরক্ত হয়েছে।'

মজার ব্যাপার হল, ন্যুডিষ্টরা বুর্জোয়াদের থেকে বেশী কাপড়জামা নিয়ে আসে সমুদ্র সৈকতে। মাথা থেকে পা অবধি ঢেকে আনে ফেল্ট হ্যাট ও ডেনিমের জামাপ্যান্টে। যেন ওরা সহরের রক্ষণশীল সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে এখানে এসেছে। এখন পুলিসম্যান দুঃখী দেবদূতের মত জনে জনে দুঃসংবাদ জানাচ্ছে এবং ওরা নিচু হয়ে পোষাক পরে নিচ্ছে। 'মাই গড!' দৃশ্যটা যেন ম্যাসাকিও-র আঁকা 'স্বর্গোদ্যান থেকে বহিষ্কার' পেইন্টিংটার মত।

সমুদ্র সৈকত থেকে ফিরে মস্ত লন-মোয়ারটা ভাড়াবাড়ীর সামনের বিশ্রী ঘাসে চালাতে চালাতে রিচার্ড নগ্নতার কথাই ভাবে। আদম ও ইভ। এবং কে তোমাকে কহিলেন যে তুমি নগ্ন? নগ্ন নোয়াকে ধরে আছে হ্যাম। নগ্ন সুসানাকে দেখছে বড়রা। রিচার্ড নিজে শিশু, নগ্ন, মায়ের সঙ্গে দোতলার খোলা বারান্দায় সূর্যস্নান করছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাতিক ছিল মায়ের। রেলিং থেকে ঝুলছে কম্বল। শহরের দৃষ্টিকে আড়ালে রাখার জন্যে। তবু ভেসে আসছে মার্চের শহরের নানা আওয়াজ। পাখী ডাকে, ছেলেরা খেলা করে। এডওয়ার্ডের নিজের ঘাবড়ে যাওয়া ভাবটা প্রত্যেক মিনিটে বাড়ছে। রিচার্ডের মনে পড়ে, শিল্পী রোদিন্ বলেছিল, মেয়েদের পোষাক ছাড়ার দৃশ্য মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ আসার দৃশ্যের মত। বিকেলের আকাশে এখন মেঘ জমছে, লনে ছায়া পড়ছে। একসময় রিচার্ড এমন একটি মেয়েকে ভালোবাসতো, যে মস্ত বড় আয়নার পাশে শুতো। প্রথমবার ওর সঙ্গে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ডান দিকে তাকিয়ে

রিচার্ড দেখে, আয়নায় তার ও তার বান্ধবীর নগ্ন শরীরের প্রতিফলন। সে ও তার সঙ্গিনী দুজনেরই পা দুটো সমান্তরাল, লম্বা। সঙ্গিনী বুঝেছিল, পুরুষের নজর অন্যদিকে গেছে। সঙ্গিনী আয়নার দিকে তাকায়। তার মুখ যেন এখন রিচার্ডের মুখের ড্যুপ্লিকেট। রিচার্ড একটু আতংকিত। সে তার শরীরের নীচে শুয়ে থাকা মেয়েমানুষকে প্রশ্ন করে—'তোমার খারাপ লাগেনা?' মেয়েমানুষ বলে—'না সকালে উঠে নিজেকে বিছানায় রাখতে বেশ লাগে।' যেন মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয় রোদ। কিন্তু আয়নায় রমণীর বদলে নিজের শরীরই রিচার্ডের চোখ কেড়ে নেয়। দীর্ঘ, চকচকে, রোমশ, সমান্তরাল পা, ছোট্ট চমকে যাওয়া মুখ।

নীচের তলায় শব্দ হয়। তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। চোখ দুটো বিস্ফোরিত হয়। কে? দুধওলা, পোষ্টম্যান, কুকুর, চুল্লি?

ওরা আবার শোনে। পায়ের শব্দ। চাদর মাথা অবধি টেনে দেয় রিচার্ড। চাদর ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ায় সঙ্গিনী। শিল্পী রেনোয়া-ব 'স্নানরতা' পেইন্টিং এর নায়িকার মত। এখন রিচার্ড আযনায় একা। আয়না বলছে, রিচার্ড যেখানে থাকা উচিত নয়, সেখানে আছে। তার সঙ্গিনী নগ্ন শরীরেই ফিরে এসে বলেছে, 'কিছু না'। রমনী নিজের বাড়ীর নীচের তলা দিয়ে একা নগ্ন অবস্থায় হেঁটে গেছে। যেন নন্দনকানন থেকে ভুল করে এখানে এসেছে। চেয়ার, ছবি ও ল্যাম্পের পাশ দিয়ে সে হেঁটেছে তার নগ্ন শরীরের বিভায় ওগুলো আঁধার হয়ে গেছে। সে চোর, ডাকাত, দুধওলা বা স্বামী কাউকে ভয় করেনি। সে নগ্ন অবস্থাতেই ফিরে এসেছে। শান্ত, শিল্পী টিশিয়ানের অমর সৃষ্টি 'ভেনাসে'র মত চওড়া, যেন অদৃশ্য আলোর জ্যোতিতে বন্যার মত ভাসিয়ে দিয়েছে পুরুষকে।

পুরুষ ভেবেছে টিশিয়ানের ভেনাসের কথা। শক্ত দুটো হাতে ভিজে চুল থেকে জল ঝাড়ছে ভেনাস। মনেৎ-এর অলিম্পিয়া, গয়া-র মাজা। লজ্জহীনা। কেট চপিন্-এর নায়িকা এডনা পনটেলিয়ার রক্ষনশীল বিগত শতাব্দীর শেষ বছরে উপসাগরের দিকে হাঁটছে, পোষাক খুলে জলে নামছে। জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়। তার আগে সে বলেছিল, আকাশের নীচে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ানো কি অদ্ভুত, কি ভয়ংকর, কি সুন্দর।

একমাস আগে এই বাড়ীটা ভাড়া নেওয়ার আগে সে বাড়ীটা দেখতে এসেছিল। দ্বীপের অর্ধেক দোকান তখনো খোলেনি। সে কয়েক দিনের মত খাবার কিনে ফাঁকা ও নিঃশব্দ ঘরে কয়েকদিন একা ছিল। একদিন সকালে সে হাকলবেরী ও বুনো আঙুরের ঝোপে ঘেরা এক মাইল পথ পেরিয়ে একটা পুকুরের কাছে এল। পুকুরের জলে সারস পাখীরা রোদের আলোর মধ্যে ভাসছিল। দেবতার মত সুন্দর, যেন অনেক দূরের কিছু। কাছাকাছি বাড়ী নেই, গাড়ী নেই, শুধু বালি আর ঝোপঝাড়। আকাশের নীচে এমন নিঃসঙ্গতা দেখে সময় নষ্ট করতে চায়নি রিচার্ড। সে জামাকাপড় খুলে নগ্ন হয়ে বসেছিল গরম ও রুক্ষ পাথরের ওপরে। জলের কিনারে সে যেন ভবিষ্যৎবক্তা

ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, সে যেন ব্যাপটিষ্ট। জল থেকে প্রতিফলিত আলো তার পায়ে এসে লাগে। সুন্দর কিছু ভালো কিছু অশ্লীল কিছু করতে তার ইচ্ছে হয়। পুকুরের বুক থেকে কুয়াশা মরে যায়। রোদ আরো তীব্র হয়। সারসেরা ডানা ঝাপটে উড়ে যায়। হঠাৎ যৌনতার কথা ভুলে যায় রিচার্ড। সে যেন বর্তুলাকার সৃষ্টির ঐশ্বরিক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। তার চামড়া যেন হঠাৎ সুন্দর হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্য্য যেন সেখানে ঢেউ তুলছে।

রাত এগারোটা। বাইরের ডিনার খেয়ে এসেছে মেপল দম্পতি, তাদের ছোট মেয়ে বান্ধবীর সঙ্গে রাত কাটাতে গেছে। তাদের শোয়ার ঘর সাদা, সেখানে হাওয়া খেলছে, ব্যুরোও চেয়ারগুলোও সাদা। ছাদ এতো নীচু যে তাদের ছায়া যেন মাথার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিছানার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে জুতোজোড়া খোলে জোয়ান। নীচের দিকে তাকাতে যেয়ে তার মুখটা ছোট দেখায়। সে স্কার্টের চেন খোলে। অর্ন্তবাসের সাদা 'ভি' অক্ষরের মত অংশ দেখা যায়। স্কার্ট খসে পড়ে। পা দিয়ে তুলে ওটা ড্রয়ারে রাখে জোয়ান।

তারপর জার্সি খোলে। মাথাটা দেখা যায়না। চুলটা মেঘের মত, মুখটা আবার দেখা যায়। কি যেন ভাবছে।

রাস্তা থেকে গাড়ীর হেডলাইটের আলো আসে, চলে যায়।

অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা। জোয়ান দ্রুত আন্ডারপ্যাণ্ট দুহাতে নামাচ্ছে। স্লিপ তুলছে। কোমরের ওপর নাইলন আটকে যায়। ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া ক্রীতদাসীর মত, মানচ-এর ম্যাডোনার মত, ইনগ্রেস-এর পূজোপচার বহনকারিণী রমণীর মত দেখায় ওকে। সাপের চামড়া খুলে যাচ্ছে। পেছনের ষ্ট্র্যাপ খুলছে। ব্রাটা ছুড়ে দিয়েছে জোয়ান। বিছানার দিকে তাকিয়ে অসন্তোষের ভঙ্গীতে সে বলে— 'তোমার কি আর কিছু করার নেই।'

অর্ধনগ্ন রিচার্ড বিছানায় শুয়ে দেখছে। হাততালি দেওয়ার ইচ্ছেটা চেপে রেখেছে। 'কিছু না'—সে বলে।

তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে নগ্ন হয়, তার ছায়া মাথার ওপরে ঘোরে। এখন দম্পতি পাশাপাশি, সমুদ্র সৈকতে ন্যুডিষ্ট যুবক যুবতীর দ্বারা উপেক্ষিতা হয়ে জোয়ান যেমন রিচার্ডের পাশে দাঁড়িয়েছিল, যখন রিচার্ড তাকে উপহাস করেছিল, এখন তারা স্মৃতির ভেতরে সৈকতে ফিরে গেছে। রিচার্ড দেখে, তার স্ত্রীর মোটাসোটা শরীরের আড়ালে হাসিখুশী হৃৎপিণ্ডটা দুলছে। স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকায়, চোখদুটো সকালের মত, হাসে, শান্তভাব বলে '—না।' রিচার্ড উত্তেজিত, নিজেকে তার আক্রান্ত মনে হয়। এই নগ্নতা তাদের দুজনের কাছেই নতুন।

মূল গল্প □ নেকেডনেস্

জাঁ পল সার্ত্র

অস্তিত্ববাদী ফরাসী দার্শনিক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার জাঁ পল্ সার্ত্র-র একমাত্র ছোট-গল্প-সংকলন থেকে বর্তমান গল্পটি গৃহীত। সার্ত্র বিংশ শতাব্দীর বিবেকের মূর্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'দ্য ফ্লায়েজ'-এ দেখা যায়, ধর্মবিশ্বাস মানুষকে অনুতাপ, মনোবিকার ও পরনির্ভরতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখে এবং মানুষ যখন 'ঈশ্বর' নামের কাল্পনিক অস্তিত্বের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে তার নিজের পথ নিজে বেছে নেয় ও নিজের কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়, তখনই সে ধর্মবিশ্বাসের চোরাবালির বদলে তার 'অস্তিত্বের' কঠিন ভূমির ওপর দাঁড়ায়। অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসিনী প্রসিদ্ধা ফরাসী কথাসাহিত্যিক সিমঁ দ্য ব্যভার সার্ত্রর জীবনসঙ্গিনী, কিন্তু স্ত্রী নন। সার্ত্র নিজে বলেছেন—'মানুষ পৃথিবীতে একা, পৃথিবীর বিরুদ্ধে একা।' তবু পুরুষ তার রমণীকে, রমণী তার পুরুষকে ভালোবাসতে চায়। যেহেতু ভালোবাসা দুটি স্বতন্ত্র ও পৃথক অস্তিত্বের সম্মিলন ও বিলুপ্তি এবং 'আমি আমার অস্তিত্ব'—এই কঠিন সত্যকে নরনারীর ভালোবাসা মুছে দিতে পারেনা, দুটিঅস্তিত্বের সংঘাত অনিবার্য্য হয়ে ওঠে।' এই গল্পের নায়িকা লীলী তার প্রায় উন্মাদ প্রেমিক ও স্বামী এনরীকে ছেড়ে যেতে পারে না। কেননা, তার মনে হয় পুরুষত্বহীন ও অর্ধ উন্মাদের পৃথক ও স্বতন্ত্র ভুবনেই 'ভালোবাসা' নামের অযৌক্তিক ও মানবিক অস্তিত্বের মৌল নিয়মবিরোধী মানবিক সম্বন্ধের বিকাশ সম্ভব। বর্তমান গল্পটি সমালোচকদের মতে ফরাসী সাহিত্যে 'ইনটিরিয়র মনোলগ' ষ্টাইলের শ্রেষ্ঠ গল্প।



অন্তরঙ্গতা

জাঁ পল সার্ত্র

লীলী উলঙ্গ হয়ে শুয়েছিল। কেননা নগ্ন শরীরে চাদরের আদরমাখানো ছোঁয়া তার পছন্দ এবং এতে লণ্ড্রির খরচা বাঁচে।

প্রথমদিকে এনরি আপত্তি জানাতো। বিছানায় এরকম সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে শোয়া ঠিক নয়, উচিৎ নয়, নোংরা অভ্যাস। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লীলী-র দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছে এনরি। অবশ্য ওর ক্ষেত্রে এটা নিছক আলস্যের দরুণ। লোকজন এলে এনরি তার সাবলীলতা হারিয়ে ফেলে। সুই-দের খুব পছন্দ করে এনরি। কেননা ওরা কাঠের মত শক্ত ও আড়ষ্ট। কিন্তু ছোটখাট ব্যাপারে ও উদাসীন, অমনোযোগী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এনরি খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন নয় ও নিয়মিত আণ্ডারউইয়্যার বদলায়না। নোংরা লণ্ড্রি-ব্যাগে নোংরা আণ্ডারউইয়্যার ভরার সময় লীলী খেয়াল না করে পারে না যে দুপায়ের ভেতরের দিকে ঘসা লেগে আণ্ডারউইয়্যারে হলুদ দাগ ফুটেছে। ব্যক্তিগতভাবে, অপরিচ্ছন্নতা অপছন্দ নয় লীলীর। কেননা এই অপরিচ্ছন্নতার ভেতরে মিশে আছে অন্তরঙ্গতা। যেমন বগলে। ইংরেজদের নৈর্ব্যক্তিক শরীরে কোন গন্ধ নেই, তাই ওদের সহ্য করতে পারেনা লীলী। কিন্তু স্বামীর অমনোযোগিতা ও বরদাস্ত করতে পারেনা।

লীলী এখন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার গায়ের বুড়ো আঙুল চাদরের ছেঁড়া জায়গাটার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আছে। আসলে ছেঁড়েনি, সেলাই খুলে গেছে। লীলীর বিরক্তি জাগে। সকালে ওটা সেলাই করবে। কিন্তু তার পায়ের আঙুল আরো চাপ দিয়ে আরও সূতো ছিঁড়তে চায়। এনরি এখনও ঘুমোয়নি, তবে চুপচাপ শুয়ে আছে। ও বলে, চোখ বুঝলেই ওর মনে হয়, ও যেন শক্ত বাঁধনে বাঁধা, ও যেন কড়ে আঙুলটাও নাড়াতে পারছে না। যেন মাকড়সার জালে ধরা পড়েছে মস্ত বড় একটা মাছি। নিজের

নগ্ন শরীরে বন্দী এনরির সেই পুরুষ শরীরের ছোঁয়া লীলীর ভালো লাগে। ও যদি ওই রকম ভাবেই থাকতো, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত, কত ভালো হত। আমি ওর যত্ন নিতাম, শিশুর মত পরিষ্কার করে দিতাম ওর শরীর, ওকে উপুড় করে শুইয়ে ওর পাছায় থাপ্পড় মারতাম। ওর মা ওকে দেখতে এলে আমি হঠাৎ চাদরটা খুলে দিতাম। ওর মা বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে। কেননা অন্ততঃ পনেরো বছর আগে ছেলেকে শেষবার উলঙ্গ দেখেছে ওর মা। লীলী তার স্বামীর পাছায় হাল্কা হাত বুলিয়ে দেয়, আস্তে চিমটি কাটে ওর কুঁচকিতে. এনরি বিড়বিড় করে, অথচ নড়ে না। পুরুষত্বহীন। 'পুরুষত্বহীন' শব্দটার কথা ভাবলে লীলীর হাসি পায়। যখন এনরিকে ওর ভালো লাগে. ছোট ছোট বামন লিলিপুটরা এনরিকে বেঁধে রেখেছে, 'গালিভার্স ট্র্যাভেলস্' এর পাতায় দেখা ছবির মতন। লীলী কখনও কখনও স্বামীকে 'গ্যালিভার' বলে ডাকে। ওই নামটা এনরি-র পছন্দ। কারণ ইংরিজী নাম, লীলীর মুখে নামটা শুনলে মনে হয ও শিক্ষিতা। নামের উচ্চারণে ইংরেজদের মত টান থাকলে আরও খুশী হত এনরি। ঈশ্বর, এসব শুনলে আমার এতো বিরক্তি লাগে। শিক্ষিতা মেয়ে পছন্দ হলে ও জীন বেইদার-কে বিয়ে করতে পারতো। জীনের স্তন দুটো ঝুলে গেছে, কিন্তু ও পাঁচটা ভাষা জানে। আমরা যখন 'শো-য় থাকতাম, এনরির পরিবারের সবাইকে আমাব এতো খারাপ লাগতো যে আমি যে কোন বই পড়তাম। মুস্কিল হতো, বই পড়ার সময় কেউ না কেউ আমার ওপর নজর রাখতো। ওর ছোট বোন বলতো— 'তুমি বই পড়ে বুঝতে পারো?' মুস্কিল হল, আমার স্বামী ভাবে, আমার মধ্যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট নেই। ওর মতে, সুইজারল্যাণ্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। কেননা একজন সুইস ভদ্রলোকের সঙ্গে এনরির বড়দিদির বিয়ে হয়েছে এবং ওদের পাঁচটি ছেলেমেয়ে হয়েছে। তাছাড়া সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়গুলোর বৈশিষ্ট্য আছে। আমার ছেলেমেয়ে হলনা আমার শরীরের দোষে।

লীলী চোখ বন্ধ করে। তার চোখের সামনে ঘুরতে থাকে কয়েকটা নীল রঙের বৃত্ত। কার্নিভালে দেখা দৃশ্যের মত। কাল আমি কল্পনায় ওই বৃত্তগুলোর দিকে রবারের তীর ছুঁড়ছিলাম। প্রত্যেকটা তীর লক্ষ্যে বেঁধার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠছিল এক একটা মহানগরের নাম। খেলাটা ও শেষ করতে দিল না। পেছন থেকে আমার নিতম্বে চাপ দেওয়া ওর এক বদভ্যাস। কেউ পেছন থেকে আমায় ছুলে আমার খুব খারাপ লাগে। আমার শরীরের পেছন দিকটা না থাকলেই ভালো হত। যেখানটা আমি দেখতে পাইনা, সেখানটা লোকে ছোঁবে, হয়তো শরীরের খানিকটা অংশ হাতে তুলে নেবে, ওদের হাত দেখা যাবেনা, শুধু হাতের ছোঁয়া টের পাওয়া যাবে—এইসব আমার ভালো লাগেনা। এইসবই ওর পছন্দ। এনরি এসব কথা ভাবেনা। কিন্তু সে খালি আমার পেছন থেকে আমার নিতম্ব ছুতে চায়। আমার এই পেছন দিকটা আছে বলে আমি লজ্জিত।

কিন্তু আমার নিতম্ব ছুলে ওর উত্তেজনা হয়। রিরেইৎ-এর কথা ভাবতে এখন আমার ভালো লাগছে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় বিশেষ একটা সময়, যখন এনরি নাক ডাকায়, তখন লীলী রিরেইতের কথা ভাবে। ভাবনাটায় সে বাধা পায়। রিরেইতের সুখের বদলে অন্য কোন সুখ তার মনে ফুটে ওঠে। শক্ত কালো চুলের চকিত ঝিলিক। সে ভাবে, এইবার......এইবার কি হবে, সে নিজেও জানেনা। কোন কোন রাতে সে চোখ বুঝতে পারেনা। কেননা এইসব ভয়ংকর স্মৃতি মনে আসে। যখন তুমি কোন পুরুষের সবকিছু, বিশেষ করে তার 'ওই জিনিসটা' দেখেছো, স্মৃতি ও স্বপ্ন বিশ্রী হতে পারে। এনরিকে আমার অন্য পুরুষের মত খারাপ লাগেনা। ওর মাংস নরম, ওর চামড়ার রং ধুসর, শুধু পেটের কাছটা লাগছে।

রিবেইৎ-এর কথা ভাবলে এখন লীলীর বিরক্তি আসে। রিরেইৎ বলেছিল—'লীলী, সুপুরষ-এর চেহারা কেমন হয়, তোমার কোন ধারণা নেই।' পুরুষ বলতে মেয়েটা বোঝাতে চাইছে পাথরের মত শক্ত ও পেশীবহুল শরীর। ওসব আমার পছন্দ নয়। এনরি আমায় জড়িয়ে ধরলে নিজেকে আমার গুটিপোকার মত নরম লাগে। এনরির শরীর নরম বলেই ওকে আমি বিয়ে করেছি। ওকে খৃষ্টান ধর্মযাজকের মত দেখায় বলেই আমি ওকে পছন্দ করছি। খৃষ্টান ধর্মযাজকদের শরীর কালো গাউন-পরা কোনো মেয়ের মতই নরম। ওরা মেয়েমানুষের মত মোজা পরে। যখন আমার বয়স মোটে পনেরো, আমি খৃষ্টান ধর্মযাজকদের স্কার্ট আস্তে আস্তে তুলে দেখতাম, ওদের শক্ত হাঁটু. ওদের মোজা। ওদের দুপায়ের মাঝখানে ওদের পুরুষাঙ্গ দেখতে আমার মজা লাগতো। এক হাতে গাউন ধরে অন্য হাতে আমি ওদের পা বেয়ে যতোটা সম্ভব উঁচুতে আমার হাত নিয়ে যেতাম। মেয়েদের দুপায়ের মাঝখানের জায়গাটা আমার তেমন পছন্দ নয়। কিন্তু পুরুষের ওটা স্কার্টের নীচে থাকলে খুব নরম লাগে। যেন মস্ত বড় একটা ফুলের মত। মুস্কিল হল, পুরুষের ওই জিনিষটা যখন জীবন্ত প্রাণীদের মত লাফাতে. নড়তে শুরু করে, শক্ত হয়ে ওঠে, হাওয়ায় উঁচিয়ে থাকে, আমার ভয় লাগে। ঈশ্বর, এই ভালোবাসা জিনিষটা কি বিশ্রী! আমি এনরিকে ভালোবাসি। কারণ ওর দুপায়ের মাঝখানের ছোট্ট জিনিষটা কখনও শক্ত হয়না, কখনো মাথা তোলেনা। আমি দেখে হাসি। কখনও কখনও ও লজ্জা পায়। বাচ্চা ছেলের ওই জিনিষটা দেখলে আমার যেমন ভয় হয়না, তেমনি এনরির ওই জিনিষটা দেখলে আমার ভয় হয়না। রোজ সন্ধ্যাবেলা আমি ওর ছোট্ট নরম পুরুষাঙ্গটা আঙ্গুলের মধ্যে ধরি। ও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, মুখ সরিয়ে নেয়। কিন্তু ওর পুরুষঙ্গটা শক্ত হয়না, আমার হাতের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমি ওটার ওপর চাপ দিইনা, শুধু অনেকক্ষণ ধরে থাকি। এনরি ঘুমিয়ে পড়ে।

চোখ বুজে সে দেখছে, শক্ত খাড়া কালো চুল। নিগ্রোর মত। যন্ত্রণা গলার কাছে

উঠে আসছে। সে শক্ত করে চোখ বন্ধ করে। এবার লীলী দেখতে পায় রিরেইৎ-এর কান। মেয়েমানুষের ছোট্ট কান, লাল আর সোনালীতে মেশানো, মিষ্টি লজেন্সের মত। কিন্তু এখন কানটা দেখে তার আনন্দ হয়না। কারণ রিরেইৎ কি বলেছিল, তার মনে পড়ে যায়। ওর গলার স্বর তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট এবং সেই কারণেই লীলীর অপছন্দ। রিরেইৎ বলেছিল—'পিয়ের-এর সঙ্গে তোমার চলে যাওয়াই বুদ্ধিমতীর মত কাজ হবে। কিন্তু রিরেইৎ যখন নিজেকে বড্ড বেশী গুরুত্ব দেয় ও নিজের যুক্তির স্রোতে ভেসে যায় আমার খারাপ লাগে। আগের রাতে কিছুটা দুঃখিত ও যুক্তিসংযত ভঙ্গীতে রিরেইৎ বলছিল 'লীলী, তুমি এনরিকে ভালোবাসোনা। সুতরাং তোমার পক্ষে এনরির সঙ্গে থাকা একটা ক্রাইম।' এনরির সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ কখনও ছাড়েনা ওই মেয়েমানুষটা। এটা বিশ্রী ব্যাপার। কেননা এনরি রিরেইতের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। হয়ত সত্যিই আমি এখন আর আমার স্বামী এনরিকে ভালোবাসিনা। কিন্তু সে কথা রিরেইৎ আমায় বলবে কেন? ওর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা খুবই সরল, নেহাৎই সোজা। তুমি পুরুষকে ভালোবাসো অথবা ভালোবাসোনা। কিন্তু আমি তো অতো সহজ বা সরল নই। পিয়ের রিরেইতের নাম দিয়েছে—'মুটকী মিনার্ভা! নামটা রিরেইতের পছন্দ নয়। লীলী হাসে। কেননা তার মনে পড়ে, একদিন যখন সে শুধু জাঙ্গিয়া পড়ে ছোট ভাই রবারৎ-এর সামনে দাঁড়িয়েছিল, ভাই বলেছিল—'তোর বগলে চুল কেন, দিদি?' লীলী সামনে পোষাক বদলাতে ভালোবাসতো। কেননা ভাই মজার মজার কথা বলতো। কথাগুলো কোথা থেকে ও শিখেছিল, কে জানে।

কোন মহিলা আমার হাতে পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোট দিয়ে বলে—'চার্চের চাঁদা দিলাম, সিষ্টার।' আমি বলি—'ধন্যবাদ, মাদাম। ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করবেন। আবার দেখা হবে।' কিন্তু সত্যিকারের ধর্মযাজিকা হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বাসে আমি কোন পুরুষকে চোখ মারবো। প্রথমে সে খৃষ্টান ধর্মযাজিকাকে চোখ মারতে দেখে অবাক হবে, তারপর আমায় অনুসরণ করবে। তখন আমি পুলিস ডাকবো। পুলিস ওকে অ্যারেষ্ট করবে। চার্চের চাঁদের টাকা আমি নিজে রেখে দেবো। ওই টাকা দিয়ে কি কিনবো? বিষের প্রতিষেধক! বোকার মত কিসব ভাবছি? চোখদুটো আমার বুজে আসছে।

'তোমার পক্ষে এনরির সঙ্গে থাকা একটা ক্রাইম।' অন্ধকারে সে লাফিয়ে উঠে বসে, তার চোখদুটোর চাউনি এখন কঠিন। ওরা দুজনে মিলে আমায় যন্ত্রণা দিচ্ছে। পিয়ের বলছে—'তুমি আমার বাড়ী চলো। আমার খারাপ কোন উদ্দেশ্য নেই।' এবং রিরেইৎ, অন্য লোকেদের সম্বন্ধে যে মেয়ে এত যুক্তিসংযত কথা বলে, তার তো অন্তত বোঝা উচিৎ, আমার সবকিছু ভেবে দেখার সময় চাই। পিয়ের আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলছে—'তুমি আসবেই। তুমি আসবেই। তুমি আমার বাড়ী আসবে।

আমি তোমায় একা পেতে চাই!' পুরুষের চোখদুটো দেখলে তখন আমার ভয় লাগে, পিয়ের যেন আমাকে সম্মোহিত করতে চায়, ও আমার বাহু চেপে ধরে, ওর ওইরকম চোখ দেখলেই ওর বুকের চুলের কথা আমার মনে পড়ে যায়, আমার ভয় হয়। 'তুমি আসবেই। আমি তোমায় একা পেতে চাই।' এসব কথা ও কিভাবে বলতে পারে? আমি তো কুকুর নই।

আমি বসলে ও হাসে। পিয়েরের জন্যে আমি আমার পাউডারের ব্র্যাণ্ড, চোখের মেক-আপ বদলেছি। কিন্তু ও আমার মুখের দিকে তাকায় না। পিয়ের আমার স্তনদুটোর দিকে তাকিয়ে আছে। আমার স্তনদুটো যদি শুকিয়ে যেতো, পিয়ের বিরক্ত হতো, বেশ হতো। এমনিতেই আমর স্তনদুটো বড় নয়, বেশ ছোটো।

'তুমি নীসে আমার ভিলায় আসবে। ভিলার রং সাদা। শ্বেতপাথরের তৈরী সিঁড়ি। সারাদিন আমরা উলঙ্গ হয়ে থাকবো। উলঙ্গ অবস্থায় সিড়ি বেয়ে উঠে যাওয়া খুব মজার।'

তাহলে আমি পিয়েরকে বলবো, তুমি আমার আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠো। তাহলে ও পেছন থেকে আমায় দেখবে না। ও পেছন থেকে আমার দেখলে আমার একপাও এগুনো হবে না। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে একমনে চাইবো, পুরুষ অন্ধ হয়ে যাক। এমনিতেই পিয়ের আমার দিকে তাকালে আমার মনে হয়, আমি যেন উলঙ্গ হয়ে আছি। ওর যৌনসঙ্গমের ইচ্ছে হলেও মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙাবে। কোন রাতে আমি আমি শান্তিতে ঘুমুতে পারবো না। শুধু মাসিকের সময়টা ছাড়া। কিন্তু কোন কোন মেয়ে নাকি মাসিকের সময়েও ওই কাজটা করে। তারপরে পুরুষের শরীরে রক্তের ছিটে লাগে, বিছানার চাদরেও, সব জায়গায়। কি বিশ্রী! আমাদের এই শরীর না থাকলেই ভালো হত।

লীলী চোখ খোলে। রাস্তা থেকে আলো আসছে। সেই আলোয় পর্দাটা লাল দেখাচ্ছে, আয়নায় রক্তাভ প্রতিচ্ছবি। এই লাল আলো, জানলার ধারে আর্মচেয়ারটার অদ্ভুত ছায়া লীলীর ভালো লাগে। প্যান্ট খুলে চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রেখেছে এনরি। ওকে নতুন সাসপেনডার কিনে দিতে হবে। আমি ওকে ছেড়ে যেতে চাইনা। সারা দিন আমাকে চুমু খাবে এনরি। আমি ওর, ও আমাকে দেখবে, ভাববে : 'এই আমার সুখ।'

লীলী এনরিকে লাথি ছোঁড়ে। ওর ঘুম ভাঙাতে চায়। 'হু'—এনরি বলে। তার ঘুম ভাঙেনা।

এমন যদি হতো, সুন্দর এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হতো আমার, যে যুবক সত্যিকার, কুমারী মেয়ের মতো পবিত্র—আমরা পরস্পরকে ছুতামনা, সমুদ্রের ধারে হাঁটতাম হাত ধরাধরি করে, রাতে আলাদা বিছানায় শুতাম, ভাই-বোনের মত, ভোর

অবধি গল্প করতাম।

রিরেইতের সঙ্গ আমার ভালো লাগতো। মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের সঙ্গে শোয়া কি সুন্দর। ওর কাঁধ দুটো কেমন মসৃণ, কেমন নরম। রিরেইং যখন ফ্রেইস্‌নেইনলকে ভালোবেসে ফেললো, আমার খুব খারাপ লাগতো। একটা পুরুষ ওকেআদর করছে, ওর কাঁধে, উরুতে হাত বোলাচ্ছে,—এসব ভাবতে আমার ভালো লাগতো না। রিরেইং যখন পুরুষ শরীরের নীচে সম্পূর্ণ উলঙ্গ, চিং হয়ে শুয়ে আছে, পুরুষের হাত ওর মাংস টিপে টিপে দেখছে, রিরেইতের মুখটা তখন কেমন দেখাতো? আমাকে লাখ টাকা দিলেও আমি আর রিরেইংকে ছোঁবোনা। ও যদি চায়, ও যদি বলে, 'সেই কাজটা আমার সঙ্গে করো,' আমি কি করবো, কি জানি। আমি যদি নিজে অদৃশ্য থেকে দেখতে পেতাম, পুরুষ রিরেইতের সঙ্গে ওই কাজটা করছে, তখন যদি ওর মুখ দেখা যেতো—তখনো কি ওর মুখটা মিনার্ভার মত মনে হবে—ও হাঁটু দুটো আস্তে আস্তে সরাচ্ছে টোকা দিচ্ছে, শীংকারের মৃদু শব্দ করছে রিরেইং ..

এনরির নাক ডাকছে। লীলী চটে ওঠে। আমি ঘুমুতে পারছি না আর উজবুকটা নাক ডাকাচ্ছে। ও যদি এখন আমায় জড়িয়ে ধরে বলতো—'লীলী, তুমি আমার, আমি তোমায় ভালোবাসি, তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা'...হ্যাঁ, আমি ওর জন্যে আত্মত্যাগ করতাম, আমি থেকে যেতাম, ওকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে সারাজীবন ওর সঙ্গে থাকতাম...

□ দুই □

কাফের উঁচু সমতল ছাদ। এক গ্লাস পোর্ট-এর অর্ডার দেয় বিবেইং। সে ক্লান্ত। লীলীর ওপর তার রাগ হয়।

রোগা কুঁজো এক ছোকরা অনেকক্ষণ ধরে রিরেইং-এর দিকে তাকিয়ে আছে। রিরেইং কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মেয়েদের দিকে চোখ মারবার আগে ছোকরার অন্ততঃ আণ্ডারউইয়্যার বদলানো উচিত। লীলী এখনও আসছে না কেন? লীলী এনরিকে ছেড়ে যেতে চায় না। আমার মনে হয়, এটা বোকামি। ধ্বজভঙ্গ একটা পুরুষের জন্যে কোন মেয়ের নিজের জীবনটা নষ্ট করা উচিত নয়। শরীরের দিক থেকে পুরুষত্বহীন পুরুষদের ঘেন্না করে রিরেইং। সে ভাবে, লীলীর উচিত এনরিকে ছেড়ে যাওয়া। লীলী, তোমার সুখ নিয়ে তোমার জুয়ো-খেলার কোন অধিকার নেই। কথাটা ওকে অন্ততঃ একশবার বলেছি। কেউ সুখী হতে না চাইলে তাকে জোর করে সুখী করা যায় না। রিরেইতের মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বড্ড ক্লান্ত। গ্লাসে পোর্টটা চিটচিটে গুড়ের মত। তার শরীরের অন্তরালে কে যেন বলে—'সুখ, সুখ।' পৃথিবীটা যেন স্তব্ধ! শান্ত, নরম। 'প্যারী-সোয়ার' পত্রিকায় যদি একটা প্রতিযোগিতা হয়—ফরাসী ভাষায় সবচেয়ে সুন্দর শব্দ কি? সে লিখতো,

'সুখ'। আর কেউ বোধহয় ওরকম ভাবতো না। ওরা লিখতো, 'সাহস' ও 'শক্তি'। কিন্তু ওরা পুরুষ, ওরা বোঝেনা। দুটো পুরস্কার থাকা উচিত। একটা মেয়েদের জন্যে। একটা পুরুষদের জন্যে। পুরুষ লিখতো, সবচেয়ে সুন্দর শব্দ 'সম্মান'। মেয়েদের বিভাগে আমি জিততাম, লিখতাম, সবচেয়ে সুন্দর শব্দ 'সুখ'। সম্মান ও সুখ। আমি লীলীকে বলবো, তোমার সুখ এভাবে নষ্ট করার কোন অধিকার তোমার নেই। তোমার সুখ, লীলী তোমার সুখ। ব্যক্তিগতভাবে, আমার ধারণা, তোমার প্রেমিক পিয়ের ভালোমানুষ, সত্যিকারের পুরুষ, বুদ্ধি আছে, পয়সা আছে, তোমার জন্যে সে সবকিছু করতে পারে। জীবনের ছোটখাট ঝামেলাগুলো কিভাবে সরাতে হয় সে জানে।

ঘড়িতে এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। লীলীকে আমি বুঝতে পারি না। ওর মেজাজ আমার কাছে দুর্বোধ্য। পুরুষদের ও পছন্দ না অপছন্দ করে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। পিয়েরকে নিয়ে ওর খুসী হওয়া উচিত। অন্ততঃ গতবছর যে পুরুষ বন্ধুটা ও জোগাড় করেছিল, তার থেকে ভালো। তার নাম ছিল রাবীং, আমি বলতাম রেইবীং।

রিরেইৎ হাসি চাপে। কাফের সেই ছোকরা এখনও তাকে দেখছে। সে মুখ ঘোরাতে ছোকরা অবাক হয়। রাবীং-এর মুখে ছিল অজস্র ব্রন। লীলী নখ দিয়ে ওর মুখের ব্রণ গেলে দিল। বিচ্ছিরি ব্যাপার। কিন্তু লীলীর দোষ নেই। সুপুরুষ কেমন দেখতে হয় সে জানেনা। গত বছরে যে পুরুষ বন্ধু লুই রিরেইৎকে ছেড়ে গেছে, তার কথা মনে পড়ে যায় রিরেইতের। লুই নিজেকে ভালোবাসতো, ওর কিছু কিছু ছোটখাট বাতিক ছিল, সোনার আংটি আর সিগারেট কেস, নানা রকম ছোটখাট ম্যানিয়া...কিন্তু এধরণের পুরুষ নিষ্ঠুর হতে পারে, মেয়েদের থেকেও নিষ্ঠুর। সবথেকে ভালো চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের পুরুষ, যে শরীরের যত্ন নেয়, যার জুলফিতে পাক ধরেছে, ব্যাকব্রাশকরা শুকনো চুল, চওড়া কাঁধ, অ্যাথলিটের মত চেহারা—জীবন সম্বন্ধে যার অভিজ্ঞতা আছে, যে যন্ত্রণার অর্থ জানে। লীলীর বয়স কম, আমার মত বান্ধবী পেয়েছে—ওর ভাগ্য ভালো। কেননা লীলীর ব্যবহারে ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে উঠছে ওর বয়-ফ্রেণ্ড পিয়ের। আমার জায়গায় অন্য কোন মেয়ে হলে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতো। আমি পিয়েরকে ধৈর্য্য ধরতে বলি। পিয়ের আমার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে বুঝেও না বোঝার ভান করি আমি, লীলীর সম্বন্ধে ভালো ভালো কথা বলি। আমার মত বান্ধবী থাকা কতো বড় সৌভাগ্য, বোঝেইনা লীলী। লুই আমায় ছেড়ে যাওয়ার পর আমার যে অবস্থা হয়েছিল, সেই রকম লীলীর হলে তবে ও বুঝতো।

ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজছে। লীলী আধ ঘন্টা দেরী করেছে। এটা

স্বাভাবিক। স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার সময় নেই লীলীর। আসলে সম্ভ্রান্ত সচ্চরিত্র সেজে থাকার ধান্দাতেই ও এনরিরি সঙ্গে জীবন বাচাচ্ছে। ও এনরিকে ঠকাচ্ছে, অন্য পুরুষের সঙ্গে মিশছে, কিন্তু ওরা যেহেতু তাকে 'মাদাম' বলে ডাকে। অতএব এসবে তার কিছু এসে যায় না। স্বামী এনরির বিরুদ্ধে লীলী আজ হয়তো একটা কথা বললো। কাল আমি যদি সেই কথাটাই আবার বলি, ও জ্বলে উঠবে। আমি তো আমার যথাসাধ্য করেছি। যা কিছু ওকে বলা দরকার, যত খারাপই হোক, আমি বলেছি।

কাফের সামনে ট্যাক্সি থামে। বড় একটা ব্যাগ হাতে নামে লীলী। ওর মুখটা গম্ভীর। 'আমি এনরিকে ছেড়ে এলাম—'

'সে কী? তার মানে—'

হ্যাঁ, সব শেষ, আমি আর ওর সঙ্গে থাকবো না।'

'সুখবর। তোমার সাহস আছে।'

কাজটা খুব শক্ত নয়, ওর বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বললো না। কেননা লীলী প্রশংসা ভালোবাসে। ও গালে রুজ লাগিয়েছে। ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল, চামড়ার তৈরী ট্র্যাভেলিং ব্যাগটা নামিয়ে রেখে ও বসে। পরণে ধুসর রঙের পশমী কোট, চামড়ার বেল্ট, হাই-কলার, হাল্কাহলুদ রং সোয়েটার। অন্যায় করেছে, অথচ মজাও পাচ্ছে—এমন একটা ভাব। মেয়েটা প্রাণশক্তিতে ভরপুব। ওর সম্বন্ধে এটাই আমার ভালো লাগে।

'এনরিকে সোজাসুজি বলে দিলাম, ওর সম্বন্ধে আমার কি ধারণা। ও বোবা হয়ে গেছে।'

'বুঝতে পারছি না, হঠাৎ তোমার হল কি, ডার্লিং। কাল সন্ধ্যায় আমি তো বাজি ফেলতে পারতাম যে তুমি কোনদিন তোমার স্বামীকে ছেড়ে যাবে না—

'এসব আমার ছোট ভাইয়ের জন্যে। এনরি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমি সহ্য করেছি। কিন্তু আমার পরিবারের কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমি কিভাবে সহ্য করবো?'

'ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো?'

'ওয়েটার কোথায়? এখানে সময়মত ওয়েটার পাওয়া যায় না। সেই বাদামী চুল ওয়েটার তো?

'হ্যাঁ। তুমি কি জানো, ও আমার জন্যে পাগল।'

'তাহলে তুমি ওয়াশরুমের মেয়েটির সম্বন্ধে সাবধান থেকো। ও মেয়েটির দিকে নানারকম ইঙ্গিত করে। আসলে বোধহয় মেয়েরা টয়লেটে ঢুকছে, তাই দেখার ধান্দা। টয়লেট থেকে কোন মেয়ে বেরিয়ে এলে এমনভাবে তাকায় যে লজ্জা

লাগে। ভালো কথা, আমি এখুনি যাবো। পিয়ের-এর কাছে ফোন করবো। ওর মুখটা কেমন হয়ে যাবে বলোতো। ওয়েটার এলে আমার জন্যে কাফেক্রেইম-এর অর্ডার দিয়ো। এক মিনিট, তারপর তোমায় সব বলবো।'

লীলী চলে যেতে রিরেইৎ ভাবে, ও শেষ পর্যন্ত স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারবে, আমি কোনদিন ভাবিনি। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে লীলী বলে—

'পিয়ের তো একেবারে চমকে গেছে। ও বিশদভাবে ব্যাপারটা শুনতে চাইছিল। আমি বললাম, পরে সব বলবো। আজ ওর সঙ্গে লাঞ্চ খাবো। ও বললো, কাল রাতে আমরা প্যারী ছেড়ে যেতে পারি।'

'লীলী, আমি খুব খুসী হয়েছি। আচ্ছা, তুমি কি তাহলে কাল রাতেই মনস্থির করেছিলে?'

'তুমি তো জানো, ওসব মনস্থির করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে গেল। ওয়েটার, ওয়েটার। ঈশ্বর, লোকটা এতো জ্বালায়। আমার জন্যে কাফে-ক্রেইম নিয়ে এসো।'

রিরেইৎ স্তম্ভিত হয়ে যায়। লীলীর জায়গায়, এই ধরণের একটা পরিস্থিতিতে সে নিজে হলে কখনোই এই মুহূর্তে 'কাফে-ক্রেইম' নিয়ে মাথা ঘামাতো না। লীলীকে তার ভালো লাগে। কিন্তু কোন কোন মুহূর্তে লীলী তুচ্ছ, অসার, নিরর্থক—পাখীর মতন।

লীলী হেসে বলে—'তুমি যদি এনরির মুখটা দেখতে!'

'তোমার মা কি বলবে, ভেবে দেখেছো?'

'মা খুশী হবে। মা-র সঙ্গেও অভদ্র ব্যবহার করেছে এনরি। মায়ের ধৈর্য্যের বাধ ভেঙেছিল। এনরি প্রায়ই অভিযোগ জানাতো, মা নাকি আমায় ঠিক মতো মানুষ করেনি। আমি গাঁয়ের খামার বা গোলাবাড়ীতে মানুষ হয়েছি। আমি যা করেছি, তা কিছুটা মায়ের জন্যেও—

'ঘটনাটা কি ঘটেছিল?'

'ও আমার ছোট ভাই রবারৎকে থাপ্পড় মেরেছিল।'

'রবারৎ তোমার বাড়ী গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। মা চায়, ও গঁপেইজ-এর ওখানে অ্যাপ্রেনটিস হবে। যাওয়ার পথে আজ সকালে আমার বাড়ী এসেছিল রবারৎ। তখন আমরা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি। এনরি আমার ছোট ভাইকে চড় মারলো।'

'কিন্তু কেন?' রিরেইৎ একটু বিরক্ত হয়। লীলীর গল্প বলার ধরণটা তার পছন্দ নয়।

'ওদের মধ্যে তর্ক বেঁধেছিল। আমার ভাই অপমান সহ্য করার বান্দা নয়।

সে রুখে দাঁড়িয়ে এনরিকে মুখের ওপর বললো—'ওল্ড অ্যাশহোল।' এনরি বলছিল, আমাদের নাকি ঠিকমত মানুষ করা হয়নি। আমার মনে হচ্ছিল, আমি হাসতে হাসতে মরেই যাবো। হঠাৎ এনরি উঠে দাঁড়ালো এবং আমার ভাইকে চড় মারলো। তখন আমার এনরিকে খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছিল—'

'ভালো কথা। তোমার স্বামী এনরি তোমার ছোট ভাই রবারৎকে চড় মারলো। তারপর কি হল?'

'তারপর আমি আমার স্বামী এনরিকে ব্যালকনিতে আটকে ফেলে চাবি বন্ধ করে দিলাম। ওর পবণে শুধু পায়জামা। ও জানলায় টোকা মারছে কিন্তু কাচ ভাঙতে সাহস করছে না। আসলে ও হাড়কঞ্জুস! আমি হলে সব ভেঙে তছনছ করে দিতাম। তাতে আমার হাত কাটলেও থামতাম না। ইতিমধ্যে টেক্সিয়াররা বেড়াতে এসেছে আমাদের বাড়ী। কাচের আড়াল থেকে এনরি এমনভাবে হাসছিল যেন গোটা ব্যাপারটাই একটা রঙ্গরসিকতা।'

এই সময় ওয়েটার পাশ দিয়ে যেতেই লীলী তার হাত ধরে টেনে বলে—'ওয়েটার, আমার জন্যে কাফে ক্রেইম নিয়ে এসো।'

নীচুস্তরের মানুষের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, লীলী জানেনা। কখনো বেশী অন্তরঙ্গতা দেখায়, কখনো বা বেশী মেজাজে কথা বলে। এজন্যে একটু বিরক্ত হয় রিরেইৎ। লীলী কিন্তু হাসতে শুরু করেছে।

'আমি হাসছি কেন জানো? আমি এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কিভাবে এনরিকে ব্যালকনিতে রেখে আমি দরজার তালা বন্ধ করে দিলাম। কি ভাবে করলাম যেন? ও তো রান্নাঘরে, আমার ভাই ছোট রবাৎ কাঁদছে আর ওকে ভারিক্কী উপদেশ দিচ্ছে এনরি। একটা ট্যাক্সি চাপা দিয়েছে ফুলওয়ালীকে। তাড়াতাড়ি ব্যালকনিতে ছুটে বের হয়ে এল এনরি। ফুলওয়ালী জাতে সুইস, ওকে খুব পছন্দ করে এনরি, ওর ধারণা; ফুলওয়ালী ওকে ভালোবাসে। আমি চুপচাপ ঘরের ভেতর যেয়ে ব্যালকনির জানলা বন্ধ করে কাচের ওপার থেকে চেঁচিয়ে বললাম—আমার ভাইয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার এই শাস্তি। ব্যালকনিতে এক ঘন্টা রইল এনরি। কাঁচের আড়াল থেকে আমাকে ও রবারৎকে গোল গোল চোখে দেখছিল এনরি।

'আসলে এনরি এখন ব্যালকনিতে, বন্ধ জানলার ওপারে। কি মজা!' রিবেইৎ হাসিতে ফেটে পরে।

লীলী হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমার ভয় হলো শেষে এনরির না ঠাণ্ডা লেগে যায়। আগে রাগের মাথায় এসব খেয়াল করিনি।

ও আমাদের দিকে ঘুষি দেখাচ্ছিল, অনর্গল কথা বলছিল। যদিও এনরির অর্ধেক কথাই আমরা শুনতে পাইনি। তারপর আমার ছোট ভাই রবারৎ চলে গেল। ঠিক

তারপর টেক্সিয়ার্সরা কলিং বেল টিপতে ওদের ভেতরে আসতে দিলাম। ওদের দেখে কাচের ওপার থেকে হাসলো ও অভিবাদন জানালো এনরি। আমি ওদের বললাম, দ্যাখো, আমার স্বামী এনরি ডার্লিংকে এখন অ্যাকোরিয়মে বন্দী মাছের মত দেখাচ্ছে। ওরা ভেতরে ভেতরে অবাক হলেও মুখে কিছু বললো না।'

'আমি কল্পনায় সব দেখতে পাচ্ছি। হা হা! ব্যালকনিতে তোমার স্বামী, রান্নাঘরে টেক্সিয়ার্স দম্পতি—'

'তারপর আমি জানলা খুলে দিতে এনরি ভেতরে এসে ওদের সামনে আমায় চুমু খেল, ভাঁড়ামির জন্যে ঠাট্টা করে বললো—'আমার বউ আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিল।' সবাই হাসলাম। কিন্তু ওরা চলে যেতে এনরি আমার কানে ঘুষি মারলো। আমিও ব্রাশটা তুলে ওর ঠোঁটের কোনে মারলাম। ওর ঠোঁটটা ফেটে গেল।'

'বেচারা মেয়ে!'

'তারপর আমি ওর মুখটা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিয়ে বললাম, এসব আমার আর ভালো লাগছে না, আমি এনরিকে আর ভালোবাসিনা এবং এনরিকে আমি চিরতরে ছেড়ে যাচ্ছি। এনরি কাঁদতে লাগলো। ও বললো, ও আত্মহত্যা করবে। কিন্তু ওসবে আর কাজ হবে না। তোমার মনে আছে, রিরেইং, গত বছর রাইনল্যাণ্ডে আমাদের ঝগড়ার সময়ে আমার স্বামী বলেছিল; বিশ্বযুদ্ধ বাঁধতে চলেছে, আর্মি সেনাবাহিনীতে নাম লেখাবো, যুদ্ধে মরে যাবো, তখন তুমি দুঃখ পাবে। আমি তখন বলেছিলাম ঃ খুব হয়েছে, তুমি ধ্বজভঙ্গ, পুরুষত্বহীন পুরুষদের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয় না। যাই হোক, এবার এনরি আমায় বান্নাঘরে তালাবন্ধ করে রাখবে বলছিল। তাই ওকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বললাম, এক মাসের মধ্যে আমি যাচ্ছি না।

তখন আমার স্বামী অফিসে গেল। কেঁদে কেঁদে ওর চোখ দুটো লাল, ফাটা ঠোঁটে এক টুকরো কাপড় সেঁটে আছে—ওকে ভালো দেখাচ্ছিলনা। আমি ঘরের কাজকর্ম করলাম, মুসুর ডাল ষ্টোভে বসালাম, ব্যাগটায় জিনিষপত্র ভরে রান্নাঘরের টেবিলে চিঠি রেখে চলে এলাম—'

'চিঠিতে কি লিখে এসেছো?'

'লিখলাম, ষ্টোভে মুসুর ডাল গরম করা রইলো। খেয়ে নিও। গ্যাস বন্ধ করে দিও। আইসবক্সে শূয়রের মাংস আছে। আমার অসহ্য লাগছে। আমি চলে যাচ্ছি। বিদায়।'

ওরা দুজনেই হেসে উঠলো।

লীলী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এখন যাই। দুপুরে পিয়েরের সঙ্গে দেখা হবে। ব্যাগটা কোথায় রেখে যাবো?'

'এখন আমার কাছে থাক। আমি লেডিজ রুমের ওই মেয়েটির কাছে রেখে দেবো। কখন তোমার সঙ্গে যাবো?'

'দুটো নাগাদ তোমার ওখানে যাবো। অনেক ছোটখাট কাজ বাকী। অর্ধেক জিনিষ নেওয়াই হয়নি। পিয়েরের কাছে টাকা চাইবো।'

লীলী চলে যাবার পর ওয়েটারকে ডাকে রিরেইৎ। লীলীর মধ্যে যে বিষণ্নতা ও গাম্ভীর্য্য এ ধরণের পরিস্থিতিতে থাকার কথা দুজনের হয়ে হাবভাবে সেটা ফুটিয়ে তুলেছে রিরেইত। ওয়েটার ছুটে আসে। রিরেইৎ লক্ষ্য করেছে, ও ডাকলেই এই ওয়েটার ছুটে আসে।

'কাল সন্ধ্যাব আগে এইসব র‍্য ভাঁদামে হতেইল দী থেয়াতর-এ পাঠাবেন।'—মেজাজে ক্যাশিয়াবকে বললো লীলী, তারপর রিরেইৎ-এর দিকে ফিরে—'কাজ শেষ। এবাব চলো।'

'নামটা বললেন না?' ক্যাশিয়ার বলে।

'ম্যাদাম লুসিয়েন ক্রিসপ্যাঁ'।

কোট কাঁধে ফেলে একরকম ছুটে সামারিট্যার চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নামছে লীলী। তাকে অনুসরণ করে রিরেইৎ। লীলীর চলার সঙ্গে তাল রাখা ওর পক্ষে শক্ত। কেননা ওর চোখ ওর বান্ধবীর রোগা শরীরের সিল্যুট ছায়ার দিকে—নীল ও হাল্কা হলুদ পোষাক পরা ছায়াটা নেচে নেচে এগিয়ে চলেছে—সত্যিই, লীলীর শরীর কেমন যেন অশ্লীল।...যখনই পেছন থেকে কিম্বা প্রোফাইলে লীলীকে দেখে রিরেইৎ, তার মনে হয়, ওর শরীর কেমন যেন অশ্লীল। ওব শরীর রোগা ও নমনীয়, খারাপ কিছু নয়, তবুও। হয়তো লীলী নিজের শরীরটা প্রকট করে তোলার চেষ্টা করে। ও বলে, নিজের নিতম্বের জন্যে ওর নাকি লজ্জা হয়। অথচ ও এমন সব স্কার্ট পরে যা পাছার দিকটায় আঁটসাঁট। ওর পাছা দুটো আমার চেয়ে ছোট অথচ আমার পাছার তুলনায় লোকের নজরে বেশী আসে। কেননা পাছা দুটো গোলগাল, স্কার্ট উপছে পড়তে চায়, পিঠটা রোগা বলে বেশী নজরে আসে। তাছাড়া লীলী পাছা দুলিয়ে হাঁটে।

লীলী ফিরে তাকায়। দুজনেই হাসে। রিরেইৎ ভাবে ওর বান্ধবীর অশ্লীল শরীরের কথা—পাপের প্রতি আসক্তি এবং অবসাদ যেখানে মিশে আছে।

স্তনদুটো শক্ত, ছোট মসৃন পালিশকরা মাংস, হলুদ, টিপলে মনে হয় যেন রবার। দীঘল উরু। সাধারণ, দীঘল শরীর। কিন্তু দীঘল পা দুটো নিগ্রো রমনীর শরীরের মত। নিগ্রো রমণী যখন রুম্‌বা নামের কিউবান-নিগ্রো-লোকনৃত্য নাচে ঠিক তেমনি।

রিভলবিং ডোরেব আয়নায় রিরেইৎ-এর নিজের শরীরের ছায়া দেখা যায়।

আমার শরীর অ্যাথলীটের মত। পোষাক পরলে লীলীকে ভালো দেখায়। উলঙ্গ হলে আমাকে বেশী ভালো দেখায়!

ওরা খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর লীলী বলে—পিয়ের খুব ভালো। তুমিও খুব ভালো। তোমাদের দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

একটু যেন আড়ষ্টভাবে কথা বলছে লীলী। রিরেইৎ জানে, অন্যকে ধন্যবাদ দিতে অভ্যস্ত নয় লীলী, সে বড্ড লাজুক।

'ওঃ, আমাকে একটা ব্রা কিনতে হবে।'

'এখানে?'

'না, আমি ফিশেইর-এর দোকানে ব্রা কিনি।'

'ব্যুলেইভার্দ মঁৎপারনাস্-এ? দ্যাখো, লীলী, ওখানে এখন না যাওয়াই ভালো। এনরির সঙ্গে দেখা হলে ঝামেলা বাড়বে।'

'এনরি? কেন?'

'লীলী, তুমি যখন কোন কিছু পছন্দ করোনা, তার অস্তিত্বও তুমি স্বীকার করতে চাওনা। যেহেতু তুমি ফিশেইর-এর দোকানে ব্রা কিনতে চাও, এনরি যে বাড়ী ফেরার সময় রোজ সন্ধ্যে ছটায় ব্যুলেইভার্দ মৎপারনাসে আসে, তুমি তা অস্বীকার করছো...'

'এখন মোটে পাঁচটা বাজে। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে যে ও আজ আর অফিসে যায়নি। আমার চিঠি পেয়ে হয়তো...

'কিন্তু লীলী, অপেরা-র কাছে ফিশেইর-এর অন্য একটা ব্রাঞ্চ আছে, রী দী কীয়াতর সেইপতেইমবর—এ।'

'হ্যাঁ, কিন্তু অনেকটা দূর?'

'মোটে দু'মিনিটের রাস্তা, মঁৎপারনাসের থেকেও কাছে।'

'ওদের জিনিষ আমার অপছন্দ।'

রিরেইৎ মজা পেয়ে ভাবে; দুটো দোকানে একই জিনিষ পাওয়া যায়।

কিন্তু লীলীর একগুয়েমি গেলনা। এখন এনরির সঙ্গে দেখা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় জেনেও সে ঝুকি নিচ্ছে।

'বেশ, ওর সঙ্গে দেখা হলে হবে। ও তো আর আমাদের খেয়ে ফেলবে না।'

লীলী পায়ে হেঁটে যাবে। কেননা তার হাওয়া খাওয়া দরকার! অগত্যা ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ওর বয়-ফ্রেণ্ড পিয়ের-এর গুণগান করে রিরেইৎ। কিন্তু লীলী বলে—

'প্যারী আমার বড় ভাল লাগে। প্যারী ছেড়ে যেতে মনটা বড় খারাপ লাগবে।'

'থামো, লীলী। আমি কোথায় ভাবছি, তোমার ভাগ্য কতো ভাল, তুমি নীসে যাচ্ছো। আর তুমি কিনা বলছো, প্যারী ছেড়ে যেতে মনটা বড় খারাপ লাগবে।'

লীলী জবাব দেয় না। সে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে। কি যেন খুঁজছে।

ফিশেয়ারের দোকানে ব্রা কিনে বার হতে ছ'টা বাজে। লীলীর হাত ধরে তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করে তার বান্ধবী। লীলী কিন্তু ফুলওয়ালা বোহ্ম্যান-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—'দ্যাখো, রিরেইৎ, আজালেইরাগুলো কি সুন্দর। আমি বড় ঘরে থাকলে ঘরে এই গাছের টব রাখবো।'

'টবের গাছ আমার ভালো লাগে না।'

রিরেইৎ খুবই বিরক্ত হয়ে উঠছে। আশংকিত চোখে সে রী দা-রেইনেই-এর দিকে তাকায় এবং এনরির প্রকাণ্ড নির্বোধ শিল্যুট ছায়া এক মিনিট পরে দেখা যায়। তার মাথায় টুপি নেই, পরণে বাদামী রঙের ট্যুইড স্পোর্টস কোট।

'ওই দ্যাখো লীলী—'

'কোথায়, এনরি কোথায়?'

'আমাদের পেছনে। রাস্তার উল্টো দিকে। তাড়াতাড়ি চলো। পেছনে তাকিওনা।'

পেছনে তাকিয়ে লীলী বলে, 'দেখেছি।'

'এনরিও বোধহয় আমাদের দেখেছে। ভগবানের দোহাই, লীলী, আর পেছনে তাকিওনা। ডানদিকে রী দেইলাত্র—আমরা ওই রাস্তা ধরে ছুটবো।'

ওরা অন্য পথিকদের ধাক্কা দিয়ে জোরে হাঁটে। কখনও লীলী পিছিয়ে পড়ছে। কখনও আবার রিরেইৎ। কিন্তু রী দেইলাত্র-র কোণে পৌছুবার আগেই রিরেইৎ দেখে, এখন লীলীর পেছনে হাঁটছে বাদামী রঙের একটা ছায়া। এনরির ছায়া। রাগে কাঁপছে রিরেইৎ। নিজের ভুল বুঝতে পেরে মুখ নীচু করে হাঁটছে লীলী। ওকে দেখলে এখন চতুর ও দৃঢ়-সংকল্প বলে মনে হয়। কিন্তু এখন ওর পালা, বড় দেরী হয়ে গেছে।

আমরা এমন ভাব দেখাবো, যেন ও এখানে নেই। রিরেইৎ ভাবে। যেন ওর অস্তিত্বই নেই। কিন্তু আড়চোখে এনরির দিকে না তাকিয়ে পারছেনা রিরেইৎ। লোকটার মুখ কাফনের মত সাদা, চোখের পাতা প্রায় বোজা। যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে এনরি, আতংকিত হয়ে ভাবে রিরেইৎ। এনরির ঠোঁটদুটো এবং নীচের ঠোঁটের কাটা জায়গায় সাঁটা লালচে রঙের গজের টুকরোটা কাঁপছে। এবং এনরির নিঃশ্বাসের সেই নিয়মিত ভারী শব্দে এখন মিশেছে একটা অনুনাসিক সুর। রিরেইতের খারাপ লাগে। এনরিকে সে ভয় পায়না। কিন্তু অসুস্থতা ও ভাবাবেগকে একটু ভয় পায়। একটু পরে হাত বাড়িয়ে লীলীর হাত ধরে এনরি। লীলী মুখ একটু বিকৃত করে। যেন সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। সে কেঁদে ওঠে, হাত ছাড়িয়ে নেয়।

'ফুঃ!'—এনরি বলে।

থামবার একটা উন্মাদ বাসনা জাগে রিরেইতের, তার শরীরের পাশে ব্যথা লাগছে, দু কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে। কিন্তু লীলী প্রায় ছুটছে। লীলী ও যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে। রিরেইতের মনে হয়, ও যদি এখন লীলী-র হাত ছেড়ে দেয়, লীলী ও এনরি পাশাপাশি ছুটতে থাকবে—

নীরব, ফ্যাকাশে, চোখ বন্ধ দুজনের, মরার মত...

এনরি যেন অপরিচিত ভারী গলায় বলে—'আমার সঙ্গে ফিরে চলো।'

লীলী কোন জবাব দেয় না। একই রকম স্বরে এনরি বলে—'তুমি আমার স্ত্রী। আমার সঙ্গে ফিরে চলো।'

'ভগবানের দোহাই, লীলীকে একা থাকতে দাও'—তীক্ষ্ণ স্বরে বলে রিরেইৎ।

'এনরি, তুমি তো বুঝতে পারছো, ও ফিরে যেতে চায়না।'

রিরেইতের কথা যেন শুনতেই পেলনা এনরি। সে বলে—'ও আমার স্ত্রী। আমি চাই, আমার সঙ্গে ও ফিরে যাক।'

এখন সে লীলীর হাত ধরেছে। লীলী হাত সরিয়ে নেয় না।

'তুমি যাও, এনরি'—রিরেইৎ বলে।

'যাবোনা। ও যেখানে যাবে, আমি ওর পেছন পেছন যাবো। আমি চাই, ও আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরে যাবে।'

হঠাৎ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে চীৎকার করে ওঠে এনরি—

'তুমি আমার!'

কিছু লোক ফিরে তাকায়, হেসে ওঠে। এনরি লীলীর হাত ধরে টানে, মুখ বিকৃত করে জন্তুর মত গর্জন করে।

ভাগ্য ভালো, খালি একটা ট্যাক্সি পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রিরেইৎ হাত নাড়তে ট্যাক্সি থামে। এনরিও থামে। লীলী হেঁটে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ওর এক হাত ধরেছ ওর বান্ধবী রিরেইৎ, আর এক হাত ধরেছে ওর স্বামী এনরি।

'এনরি, তোমার বোঝা উচিত, গায়ের জোরে তুমি লীলীকে ফিরে পাবেনা।'

লীলীর হাত ধরে ট্যাক্সির দিকে টানে রিরেইৎ।

'ওকে ছেড়ে দাও। আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও'—লীলীর অন্য হাত ধরে উল্টোদিকে টানে এনরি।

মাঝখানে লীলী, তার শরীর লন্ড্রি-ব্যাগের মতন শিথিল।

'তোমরা ট্যাক্সিতে উঠবে না উঠবে না?'

ট্যাক্সি ড্রাইভার জানতে চায়।

লীলীর হাত ছেড়ে এনরির হাতে ঘুঁসির পর ঘুসি মারছে রিরেইৎ। কিছু যেন টের পাচ্ছেনা এনরি। একটু পরে সে লীলীর হাত ছেড়ে বোকার মত তাকিয়ে

থাকে রিরেইতের দিকে। রিরেইতও তাকায়। তার খারাপ লাগে। একটু সময় ওরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। তারপর রিরেইৎই প্রথম সম্বিত ফিরে লীলীর কোমর ধরে টেনে ওকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে নেয়।

'কোথায় যাবে?'—ট্যাক্সি ড্রাইভার জনতে চায়।

এনরিও ট্যাক্সিতে ওঠার চেষ্টা করছিল। সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে রিরেইৎ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে— 'গাড়ী চালাও। কোথায় যাবো, পরে বলছি।'

ট্যাক্সি ষ্টার্ট দিতেই পেছনের সীটে গা এলিয়ে দেয় রিরেইৎ। কি বিশ্রী, কি কুৎসিৎ এই সব! সে ভাবে। লীলীর ওপর তার ঘেন্না হয়।

'লীলী, কোথায় যাবে তুমি? পিয়েরের ঠিকানায় নামিয়ে দেবো তো!' লীলী কোন জবাব দেয়না। রিরেইৎ ঝুঁকে বলে—'১১ নম্বর রী মেসিনে যেতে চাই।'

রিরেইত ফিবে তাকিয়ে দেখে, অদ্ভুত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লীলী।

'কী হয়েছে?'

'তোমাকে, পিয়েরকে, এনরিকে আমি ঘেন্না করি। আমি তোমাদের কী ক্ষতি করেছি? তোমরা আমায় যন্ত্রণা দিচ্ছো।' চেঁচিয়ে ওঠে লীলী।

'কাঁদো। কাঁদলে তোমার ভালো হবে।'

লীলী ফুপিযে কাঁদে। ওকে আলিঙ্গনে বেঁধে রেখে ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বিবেইত। কিন্তু তার ভেতরে ভেতরে অবিশ্বাস। ট্যাক্সি যখন থামে, লীলী তখন শান্ত। ও চোখ মুছে নাকে পাউডার লাগায়। ও বলে—

'আমাকে মাফ করো। নার্ভ ঠিক ছিলনা আমার। এনরিকে ওই অবস্থায় দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল—'

'তোমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে আমার?'

'কালকের আগে নয়। তুমি তো জানো পিয়ের ওর মায়ের আপত্তির দরুণ আমাকে ওই ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে পারছে না। আমি হোটেলে আছি। তোমার যদি অসুবিধে না হয় কাল সকাল নটা নাগাদ এসো। তারপর আমি মার সঙ্গে দেখা করবো।'

'আজ রাতে বেশী মন খারাপ করোনা।'

'আমি বড় ক্লান্ত। পিয়ের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে ভালো হয়। কিন্তু পিয়ের এসব কিছুই বোঝেনা।'

ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরে যায় রিরেইত। এখন সিনেমায় যেতেও ভালো লাগবে না। টুপিটা চেয়ারে রেখে জানলার দিকে এগিয়ে যায় রিরেইত। কিন্তু বিছানাটা

তাকে কাছে ডাকে। সাদা, নরম, মোলায়েম। জ্বলন্ত গালে নরম বালিসের আদর। আমি লীলীর জন্যে সবকিছু করেছি। এখন আমি একা। কেউ আমার জন্যে কিছু করবে না। একটা বোবা কান্না তার গলায় উঠে আসে। ওরা নীসে যাবে। আর হয়তো ওদের সঙ্গে দেখাই হবে না। আমার জন্যেই ওরা সুখী হবে। কিন্তু ওরা আমার কথা ভাববে না। আমি দিনে আট ঘন্টা নকল বার্মিজ মুক্তো বেচবো। তার চোখে জল আসে। বিছানায় শুয়ে সে কাঁদে, বলে—'নীস্...রোদের আলো...রিভিয়েরা—

'ফুঃ!' অন্ধকার কালো রাত। মনে হয়, কে যেন ঘরের ভেতরে চারপাশে ঘুরছে। পায়ে স্লিপার, একটা পুরুষ। আস্তে আস্তে পা ফেলছে, থামছে, আবার উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছে। লীলীর শীত করছে। কম্বলটা বড্ড পাতলা। 'ফু!'—বলার সময় নিজের গলার শব্দে লীলীর ভয় হয়।

ফুঃ! ও এখন বাইরে আকাশ দেখছে, আকাশের তারা দেখছে। সিগারেট ধরাচ্ছে। রাতের প্যারীর আকাশে বেগুনী রং ওর ভালো লাগে। যৌনসঙ্গমের পরেই ওর কবিত্ব জেগে ওঠে। গরুর দুধ দুয়ে নিলে গরুর যেমন হাল্কা লাগে, ওর এখন তেমনি হাল্কা লাগে। কিন্তু আমি, আমি তো নোংরা হয়ে গেছি, পুরুষের নোংরা আমার ভেতরে, এখানে, এই অন্ধকারে। একটা তোয়ালে ভিজে গেছে, বিছানার মাঝখানে চাদরের একটা জায়গাও ভিজেছে।

ঘরে আসার সময় পিয়ের বলেছিল—'এক মিনিট থাকবো। তোমার ঘরটা দেখবো।' পিয়ের দু'ঘন্টা রইলো। ও যখন সেই কাজটা করছিল, জঘন্য এই লোহার খাটটা ক্যাঁচক্যাঁচ করছিল। এই হোটেলের কথা ও জানলো কি করে কে জানে। ও বললো, এখানে এক সময় ও নাকি দু'সপ্তাহ ছিল। নিশ্চয়ই কোনো মেয়ের সঙ্গে ছিল। ছোট ছোট ঘর, আসবাবে ভর্তি, কুশন, কোচ, ছোট টেবিলে কামনার দুর্গন্ধ। আমাকে ও যখন এখানে এনে তুলেছে, আমার সম্বন্ধে ওর ধারণা নিশ্চয়ই খুব উঁচু নয়। আমরা যখন উপরে উঠছিলাম, আলজেরিয়ান বেল-বয় হাসছিল, এরা দুজনে ওই কাজটা করতে এখানে এসেছে। ও আরও অনেক নোংরা কথা ভাবছিল হয়তো। আলজেরিয়ার ওরা এইসব করে। কোন মেয়ে কোন আলজেরিয়ান পুরুষের পাল্লায় পরলে তাকে সারা জীবন খুড়িয়ে হাঁটতে হয়। যখন পিয়ের আমায় বিরক্ত করছিল, ওই কাজটা করছিল, আমি ভাবছিলাম সেই আলজেরিয়ান পুরুষের কথা। ও আমাদের সম্বন্ধে এখন কতো নোংরা কথা ভাবছে।

এখন থেকে রোজ রাতে এমনিই লাগবে। শুধু কাল রাতটা ছাড়া। কেননা কাল রাতে আমরা ট্রেনে যাব। লীলী ঠোঁট কামড়ায়। ও যখন কাজটা করছিল, আমি মৃদু আর্তনাদ করেছিলাম। না আমি শুধু জোরে নিঃশ্বাস নিয়েছিলাম। পিয়েরের শরীরটা ভারী, ও আমার ওপর চাপলে আমার নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। পিয়ের

বলছিল—'তুমি কাতরাচ্ছো, এইবার তুমি মজা পাবে।' ওই কাজটা করবার সময় পুরুষ কথা বললে আমার খারাপ লাগে। অথচ পিয়ের খালি নানা নোংরা কথা বলছিল। আমি চেঁচাইনি। ডাক্তার বলেছে, পুরুষের শরীরের ক্লান্তি মানেনা। 'থামো, লীলী। আমি কোথায় ভাবছি, তোমার ভাগ্য কতো ভাল, তুমি নীসে যাচ্ছো। আরে তুমি কিনা বলছো, প্যারী ছেড়ে যেতে তোমার কতো খারাপ লাগবে!'

'আমি তোমায় শেখাবো।' আমি ওদের বলতে দিই। আসল ঝামেলাটা কোথায় আমি তো জানি। শরীরের ব্যাপার, ডাক্তার বলেছে। কিন্তু ওরা তা জানে না, ওরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। ঈশ্বর, পিয়ের যেন ফিরে না আসে। ওর আবার ইচ্ছে হলে ও আবার হয়তো ওই কাজটা করবে। না, পিয়ের নয়। ভারী পায়ের শব্দ। লীলীর বুকের আড়ালে হৃৎপিণ্ডটা দুলে ওঠে। ওই আলজিরিয়ান পুরুষটা নয়তো?

পনেরো মিনিট পরে ও এনরির দরজায় ধাক্কা দেয়।

দরজার আড়াল থেকে এনরি বলে, 'ওখানে কে?'

'আমি।'

এক মিনিট পরে আধখানা দরজা খোলে। এনরিকে দেখা যায়। ফ্যাকাশে, নাকে ব্রণ। ও ঘুমোয়নি। লীলীর মনটা নরম হয়। এনরি মুখে কিছু বলে না। লীলী ওকে একটু ঠেলে ভেতরে ঢোকে। এনরি কি বোকা, সবসময় পথ আগলায়, গোল গোল চোখে আমায় দেখছে, হাত দুটো ঝুলছিল, ওর শরীরটা নিয়ে কি করতে হবে ও জানে না। চুপ করে থাকে। আমি জানি, তোমার মন খারাপ, তুমি কথা বলোনা। ও মুখের থুথু গেলার চেষ্টা করবে। লীলীকেই দরজা বন্ধ করতে হয়।

'আমি ভালো বন্ধু হিসেবেই বিদায় নেবো।' লীলী বলে।

ও মুখ খোলে, কথা বলার চেষ্টা করে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়, পালায়। ও কি করছে? কাঁদছে? না, কাশছে। ও বাথরুমে গেছে। ও ফিরে এলে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বমির গন্ধ পায় লীলী। তখন লীলী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

'আমার ঠাণ্ডা লাগছে'—এনরি বলে।

'বিছানায় চলো। কাল সকাল অবধি এখানে থাকতে পারি।' ওরা শুয়ে পড়ে। লীলী ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার ঘর বিছানা কি পরিষ্কার। জানলায় সেই লাল আলো। ও ভেবেছিল, এনরি তাকে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু না, কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে পা ছড়িয়ে শোয় এনরি। দুজনে কাঁদে। তারপর আলো নিভিয়ে হাল্কাভাবে এনরির কাঁধে মাথা দিয়ে বসে থাকে লীলী। পবিত্র এবং বিষণ্ণ দুই অনাথ শিশুর মত। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। জীবনে এরকম কখনও ঘটে না, জীবন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। লীলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঢেউ। তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এনরির হাত থেকে। এনরির হাত, মস্ত বড়। ওই হাতের জন্য ও গর্বিত। ও বলে, অভিজাত

পরিবারের সন্তানদের হাত দুটো মস্ত বড় হয়। ও এখন আর আমার কোমর ধরে না, একটু একটু সুড়সুড়ি দেয় শুধু...না, ও পুরুষত্বহীন নয়। 'আমি আমার বাবা-মাকে কি বলবো?' এনরি বলছে!

'আমার মা এসব শুনলে মরে যাবে।'

মা, মাদাম ক্রিসপ্যাঁ মরবে না। বরং এটা তো তারই জয়।

'এনরি, আমি তোমায় খুব ভালোবাসতাম।'

'এবং এখন বাসোনা?'

'এখন আগের মত নয়।'

'তুমি কোন্ পুরুষের সঙ্গে পালাচ্ছো।' এনরি কেঁদে বলে।

'শোনো, এনরি, আমি শপথ করে বলছি, পুরুষদের আমার ভালো লাগেনা। আমি রিরেইদের বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছি। আমি একা থাকতে চাই, চাকরী খুঁজতে চাই।'

এনরির পাজামার নীচে হাত গলিয়ে ওর সমস্ত শরীরে আদরের হাত বুলোয় লীলী। ওর ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়ায় কেঁপে উঠলেও এনরি সরে যায় না, শুধু বলে 'আমার আবার বমি পাচ্ছে।'

সত্যি, এনরির ভেতরে কি যেন ভেঙে গেছে।

সকাল সাতটার সময় বিছানা ছেড়ে উঠে লীলী। তার চোখ কেঁদে কেঁদে ফুলে ওঠেছে। সে ক্লান্তভাবে বলে—'আমায় ফিরে যেতে হবে।'

'কোথায় ফিরে যাবে?

'হতেইল দী থেয়াতর, রী ভাঁদামে।'

চাদরের বাইরে শুধু এনরির চুল আর কান দেখা যাচ্ছে। ও বলছে—

'এক হপ্তা ঘুমুতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।'

'বিদায়, ডার্লিং।'

ঝুঁকে চাদর একটু সরিয়ে এনরিকে চুমু খায় লীলী। কপালে চুমু খায়। একটু সময় ও ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে থাকে। দরজা বন্ধ করবে কিনা বুঝতে পারে না। এক লহমা পরে চোখ সরিয়ে ও জোরে দরজা বন্ধ করে। ভেতর থেকে শুকনো একটা শব্দ ভেসে আসে। লীলীর মনে হয়, ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।

'লীলী শেষ অবধি এই করলো।'—রিরেইত যেন অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে আছে।

তখন সন্ধ্যাবেলা। ছটার সময় রিরেইতকে ফোন করেছে পিয়ের।

'কিন্তু সকাল নটায় লীলীর সঙ্গে তোমার দেখা করার কথা ছিলনা?'

পিয়ের জানতে চায়—

'আমার সঙ্গে লীলীর দেখা হয়েছিল।'

'ওকে অদ্ভুত মনে হল?'

'না। আমি তো কিছু খেয়াল করিনি!.একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ও বললো,

তুমি চলে যাওয়ার পর ওর ঘুম হয়নি। কেননা নীসে যাওয়ার ব্যাপারে উত্তেজনা, তাছাড়া অ্যালজেরিয়ান সম্বন্ধে ওর ভয়। লীলীর চিঠি এখন পিয়ের-এর হাতে। ওটা পড়তে চায় রিরেইৎ। কিন্তু সে সুযোগ ওকে এখনও দেয়নি পিয়ের।

'ওটা কখন পেলে?'

'চিঠিটা?' সরলভাবে চিঠিটা ওর হাতে তুলে দেয় পিয়ের—

'পড়ে দেখো। দুপুর একটায় দারোয়ানকে দিয়ে গেছে লীলী।'

'ডিয়ারেস্ট ডার্লিং, টেকসিয়ার্স দম্পতি এসেছিল। ওদের ঠিকানাটা কে দিয়েছিল, আমি জানিনা। আমি জানি, এই চিঠি পড়ে খুব দুঃখ পাবে। কিন্তু ডিয়াবেস্ট ডার্লিং পিয়ের আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। আমি এনরির সঙ্গেই থাকবো। ও বড্ড অসুখী, ওরা আজ সকালে এনরির সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে দরজা খুলতে চায়না। মাদাম টেকসিয়ার বলছিল, এনরিকে মানুষের মত দেখাচ্ছিলনা। হয়তো রিরেইতের সঙ্গে আমি হোটেল ছেড়ে যাওয়ার সময় ওরা আজ সকালেই আমায় দেখে ফেলেছে। মাদাম টেকসিয়ার বললেন, উনি আমায় দারুণ আত্মত্যাগ করতে বলছেন। কিন্তু উনি জানেন, এ অবস্থায় এনরিকে ছেড়ে আমি যাব না। তোমার সঙ্গে নীসে বেড়াতে যাওয়া হলনা ভাবতে আমার খুব ভালো লাগছে, ডার্লিং। কিন্তু আমি জানি, আমি তোমারই, এটা জানলে তুমি কম দুঃখ পাবে। আমার হৃদয়, আমার শরীর সব তোমার। আগের মত আমরা প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু আমি এনরিকে ছেড়ে গেলে ও আত্মহত্যা করবে। আমি এনরির কাছে ফিরে যাচ্ছি। ওকে ওই অবস্থায় দেখবো ভাবলে খারাপ লাগছে। কিন্তু আমার শর্তগুলো বলার মত সাহস আমি পাবো। প্রথমতঃ আমি বেশী স্বাধীনতা চাই। কোননা আমি তোমায় ভালবাসি। তাছাড়া ও যেন আমার ছোট ভাই রবারৎকে আর কিছু না বলে। আমার মায়ের সম্বন্ধেও এনরির খারাপ কিছু আর বলা চলবেনা। প্রিয়তম, আমি খুব দুঃখিত, তুমি এখানে থাকলে আমি আনন্দ পেতাম। আমি তোমায় চাই। তোমায় জড়িয়ে ধরতে, সারা শরীর তোমার আদরের ছোঁয়া পেতে চাই, কাল পাঁচটায় কাফেতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।—'লীলী'

'বেচারা পিয়ের'—রিরেইৎ ওর হাত ধরে।

পিয়ের বলে—'আমি ওর জন্যে দুঃখিত। ওর দরকার ছিল ফাঁকা হাওয়া, রোদের আলো। কিন্তু ও যখন এটাই বেছে নিল...আমার মা খুব ঝগড়া করেছে। ভিলাটা আমার মায়ের। সেখানে আমার মেয়েমানুষ নিয়ে যাওয়া মায়ের পছন্দ নয়।'

'আহ্?'—ভাঙা গলায় বলে রিরেইৎ—'তাহলে সব ভালো, তাহলে সবাই সুখী?'

পিয়েরের হাত ছেড়ে দেয় রিরেইৎ। তার মনের অন্তরালে তিক্তবিষাদের বন্যাস্রোত বয়ে যায়। কেন, সে জানেনা।

মূল গল্প □ ইন্টিম্যাসি



ব্লু লেগুন

এইচ দ্য ভের স্ট্যাকপোল

বাটন তার বাঁ কানের নিচে বেহালা লাগিয়ে একটা বাক্সের উপর বসেছিল। নাবিকদের ঘুমোবার ঘরের পাটাতনে পা ঠুকে আর গলার সুর সে সঙ্গত করছিল বেহালার সুরে সুর মিলিয়ে। তার পরনে ডাঙ্গারী প্যান্ট, ডোরাকাটা জামার উপর জ্যাকেট। সূর্য এবং লবনাক্ত হাওয়ায় সবুজ হয়ে গেছে। ক্রান্তিয়-কুয়াশার ভিতর দিয়ে চাঁদকে যেমন দেখায়, তেমনি তার মুখশ্রী।

জাহাজে তার নাম 'ল্যাটা প্যাট।' সে বাঁ হাতে কাজ না করলেও সে কখনো ভুল করা ছাড়া কাজ করেনি। পাল খাটানো অথবা গুটানো, কিংবা ঠাণ্ডা জলের পাত্র পরিষ্কারে যদি কখনো গোলমাল হয় তবে বুঝতে হবে, তারই কাজ।

জাতিতে সে কেল্ট। গত চল্লিশ বছর ধরে সমুদ্রের লবনাক্ত জল তার এবং জাহাজের হালের মধ্য দিয়ে বয়ে গেলেও তার রক্তের মধ্যে কেল্‌টিক উপাদান ধুয়ে মুছে যেতে পারেনি। পরীদের সম্পর্কে তার বিশ্বাস অটুট থেকে গেছে। পৃথিবীর কোন বন্দরের মদ তার পেটে পড়েনি বলা মুস্কিল। মার্কিনী জাহাজেও সে কাজ করেছে। মার্কিনী মাল্লাদের হাতে মারধোরও খেয়েছে। কিন্তু পরীদের সম্পর্কে বিশ্বাস ছাড়াও প্রচুর আদিম সরলতা সে দূর করতে পারেনি।

মাল্লাদের শোবার ঘরে পালের বাঁধা খুঁটির গায়ে বাঁধা একটা তেলের বাতি দুলে দুলে অন্ধকার দূর করছিল। ঝোলান বিছানা থেকে কারো পা ঝুলছিল, পাইপ টানছিল কেউ, কারো বুকে লোম ভর্তি, কারো হাত অথবা পা ট্যাটু করা। মনে হচ্ছিল যেন তারা কতগুলি লেমুর অথবা বৃক্ষবাসি-ইঁদুর। আজকাল দো-চালা পালের জাহাজে মাল্লা অনেক লাগে। 'নর্থামবারল্যাণ্ড' জাহাজে মাল্লারা ক্ষেত মজুর কিংবা শুয়োর পালনের কাজ করত আগে। কিন্তু পৃথিবীর যত মন্দ এবং ভাল'র

মিশ্রণে মিশ্রিত প্যাডি বাটনের মত সমুদ্রের পোড় খাওয়া নাবিক আর একজনও ছিল না।

নর্থামবারল্যাণ্ড বহু সমুদ্র ঘুরেছে। এমন সমুদ্র যেখানে তিনটে ঢেউ একমাইলের থেকেও বেশি লম্বায় চওড়ায়। নিউ অর্লিয়েন্স থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত তিরিশ দিন ক্রমাগত সম্মুখ-বাতাস আর ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে। ষ্টিফ্ অন্তরীপ ঘুরতেও লাগিয়েছে তিরিশ দিন। আর এই মুহূর্তে জাহাজটির দক্ষিণের এক ভীষণ শান্ত জলে বন্দী।

ছড়'এর এক শেষ টান দিয়ে বেহালা বাজনো বন্ধ করল বাটন। জামার ডান হাতের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তারপর ছাইমাখা একটা পাইপ বের করে তামাক ভরে ধরিয়ে নেয়।

'প্যাত্রিক', ওপরের ঝোলানো বিছানার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বাটন বলে, 'কোন গপ্পো?'

ঘুম ঘুম গলায় একটি ডাচগলায় বাঙ্ক থেকে আসে, 'ওইযে গো, সবুজ পারা কি একটা।'

'ও-হো, লেপ্রিকুন, আইরিশ পরীর কথা কইছ, মোর মায়ের বুন একবার দেখেছেল কনট গাঁয়ে।'

'কি রকম? আরে, লেপ্রিকুন—লেপ্রিকুনের মত ছাড়া আর কি রকম দেইখতে হবে?'

সেইটেইতো জানতে চাই।'

'ছোট এইটুন মনিষ্যি, মুলার মতন আর বান্দাকপির মতন রং। অনেক বচ্ছর আগে একবার কনট গেস্লাম। আহা, মুশা, মুশা, ঠাকুর ঠাকুর, সেই পুরানো দিনগুলান! তুই মোর কথা মান আর না মান, ওই উটা তুই পকেটের মদ্দি রাইখতে পারিস। মোর মাসি উয়ারে আলমারিতে রাইখতো। আলমারি থেকে ঝাঁপ দিয়ে কখুন দুধের বাটিতে, কখুন বিস্তারার তলে চইল্লে যেত। কখুন শুয়ার তাড়া কইরত, কখুন গত্তে। মুরগীর ফুঁকা ডিমের থে, ছ'মাথা আর সাতাইশ পা অলা মুরগী বাচ্চা বের কইরত। উয়ারে ধইরতে যাও—পাইলে পাইলে যাবে। শ্যাষে, শুয়োর যখন গত্ত থেকে নাক বের করল, সে অমনি ছুট্টে আলমারিতে।'

বিড় বিড় করে ডাচটি বলে, 'উটা একটা ট্রল, বাটুল কুনো জীব।'

'বলতেছিনা লেপ্রিকুন। কত্ত শয়তানি কইরত। বান্দাকপি রান্না হচ্ছে, উয়ার ঝোল তোর মুয়ে মাখাই দিল। তাপ্পর উয়ার দিকে হাত বাড়াও, একটা মোহর দিবে হাতে।'

বাঙ্ক থেকে একটা কণ্ঠস্বর—'আ-হা, উটি যদি ইখানে থাইকতেন।'

'প্যাণ্ডিক', ঝোলানো বিছানা থেকে একজন বলে, 'তুর পকিটে বিশ পাউণ্ডের এট্টা পাত্তি থাকলে পেথমেই কি করবি তুই?'

'মোরে জিগাও কেন?' বাটন বলল, 'দরিয়ার মদ্দি লস্করের পকিটে বিশ পাউণ্ড দে কি হবে? ইখানে জলো মদ আর ঘোড়ার মত গরুর মাংস দ্যায়। ডেংগায় নামতে-দে-তবে না দেইখবি কি করি।' একটু থেকে বাটন আবার বলে, 'কইতে শরম নাই, মদ প্যাটে পইড়লে মুই শয়তান বইনে যাই। জেবনের শ্যাষ দিনতক এইডা থাইকবে। দরিয়া থে ফিরলাম, মা কইলে—প্যাট, তুই তুফান থে বাঁচবি, মাগীর হাত-থে রেহাই পাবি, কিন্তু এই বিষ তুরে খাইবে।'

ওহিও দেশের একজন বলল, 'এখনতক খায় নাই তুরে।'

'না, কিন্তু একদিন খাইবে।'

ক্রান্তিয় স্তব্ধতা, উজ্বলতা নিয়ে আকাশের নক্ষত্রসহ ডেকের উপর আজকের রাত বড় সুন্দর। প্রশান্ত মহাসাগর যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তরঙ্গের সামান্য আন্দোলনে নর্থামবারল্যাণ্ডে হাল'-এ ক্ষীণ ক্যাঁচকোচ শব্দ, দূরের জলের ওপর ভাসমান পাথরে ঢেউ'এর মৃদু আঘাতের শব্দ ভেসে আসছে। মাথার ওপরে ছায়াপথের ভীতিজনক তোরণ। দক্ষিণীক্রশ যেন কাটা ঘুড়ির মত আকাশে ঝুলছে। আকাশ জুড়ে নক্ষত্র, জলে নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব—কোটি কোটি নক্ষত্রের মেলা। কোন জনবহুল রাতের শহর যেন। উজ্জ্বল, জীবন্ত। কিন্তু নিঃশব্দ।

কেবিনে--অথবা জাঁক করে যাকে সেলুন বলা হয়—জাহাজের তিনজন যাত্রী বসে আছে। বই'-এ চোখ রেখে বসে আছেন আর্থার লেস্ট্রেঞ্জ'এর ভাইঝি—হাতে কিছু একটা নিয়ে তাকে দোলা দিচ্ছে আর নিজের মনে কথা বলছে। এমিলির ডাগর চক্ষু স্বপ্ন দেখে কত কি। লেস্ট্রেঞ্জের ছেলে ডিক। আট বছর থেকে একটু বড়ই। এখন সে টেবিলের নিচে লুকিয়ে আছে।

এদের দেশ বোস্টনে। যাচ্ছে সানফ্রান্সিসকো। এখানে লেস্ট্রেঞ্জ একটা ছোট জমিদারি কিনেছেন। ইচ্ছে, শেষ জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দেওয়া।

কেবিনের দরজা খুলে যায়। দরজায় পারিবারিক তত্ত্বাবধায়িকা মিসেস ষ্ট্যানার্ড। ওর আগমনের অর্থ হল ছোটদের ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে।

বই বন্ধ করে' টেবিলের ঢাকনা একটু তুলে লেস্ট্রেঞ্জ ডাকলেন, 'ডিকি।'

টেবিলের তলা থেকে ঘুম জড়ানো গলা—'না বাপি, এখন না। আমি এখুনি ঘুমাবো না।'

মিসেস ষ্ট্যানার্ড টেবিলের কাছে এসে ডিকির পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে বের করে আনে তাকে। কিন্তু ডিক লাথি ছুঁড়ে, যুদ্ধ করে, কান্না কান্না গলায় প্রতিবাদ

জানাতে কসুর করে না। শেষ পর্যন্ত চোখ মুছে কান্না ভেজা মুখ তুলে দেয় বাবার দিকে শুভরাত্রি জানাবার জন্য।

তারও পরিণতি একই হতে পারে ভেবে এমেলিন দাঁড়িয়ে পড়ে। এতক্ষণ যে ন্যাকড়ার পুতুলটাকে আদর করছিল সে, এবার পুতুলটার মাথা শূন্যে ঝুলতে দিয়ে তার পা চেপে ধরে কাকুর কাছ থেকে শুভরাত্রি জানাবার চুমু নিয়ে মিসেস ষ্ট্যানার্ডের হাত ধরে চলে যায়।

লেষ্ট্রেঞ্জ আবার বইতে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু একটু পরেই খোলা দরজা দিয়ে এমেলিন ফিরে আসে। তার পরণে রাত্রিবাস। হাতে একটা ছোট বাক্স।

'আমার বাক্স।' এমেলিন যখন বাক্সটা তুলে ধরে তার ছোট্ট মুখটা যেন দেবকন্যার মত দেখায়। এমেলিন যখন হাসে, মনে হয় যেন স্বর্গ নেমে এসেছে।

বাক্স নিয়ে আবার চলে যায় এমেলিন। এই বাক্সটা নিয়ে আজ পর্যন্ত যত ঝামেলা হয়েছে, জাহাজের সমস্ত মাল হারিয়ে গেলেও বোধহয় এত ঝঞ্ঝাট হত না। বোষ্টনে তার এক বান্ধবী জাহাজে উঠবার সময় এই উপহারটি তাকে দেয়। ভিতরের বস্তুর কথা খুবই গোপনে রাখা আছে। সে আর তার কাকা ছাড়া আর কেউ এর খবর জানে না। আর মুস্কিলের ব্যাপার এই যে, বাক্সটা ক্ষণে ক্ষণে হারায়। পৃথিবীতে কত যে ডাকাত আছে আর। তারাই বাক্সটা মধ্যে মধ্যে চুরি করে নেয়, এই হল এমেলিনের ধারণা। জাহাজের মাল্লাদের কাজকর্ম দেখতে দেখতে এক সময় সে আবিষ্কার করে বাক্সটা নেই। তারপরই করুণ মুখে সে জাহাজের সর্বত্র বাক্সটা খুঁজে বেড়ায়। জাহাজের রান্নাঘর থেকে মাল্লাদের ঘুমোবার ডেক—এতটুকু বিলাপ না করে, নিঃশব্দে ভূতের মত ঘুরে বেড়ায় বাক্সটার জন্য।

যদিও বাক্সটার হারানোর ব্যাপারে কাউকে সে কিছু বলত না, কিন্তু জাহাজের সমস্ত নাবিকেরাই জানত কি হয়েছে এবং সকলেই বাক্সটা খুঁজে বেড়াত। আর আশ্চর্য ব্যাপার—প্রতিবারই খুঁজে বের করে দিত বাটন। সকলের চোখে বাটনের দোষ থাকলেও শিশুদের কাছে কিন্তু সে ছিল একেবারে নির্দোষ ব্যক্তি। শিশুদের বন্ধু ছিল সে।

লেষ্ট্রেঞ্জ বই বন্ধ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। সুসজ্জিত কেবিনের একটা আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছিলেন তিনি। তার কৃশ চেহারা ভয়ানক দেখাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, তিনি মারা যাবেন। খুব শিগ্‌গীর তার মৃত্যু অবধারিত।

আয়না থেকে চোখ সরিয়ে গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকেন লেষ্ট্রেঞ্জ। টেবিলক্লথের ওপর কালির একটা দাগের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কেবিনের অপর প্রান্তে ডেকে উঠবার সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন খুব কষ্ট করেই। ডেকে উঠে—সমুদ্রের দিকের রেলিং ধরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিলেন। রাত্রির

সমারোহ এবং সৌন্দর্য তার বুকে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দেয়। একটা ডেক চেয়ারে বসে তাকিয়ে রইলেন ছায়াপথের দিকে। এই ছায়াপথ যেন আবর্তময় এক পাতাল, এক সীমাহীন গিরিগুহা। তার কল্পনা-প্রবণ মনে এই দৃশ্য এমন অনুভূতি জাগায়, যার ফলে তার মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে একটু পরে। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র চাঁদ ওঠবার সাথে সাথে নিস্প্রভ হয়ে যায়।

কোয়ার্টার ডেকে এক ছায়ামূর্তির পায়চারি করা দেখে লেস্ট্রেঞ্জ সচেতন হয়ে ওঠেন। এ হল 'বুড়ো'। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বুড়ো বলেই ডাকা হয় তা তার বয়স যাইহোক না কেন। ক্যাপ্টেন লা ফার্জ-এর বয়স পয়তাল্লিশ। ফরাসি বংশোদ্ভব কিন্তু বর্তমানে মার্কিন নাগরিক। একটা ডেক চেযার টেনে লেস্ট্রেঞ্জের পাশে বসে ক্যাপ্টেন বলে, 'হাওয়া যে কোথায় উধাও হয়ে গেল! আকাশ ফুটো করে পালিয়েছে।'

লেস্ট্রেঞ্জ বললেন 'বড় লম্বা সফর হয়ে গেল ক্যাপ্টেন। শেষ পর্যন্ত আমি সানফ্রান্সিসকো পৌঁছাতে পাবব কিনা কে জানে?'

'ও সব কথা ভাববেন না। আবহাওয়া নিয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায় না। আমরা এখন এক উষ্ণ মহাবিস্তৃতির মধ্য দিয়ে চলেছি। গোল্ডেন গেট-এর কাছাকাছি এলেই আমাদের মত আপনিও চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।'

ক্যাপ্টেনের কথা যেন কান পর্যন্ত যায়নি এমন ভাবে লেস্ট্রেঞ্জ বলেই চলেন, 'আমি বাচ্চা দুটির কথা ভাবছি। বন্দরে পৌঁছাবার আগেই যদি আমার কিছু হয় তবে আমার কয়েকটা অনুরোধ রাখবেন। বাচ্চারা যাতে জানতে না পারে এমন ভাবে আমার দেহ সংকার করবেন। ক'দিন ধরেই কথাটা আপনাকে বলব বলব ভাবছিলাম। ক্যাপ্টেন, মৃত্যু কি ওই শিশুরা জানেনা।'

লা ফার্জ অস্বস্তি নিয়ে চেয়ারে নড়ে চড়ে বসে।

'এমেলিনের বাবা, আমার ভাই, ওর জন্মের আগেই মারা যায়। মেয়েটা যখন দু'বছরের, ওর মার মৃত্যু হল। ডিকি মায়ের মুখই দেখেনি। প্রসবের সময়ই ওর মা মারা যান। মৃত্যুর ভারি থাবা আমার পরিবারের উপর পড়েছিল। আপনি ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আমার ভালবাসার ধন দুটি শিশুর কাছেই আমি মৃত্যুকে গোপন রেখেছি।'

'আহা', লা ফার্জ বলল, 'খুব দুঃখের ব্যাপার।'

'ছেলেবেলায় আমার আয়া আমাকে মৃত আত্মাদের কথা শুনিয়ে ভয় দেখাত। আমি দুষ্টুমি করলে মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা হয়ে নরকবাস করব এসব কথা বলে আতঙ্কিত করত আমাকে। এসব কথা কিভাবে আমার জীবনকে সে বিষিয়ে দিয়েছে, আপনাকে বলতে পারব না ক্যাপ্টেন। তাই শিশু দুটির ভার যখন আমার উপর পড়ল, ঠিক করলাম, জীবনের বিভীষিকা, বিশেষ করে মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে

ওদের রক্ষা করব।'

'কিন্তু একদিন ওরা জানবেই যে ওদেরও মৃত্যু হবে।' ক্যাপ্টেন বলল।

'শুনুন, মাটি স্পর্শ করবার আগেই যদি আমাকে যমদূতের জরিমানা দিতে হয়, তবে, এই বিরাট সমুদ্রে আমাকে সমাধিস্থ করবেন আর বাচ্চাদের বলবেন আমি অন্য এক জাহাজে চড়ে চলে গেছি। আপনি ওদের বোস্টনে নিয়ে যাবেন। এই একটা চিঠিতে সব কিছু লেখা আছে। এক মহিলা ওদের ভার নেবেন। ভালই থাকবে ওরা। শুধু বলবেন, আমি অন্য জাহাজে চলে গেছি। আর বাচ্চারা তাড়াতাড়ি সব ভুলে যায়।'

'আপনি যা বলবেন, করব।'

চাঁদ দিগন্ত ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। নর্থামবারল্যাণ্ডে যেন রুপোর নদীতে ভাসছে। মাস্তুলগুলি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। পালের প্রতিটি কোনা আর ডেক যেন কুয়াশার মত আলো আঁধারিতে ছেয়ে গেছে।

এই দু'জন যখন নীরবে নিজ নিজ ভাবনায় ডুবে আছে, তখন সেলুনের ঢাকনা খুলে ছোট একটি শ্বেত-মূর্তি বেরিয়ে আসে। এমেলিন, ঘুমের মধ্যে হাঁটা যার রোগ। ঘুমের দেশে পৌঁছে সে তার বহুমূল্য বাক্সটি হারিয়ে ফেলে। এখন ডেকে এসে খুঁজছে।

লেষ্ট্রেঞ্জ নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করেন। দড়ির স্তূপের আড়ালে খোঁজা শেষ করে এমেলিন রান্নাঘরের দরজা খুলবার চেষ্টা করে। বড় বড় চোখ মেলে বিব্রত মুখে এখানে সেখানে বাক্সটা খুঁজছে সে। অবশেষে মুরগী ঘরের অন্ধকার কোন থেকে কাল্পনিক বাক্সটি উদ্ধার হয়। তারপর রাত্রিবাসের এক প্রান্ত একটু তুলে সে সেলুনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে বিছানায় চলে যায়।

এতক্ষণ দু'হাত বিস্তৃত করে এমেলিনের পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন লেষ্ট্রেঞ্জ, পাছে সে পড়ে না যায়।

মহা নিথর নিস্তরঙ্গ সময়ের আজ চতুর্থ দিন। যাত্রীদের জন্য জাহাজে শেষ অংশের পাটাতনে খাটান হয়েছে একটা চাঁদোয়া। এর নিচে বসে লেষ্ট্রেঞ্জ পড়বার আর বাচ্চারা খেলবার চেষ্টা করছে। গরম আর ক্লান্তিকর একঘেয়েমি ডিককে পর্যন্ত রূঢ়ভাষী করে তার ছটফটানি বন্ধ করে দিয়েছে। এমেলিনও যেন হতবুদ্ধি। ন্যাকড়া পুতুল অনাদরে পাটাতনে লুটিয়ে আছে। এমন কি সেই বাক্সটা কোথায় আছে কি নেই, তাও যেন তার আর মনে নেই।

'বাপি।' রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়া অবস্থায় ডিক হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।

'কি হল?'

'মাছ।'

কাছে গিয়ে লেস্ট্রেঞ্জ রেলিং-এ ঝুঁকে পড়েন। সমুদ্রের গাঢ় সবুজ জলে অস্পষ্ট অথচ মৃত্যু ভয়ংকর রূপ নিয়ে কিছু একটা নড়ছে। একটা হঠাৎ ডুব দিতে আরেকটা ভেসে ওঠে আরও স্পষ্ট আকৃতি নিয়ে।

এটার চোখ, কালো পাখনা এবং অবশেষে প্রাণীটির বীভৎসপূর্ণ আকৃতি দেখতে পান লেস্ট্রেঞ্জ। একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনির স্রোত তার শরীরে বসে যায়। ডিককে দুহাতে আঁকড়ে ধরেন তিনি।

'কি সুন্দর—না বাপি?' ডিক বলে, 'একটা ছিপ থাকলে ওটাকে জাহাজে তুলে আনতাম। আমাকে একটা ছিপ দাওনি কেন বাপি?'

'ওঃ—তুমি আমাকে পিষে ফেলছ যে—।'

এমেলিনও দেখবার জন্য এসে দাঁড়ালে, লেস্ট্রেঞ্জ ওকে কোলে তুলে জীবটিকে দেখাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে তারা জলের উপর কোন সাক্ষর না রেখেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ডিককে রেলিং থেকে নামিয়ে চেয়ারের কাছে নিয়ে যান লেস্ট্রেঞ্জ।

'ওটা কি বাপি?' ডিক প্রশ্ন করে।

'হাঙ্গর।'

লেস্ট্রেঞ্জের মুখে ঘাম ঝরছিল। যে বইটা পড়ছিলেন—টেনিসনের একটি খণ্ড—তুলে নিলেন কিন্তু রৌদ্রস্নাত মূল ডেকের মাস্তুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সমুদ্র তার কাছে এক নবরূপে দেখা দিয়েছে। কাব্য, দর্শন, সৌন্দর্য, শিল্প, জীবনের প্রেম ও আনন্দ। কিন্তু মৃত্যুর পরপারেও কি এই জগত আছে? একটু আগে যে ভয়ংকর প্রাণীটি খাদ্যের জন্য জাহাজের তলায় ওৎ পেতে ছিল, তার সঙ্গে সেই জগতের কি মিল আছে?

জাহাজের ঘন্টা বাজল। বিকেল সাড়ে তিনটে। তত্ত্বাবধায়িকা বাচ্চাদের নিয়ে যাবার জন্য এসে দাঁড়াল। ওরা তার সঙ্গে নিচে নেমে গেলে জাহাজের পিছনের অংশ থেকে ক্যাপ্টেন ডেকের উপর দাঁড়ায়। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সমুদ্রের উপর ঘনসংবদ্ধ কুয়াশা হঠাৎ জেগে উঠছে ছায়ামূর্তির আতংক নিয়ে।

'সূর্যের তেজ একটু কম। খালি চোখেই সূর্যের দিকে তাকান যাচ্ছে। কুয়াশা জাগছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কুয়াশা কখনো দেখেছেন?' ক্যাপ্টেন বলল।

'না, কোনদিন দেখিনি।'

'কখনো যেন দেখতে না হয়।' সমুদ্রের দিকে চোখ স্থির রেখে ক্যাপ্টেন বলল। দিগন্ত যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অচেনা একটা ছায়া হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে।

আকাশ ও সমুদ্রের চিন্তা ছেড়ে হঠাৎ ক্যাপ্টেন মাথা তুলে কিসের গন্ধ শুকবার

চেষ্টা করে।

'কোথায় যেন কি পুড়ছে। গন্ধ পাচ্ছেন? মনে হচ্ছে রাঁধুনীর ন্যাতা পুড়ছে। কিংবা পুরানো মাদুর। অথবা লণ্ঠনের কাঁচ ভেঙ্গে কার্পেটে আগুন ধরছে। ভগবান, জেনকিনসের মত রাঁধুনী বুদ্ধুটাকে. . .।' সেলুনের উপর পাটাতনের ঢাকনার কাছে গিয়ে হাঁক দিল, 'নিচে কে?'

'আমি স্যার।'

'কি পোড়াচ্ছ?'

'আমি কিছু পোড়াইনি—স্যার।'

'গন্ধ আসছে কেন তবে?'

'এখানে কিছু জ্বলছে না স্যার।'

'উহুঃ, এখানে নয়। ডেক থেকে গন্ধটা আসছে। রান্নাঘর থেকে নিশ্চয় কোন ন্যাকড়া আগুনে ফেলেছে।'

'ক্যাপ্টেন!' লেষ্ট্রেঞ্জ ডাকল।

'বলুন।'

'এখানে একটু আসবেন।'

লা ফার্জ ওখানে গেলে লেষ্ট্রেঞ্জ বললেন, 'আমার চোখের দোষে কিনা বুঝতে পারছি না, কিন্তু প্রধান মাস্তুলে কিন্তু আশ্চর্য জিনিষ দেখছি।'

চাঁদোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে,—প্রধান মাস্তুলের খুঁটি যেখানে ডেকের ভিতর ঢুকেছে, সেখানে কুণ্ডলী আকারে কিছু ঘুরছে। কুয়াশার মত অস্পষ্ট যেন কিছু সেখানে চক্র কাটছে।

'ভগবান।' চীৎকাব করে ওঠে লা ফার্জ। পাটাতনে লাফ দিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে যায়।

লেষ্ট্রেঞ্জ রেলিং ধরে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে ওর পিছনে যান। তিনি শুনতে পেলেন প্রধান মাল্লার তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজ। দেখতে পেলেন নাবিকদের ঘুমোবার জায়গা থেকে মৌমাছির ঝাঁকের মত হাতগুলি উঠে উঠে আসছে। ওরা প্রধান ঢাকনার কাছে ভীড় করেছে। ওবা ত্রিপল আর নৌকার বন্ধনী দণ্ড খুলছে। ঢাকনা খুলে দিল ওরা। কালো, বিভৎস কালো ধোঁয়া বাতাসহীন আকাশে ঘন হয়ে প্রবল বেগে উঠছে।

লেষ্ট্রেঞ্জ ভীত প্রকৃতির লোক। কিন্তু এই ধরণের লোকেরাই বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখতে পারে যখন স্থির ব্যক্তিরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। লেষ্ট্রেঞ্জের মাথায় প্রথম এল বাচ্চা দুটির কথা। কেপ হর্ণ পাড়ি দেবার সময় নর্থামবারল্যাণ্ডের অনেকগুলি নৌকাই নষ্ট হয়েছিল। ছিল একটা বড়, একটা ছোট নৌকা আর একটা

ডিঙ্গি। লেস্ট্রেঞ্জ শুনতে পেলেন—লা ফার্জ ঢাকনা বন্ধ করবার আদেশ দিচ্ছে। পাম্প চালাবার নির্দেশ দিচ্ছে যাতে জায়গাটাকে প্লাবিত করা যায়। তারপর দ্রুত তার কামরার দিকে চলে গেল সে।

বাচ্চাদের কেবিন থেকে মিসেস ষ্ট্যানার্ড বেরিয়ে আসে। উত্তেজনাজনিত ক্লান্তিতে প্রায় শ্বাসহীন অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন লেস্ট্রেঞ্জ, 'বাচ্চারা কি ঘুমোচ্ছে?'

লেস্ট্রেঞ্জের আতঙ্কগ্রস্থ মুখের দিকে তাকিয়ে ভীত চোখে তাকিয়ে থাকে মহিলাটি।

'ওরা ঘুমালে জাগিয়ে দিয়ে জামা-কাপড় পড়িয়ে দিন। জাহাজে আগুন লেগেছে।'

'হে ভগবান।'

সিঁড়িতে প্রচণ্ড শব্দ তুলে লা ফার্জ সেলুনে ঢুকে পড়ে। তার মুখ রক্তের মত লাল হয়ে গেছে। মাতালের মত তার দৃষ্টি। কপালের দু'পাশের রগগুলি যেন দড়ির মত পাকিয়ে পাকিয়ে জেগে আছে।

'বাচ্চাদের তৈরি করে নাও। সবাই তৈরি হয়ে নাও। নৌকা নামাও। খাদ্য পানীয় তোল। এই লোকেরা, আমার কাগজপত্রগুলি কোথায়?' লা ফর্জ চীৎকার করতে করতে নিজের কেবিনে ঢুকে যায়। পাগলের মত কেবিন থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করতে থাকে। জাহাজের কাগজপত্র, হিসাব, যা একজন দক্ষ ও যোগ্য নাবিকের জীবনের মতই অপরিহার্য জিনিষ সেগুলি খুঁজে খুঁজে বের করে পোঁটলা বাঁধতে থাকে। এই কাজগুলি করতে করতেই সে চীৎকার করে বাচ্চাদের ডেকে আনবার জন্য আদেশ দিতে থাকে। বিভিন্ন মালের সঙ্গে জাহাজে সেই সাংঘাতিক জিনিষটার কথা ভেবে সে প্রায় পাগলই হয়ে যাচ্ছে।

ডেকের উপর প্রধান সহকর্মীর নির্দেশে অন্যান্য মাল্লারা শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা অবশ্য জানেই না যে তাদের পায়ের নিচে জাহাজের খোলের মধ্যে কি আছে। তারা জানে একটা মালবাহি জাহাজে যেমন হঠাৎ আগুন লাগে, তেমনি কিছু ব্যাপার। নৌকাগুলির ঢাকনা খুলে ফেলা হয়েছে। জলের পিপে আর বিস্কুটের বস্তা তোলা হচ্ছে। নৌকাগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি—ডিঙ্গিটায় প্রয়োজনীয় জিনিষ তুলতে কষ্ট হল না। প্যাডি বাটন এই ডিঙ্গিতে জল ও খাবার রাখছিল। সেখানে লা ফার্জ তাড়াতাড়ি ছুটে আসে। তার সঙ্গে তত্ত্বাবধায়িকার কোলে এমেলিন এবং লেস্ট্রেঞ্জের হাত ধরে ডিক পৌঁছে গেল। এই ডিঙ্গিটা একেবারে সাধারণ নয়। এটা একটু বড়। ছোট মাস্তুল এবং লম্বা পাল এতে আছে। দুটি নাবিক এটাকে জলে ভাসাবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। প্যাডি বাটন কাজ শেষ করে ওখান থেকে চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই ক্যাপ্টেন তাকে খপ করে ধরল।

'ডিঙ্গিতে উঠে পড়', চীৎকার করে বলল লা ফার্জ, 'এই শিশু আর যাত্রিদের নিয়ে জাহাজ থেকে যতদূর পার চলে যাও—সমুদ্র থেকে দূরে কোথাও চলে যাও।'

'যাচ্ছি ক্যাপ্টেন, আমার বেহাটা ফেলে এসেছি—'

লা ফার্জ হাতের পোঁটলা ডেকের উপর ফেলে দিয়ে বয়স্ক নাবিকটিকে এমনভাবে চেপে ধরল যেন তাকে এখুনি জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বাটন তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠে বসে। এমেলিনকে তার হাতে তুলে দেওয়া হল। এমেলিনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। চোখ দুটো বড় বড়। ছোট্ট একটা শালে সে কিছু জড়িয়ে ধরে আছে। এরপর ডিক ও লেস্ট্রেঞ্জকে নৌকায় তুলে দেওয়া হল।

'আর জায়গা নেই।' লা ফার্জ চীৎকার করে বলে, 'মিসেস ষ্ট্যানার্ড আপনার জায়গা অন্য নৌকায় হবে। নৌকা নামাও, নৌকা নামাও।'

নীল সমুদ্রে নেমে নৌকাটি ভাসতে থাকল। বাটন এর আগে দেখেছিল নর্দামবারল্যাণ্ডে কি কি মাল পোবা হয়েছে। এই মুহূর্তে তার সেই স্মৃতি জেগে উঠতে ঝুঁকে থাকা দুই নাবিককে চেঁচিয়ে বলল, 'বাঁচতে চাওতো পালাও। জাহাজের খোলে দু ব্যারেল বারুদ রয়েছে।'

তারপর সে বৈঠা হাতে নিয়ে ঝুঁকে প [illegible] আর এমেলিনকে জড়িয়ে ধরে নৌকার গলুইতে বসেছিলেন লেস্ট্রেঞ্জ। বাটনের কথা শুনে চোখে অন্ধকার দেখলেন। বাচ্চা দুটি যারা বারুদের কথাই জানে না, তারা ক্ষণিকের ভয় ভীতি কাটিয়ে উঠে নিজেদের নীল সমুদ্রের মাঝে ছোট্ট নৌকায় বসে থাকতে দেখে বরং খুশিই হল। ডিক জলের ভিতর আঙ্গুল ডুবিয়ে ঢেউ তুলবার চেষ্টা করছিল। কাকার হাত ধরে এমেলিন বাটনের দিকে তাকিয়ে রইল।

বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বাটন বৈঠা দিয়ে জল কাটছিল। তার মনের হাজার যন্ত্রনা মুখে ভেংচি কাটার মত ফুটে উঠেছে। পিছনে জাহাজটি ভাসছে নির্জিবের মত। জাহাজ থেকে বড় ও মাঝারি নৌকা জলে নামতে মাল্লারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্রুত সাঁতার কেটে নৌকাগুলিতে উঠে পড়ছে। জাহাজের প্রধান খোল থেকে এবার কালো ধোঁয়া গলগল করে বেরিয়ে আসছে। ধোঁয়ার সঙ্গে স্ফুলিঙ্গ। মনে হচ্ছে যেন একটা ড্রাগনের আধখোলা মুখ থেকে এগুলি বেরিয়ে আসছে। জাহাজের মাইল খানেক দূরে ঘন কুয়াশার স্তর। সেখানে যেন সাদা অলৌকিক পাহাড়ের সারি।

'আমার দম ফুরোচ্ছে।' বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বাটন হঠাৎ বৈঠার ডাণ্ডা হাঁটুর তলায় গুঁজে দিল। এমনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল যেন সে নৌকার অন্য যাত্রীদের মধ্যে গিয়ে পড়ে যাবে। 'জাহাজ উড়ে যাক আর না যাক, আমি আর পারছি না। মোর দম ফুরিয়ে গেছে।'

প্রাথমিক ভয় ভীতি কেটে গেলেও লেস্ট্রেঞ্জকে দেখাচ্ছিল যেন একটি শ্বেত

প্রেতাত্মার মত। ওকে দম ফেলতে দিয়ে জাহাজের দিকে তাকালেন। জাহাজ এখন অনেকটা দূরে। অন্য নৌকাগুলি এই নৌকার দিকে পাগলের মত ছুটে আসছে।

ডিক তখনো জলে আঙ্গুল ডুবিয়ে খেলছিল। এমেলিনের চোখ প্যাডি বাটনের দিকে। জাহাজে বাটনের ছিল ভিন্ন চেহারা। কখনো কাজে মত্ত, কখনো ঝাঁকি দিয়ে নাচছে। অথবা ডিককে পিঠে চাপিয়ে সমস্ত জাহাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখনকার বাটনের অন্য রূপ। এমেলিনের মনে হল বাটনের বড় কষ্ট হচ্ছে। সে নিজের জামার পকেট হাতড়ে ছোট কমলালেবু বের করে বাটনের মাথায় ছোঁয়াল। মাথা তুলল বাটন। কয়েক মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে সামনে বাড়ান কমলালেবুটা দেখল। বাচ্চাদের কথা মনে পড়ল তার। নিজের কথা এবং বারুদের কথাও মনে পড়ল। নিজেকে যেন ফিরে পেল সে। তারপর বৈঠা হাতে তুলে নিল।

'বাপি।' জাহাজের দিকে তাকিয়ে ডিক বলে উঠল, 'জাহাজের কাছে কত মেঘ।'

বাতাসের মৃদু ধাক্কায় কুয়াশার জমাট বাধা স্তূপ হঠাৎ সচল হল। ধূসর এবং বিষণ্ণ পশ্চাদপটে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা জাহাজের পালগুলি কাঁপছে। খোল থেকে দমকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া যেন তাড়া করেছে পলাতক নৌকাগুলিকে। কুয়াশা আরে ধোঁয়ায় আকাশের গায়ে অনেক মূর্তি সৃষ্টি করছিল। ভয় পেয়ে এমেলিন তার কাকার হাত জড়িয়ে বলল, 'কাকু আমার ভয় করছে। কত মূর্তি— '

হাঁপাতে হাঁপাতে বাটন বলল, 'ওগুলি কুয়াশা—'

লেস্ট্রেঞ্জ বললেন, 'আমরা এখন অনেকটা দূরে। ওই নৌকাগুলির জন্য অপেক্ষা করা যাক।'

'ঠিক বটে', বাটনের আতংক দূর হয়েছিল। 'এবারে জাহাজ ফাটুক আর না ফাটুক— মোদের কিছু ক্ষেতি হবে না।'

'বাপি।' ডিক বলল, 'আমরা কখন ফিরে যাব?

'আমরা আর ওখানে ফিরে যাব না।' লেস্ট্রেঞ্জ বললেন, 'জাহাজে আগুন লেগেছে। আমরা অন্য জাহাজের জন্য অপেক্ষা করব।'

'কোথায় সেই আরেকটা জাহাজ?' দিগন্ত বিস্তৃত জলের দিকে তাকিয়ে ডিক বলে।

'আসবেরে, ঠিক আসবে।'

অন্য নৌকাগুলি এগিয়ে আসছিল। একটু পরেই আগুনের স্রোত বইল সমুদ্রে। কাঠের জাহাজটা একটা ন্যাকড়ার মত জ্বলছে।

সূর্যের আলো স্তিমিত হতে হতে এক সময় মুছে গেল। ডিঙ্গি নৌকাটার চারপাশের কুয়াশা তত গাঢ় নয়। কিন্তু অন্য নৌকাগুলি আবছা দেখাচ্ছে। দিগন্তের

যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল, তাও অদৃশ্য হয়ে গেল। বড় নৌকাটি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। সব নৌকাগুলি কাছাকাছি আসতে ক্যাপ্টেনের জোরাল গলা শোনা গেল, ডিঙ্গির লোকেরা—'

'এই যে।'

'কাছে এসো।'

দাঁড় টানা বন্ধ করে বড় নৌকা অপেক্ষা করল মাঝারি নৌকার জন্য। নৌকাটা মজবুত কিন্তু এই মুহূর্তে বহন ক্ষমতা থেকেও বেশি যাত্রিতে ঠাসা। প্যাডি বাটনের উপর ক্যাপ্টেনেব এক সময় যে ক্রোধের প্রকাশ হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি করবার সময় এটা নয়; তাই ডিঙ্গি কাছে আসতে ক্যাপ্টেন বলল, 'কিন্তু লেফ্ট্রেঞ্জ, আমাদের নৌকায় চলে আসুন। একজনের জায়গা হয়ে যাবে, মিসেস স্ট্যানার্ড মাঝারি নৌকাতে আছে। ওই নৌকাটাতে অনেক লোক চেপে গেছে। ওকে বরং ডিঙ্গিতে উঠতে দিন। বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে পারবে। আসুন, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। নিঃশ্বাস বন্ধ করবার মত ঘন হাওয়া এগিয়ে আসছে। এই মাঝারি নৌকার লোকেরা, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কর।'

মাঝারি নৌকা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আরে, কোথায় গেলে, কোথায় গেলে?' ক্যাপ্টেন ফার্জ চীৎকার করতে লাগল।

'এখানে।' কুয়াশার ঘন স্তর থেকে উত্তর এল।

পরমহূর্তে বড় নৌকা আর ডিঙ্গি—পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কুয়াশা যেন গিলে ফেলল তাদের। তিনটি নৌকা থেকে ডাকাডাকি চলতে লাগল। কিন্তু আস্তে আস্তে তিনটি নৌকা থেকে উচ্চারিত শব্দগুলি কুয়াশা আর সমুদ্রে হারিয়ে গেল! বাটন দ্রুত বৈঠা চালাতে লাগল বড নৌকাটিকে ধরবার জন্য।

আর তখুনি বাটন শুনতে পেল ডিকের অনুচ্চারিত কণ্ঠস্বর, 'প্যাডি আমরা কোথায়?'

'কোথায় আর, কুয়াশার মধ্যে। ঘাবড়ে যেওনি।'

'আমি ভয় পাইনি। কিন্তু কাঁপছে।'

বৈঠা থামিয়ে নিজের কোট খুলতে খুলতে বাটন বলল, 'ওকে ওটা দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে দাও। আর তারপর আমরা তিনজন চেঁচিয়ে এক সঙ্গে ডাকব ওদের।'

কোট খুলে এগিয়ে দিতে ডিকেব অদৃশ্য হাত ওটা ধরল। আর তখুনি সমুদ্র আর আকাশ কাঁপিয়ে একটা বিস্ফোরণেব শব্দ শোনা গেল।

'গেল—জাহাজটা গেল।' বাটন বলে উঠল, 'আমার বেহালাটা গেল ওর সঙ্গে। বাচ্চারা, ঘেবড়ে যেওনি। এবার এসো, সবাই মিলে চ্যাঁচাই।'

'কে আছ?' প্যাট প্রথমে চেঁচালো।

'কে, আছ—কে আছ।' ডিক আর এমেলিন ওর সঙ্গে গলা মেলায়।

খুব অস্পষ্ট একটা উত্তর ভেসে এল। কিন্তু ওটা যে কোথা থেকে এল বলা মুস্কিল। কয়েকবার বৈঠা চালিয়ে বুড়ো বাটন থেমে গেল। বৈঠার টানের সঙ্গে জলের শব্দ মিলিয়ে যেতে একটা নিস্তব্ধতা ওদের ঘিরে ফেলল। আকাশের আলো আসছিল যেন ঘষা কাঁচের গবাক্ষের ভিতর দিয়ে। যদিও আলোর রেশ ছিল খুবই কম, তবু ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে ছোট নৌকার উপর এসে পড়ছিল ঘন কুয়াশার আস্তর ভেদ করে।

সমুদ্রের এই ভীষণ কুয়াশা কখনো একইভাবে জমাট বেঁধে থাকে না। এর ঘনত্ব বদলায়। কখনো এর রূপ হয় মৌচাকের মত। অসংখ্য রাস্তা থাকে তাতে। কখনো পরিস্কার বাতাসের গর্ত থাকে গুহার মত। আর জমাট বাষ্পের আকারে পাহাড়ের চূড়োর মত হয়ে থাকে। বারে বারে এই রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে যাদুকরের হাতের স্পর্শে মায়ালোকের মত। মায়াবিনীর মত সূর্য ডোবার সাথে ক্রম-অগ্রসরমান অন্ধকারের সাথে কুয়াশা বাড়তেই থাকে।

সেই সূর্য যদি আকাশে থেকেই থাকে, তারও দিগন্ত ছেড়ে যাবার সময় হয়েছে। তিনজন আবার চীৎকার করে ডাকতে থাকে। উত্তর শোনবার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু কোন সাড়া আসে না।

বৈঠা চালাতে চালাতে বাটন বলে, 'ষাড়ের মত চ্যাঁচালেও কালাদের কানে যাবেনি।'

'মিঃ বাটন!' এমেলিনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

'বল সোনামনি।'

'আমার ভ-ভয় করছে।'

'একটু অপেক্ষা কর। দেখি শালটা কোথায় রেখেছি। এই যে পেয়েছি—এটা দিয়ে তোমায় জড়িয়ে দেব।'

'শাল চাইনা।' এমেলিন বলল, 'তোমার কোটের ভিতর ভয় একটু কম লাগছে।'

খসখসে, ভারী, তামাকের গন্ধ লাগা কোট এমেলিনকে সাহস জুগিয়েছিল।

'তা'লে ওইটে ভাল কইরে জইড়ে বসে থাক। ডিকি, তুমার শীত করছে?'

'বাবা যে বড় কোটটা ফেলে গেছেন, ওটার মধ্যে ঢুকে আছি আমি।'

'তা'লে শালটা মোর গায়ে জড়াই। বড় ঠাণ্ডা। খোকা খুকুরা, তুমাদের খিদে পেইছে?'

'না।' ডিক বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুম পেলে নৌকার খোলের মদ্দি চলে যাও। শালটা দিয়ে একটা বালিস করে নাও। বৈঠা চালালে গরম হয়ে যাব আমি।'

ঘুম ঘুম গলায় এমেলিন বলল, 'আমি ঠিক আছি।'

বহুকাল আগে, বাটনের বাল্যকালের অস্পষ্ট ভাবে একটা ঘুম পাড়ানি গান মনে এল। আবছা ভাবে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দোলনা। বাটন বলল, 'চোখ বন্ধ করে থাক। নইলে বিলি উইন্‌কার পরী তুমাদের চোখে ধুলা ছিটাবে।'

তারপর নিজস্ব ভঙ্গিতে সে ঘুমপাড়ানি গান ধরল ঃ

ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে
আয়রে ঘুম আয়—
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে—
গোল করোনা,
মোর খোকা-খুকুরা ঘুমায়—

'ঘুমিয়েছে।' হাত ঢিলে করে বাটন এমেলিনকে শুইয়ে দিল ডিকের পাশে। তারপর কাঁকড়ার মত সামনের দিকে এগিয়ে গেল। পকেট হাঁতড়ে তামাক, পাইপ আর চকমকির খোঁজ করল। নাঃ, ওগুলিতো কোটের পকেটে। খুঁজতে গেলে এমেলিন জেগে যেতে পারে।

রাত্রির অন্ধকার কুয়াশার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে দৃষ্টি পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। বৈঠা আটকে রাখবার জন্য বৈঠার গোঁজ কাঠি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেনা বাটন। সমুদ্রের স্রোতের সঙ্গে নৌকা ভেসে চলেছে। কুয়াশা আর কুয়াশার বিচিত্র আকৃতি তাকে ঘিরে ধরে।

ডানবেগ উপসাগরে, আচিল উপকূলের অদূরে এই অবস্থায় মৎসকন্যারা খেলা করে বেড়ায়। খেলা, হাসি, পরস্পরকে ডাকাডাকি করে কুয়াশার মাঝে জেলেদের ভুল পথে নিয়ে যায়। এই মৎসকন্যাদের সবুজ চুল, সবুজ দাঁত, কোমর থেকে মাছের মত লেজ। হাতের বদলে মাছের মত পাখনা থাকে। সব মৎসকন্যাই শয়তানি করে না। রুই মাছের মত তারা নাবিকদের খেলা করে বেড়ায়। কিন্তু একটা ছোট্ট নৌকায় অথৈ সমুদ্রে একা একজনকে এইসব দৃশ্য চুল পাক ধরিয়ে দিতে পারে।

একবার বাটনের মনে হল বাচ্চাটিকে জাগিয়ে দেয়। এই ভয়ংকর পরিবেশে সে অন্তত একা থাকবে না। কিন্তু পরক্ষণেই তার লজ্জা হল। বৈঠা তুলে নিয়ে বাইতে শুরু করল। বৈঠার জল কাটার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ নৈশব্দ দূর করল। পরিশ্রমে ভয়ও দূর করল কিছুটা। ঘুমন্ত শিশু দুটির কথা ভুলে গিয়ে এক এক সময় সে চীৎকার করে ডাক দিচ্ছিল অন্য নৌকাগুলির উদ্দেশ্যে। কান খাড়া করে উত্তরের অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু নাঃ, কোন সাড়া আসে না।

তারপর সে নৌকা বাইতে লাগল। লম্বা লম্বা টানে দাঁড় টানতে লাগল নিরলসভাবে। আর প্রত্যেকবার বৈঠার টানে টানে সে অন্য নৌকাগুলি থেকে সরে

যেতে লাগল—দূরে, বহুদূরে।

'আরে, অনেকক্ষণ ঘুম মেরেছি আমি?'

হঠাৎ জেগে উঠে চমকে যায় বাটন। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য বৈঠা বাওয়া বন্ধ করেছিল সে। কিন্তু তারপরেই ঘুম এসে আচ্ছন্ন করে তাকে। কত ঘন্টা ঘুমিয়েছে কে জানে! উষ্ণ মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। আকাশে চকচক করছে চাঁদ। কুয়াশার অস্তিত্ব নেই।

'আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম?' বিড় বিড় করে বাটন। 'আমি কোথায়? হে ঠাকুর, এই তো আমি। স্বপ্ন দেখছিলাম—জাহাজের খোলে ঘুম মারছি আর জাহাজটা ফেটে গেল বারুদে।'

'মিঃ বাটন!' এমেলিনের ক্ষীণ কণ্ঠ।

'কি সোনামনি।'

'আমরা এখন কোথায়?'

'মোরা সমুদ্দুরে ভাসতেছি।'

'কাকু কোথায়?'

'বড় নৌকাটায়। মোদের কাছে জলদি আসবে।'

'জল খাব।'

পিপে থেকে জল দেয় বাটন। তারপর এমেলিনের গায়ে জড়ান কোটের পকেট থেকে পাইপ আর তামাক বের করে নেয়।

ঘুমন্ত ডিকের পাশে আবার শুয়ে এমেলিন তক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়ে। বাটন দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গে। দিগন্তের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখে। চন্দ্রালোকে প্লাবিত সমুদ্রের কোথাও কোন নৌকা বা জাহাজের পালের কোন চিহ্ন নেই। অবশ্য খোলা নৌকা থেকে চাঁদের আলোয় ভরা সমুদ্রে দিগন্ত খুঁজে পাওয়াও মুস্কিল। সকাল হলে যদি সম্ভব হয়। কিন্তু সমুদ্রের রহস্যময় স্রোতগুলি এমনই যে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই একটা নৌকা থেকে আর একটা নৌকা বহুদূরে চলে যেতে পারে। সমুদ্র হল অনেক নদীর সম্মেলন। কোন নদী ধীরে বয়, কোনটা দ্রুত। কোন নৌকা যদি ঘন্টায় এক মাইল যায় তো অন্য নৌকা দু'মাইল বেগে চলে।

সামান্য উষ্ণ বাতাস চাঁদের আলো আর নক্ষত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে জলের উপর বয়ে যাচ্ছিল। সমুদ্র যেন হ্রদের মত স্থির। এখান থেকে সব থেকে কাছের মূল ভূখণ্ড হয়তো হাজার মাইল দূরে।

নক্ষত্রের চাঁদোয়ার নিচে পাইপ টানতে টানতে অনেক কথাই মনে পড়ছিল বাটনের। পৃথিবীর গোল আকৃতির মত তার ভাবনাগুলিও গোলাকার ভাবে

আবর্তিত হচ্ছিল। 'ক্যালো' জাহাজের আলো ঝলমল পানশালা, তেলঢালা জলের মাঝে এক বন্দর আর সাম্পানগুলি ছুটেছে যেন কাঁচ পোকার মতন—ম্যাকাওর আলোকমালা—লণ্ডনের ডক। এক জাহাজের ঘুমাবার গর্ত থেকে অন্য জাহাজের খোলে রাত কাটান। পঁয়তাল্লিশ বছরের সমুদ্র ভ্রমনে কি তার মনে আছে 'জ্যাক র‍্যাফরটি' জাহাজের ঘটনা। অথবা সে লড়াই—রক্তাক্ত মুখের উপর একজন লম্ফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

বাটনের মনেই নেই কবে সে প্রথম জাহাজটায় উঠেছিল—তার নাম কি। নাম মনে নেই, শুধু মনে আছে বাল্টিক সমুদ্রে এক নিষ্ঠুর শীতল আবহাওয়া। কষ্টে, যন্ত্রণায় সে কাঁদছিল আর সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন একটা মোটা দড়ির শেষ প্রান্ত দিয়ে মেরে মেরে তাকে চুপ করাচ্ছিল।

পাইপ টেনে চলেছিল বাটন। তার মাথার উপর আকাশ প্রদীপ জ্বলছে। আরও মনে পড়ছে তার মদ্যপ অবস্থার দৃশ্য। পাম গাছের ছায়ায় কোন বন্দর। যে সমস্ত মানুষ আর মেয়ে মানুষদের সে দেখেছে যারা পৃথিবী আর সমুদ্রে পতিত— পতিতা। তারপর এক সময় তার কাঁধ ঝুলে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, চাঁদ আকাশে নেই। পূব আকাশে পতঙ্গের মত একটুকরো আলো নিভে গেল। তারপর হঠাৎই যেন ধাক্কা মেরে পূবদিগন্ত জেগে উঠল পেন্সিলে টানা একটা আগুনের দাগ। পূবের আকাশ গোলাপের পাঁপড়ির মত আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠল। আগুনের দাগ যেন সংবদ্ধ হতে থাকে আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠা একটা ফোঁটার মত। উদীয়মান সূর্যের দ্যুতি।

আলো বেড়ে ওঠার সঙ্গে আকাশের নীল আশ্চর্য অদেখা নীলিমায় ধরা দেয়। সেই নীলে সোনার সূর্যের বসতি। তারপর সমস্ত সমুদ্রের জলে অ্যাপোলোর বাঁশীর মত ঝলকাতে থাকে। হৃদয়ে সংগীতের ধ্বনি তোলা আলো। দিন শুরু।

'বাপি।' সূর্যের আলো লেগে ঘুম ভাঙ্গলে ডিক চোখ রগড়াতে থাকে। 'আমরা কোথায়?'

'সব ঠিক আছে ডিকি, মেরে বেটা।' চেঁচিয়ে বলল বাটন। সে তখন নৌকার উপর দাঁড়িয়েছিল। তার দু'চোখ বৃথাই অনুসন্ধান করছিল অন্য নৌকাগুলির। 'তোমার বাপ অন্য জাহাজ নিয়ে এখুনি এসে পড়বে। এমেলিন জেগে গেছ?'

বাটনের কোটের ভিতর থেকে মাথা নাড়ল এমেলিন। কোন কথা বলল না। এমন কি ডিকের মত সে তার কাকুর কথাও জিজ্ঞেস করল না। সে কি বুঝে গেছে যে ডিককে দেওয়া উত্তরের মতই তাকেও এড়িয়ে যাবার মত জবাব দেবে বাটন? এমেলিনের মাথায় ডিকের একটা পুরানো টুপি যা তাড়াহুড়ার সময় মিসেস ষ্ট্যানার্ড তার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল। টুপিটা মাথার একপাশে হেলান। সূর্যালোকিত উজ্জ্বল

সকালে তার ছোট্ট শরীরটিকে বড় অদ্ভুত অথচ মনোরম দেখাচ্ছিল। নোনামাথা বাটনের কোট জড়ানো এমেলিন ডিকের পাশে বসে আছে। আর তার সোনা হলুদ চুল বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে।

'কি মজা!' ডিক চেঁচিয়ে উঠল। নীল জলে একটুকরো কাঠ দিয়ে জলে থাবড়া মারছিল সে। 'প্যাডি, আমি মাঝি হব। তাই না? আমাকে নৌকাটা চালাতে দাওনা একটু। শিখিয়ে দাওনা প্যাডি, কিভাবে বৈঠা চালাতে হয়।'

খপ করে ওকে ধরে ফেলে বাটন বলল, 'স্থির হয়ে বোসো বাবু। গামছা-টামছা তো নেই—দেখি লোনা জলে তোমার মুখ ধুয়ে দি। তারপর রদ্দুরে জল শুখাবে।'

একটা পাত্রে সমুদ্রের জল ভরে তোলে সে।

'না, আমি মুখ ধোবোনা।' ডিক চেঁচিয়ে ওঠে।

আক্ষেপের সুরে বাটন বলল, 'এই টিনের জলে মুখ ডুবাও। এই নোংরা মুখ নিয়ে কোথাও যেতে আছে?'

'তোমার মুখ ডুবাও।' ডিকও হুকুম ছাড়ে।

বাটন টিনের জলে মুখ ডুবায়। জলে বু-ভু-বু করে শব্দ তোলে। পরিস্কার মুখ তুলে তাকায়। তারপর টিনের জল ফেলে দেয়।

'জল ফেলে দিলে যে?'

'সমুদ্দুরে আরও কত জল আছে না?'

'ব্যস, আর জল নেই। সব শেষ। মুখ ধোবার মত জল শেষ। কালকের আগে মাছেরা তোমাকে জল তুলতেই দেবে না আর।'

'কিন্তু আমাকে মুখ ধুতেই হবে। ঠিক তোমার মত মুখ ধোব আমি। এমলিন ও ধোবে।'

'ধোব।' এমেলিন বিড় বিড় করে বলে।

'তা'লে আমি হাঙ্গরদের ডাকি।' বোটের একপাশে ঝুঁকে জলের কাছে মুখ নিয়ে যায় বাটন। 'আছ নাকি তোমরা?' এমন ভঙ্গি করে যেন হাঙ্গরদের উত্তর শোনবার জন্য কান পেতে আছে। ডিক আর এমেলিন উৎসাহী হয়ে ঝুঁকে পড়ে।

বাটন আবার হাঁক দেয়, 'কোথায় গেলে তোমরা? ঘুমচ্ছো নাকি? আ, এইতো এসে গেছ। এখানে একটা ছেলে আছে যার মুখ নোংরা। একটিন জল নেব? নিলাম। ধন্যবাদ! আচ্ছা, এবার তা'লে চলে যাও। নমস্কার।'

'হাঙ্গর কি বলল?' এমেলিন জিজ্ঞেস করে।

'বলল—এক পিপেই নাও-না। তারপর ডানায় মুখ গুঁজে ঘুমাতে গেল আবার। আমি ওর নাক ডাকা পর্যন্ত শুনেছি।'

ডাঙ্গায় অনেক সভ্য-ভব্যতা থাকে। অনেক ব্যক্তিগত গোপনীয়তাও থাকে।

কিন্তু, জলে, এরকম একটা ছোট্ট নৌকায় লাজলজ্জা, গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর বাটন ছিল সিধেসোদা মানুষ। একটা জলহস্তীর থেকে তার সভ্যতা-ভব্যতা বেশি নয়। শিশু দুটিকে সে বাচ্চাদের তত্ত্বাবধায়িকার মতই দেখছে। অথবা জলহস্তীরা যেমন তাদের বাচ্চাদের লালন পালন করে তেমনি। আর ডিক ও এমেলিন, বাটনকে তাদের বন্ধুর মতই দেখে।

নৌকাতে বিস্কুটের একটা বড় বস্তা ছিল। আর ছিল সার্ডিন মাছের মুখ-বন্ধ টিন। একটা ছুরি ছিল বাটনের। টিনের মুখ খুলে সে সার্ডিন মাছগুলি বিস্কুটের সঙ্গে পাটাতনে রাখল। এমেলিনের কাছে ছিল কমলালেবু। এই সব আর পানীয় জল সহযোগে খাওয়াটা ভালই জমল। যেন তিনজনে মিলে একটা উৎসব করছে।

খাওয়া শেষ হলে ভোজ্যাবশিষ্ট অনেক দূরে সাবধানে ফেলে দেওয়া হল। তারপর মাস্তুলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় বাটন। মাস্তুলে হাত রেখে সে বিশাল বোবা সমুদ্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের জলের রং নীল। কিন্তু এই নীল রং তিন রকমের দেখায়। সকালের নীল রং বড় মধুর, অস্পষ্ট উজ্জ্বল, যেন এখুনি জন্ম নিল। এ যেন স্বর্গের নীলিমা। যৌবন দৃপ্ত।

ডিক জিজ্ঞেস করল, 'কি দেখছ প্যাডি?'

'সিগাল।'

ডিককে জবাব দিয়ে বাটন নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলে, 'একটাও দেখা যাচ্ছেনা। না ওদের ডাক শোনা যাচ্ছে। ঠাকুর, ঠাকুর—কোন দিকে আমি যাব? পূব, পশ্চিম, উত্তর, দখিন? সব সে তালগোল পাকিয়ে একটা দিক হয়ে গ্যাছে। আমি যদি পূবে নৌকা বাই তা'লে উয়ারা পচ্ছিমে চলে যাবে। দক্ষিণে বাইলে উত্তরে। পাচ্ছিমেতো যাওয়া যাবে না, মোরে হাওয়ার গতি বুঝে নৌকা চালাতে হবে। পূব দিকেই যাই—দেখি যদি কোন সুরাহা হয়।'

নৌকায় পাল খাটিয়ে নেয় বাটন। তারপর হাল ধরে বসে রাজকীয় ভঙ্গিতে, মুখে জ্বলন্ত পাইপ। বাতাসের ছোঁয়ায় নৌকা এগিয়ে চলে।

বাটনের মানসিক গঠনে এবং পেশাতেও ছিল শুধু যাত্রা আর এগিয়ে যাওয়া। এই এগিয়ে যাওয়া যদি অনাহারে অথবা তৃষ্ণায় মৃত্যু হয় তবুও। ভবিষ্যত নিয়ে কখনো তার কোন দুশ্চিন্তা হয়নি। বর্তমান তার উপজীব্য। দুটি শিশুকে নিয়ে সে চলেছে যেন গ্রীষ্মকালীন প্রমোদ ভ্রমণ করছে। বর্তমান পাল্টে যাবে না কোন জাদু বলে অথবা দোহাই পেড়ে।

নৌকাটিতে যেন আনন্দের স্রোত বইছে। বাটন এবং শিশুদের অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। খাবারের সময় বাটন শিশুদের বুঝিয়ে দিয়েছে

যে ডিকের বাবা অথবা এমেলিনের কাকু এক্ষুনি এসে পড়বে বলে মনে হয় না। ওরা সবাই নিশ্চয় কোন জাহাজে চড়ে বসেছে। ওদের নিয়ে যাবার জন্য আসছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের জল যেন বরফের মত জমে আছে। এই যে নৌকাটা তর তর করে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ ভেসে আসা সামুদ্রিক ঝড়ে কোন দ্বীপপুঞ্জে আছড়ে পড়তে পারে। মহাসাগরের এই ঘুম আপাত দৃষ্টিতে বোঝা যায় না।

এমেলিন তার ন্যাকড়ার পুতুলের পরিচর্যায় ব্যস্ত। পুতুলটি বিচিত্র। দেহগত ও শিল্পগত ভাবে এর জুরি নেই। মুখটা কালি লেপা কোন আকার বিহীন। একটা হাতও নেই। পুতুলটা যেন একটা অপ্রাকৃত বস্তু। তবু একে বদলে এমেলিন কখনোই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুতুল নিতে রাজী নয়।

ডিক জলের উপর ঝুঁকে আছে মাছ দেখবার আশায়।

অনেকক্ষণ ধরে নীরবে বাটনেব দিকে তাকিয়ে থেকে এমেলিন বলল, 'মিঃ বাটন, তুমি কেন তামাক খাও?'

জবাবে বাটন বলে, 'মোর কষ্টগুলানকে জব্দ করবার জন্য।'

পিছনে ঠেস দিয়ে বসে বাটন পালের ফুলে ওঠা অংশের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই তার প্রকৃতিগত কাজ—সূর্যের তেজে নিজেকে উত্তপ্ত করে আবার বাতাসের ধৌত শরীরে মাখিয়ে পাইপ টানে আর এগিয়ে চলে। এ অবস্থায় ডাঙ্গার লোকেরা উন্মত্ত হয়ে যেত। অনেক নাবিক হয়ে যেত বোবা কিংবা কর্কশভাষী। উদ্ধারকারি জাহাজের জন্য তাকিয়ে থাকত। নিজের দুর্ভাগ্যকে দোষ দিত। ভগবানের কাছে কাকুতি মিনতি করত। কিন্তু প্যাডি বাটন ধূমপান করে চলে।

'হুপ্!' ডিক চেঁচিয়ে ওঠে, 'প্যাডি, দ্যাখো দ্যাখো।'

একটা অ্যালবিকোর উজ্জ্বল সমুদ্র থেকে লাফিয়ে উঠে ডিগবাজি 'য়ে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

'ওটা একটা অ্যালবিকোর। এর আগেও অনেক দেখেছি। ওকে তাড়া করেছে।'

'কে ওকে তাড়া করেছে প্যাডি?'

'কে আবার: গিব্‌লি-গব্‌লি—আম্‌স্ ছাড়া আর কে ওকে তাড়া করবে?'

গিব্‌লি-গব্‌লি আম্‌স্ কি—ডিক একথা জানতে চাইবার আগেই এক ঝাঁক রূপালী তীরের মত মাথা নৌকার পাশ দিয়ে জল ছিটিয়ে হিসহিস শব্দ তুলে চলে গেল।

'ওগুলি উড়ুক্কু মাছ। কি বললে? মাছ উড়তে পারে না? তুমি চোখের মাথা খেয়েছ?'

উড়ুক্কু মাছগুলিকে কি গিবলি-আমস্ তাড়া করেছে?'

'না। বিল্লি বেলুন তাড়া করেছে। আর আমাকে কিছু পুছো না। এবার আমায়

মিছে কথা বলতে হবে।'

এমেলিনের সেই ছোট্ট বাক্সটা ছিল শালে মোড়া। নৌকার বসবার জায়গার নিচে ওটাকে লুকিয়ে রেখেছিল সে। বাক্সটা ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য সে বার বার মাথা ঝুঁকাচ্ছিল।

প্রায় প্রতি ঘন্টায় বাটন তার আলসেমি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ মেলে সি-গাল খোঁজে। কিন্তু প্রতিবারই সে বিফল হয়। সমুদ্রটা যেন কোন প্রাগঐতিহাসিক আমলের। প্রাণের কোন সাড়া নেই। ডিক এক এক সময় ছটফট করে উঠলে বাটন তাকে নানাভাবে ভুলাবার চেষ্টা করে। একটা বাঁকানো পিন আর কিছু সুতো দিয়ে তাকে মাছ ধরবার সরঞ্জাম বানিয়ে দেয়। ডিক মাছ ধরতে পারলে নৌকায় পিকনিক হবে বলে দেয়। আর ডিক, বাল্যের সরলতা নিয়ে মাছ ধরতে বসে যায়।

তারপর দু'জনকে ডিল গ্রামের গল্প বলে সে। সেখানে তারে খুড়তুতো বোনের সঙ্গে এক মাসির বিয়ে হয়েছে। খুড়তুতো বোন আর তার স্বামীর অনেক কথা, বিশেষ করে তাদের ছোট্ট সুন্দর মেয়ে হান্নার কথা অনেক জমে আছে বাটনের ভিতরে। হান্নার জন্ম হয়েছিল দাঁত নিয়ে। জন্মেই হান্নার প্রথম কাজ হয়েছিল ডাক্তারকে কামড়ে দেওয়া।

'মিসেস জেমসের একটা ছোট্ট বাচ্চা হয়েছিল—একেবারে গোলাপি রংয়ের।' এমেলিন বলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, 'বাটন বলল, 'পেত্থমে সব বাচ্চাই ও'রকম ধুঁযে নেবার পর গোলাপি রং চলে যায়।'

এমেলিন বলে, 'ওর কিন্তু দাঁত ছিল না। আমি মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরে দিয়ে দেখেছি।'

মাছ ধরবার চেষ্টা চালাতে চালাতে ডিক বলে ওঠে, 'ডাক্তারতো ওকে ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিল। তারপর তাকে আবার সারের গাদায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল।'

'আমার যদি একটা বাচ্চা থাকত।' এমেলিন বলে, 'তবে ওকে কিন্তু আমি সারের গাদায় পুঁতে দিতাম না।'

ব্যাখ্যা করে ডিক বলল, 'ডাক্তারবাবু বাচ্চাটাকে পুঁতে দিয়েছিলেন। মিসেস জেমসকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি কাঁদতে লাগলেন। বাবা বলেছিলেন যে ওকে পুঁতে দেওয়া হয়েছে যাতে সে এক দেবদূত হয়ে বেরিয়ে আসে।'

'দেবদূতের ডানা আছে।' স্বপ্নালু গলায় এমেলিন বলে।

ডিক বলে চলে, 'আমি তো রাধুনীকে একথা বললাম। সে আবার গিয়ে বলল

জেনকে—বাপি বাচ্চাদের নাকি নাড়ি ভুড়ি ফেলে দিয়ে ভিতরে খড় পুরে দেয়। আমি বাপিকে বললাম—আমি ওরকম বাচ্চা বানানো দেখব। বাপি তখন রাধুনীকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে দিল।'

পুরানো কথা মনে পড়ে যায় এমেলিনের। বলল, 'রাধুনীর তিনটে বড় ট্রাঙ্ক আর মাথার টুপির জন্য একটা বাক্স ছিল।'

'তারপর ঘোড়াগাড়ির কোচম্যান রাঁধুনীকে জিজ্ঞেস করল তার আর ট্রাঙ্ক নেই গাড়িতে রাখবার মত। তোতা পাখীর খাঁচাটা ভুলে ফেলে আসেনিতো?' ডিক বলে।

একটু সরে পালের নিচে ছায়ার বসতে বসতে এমেলিন বলে, 'আমার যদি খাঁচায় পোড়া একটা তোতা থাকত।'

'তোতা পাখী, খাঁচায় পোড়া তোতা নিয়ে তুমি করবেটা কি?' বাটন জিজ্ঞেস করে।

'আমি ওকে ছেড়ে দিতাম।' এমেলিন বলল।

'তোমার ওই কথা শুনে মোর ঠাকুদ্দার কথা মনে আসতেছে। ঠাকুদ্দার একটি বুড়া শুয়ার ছিল।' বাচ্চাদের মত বাটনও খুব গম্ভীর ভাবে কথা বলল, 'শুয়ারটার খাঁচার কাছে গেলে ওটা নাক দিয়ে মোরে ঢুসা মারত। আর শুয়োরের ভাষায় বলত—'মোরে বের করে দাও, তুমারে একটা রূপার টাকা দিব।' আমি বলতাম, 'দরজার নিচ থে বেরিয়ে এস।' সে লম্বা নাকটা গলিয়ে দিত দরজার ফাঁকে আর আমি একটা কাঠি দিয়ে ছিটকিনি খুলে দিতাম। আর ওটা বেরিয়ে এসে চেঁচাতে লাগত। মোর মা মোরে লাঠি দে পিটাত খুব।'

বেলা এগারোটা নাগাদ ওরা তিনজন দুপুরের খাওয়া শেষ করল। বাটন পাল একটু নামিয়ে তাবুর মত একটা ঢাকনা তৈরি করল যাতে বাচ্চারা মাথার উপর সূর্যের তেজ থেকে রক্ষা পায়! তারপর নিজে নৌকার মাঝখানে গিয়ে ডিকের খড়ের টুপিটা মুখের উপর ঢাকনি করে শুয়ে পড়ে। যতটা সম্ভব হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিল বাটন! কিন্তু একটানা একটা ভীত-চীৎকারের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ওভাবে চীৎকার করছিল এমেলিন। দুপুরের খাওয়া আর 'গিব্‌লি-গব্‌লি-আম্‌স'এর স্মৃতি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাড়া করেছিল তাকে। বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকুনি দেবার পর তার আচ্ছন্ন ভাব কাটে। নৌকার মাস্তুল নামিয়ে নেয় বাটন।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাটনের চোখে অদ্ভুত একটা কিছু ধরা পড়ে। মাইল তিনেক দূরে জলের উপর একটা ছোট জাহাজের মাস্তুল আর পাল জেগে আছে। দেখলে মনে হয় কতকগুলি গাছের কংকাল একত্রে জড়াজড়ি করে

আছে।

কচ্ছপের মত গলা বাড়িয়ে বাটন নিঃশব্দে ওইদিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সে একটা বন্য-হুংকার দিয়ে ওঠে, 'হু-র-রু।'

ডিক জিজ্ঞেস করে, 'কি হলো প্যাডি?'

'হু-র-রু। জাহাজ। জাহাজ। ডিক পালটা দাওতো। বাতাসে আমরা জলদি পৌঁছে যাব।'

পাল টাঙ্গানো হলে হাওয়ার গতিতে নৌকা তর তর করে এগিয়ে চলতে থাকে।

উত্তেজিত গলায় ডিক জিজ্ঞেস করে, 'ওটা কি বাপি'র জাহাজ?'

'বলতে পারছি না। কাছে গেলে জানা যাবে।'

'আমরা ওই জাহাজে চড়ব?' এমেলিন জিজ্ঞেস করে।

'নিশ্চয় সোনামনি।'

নৌকা এগোতে থাকলে জাহাজটির আকার দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ওটা একটা দুই মাস্তুল জাহাজ! গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরি মাস্তুল। তখনো ছেঁড়া পালের অংশ বিশেষ ঝুলছে। বাটনের অভিজ্ঞ চোখ খুব শিগ্‌গীর আবিষ্কার করল ওটা একটা পথভ্রষ্ট জাহাজ।

'জাহাজটা থেকে লোক চলে গেছে', বিড়বিড় করে বাটন বলে, 'খালি জাহাজ, হায় কপাল!'

গলুইতে বসে ডিক-ও লক্ষ্য করছিল জাহাজটাকে। সে চেঁচিয়ে বলল, 'জাহাজে কোন লোক নেই। বাপি এখানে নেই।'

বাটন জাহাজটাকে ভাল করে দেখবার জন্য আরও এগিয়ে যায়। কুড়ি কেবল'এর মত দূরত্বে এসে মাস্তুল খুলে নিয়ে বৈঠা হাতে নেয়।

দুই মাস্তুল জাহাজটার উপরের অল্প অংশই জলে ভাসছিল। জাহাজের দড়ি-দড়া যন্ত্রপাতি সবই আগোছাল অবস্থায়। টুকরো টুকরো ক্যানভাস ডেকে লুটাচ্ছিল। ঝোলানো তারে একটা নৌকাও ছিল না। সব মিলিয়ে এক করুণ ছবি। বোঝা যাচ্ছিল, জাহাজটা কাঠের তৈরি। ফুটো হয়ে গিয়ে প্লাবিত হয়ে যায় এবং জাহাজের আরোহীরা এটাকে পরিত্যাগ করে।

বাটন জাহাজটির কাছে গিয়ে বৈঠা চালান বন্ধ করে। জাহাজটা এমন সুন্দর ভাবে ভেসে আছে যেন সানফ্রানসিসকো বন্দরে নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ জলে তার ছায়া পড়েছে। গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় আগাছারা জাহাজের তামার পাত বেয়ে উঠেছে। জাহাজের রং জায়গায় জায়গায় ফুলে আছে ফোস্কার মত। রং পুড়েও গেছে এমন ভাবে যেন ওর মধ্য দিয়ে ঢুকে গেছে গরম লোহার শিক। বড় একটা দড়ি ঝুলতে ঝুলতে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কয়েকবার বৈঠা চালিয়ে জাহাজের সামনের অংশে নৌকা নিয়ে যায় বাটন। অস্পষ্ট অক্ষরে জাহাজটির নাম ও যে বন্দরের জাহাজ তার নাম পড়া যাচ্ছে। 'কোনানডোআ ঃ মার্থার আঙ্গুর বাগান।'

'ওতে কি সব লেখা আছে।' বাটন বলে, 'কিন্তু আমি পড়তে পারছিনা। আমি তো মূর্খ।'

'আমি পড়তে পারি।' ডিক বলল।

'আমিও।' এমেলিন মৃদুস্বরে বলল। 'কি লেখা আছে?' বাটন জিজ্ঞাসা করল।

জাহাজটির পুরানো ধরণের পাটাতন ছিল এবং এটা জলের উপর ভাসছিল ডিঙ্গি নৌকাটার মাত্র ফুটখানেক উঁচুতে। জাহাজের গায়ে নৌকাটাকে শক্ত করে বাঁধল বাটন। তারপর এক হাতে এমেলিনকে নিয়ে উপরে উঠল। তারপর বিস্কুটের বস্তা, জলের পাত্র, টিনের খাদ্য তুলে ডিককে উপরে তুলে নিল।

'কোনানডোআর' ডেক কাঠের তৈরি, বেশ বিস্তৃত আকারের। দড়িদড়া আর খোলা অবস্থায় গুটানো পড়ে আছে। একটা ডেকহাউস-ও আছে কোয়ার্টার ডেক জুড়ে। জাহাজময় পচা কাঠ, আলকাতরা আর অজানা গন্ধ ছড়িয়ে আছে। প্রধান মাস্তুল থেকে একটা ঘন্টা ঝুলছে। একটা লোহার টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ঘন্টা বাজাতে লাগল ডিক।

ঘন্টার শব্দে বাটনের বিরক্ত ধরে যায়। চীৎকার করে সে ডিককে ঘন্টা বাজানো বন্ধ করতে বলে। তার চেঁচিয়ে বলা এই পরিত্যক্ত জাহাজে যেন কর্তৃত্বব্যঞ্জক আদেশের মত শোনায়। কে জানে এই ঘন্টধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে কোন অশরীরি সাড়া দিয়ে ফেলে? ডিক ঘন্টা বাজানো বন্ধ করে দৌড়ে ডেক-হাউসের দিকে যায়। বাটন ও এমেলিনও পিছনে পিছনে যায়। ডেক-হাউসের দরজাটা হাট করে খোলা। তিনজনই দরজার ভিতরে উঁকি দেয়।

ডেক-হাউসের তিনটে জানলা দিয়ে সূর্যের আলো যেন কান্নার মত ঝরে পড়ছে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তার পাশে একটা চেয়ার। চেয়ারটা এমনভাবে আছে যেন ওটাকে তাড়াতাড়ি ঠেলে দিয়ে কেউ উঠে গেছে। টেবিলে দুটো প্লেট, দুটো কাপ, একটা চায়ের পট। ভোজ্যাবশিষ্ট ছড়িয়ে আছে। একটা প্লেটে একটা কাটাচামচে মাংসের টুকরো। কেউ যেন খেতে যাচ্ছিল—তখনই হঠাৎ কিছু ঘটে। চায়ের পটের পাশে কনডেন্সড মিল্কের একটা খোলা টিন। চিনি ছড়িয়ে আছে এমনভাবে যেন চায়ের কাপ দেবার সময় কোন রহস্যময় কিছু হয়। এইসব প্রাণহীন পদার্থগুলি যেন কথা বলতে চাইছে।

সব কিছু যেন জাদুমন্ত্রে শূন্য হয়ে গেছে। হয়তো জাহাজের ক্যাপ্টেন চা পান শেষ করছিল। তার সহকারি খাওয়া শেষ করবার মুখে ছিল। এই সময় সম্ভবতঃ

জাহাজে কোন ছেঁদা আবিষ্কৃত হয় এবং জাহাজ পরিত্যক্ত হয়। অথবা যা কিছুই ঘটে থাকুক না কেন—অঘটন-ই ঘটেছে। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিস্কার। ছোট্ট জাহাজটা পরিত্যাগ করবার সময় আবহাওয়া ভালই ছিল। নইলে জিনিষপত্রগুলি সাজান-গুছানো থাকত না।

বাটন ও ডিক দরজা পেরিয়ে ঘরের ভিতর যায়। এমেলিন কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। পুরানো পরিত্যক্ত জাহাজটায় ডিকের মত তারও কৌতূহল কম নয়। কিন্তু ওর মনে অজানা একটা অনুভূতি জাগছে। যে জাহাজে কেউ নেই সে জাহাজে 'অন্য কিছু' থাকলেও থাকতে পারে তো! কিন্তু ভিতরে ঢুকতে যেমন, বাইরে একা থাকতেও তার ভয়। মাঝখানে বসে পড়ে সে নিজের সমস্যা মেটায়। নিজের পোঁটলাটা পাশে রেখে পকেট থেকে ন্যাকড়ার পুতুলটা বের করে। দরজায় ওটাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিয়ে বলে, 'ভয় করিসনা যেন।'

ডেক-হাউসের ভিতরে খুব বেশি জিনিষপত্র পাওয়া গেল না। ওর পিছনের অংশে আরও দুটো ছোট ছোট খুপরি। এগুলিতে কোনদিন ক্যাপ্টেন আর তার সহকারি থাকত। পুরনো জঞ্জাল থেকে যা পাওয়া গেল ঃ পুরনো জামা কাপড়, জুতো বিচিত্র ধরণের বড় একটা টপহ্যাট—উপর দিকে সরু হয়ে উঠে গেছে, একটা লেন্স নেই এমন টেলিস্কোপ, হয়েটের এক ভল্যুম বই, নাবিকদের প্রয়োজনীয় নৈসর্গিক ও স্রোত সম্পর্কে তথ্যসম্বলিত পঞ্জিকা, এক বাক্স মাছ ধরবার সরঞ্জাম, একটা করাত। তবে এককোনে যা পাওয়া গেল তার তুলনা নেই—প্রায় দশগজের মত লম্বা হবে এমন কুণ্ডলী পাকানো কালো দড়ির মত জিনিষ।

জিনিষটি দখল করে বাটন আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। এ জিনিষ বন্দরের তামাকের দোকানে টাঙানো থাকে। শুযোরের লেজ। এর এক পাইপ তামাক টানলে একটা হিপোপটেমাসও বমি করতে থাকবে। কিন্তু প্রাজ্ঞ নাবিকেরা এই জিনিষ খৈনীর মত চিবিয়ে অথবা পাইপে ভরে টেনে মহাসুখ অনুভব করে।

ডিককে বলল বাটন, 'জিনিষ গুলান বের করে ডেকে নিয়ে এস। কোনটা কাজে লাগবে কোনটা লাগবে না দেখতে হবে।'

দু'হাতে গাদা করে জিনিষপত্র বাইরে আনে বাটন। আর ডিক সেই টপহ্যাট নিয়ে আসে যেন দারুন এক লুটের মাল পেয়ে গেছে।

দরজার বাইরে বেরিয়ে ডিক চেঁচিয়ে বলে, 'এম, দ্যাখো কি পেয়েছি।'

টুপিটা মাথায় পরে নেয় ডিক। তার কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে গেছে জিনিষটা। এই দৃশ্যে এমেলিনের মুখ থেকে একটা ভয়ার্ত স্বর বেরিয়ে আসে।

এমেলিন ছিটকে রেলিং'এর পাশে চলে যায়। একটা জলের পাইপের উপর বসে বড় বড় চোখ মেলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে। ভয় পেলে সে নির্বাক

হয়ে যায়। টুপি দিয়ে মুখ ঢাকা ডিকের চেহারা ওকে বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কালো জিনিষ বড় ঘেন্না ওর। কালো বিড়াল, কালো ঘোড়া, কালো কুকুর। বোষ্টনে থাকবার সময় একবার কালো কুলগাছের তৈরি শবাধারের মোমবাতিদান দেখে এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে অজ্ঞান হয়ে যায়। আর এই টুপিটাও কালো বলেই তার এত ভয়।

ইতিমধ্যে বারে বারে দু'হাত ভরে ডেকের উপর মালগুলি জমা করছিল বাটন। সবগুলি আনা হয়ে গেলে রোদ্দুরে ভরা ডেকের উপর বসে পড়ে পাইপ ধরায় সে।

এই নবলব্ধ-ঈশ্বর-প্রদত্ত ঐশ্বর্য নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল সে, জীবনের জন্য সব থেকে প্রয়োজনীয় জল ও খাদ্য জাহাজে আছে কিনা তার সন্ধান নিতে ভুলে গেছে। অবশ্য খুঁজলে আধা-বস্তা আলু পেত রান্নাঘরে। আর ছিল ব্যবহারের অযোগ্য কিছু পানীয় জল।

টুপিটা আর পড়বে না, এমন কথা দেবার পর এমেলিন হামাগুড়ি দিয়ে ওদের কাছে এল। এবার তিনজন বসল স্তূপাকৃত জিনিষগুলির পাশে।

'দ্যাখো এক জোড়া ব্রোগ।' জুতো জোড়া শূন্যে তুলে নিলামদারের মত চোখ নিয়ে দেখতে থাকে বাটন। জুতোকে আইরিশ কথ্য ভাষায় বলে ব্রোগ। জুতো জোড়া দোলাতে দোলাতে সে বলল, 'দুনিয়ার যে কুন বন্দরে ইয়ার দাম আধা ডলার তো দিবেই। ডিক এই ব্রীচেসটা বের করে লম্বা করে টান করতো।'

ট্রাউজারটি লম্বা করে ধরলে তাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বাটন। তারপর এক পাশে রেখে দেয়।

ভাঙ্গা টেলিস্কোপটা বাদ্যযন্ত্রের মত ধরে বাটন বলল, 'এই একচোখে টেলিস্কোপটাকে জুতার পাশে রাখ। কুনোদিন কাজে আসতে পারে। এই দ্যাখো একটা বই—' ডিকের দিকে নৌ-সারণী বইটা ছুঁড়ে দিয়ে সে আবার বলে, 'এতে কি লেখা আছে বলতো!'

'পড়তে পারছি না। শুধু নম্বর লেখা।' ডিক বলে।

'জলে ফেলে দাও।'

বাটনের কথামত কাজ করবার পর ডিক আবার বসে পড়ে জিনিষগুলির পাশে। বাটন টুপিটা মাথায় দিলে বাচ্চারা হেসে ওঠে। এমেলিন এবার ভয় পায় না।

টুপিটা একপাশে রেখে জিনিষগুলি ঘাটতে থাকে বাটন। যেগুলিকে প্রয়োজনীয় মনে করল, সেগুলি রেখে বাকিগুলি জলে ফেলে দিল।

এই মূল্যবান জিনিষগুলি রেখে দেওয়া হল এরপর খাদ্য ও জল আছে কিনা খোঁজবার কথা বাটনের মনে এল। জলের পাত্র শুধু সমুদ্রের জলে ভর্তি। রান্নাঘরের

তামার পাত্রে এক খণ্ড পচাগলা মাংস পাওয়া গেল আর পাওয়া গেল অনেক নুনের চাকা। অবশ্য ডিঙ্গি থেকে যে সমস্ত খাদ্য-সম্ভার আর পানীয় জল আনা হয়েছে তাতে দশদিন স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। আর দশদিনে কত কিছুই ঘটতে পারে।

বাটন একপাশে গিয়ে ঝুঁকে ডিঙ্গিটাকে দেখল। তাদের ছোট ডিঙ্গিটাকে জাহজের পাশে মনে হচ্ছে একটা রাজহাঁসের পাশে বাচ্চা হাঁস। নৌকাটা ঠিক মত বাঁধা আছে কিনা পরীক্ষা করে সে জাহাজের প্রধান চত্তরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

ডিক হঠাৎ বলে উঠল, 'অনেক সময় গেল—বাপিতো এল না?'

ওরা তিনজন রান্নাঘরের দুপাশে রাখা কাঠের পাঁজার উপর বসেছিল। বসবার পক্ষে সুন্দর জায়গা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এখন সমুদ্র যেন গলন্ত সোনা। রহস্যময় মরিচিকার মত আকার নিয়ে জল কাঁপছে।

'তুমার বাবা আসবে। দেরি হলেও আসবে। এখন ওনার কথা ভেবোনি। ভাবলেই তিনি এসে যাবে না। ওই দ্যাখো, জলের মদ্দি সূর্য ডুবছে। চুপ করে শোন—হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পাবে।' বাটন বলল।

কল্পনাশক্তির প্রখরতা থাকলে যে কেউ অবশ্য হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পাবে। তিনজনে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। নির্বাক হয়ে ওরা দেখে বিরাট জ্বলন্ত বর্মটা জলকে আলিঙ্গন করবার জন্য লাফিয়ে পড়ছে। জল স্পর্শ করে জলের ভিতর ঢুকে যায় সূর্য, যেন কেউ সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে।

সূর্য জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেলে সোনালী রংয়ের এক ভৌতিক আলো সমুদ্রে ছড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে মুছে যাওয়া আলো অপূর্ব সৌন্দর্যের পরিবেশ তৈরি করে। সমুদ্রের রং এখন বেগুনী। পশ্চিম আঁধার করে আসে যেন আজকের মত দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া হল। আর তারপরই নক্ষত্ররা আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ডিক জিজ্ঞেস করে, 'সূর্য কোথায় চলে গেল প্যাডি?'

'উনি চাঁদকে ধরতে গেলেন। চাঁদ এখন সোন্দর জামা কাপড় পড়ে তৈরি হচ্ছে বেরুবার জন্য। চাঁদের পিছে পিছে ছোটে বটে সূর্য কিন্তু উয়াকে কুনদিন ধরতে পারলেন না।'

এমেলিন বলে, 'চাঁদকে ধরতে পারলে সূর্যকে কি করবেন?'

'মাইরি, ধরতে পারলে দেখাবে মজা।'

'কেন, মজা দেখাবে কেন?' ডিকের প্রশ্ন।

'চাঁদ মানুষদের ক্ষ্যাপা করে দিয়ে ভুইলে ভাইলে নিয়ে যায়। বেটাছেলে, মেয়েছেলে, সক্কলের মাথা খেয়ে ফেলে। যেমনটি করেছিল বাক ম্যাক্‌কানকে।'

'ম্যাক্‌কান আবার কে?'

'ম্যাক্‌কান? মোর ছেলেবেলার গেরামের সাথী।'

'কি হয়েছিল তার?'

এরপর এক ভারি মজার গল্প বলল বাটন। ম্যাক্‌কান চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকত ঘাসে শুয়ে শুয়ে। তারপর কখনো চাঁদকে ধরবার জন্য পাহাড়ের মাথায় চড়ত। এমনও দিন গেছে—ম্যাক্‌কানকে দু'তিনদিন পরে খুঁজে পাওয়া গেছে বনের ভিতর। ওকে বাড়ির লোকেরা বেঁধে রাখত। শেষে একদিন ম্যাক্‌কানের দোসর খুঁজে পাওয়া গেল।

বাটন বলতে থাকে, 'এক রাত্তিরে মোর বড় ভাই টিম বসেছিল আগুনের ধারে, এমন সময় বাক রাঙ্গা পা নিয়ে খুঁইড়ে খুঁইড়ে এল। 'টিম,' সে কইল, 'উয়ারে শ্যাষতক ধইরে ফেলেছি।' 'কারে ধইরেছ?' টিম শুধায়। 'চাঁদ।' টিম কইল। 'কোথায় ধইরলে?' টিম জিগালো। 'পুকুরের ধারে বালতির মদ্দি। দেইখবিতো আয়।' টিম উয়ার সঙ্গে গেল। আর সত্যি সত্যি বালতি ভর্তি জলের মদ্দি চাঁদ আলো দিচ্ছে।

'পুকুরের মদ্দি ছিল ও। বালতিতে করে তুল্যে এনেছি। এখুন উয়ারে জ্যান্ত ধইরতে হবে।' এই না বলে বাক আস্তে আস্তে বালতির জল ফেইলতে লাগল। কিন্তু চাঁদ পালিয়ে গেল। 'ফির ধর।' টিম কইল। বাক বালতিতে জল ভরল। বালতির জল স্থির হলে চাঁদকে উয়ার ভিতর দেখা গেল। 'ইবার খুব ধীরে ধীরে জল ফেল। নইলে চাঁদ আবার পালাবে।' মোর বড় ভাই কইল। 'এক মিনিট।' বাক বুদ্ধি দিল, 'ইবার আর উয়ারে পালাতে দিব না।' রাঙ্গা পা নিয়ে খুঁইড়ে খুঁইড়ে বাড়ি গেল। তারপর এটা ছাঁকনি নিয়ে ফিরল।

'তুই ছাঁকনিটা ধর।' বাক বইলল টিমকে, 'বালতির জল ঢালতেছি। ইবারে ছাঁকনির মদ্দি চাঁদ আটকে যাবে।' খুব সাবধানে জল ঢালল বাক। বালতি উপুর করে দেবার পর সে চ্যাঁচালো, 'পাইলেছে, চাঁদ ফির পাইলেছে।' রাগ কইরে সে বালতি আর ছাঁকনি পুকুরে ফেইলে দিল।

'লাঠিতে ভর দিয়ে বাকের বুড়ি মা এসে জিগালো, 'মোর বালতি কুথায়?'

'পুকুরে।' বাক জবাব দেয়। 'মোর ছাঁকনি?' 'বালতির সঙ্গে পুকুরে'। উয়ার বুড়ি মা উয়ারে লাঠির বাড়ি মারতে লাগল। কান্দতে লাগল বাক ভ্যা ভ্যা কইরে। শ্যাষে উহার মা উয়াকে টানতে টানতে নে গিয়ে ঘরের মদ্দি বন্দি করে রাখল। হপ্তাভর উয়ারে শুধু জল আর রুটি খাইয়ে রাখল যাতে উয়ার মাথাথে চাঁদ বিদায় হয়। কিন্তু বেরথা চেষ্টা। পরের মাসে চাঁদ ফির যে কে সেই—ওই যে, দ্যাখো চাঁদ উঠতেছে।'

রূপোলী চাঁদ তার সৌন্দর্য নিয়ে জল ঠেলে উঠছে। পরিপূর্ণ চাঁদ দিনের মত উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। রান্নাঘরের কাঠের দেয়ালে ডিক, এমেলিন আর বাটনের অদ্ভুত ছায়া যেন কালো নক্সা সৃষ্টি করে।

মাথার টুপি নাড়তে নাড়তে ডিক চেঁচিয়ে উঠে, 'দ্যাখো, আমাদের ছায়াগুলিকে দেখ।'

এমেলিন তার ন্যাকড়ার পুতুল তুলে ধরে তাকে ছায়া দেখাবার জন্য। বাটন পাইপ উঁচিয়ে ধরে। তারপর পাইপ মুখে ঝুলিয়ে বাটন বলল, 'চল বাছারা, এবার ঘুমোতে চল।'

'আমার ঘুম পায়নি প্যাডি।' ডিক বলে, 'আমি এখুনি ঘুমাব না। আরেকটু থাকনা।'

'ঠিক আছে। মোর পাইপ শ্যাষ হবার পর আর এক মিনিটও নয় কিন্তু।'

'আবার তামাক ভরে নাও না।'

বাটন জবাব না দিয়ে পাইপ টানতে থাকে।

'মিঃ বাটন।' এমেলিন ডাকল। শুয়োরের লেজের কটুগন্ধ সত্ত্বেও তার নাক অন্য কিছুর গন্ধ পাচ্ছে।'

'কি সোনামনি।'

'আমি একটা গন্ধ পাচ্ছি।'

'কিসের গন্ধ?'

'খুব সুন্দর আর মিষ্টি গন্ধ।'

'কি রকম গন্ধ?' নাক উঁচু করে বাতাসে গন্ধ খুঁজতে খুঁজতে ডিক বলে, 'কই আমি কেন পাচ্ছিনা।' ভাল করে বাতাসে আবার ঘ্রাণ নিয়ে এমেলিন বলল, 'ফুলের গন্ধ।'

দুপুর থেকে বাতাসের গতিপথ অনেকবারই পরিবর্তিত হয়েছে। এখানকার বাতাসে খুব মৃদু, হাল্কা সুগন্ধ বহু দূর থেকে ভেসে আসছিল। কিন্তু, তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি সম্পন্ন না হলে এই গন্ধ পাবার কথা নয়।

'ফুলের গন্ধ!' জুতোর হিলে পাইপের পোড়া তামাক ঝাড়তে ঝাড়তে বাটন বলে, 'সমুদ্দুরের মদ্দিখানে ফুলের গন্ধ? তুমি স্বপ্ন দেখতিছ! চল চল। দু'জনাই ঘুমাতে চল।' কাঠের স্তুপের ভিতর থেকে দু'জনকে নামিয়ে নেয় সে।

দু'জনকে দু'হাতে ধরে বাটন এগোতে থাকে। ঘন্টার পাশ দিয়ে যাবার সময় ডিক লাঠিটা তুলে ঘন্টার আঘাত করে। ভীষণ জোরে ঘন্টা বেজে ওঠে। ঘুমাতে যাবার আগে ডিকের শেষ দুষ্টুমি।

ডেক হাউসের মেঝেতে তিনজনের জন্যই শয্যা পাতে বাটন। পরিত্যক্ত সতরঞ্চি তখনো জাহাজে ছিল। তাই বিছিয়ে ওদেরও নিজের শোবার ব্যবস্থা করে।

বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে বাটন আবার ডেকে এসে রেলিং ধরে সমুদ্রের দিবে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকে। এমেলিনের নাকে ভেসে আসা গন্ধটার কথা তার

ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে। এই গন্ধ একটা বার্তা। তারপর রেলিং-এ পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায় সে। চন্দ্রালোকিত ডেকের পাটাতনের তক্তাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। শূন্য ডেক আর দড়িদড়ার ভৌতিক ছায়াগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রান্নাঘরের হাট করে খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তেই সে চমকে ওঠে। ওই দরজা দিয়ে যদি কোন অশরীরী ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসে? ভয়ে আতংকে সে হিম হয়ে যায়।

দ্রুত সে ডেক-হাউসের ভিতর ঢুকে বাচ্চাদের পাশে শুয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে প্রগাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সারারাত ধরে ধরে ছোট্ট জাহাজটি প্রশান্ত মহাসাগরের মৃদু ঢেউ-এর দোলানিতে দুলতে থাকে। আর বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসতে থাকে ফুলের গন্ধ।

দ্বিতীয় খণ্ড

'খোকাখুকুরা—' বাটন চিৎকার করে ওঠে, 'একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।'

সকালের পরিপূর্ণ রোদ্দুরে ডেকে দাঁড়িয়েছিল ওরা তিনজন। অনেক দূরে অস্পষ্ট সবুজের একটুরো ছায়া দিগন্তের এক সঙ্গে দৃশ্যমান। ডিক ও এমেলিন যখন গভীর আগ্রহ নিয়ে অজানা দ্বীপটাকে দেখবার জন্য চেষ্টা করে তখন জাহাজ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় বাটন। ওদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে নিয়ে একটা বিস্কুট চিবুতে চিবুতে সে ডেকময় ঘুরে ঘুরে জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে থাকে আর ডিঙিতে তুলতে থাকে। অনেক জিনিষের মধ্যে জাহাজে আরও পাওয়া গিয়েছিল বেশ কিছু সূচ সুতো আর আধবস্তা আলু।

সূর্যের আলো আরও উজ্জ্বল হলে দ্বীপের গাছগাছালি দেখা যায়। এ যেন স্বর্গীয় নীলিমায় এক তৃণ শ্যামল উদ্যান।

বাটন বলে, 'মোরা ওখানে যাব। দুপুরের আগেই পৌঁছে যাব।'

দ্বীপ থেকে বাতাস ছুটে আসছে ক্রান্তিয় উদ্ভিদের সমস্ত রকমের মিলিত সুগন্ধ নিয়ে। নাকের পাটা বড় করে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এমেলিন বলল, 'কাল রাতে এই গন্ধই আমি পেয়েছিলাম। এখন খুব তীব্র গন্ধ পাচ্ছি।'

আরও কিছুক্ষণ পরে দ্বীপের পরিপূর্ণ আকৃতি ওদের চোখে পড়ে। ছোট পাহাড়, সবুজ গাছ, কোথাও হাল্কা কোথাও ঘন ছায়া। দ্বীপের চারপাশে বেষ্টন করে আছে যেন শ্বেত পাথর। আসলে ডুবো পাহাড়ের সংঘাতে সমুদ্রের ফেনা ওগুলি। নারকেল গাছের বড় বড় পাতা নজরে আসে। ডিক ও এমেলিনকে নৌকায় বসিয়ে বাটন এবার 'কোনানডোয়া' ছেড়ে সামুদ্রিক স্রোত অবলম্বন করে ভেসে পড়ে।

ডিকের কৌতূহলী মনে অবিশ্রান্ত প্রশ্ন ওঠে। ঠিক একটা প্রশ্নেরও জবাব না

দিয়ে বাটন নিজের ভাবনায় ডুবে যায়। দ্বীপে কি লোক আছে? লোক থাকলে তারা কি ভাবে গ্রহণ করবে ওদের?

দক্ষিণ সমুদ্রে সে অনেক বছর কাটিয়েছে। সামোয়া, মার্কুসাস দ্বীপের লোকজনেরা ভালই। কিন্তু এখানে?

পাইপ ধরিয়ে বাটন শক্ত হাতে হাল ধরে বসে থাকে। আরেকটা চিন্তা তার মাথায় ঘুরছে। ডুবো পাহাড়ের উপর দিয়ে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছে। অজস্র ফেনায় সে জায়গা ভরে আছে। তার মাঝখান দিয়ে দ্বীপে যাবার পথ। এই জায়গাটুকু নির্বিঘ্নে পার হতে পারবে তো? যতই সে এগিয়ে যাচ্ছে বাতাসে ভেসে আসছে পাহাড়ের আঘাত লেগে ঢেউ ভাঙ্গার তীব্র সঙ্গীত। এটুকু পার হয়ে গেলে জনহীন সৈকত। সেখানে সমুদ্রের ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে উঠছে। সী-গালেরা ডানা মেলে উড়ছে আর তীক্ষ্ণ কর্কশ চীৎকার করছে। এটুকু পার হতে পারলে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে শান্ত নীল জল। বাটন পাল খুলে নিয়ে বৈঠা হাতে বসে।

উত্তেজনায় ডিক চীৎকার করতে থাকে। সীগালগুলি নৌকার চারপাশে এসে কর্কশভাবে ডাকতে ডাকতে উড়ছে। নৌকা আঘাত খাচ্ছে, দুলে উঠছে। এমেলিন চোখ বন্ধ করে বসে থাকে।

সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গা গর্জন হঠাৎ কম হয়ে গেলে এমেলিন চোখ মেলে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য দেশ।

নৌকার দুপাশে শান্ত নীল জলের মৃদু ঢেউ। জল এত পরিস্কার যে অনেক নিচে প্রবালের সারি দেখা যাচ্ছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মাছ। নিচের বালুকারাশিতে মাছের ছায়া পড়ছে স্পষ্ট।

বাটন বৈঠা থামিয়ে তাকিয়ে থাকে এক ঝাঁক নীল পাখীর দিকে। নিঃশব্দে ওরা উড়ে দ্বীপের কোন উঁচু অংশের দিকে চলে যায়। সৈকতে নারকেল গাছগুলি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে লেগুনের জলের উপর ঝুঁকে নিজেদের ছায়া দেখছে যেন। এদের সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে কাঁঠাল, কোকো-পাম, রুটি ফলের গাছ। গাছগুলির সঙ্গে লতিয়ে আছে বুনো আঙ্গুর লতা। সমুদ্রের আলোর চোখ ঝলসানো প্রখরতা এই দ্বীপে নেই। এক নরম আলো ছড়িয়ে আছে রঙ্গীন গাছ-গাছালিতে, উড়ন্ত পাখীতে, সাদা প্রবাল স্তূপে, নীল লেগুনে। সব মিলিয়ে হৃদয়-স্তব্ধিত সৌন্দর্য—যা উদ্ধত, সুখী আর অনন্ত যৌবনের দ্যোতক। এর মাঝে, বাটন যখন ছোট্ট নৌকাটা বেয়ে আসছিল পারের দিকে, ওদের একটু পেছনে জল থেকে ভেসে উঠেছিল ত্রিকোন এক ছায়া। জলে বুড়বুড়ি কেটে শয়তান ছায়াটা আবার মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওরা তিনজনের কেউই ব্যাপারটা দেখতে পায়নি।

সৈকতে আসতে দেরি হলনা বাটনের। হাঁটু জলে নেমে পড়ে সে ডিঙ্গিটাকে টেনে বালুকাবেলায় তুলে ফেলল। তারপর এমেলিনকে কোলে নিয়ে ডাঙ্গায় নামাল। নিজেই জল ভেঙ্গে পারে উঠে পড়ে ডিক। চারিদিকের দৃশ্যে মোহিত হয়ে সে ছুটাছুটি শুরু করে আনন্দে। বাটন নৌকাটাকে ঠেলে আরও শুকনো জায়গায় তুলে দেয়। এমেলিন তার জিনিষপত্র নিয়ে বালুতে বসে বাটনের কাজ দেখে আর চারিদিকের অদেখা অচেনা দৃশ্য দেখে অবাক বিস্ময়মাখা একজোড়া চোখ নিয়ে। প্যাডি বাটন অবশ্য বাচ্চাদের ভয় দেখানো থেকে বিরত থেকেছে! কিন্তু এই মুহূর্তে সেই নর্দামবারল্যাণ্ডে জাহাজ, কুয়াশা, লেষ্ট্রেঞ্জ কাকু, জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রে ভাসা, এই নতুন দ্বীপের ছায়া ফেলে এমেলিনের মনে। সব কিছুই ঠিক আছে, তবু তার ছোট্ট মনের অনুভূতি বলছে কোথায় যেন গোলমাল হয়ে গেছে।

এমেলিনের চিন্তার ঘোর হঠাৎ কেটে যায় ডিকের চীৎকারে। ডিক ওর দিকে দৌড়ে আসছে। হাতে একটা জীবন্ত কাকড়া।

'ওটা ফেলে দাও, মিঃ বাটন, মিঃ বাটন, মিঃ বাটন।' দু'হাত মুখের সামনে রেখে এমেলিন চীৎকার করে ওঠে।

বাটন গর্জন করে ওঠে, 'ওরে ক্ষুদে শয়তান, ওকে জ্বালাচ্ছিস কেন? অ্যা?'

'শয়তান কি প্যাডি?' হাঁপাতে হাঁপাতে ডিক প্রশ্ন করে।

'শয়তান-শয়তান হলে তুমি। যাক, মোরে আর বিরক্ত করোনি। আমি একটু আরাম করব এখন। বড্ড ধকল গেছে।'

নিজের বিরাট শরীর নিয়ে একটা পামগাছের নিচে বসল বাটন। তারপর পাইপে তামাক ভরে চকমকি জ্বালিয়ে আগুন ধরায়। এমেলিন হামাগুড়ি দিয়ে ওর কোল ঘেঁষে বসে। ডিকও এমেলিনের কাছাকাছি বালুর উপর বসে পড়ে।

বাটন নিজের কোট খুলে বালিশের মত করে একটা নারকেল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপগুলির অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, এই দ্বীপে যা খাদ্য মজুত আছে তা একটা পুরো সেনাবাহিনীর রসদ। এখন দেখতে হবে পানীয় জল কোথায় আছে। এখান থেকে সে দেখতে পাচ্ছে নিচু একটা অংশ। বর্ষাকালে ওটা হয়ত একটা ছোট্ট নদী হবে। লেগুনের মধ্যে এখুনি ওর জল এসে পড়তে পারছে না। কিন্তু বনের ভিতর নিশ্চয় এর উৎস আছে। অবশ্য এক সপ্তাহের পানীয় জল তাদের সঙ্গেই আছে। তাছাড়া ডাব তো আছেই। শুধু গাছে উঠে নেবার অপেক্ষা।

বাটন যখন পাইপে সুখটান দিয়ে বিশ্রাম করছে, এমেলিন তখন তার রহস্যময় বাক্সটা বের করে। বাটন কনুইতে ভর দিয়ে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভগবান, সেই বাক্সটা! তুমি ওটা আনতে ভুলোনি দেখছি।'

ডিক বলল, 'খোল ওটা।'

খুব সাবধানে বাক্সটা খোলে এমেলিন। ওর মধ্য থেকে বার করে ছোট ছোট চায়ের পট, কাপ, প্লেট, দুধের বাসন। প্রত্যেকটাতে নীল রংয়ের ফুল আঁকা।

'আরে, এটা দেখছি চায়ের সেট।' আমুদে গলায় বাটন বলল, 'কখুন মোদের চায়ের নেমন্তন্ন করছো সোনামনি?'

'এক সময় হবে।' বাক্সটা আবার গোছাতে গোছাতে এমেলিন বলে।

পাইপ টানা শেষ করে বাটন উঠে দাঁড়ায়। জুতোর হিলে তামাকের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, 'এবার থাকবার জন্যি একটা বেবস্থা করা দরকার। কিন্তু আগে আমি বনের ভিতরটা ঘুরে আসি। জলের খোঁজ করতে হবে। বাক্সটা এই জিনিষপত্তর গুলানের সঙ্গে রাখ। ইখানে চুরি করবার মতন কেউ নেই।'

দু'জনের হাত ধরে বাটন গাছ্ গাছালির ভিতর চলতে থাকে। এ যেন এক পাইনের বন। লম্বা, ঋজু গাছগুলি যেন অংকের নিয়মে পরস্পরের সঙ্গে সমান দূরত্ব রেখে জন্মেছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলো ঝরে পড়ছে। যেন সবুজ একটা ছাদ। ঝাড় লণ্ঠনের আলো জ্বলছে। এক সময় এমেলিন ফিসফিস করে বলে, 'মিঃ বাটন, আমরা বনের ভিতর দিয়ে হারিয়ে যাব নাতো?'

'হারিয়ে যাব? মাইরি। দেখছ না মোরা উপরে উঠতেছি। আরে, হুসিয়ার!'

উপর থেকে একটা ডাব খসে পড়ে মাটিতে। খুবই ছোট। বাটন ওটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলে, 'চায়ের সঙ্গে জমবে ভাল। চল, চল। কথা বলোনি। নইলে আবার ক্লারিকুন পিছু নেবে মোদের।'

'ক্লারিকুন কি?' ডিক প্রশ্ন করে।

'বুড়ো আঙ্গুলের মাপে এই-টুন পরী।'

'কি করে ওরা?'

'চুপ। কথা বলোনি। এমেলিন মাথা বাঁচিয়ে চল। গাছের ডালের ঝাপটা লাগবে তুমার।'

নারকেল গাছের বাগান ছেড়ে ওরা বনের গভীরতায় চলে আসে। এখানে আলো অনেক কম। বড় বড় পাতা মেলে গাছেরা জায়গাটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঘনসম্বদ্ধ গাছগুলিকে সাপের মত জড়িয়ে আছে মোটা দড়ির মত বুনো আঙ্গুরলতা। অজস্র ফুলের সমারোহ জায়গাটির সৌন্দর্যকে একটা বিষণ্ণতা এনে দিয়েছে।

'চুপ।' বাটন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। কান খাড়া করে একটা শব্দ শোনে। বনের পতঙ্গদের নানারকম ডাক আর দূরে ডুবো পাহাড়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দের মাঝে ঝির ঝির একটানা কলকল শব্দ। জলের শব্দ।

শব্দটার উৎস খুঁজতে ওরা এগিয়ে যায়। একটু পরেই ওরা পৌছে যায় বনের মাঝখানে ছোট্ট এক সমতল তৃণভূমিতে। উপরের পাহাড়ের কালো পাথর থেকে

এক হাত চওড়া একটা জলস্রোত নেমে আসছে। তৃণভূমির আশে পাশে ফার্ণের সমারোহ। একটা গাছ থেকে ঝুলছে কলমি ফুলর গুচ্ছ। এই দৃশ্যে বাচ্চারা মুগ্ধ হয়ে যায়। এমেলিন দৌড়ে গিয়ে জলে হাত ডুবিয়ে দেয়। ঝর্ণার ঠিক পাশেই একটা কলাগাছ। বড় বড় কলাপাতার ফাঁকে সোনালী রংয়ের পাকা কলাগুলি থরে থরে ঝুলছে। বাটন জুতো খুলে পাহাড়ে চড়তে থাকে। একটু পরেই তার সাবধান বাণী ভেসে আসে। বিরাট একটা কলার ছড়া ওদের কাছে এসে পড়ে। ডিক আনন্দে চেঁচাতে থাকে।

কিন্তু এমেলিন কোন উত্তেজনা প্রকাশ করে না। সে অন্য কিছু দেখতে পেয়েছে।

বাটন নিচে নেমে এলে এমেলিন বলল, 'মিঃ বাটন, দেখো একটা ছোট পিপে।'

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাটন জিনিষটাকে দেখে। দুটো গাছের গুড়ির মাঝে অর্ধপ্রোথিত শ্যাওলা ভরা বস্তুটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটা খালি পিপে। কুন জাহাজ ইখানে জল ভরতে এসে ভুলে ফেল্যে গেছে। উটা দিয়ে মোদের খাবার টিবিল করা যাবে।'

পিপের উপর বসে এমেলিন ও ডিককে সদ্য পাড়া কলা ভাগ করে দেয় সে। পিপেটা খালি না ভর্তি, তখনো জানতে না পারলেও ওটা একটা চমৎকার বসবার জায়গা হয়েছে সন্দেহ নেই। কলা চিবোতে চিবোতে বাটন বলে, 'এখানে যদি জাহাজ এসে থাকে! তবে আবার আসবে।'

'বাপির জাহাজ আসবে?' ডিক প্রশ্ন করে।

পকেট থেকে পাইপ বের করে বাটন বলে, 'নিশ্চয় আসবে। যাওতো বাছারা, এবার খেলা কর। আমি একটু তামাক খেয়েনি। তারপর মোরা 'হাড়টার মাথায় চড়ে চান্দিক দেখব।'

ডিক আর এমেলিন বনের ভিতর ছুটোছুটি করে। ডিক মোটা আঙ্গুর লতায় দোল খায়। এমেলিন তার ছোট্ট হাতে যতটা পারে অজস্র রঙ্গীন ফুল তুলতে থাকে।

ধূমপান শেষ করে বাটন ওদের ফিরে আসবার জন্য ডাকতে থাকলে দু'জনে খুশিতে ডগমগ হয়ে ফিরে আসে। এমেলিনের হাতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। ডিকের হাতে ধূসর রংয়ের একটা বড় পাথরের মত জিনিষ। সে চীৎকার করে বলে, 'দ্যাখো কি একটা মজার জিনিষ পেয়েছি। এর মধ্যে আবার গর্ত আছে।'

'ফেলে দাও।' বাটন চীৎকার করে উঠে দাঁড়ায়। কুথায় পেয়েছ এটা? এটা ধরতে কে বলেছে? মোর হাতে দাও।'

ঘৃণাভরে বাটন ওটা হাতে তুলে নেয়। জিনিষটা ছত্রাকে ঢাকা মড়ার খুলি। পিছন দিকটা তোবড়ানো। যেন কুড়াল অথবা ধারাল অস্ত্রের আঘাতে গভীর গর্ত। যতদূরে

পারল বাটন ওটাকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়।

বাটনের আচরণে বিস্মিত ও আতঙ্কিত ডিক জিজ্ঞেস করে, 'ওটা কি, প্যাডি?'

'ভাল জিনিষ না।'

'আরও দুটো ওখানে আছে। ভাবছিলাম ওগুলিও নিয়ে আসব।' ডিক গজ গজ করতে থাকে।

'ওগুলি ধরবে না। ঠাকুর, ঠাকুর। কুন সময়ে ইখানে অনেক খুনোখুনি হয়েছে। এমেলিন, তুমার হাতে কি?'

এমেলিন তার হাতের ফুলের গুচ্ছ বাটনের দিকে এগিয়ে দেয় প্রশংসার প্রত্যাশায়। ওর থেকে বড় দেখে একটা ফুল তুলে নিয়ে পকেটে রেখে দেয় বাটন। তারপর ওদের নিয়ে পাহাড়ে চড়তে থাকে।

যত উপরে উঠতে থাকে বনের ঘনত্ব কমতে শুরু করে। নারকেল গাছও এখানে কম। সেগুলিও লেগুনের দিকে ঝুঁকে আছে। একটা বেত ঝাড় পার হয় ওরা। লম্বা লম্বা বেত জড়াজড়ি করে আছে। এর পর বৃক্ষহীন এক তৃণ প্রান্তর। এখান থেকে উঠে গেছে একটা পাথর যার চূড়া এই দ্বীপের উচ্চতম জায়গা। কুড়ি ফুট উঁচু পাথরটায় ওঠা কষ্টকর নয়। এর চূড়া একটা ডিনার টেবিলের মাপে সমতল। এখান থেকে সমস্ত দ্বীপ এবং সমুদ্র পরিস্কারভাবে দেখা যায়।

এখানে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালে বাতাসে কম্পিত ঢেউ খেলানো গাছের মাথা দেখা যায়। লেগুনের বিস্তৃত অংশ, ডুবো পাহাড় আর তারপরই অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর। ডুবোপাহাড় সমস্ত দ্বীপকে ঘিরে রেখেছে। কোথাও ডুবো পাহাড় দ্বীপের দূরে, কোথাও খুব কাছে। সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গা গানের শব্দ এখানে ফিসফিসিয়ে ভেসে আসছে।

এখন দক্ষিণ পশ্চিমের বাতাস বইছে। বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে দুলছে বট, কোকো পাম, আরটু, রুটিফল গাছগুলি। এখান থেকে বাত্যাতাড়িত সমুদ্র, নীল লেগুন, ফেনায় ভরা ডুবো পাহাড়ের সারি, নাচের ভঙ্গিমায় গাছগুলি—সমস্ত মিলিয়ে মনে হয় যেন কোন রহস্যময় আনন্দোৎসব দিন। প্রকৃতি যেন উৎসবে মেতেছে। মাঝে মাঝে গাছগুলি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে রং বেরংয়ের পাখী বেরিয়ে গিয়ে আকাশে উড়ছে। দূর থেকে সী-গালগুলিকে যেন মনে হচ্ছে জলের উপর ছোট ছোট সাদা মেঘ ভাসছে।

লেগুনের রং কোথাও ঘন নীল কোথাও হাল্কা নীল। গভীরতার জন্যই এমন দেখাচ্ছে। হাল্কা নীল অংশে প্রবাল স্তুপের সারি। দ্বীপটা প্রায় তিন মাইল চওড়া। সমস্ত দ্বীপে কোন লোক বসতির চিহ্ন নেই। সমুদ্রেও কোন জাহাজের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছেনা। এই আশ্চর্য জায়গায় যেখানে চারিদিকে সবুজের আর নীলের বসতি

যেখানে কোন মানুষ বাস করেনা, সেখান থেকে বাতাস এবং সী-গালেরা ছাড়া এদের খবর কে পৌঁছে দিতে পারবে ভিন্ন জগতে?

বৃদ্ধ নাবিকের মনে কিন্তু এত কথা এত প্রশ্ন ছিলনা। তার চোখ এক জায়গায় স্থির হয়ে ছিল। দক্ষিণ, দক্ষিণ পশ্চিমের দূর দিগন্তে খুব ছোট্ট, অস্পষ্ট একটা বিন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে সে। সন্দেহ নেই এটা অন্য একটা দ্বীপেরই ইশারা। এই অস্পষ্ট বিন্দুটি ছাড়া সমুদ্রে শুধু জল আর জল।

এমেলিন ওদের সঙ্গে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠেনি। সে উদ্ভিদ-বিদ্যায় মগ্ন ছিল। একটা বিষাক্ত বৈঁচিফলের ঝোঁপের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে। দুই গুচ্ছ ফল্ তুলে নিয়ে সে পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়াল।

পাহাড় থেকে নামবার সময় বাটন দেখতে পেয়েছিল এমেলিনকে। সে আরও তাড়াতাড়ি নামতে নামতে চীৎকার করে বলতে থাকে, 'ওগুলি ফেলে দাও। খবর্দার মুখে দিওনা। ওগুলি খেলে আর ঘুম ভাঙ্গবে না।'

এমেলিনের কাছে এসে ওর মুঠি থেকে ফলগুলি কেড়ে নেয় বাটন। দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এমেলিনের মুখ হা করিয়ে দেখতে থাকে মুখের ভিতর ফল আছে কিনা! দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হল যে না, এমেলিন ওগুলি খায়নি। তারপর দুষ্টুমি কিংবা অবাধ্যপনা করলে নার্সেরা যেমন বাচ্চাদের ঝাঁকুনি দেয়, তেমনি এমেলিনকে ঝাঁকুনি দিল বাটন। ডিককে পাহাড় থেকে নামতে সাহায্য করে ওদের নিয়ে বাটন সৈকতে ফিরে যাবার রাস্তা ধরল।

সেই রাতে, বাটনের তৈরি আশ্রয়স্থলে বসে ওরা তিনজন গল্প করছিল। দুটো দাঁড়, গাছের একটা ডাল, নৌকার পাল সহযোগে তৈরি হয়েছিল একটা তাবু। সামুদ্রিক বাতাস কখনো ক্ষিপ্ত হতে পারে অথবা উপর থেকে নারকেল পড়তে পারে, তাই। যতটা সম্ভব মজবুত করেই তৈরি করা হয়েছিল।

আকাশে তখনো চাঁদ দেখা দেয়নি। নক্ষত্রলোকের বালুকাবেলায় বসেছিল ওরা। এক সময় ডিক প্রশ্ন করে, 'বনের মধ্যে দুপুরে কাদের সম্বন্ধে বলেছিল?'

'যাদের কথা বলতে বলতে তুমি কথা বলতে মানা করেছিলে।'

'ও—সেই ক্ষুদে ভালো মনিষ্যিদের কথা? ক্লারিকুনস্?'

'হ্যাঁ।' কৌতূহলী ডিক বলল, 'ভালো মানুষ বলতে কারা?'

'মোদের দেশে পরীদের বলে ভালো মনিষ্যি।'

'পরী বলে কিছু নেই।' ডিক বলে, 'মিসেস সিম্স্ বলতেন—ওরা নেই।'

এমেলিন বলে ওঠে, 'মিসেস জেমস কিন্তু বলতেন ওরা আছে।'

বাটন বলল, 'তোমরা উয়াদের মান আর না মান—উয়ারা আছে, অবশ্যি আছে।

এখুনিই হয়তো পিছনে বনের ভিতর থে মোদের উঁকি মেরে দেখছে, মোদের কথাবার্তা শুনতেছে। তার মনে লয় ইখানে উহারা নাই। কিন্তু মোর কন্‌ট গাঁয়ে থিক্ থিক্ করত। ঠাকুর, ঠাকুর, কবে আবার গাঁয়ে গিয়ে উহাদের দেখব। তোমরা বিশ্বাস কর আর না কর, মোর বাপ একদিন উহাদের দেখেছিল। মৌমাছির মত গুন গুন কথা বলতেছে, হাতে হাত ধরে গোল হয়ে নাচছে। উয়াদের চোখে যেন জোনাকি পোকার আলো। একটা পাথরে দাঁইড়ে আঙ্গুলের একটা কড়ার সমান এই'টুন মনিষ্যি বাঁশি বাজাচ্ছে, আর উয়ারা নাচতে নাচতে গান গাইছে।'

নিভে যাওয়া পাইপ ধরাবার জন্য বাটন চুপ করে। আকাশে এখন চাঁদ উঠেছে। দূরের ডুবো পাহাড়ে ঢেউ ভাঙ্গার শব্দে যেন ঘুম পাড়ানিয়া গান। জোয়ার আসবার আগে যেগুলো জলে মৃদু ঢেউ জাগছে। দিনের আলোয় যেমনটা দেখাচ্ছিল, চাঁদের আলোয় অনেক বড় দেখাচ্ছে, লেগুনকে। মাঝে মাঝে বড় মাছেদের ঘাই মারার শব্দ নীরবতা ভঙ্গ করছে।

রাত্রির লেগুন অন্যরকম। এর তীরবর্তী বনভূমিতে যদি কেউ হেঁটে যায় তবে দেখতে পাবে যে এই ক্রান্তিয় বনে, ক্রান্তিয় চাঁদের আলোয় যেন সমুদ্রের একটা গুহা। লতা, ফুল, অর্কিড, গাছের শরীর-চাঁদের আলোয় যেন দীপ জ্বালিয়েছে।

'এবার শোবার সময় হয়ে গেছে।' পকেট থেকে একটা লম্বা দড়ি বের করতে করতে বাটন বলল, 'এমেলিনকে বেইন্ধে রাখতে হবে। ঘুমের মদ্দিও হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে বনের মদ্দি চলে যাবে আর ফিরতে পারবে না।'

'না, না, আমাকে বাঁধা চলবে না।' এমেলিন প্রতিবাদ করে ওঠে।

'তুমার ভালর জন্যি ইটা করতে হবে।' এমেলিনের কোমরে দড়ি জড়াতে জড়াতে বাটন বলল, 'এখন চল।'

এমেলিনকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় তাঁবুতে নিয়ে আসে বাটন। তারপর দড়ির অপরপ্রান্ত একটা বৈঠার সঙ্গে বাঁধে। এই বৈঠাটা আবার তাবুর দাঁড়িয়ে থাকার প্রধান খুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

'এবার যদি রাত্তিরে ঘুমের মদ্দি উঠে হাঁটা মার তবে তাবু শুদ্দু মোরা চাপা পড়ব।' বাটন বলে।

আর সকালবেলা তাবুর অবস্থা তাই হয়েছিল।

'আমি ওই পুরানো প্যান্ট পড়ব না—পড়বনা, পড়ব না।'

উলঙ্গ হয়ে ডিক বালুর উপর ছোটাছুটি করছে আর একটা প্যান্ট হাতে নিয়ে বাটন ওর পিছনে ছুটছে। দৃশ্যটা দেখাচ্ছে যেন একটা কাঁকড়ার পিছনে ছুটছে কৃষ্ণসাগর হরিণ।

এই দ্বীপে ওরা পনের দিন হল বাস করছে। এর মধ্যে ডিক আবিষ্কার করেছে তার জীবনের গভীরতম আনন্দ—উলঙ্গ হয়ে থাকার আনন্দ। নগ্ন হয়ে সে লেগুনের অগভীর জলে গড়াগড়ি খায়। তারপর রোদে শুকিয়ে নেয় দেহ। বসনের অভিশাপ থেকে সে মুক্তি চায়। জামা, কাপড়, জুতো, টুপির মত সভ্যতার বস্তুগুলিকে বালুকাবেলায় বিসর্জন দিয়ে সে সমুদ্র, বাতাস আর সূর্যের সঙ্গী হতে চায়।

দ্বীপে বাস করবার দ্বিতীয় দিন থেকেই বাটন ওদের নগ্ন হয়ে স্নান করবার জন্য জোরাজোরি করেছিল। প্রথমে বাধা দিয়েছিল ডিক। এমেলিন, যাকে কাঁদতে দেখা যেত খুবই কম, বাটনেব আদেশ শুনে শেমিজে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। ওদের জলে নামাতে তখন বাটনের কি কষ্টই না হয়েছে। আর এখন জল থেকে ওদের তোলা এক সমস্যা।

এই মুহূর্তে নগ্ন এমেলিন স্নান শেষে রোদ্দুরে শরীর শুকাচ্ছে আর ডিকের ছোটাছুটি করা দেখছে।

ডিক এবং এমেলিনের ডাঙ্গার থেকেও আকর্ষণ বেশি লেগুনে। বনের পাকা কলা বেতের লাঠি দিয়ে খোঁচালেই পড়ে। সোনালী গিরগিটিগুলি এতই পোষমানার মত আচরণ করে যে একটু সতর্কতা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের লেজ ধরে ফেলা যায়। পাহাড়ে উঠলে দ্বীপটা আয়নার মত দেখা যায়। কিন্তু এদের কাছে লেগুনের মজা কিছু নয়।

জলের অনেক নীচে প্রবালের শাখা প্রশাখা। বাটন যখন মাছ ধরে, তখন প্রবাল-গুচ্ছের ফাঁকে ফাঁকে কত না খেলা চলে। সন্ন্যাসী কাঁকড়ারা তাড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গীন শামুকদের। সামুদ্রিক বায়ু-পরাগি এনোমোনেরা যেন বড় বড় গোলাপ। অনেক ফুল, যাদের স্পর্শে করলে পাপড়ি বন্ধ করে দেয়। অদ্ভুত আকৃতির শঙ্খ তাদের খোলসে ভর দিয়ে হাঁটছে, কাঁকড়াদের পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে অথবা শামুকদের ভয় দেখাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে রং মাখানো মাছ। অ্যালবিকোরেরা আগুনের মত চলে যায়। বিস্তৃত এই হ্রদে ক্রান্তিয় জীবনের স্পর্শ ছড়িয়ে আছে। লেগুনের গভীরতায় আছে মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত দৃশ্যের মেলা।

বাটন কখনো মাছ ধরবার জন্য বেশি দূরে যেত না। এটা অবশ্য তার আলসেমির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। প্রয়োজনীয় মাছ ধরা হয়ে গেলে সে পাড়ে চলে আসত। খড়কুটা জোগাড় করে চকমকি দিয়ে আগুন জ্বালাত। সেই আগুনে ঝলসানো হতো মাছ, রুটি ফল আর ক্রান্তিয় উদ্ভিদ-টারো'র শিকার। অবশ্য ডিক আর এমেলিন তাকে সাহায্য করত। তাঁবুটা তারা বনের ধারে গাছ-গাছালির মাঝে বেশ ভাল ভাবে দাঁড় করিয়েছিল যাতে থাকা, শোয়া, বসার ভাল মত জায়গা থাকে।

সারাদিনের কাজ-অকাজ, বিস্ময়, আনন্দের মাঝে দুটি শিশুই সময়ের হিসাব হারিয়েছে। এখন আর লেস্ট্রেঞ্জের কথা তাদের মনেও নেই।

তৃতীয় খণ্ড

সময়ের হিসাব ভুলতে হলে আপনাকে খোলা বাতাসে, উষ্ণ জলবায়ুতে এবং শরীর যতটা সম্ভব আব্রুহীন অবস্থায় রাখতে হবে। নিজেই সংগ্রহ করে নিতে হবে নিজের খাদ্য। তা'হলেই সভ্যতা থেকে বন্ধন মুক্তি ঘটবে আপনার। বাকী কাজটুকু করবে প্রকৃতি যা তিনি করেন বন্যদের জন্য। এক সময় আপনি আবিষ্কার করবেন—বই, খবরের কাগজ, চিঠিপত্র পাওনাদারের তাগিদ না থাকলেও সুখী হতে পারেন। আর বুঝতে পারবেন ঘুম নামক অপার্থিব বস্তুটির উপর। প্রকৃতির কি ভূমিকা।

এই দ্বীপে বাস করবার মাসখানেক পরে দেখতেই পাচ্ছেন ডিকের পরিবর্তন। এই সে প্রাণবন্যায় ভরপুর হয়ে বাটনকে টারো শিকর তুলতে সাহায্য করছে। আর তারপরই দু'জনে কুকুর কুণ্ডলী হয়ে ঘুমাচ্ছে। এমেলিনেরও একই রকমের পরিবর্তন। গভীর ঘুমে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন থেকে সে জেগে ওঠে নির্মল বাতাস, উজ্জ্বল আলো আর ঘিরে থাকা রঙ্গীন পৃথিবীতে। এই দুটি শিশুর জন্য প্রকৃতি যেন তার ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েছে।

জাহাজ থেকে এমেলিন যেমন তার মূল্যবান বাক্সটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। বহুবর্ণের এই গুলিগুলির সঙ্গে বড় একটা গুলিও ছিল। দ্বীপের বালুকাবেলায় গুলি খেলছিল ডিক এমেলিন। বাটন কৌতূহলী হয়ে ওদের কাছে এগিয়ে যায়। প্রথমে প্যান্টের পকেটে হাত রেখে পাইপ টানতে টানতে ওদের খেলার সমালোচনা করছিল সে। তারপর নিজেই জড়িয়ে পড়ল এই খেলায়। হাঁটু মুড়ে সে তার বড় বড় মোটা আঙ্গুল দিয়ে ডিকের সঙ্গে গুলি খেলায় মত্ত হয়ে গেল।

কোন এক দুর্লভ মুহূর্তে এমেলিন তার বাক্স খুলে 'টি পার্টি' দেয়। পার্টিতে বাটন কখনো হয় প্রধান সম্মানিত অতিথি, আবার কখনো নিজেই অতিথি সৎকারের ভার নেয়। 'মাদাম, চা-টা আপনার পছন্দ হয়েছে তো?' বাটনের জিজ্ঞাসার জবাবে এমেলিন তার ছোট্ট কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে বলে, 'দয়া করে আর এক টুকরো চিনি দিন মিঃ বাটন।' পার্টি শেষ হলে এমেলিন কাল্পনিক জলে চায়ের বাসন ধুয়ে মুছে বাক্সে তুলে রাখে। তারপরই সভ্যতার শিষ্টাচার ভুলে গিয়ে আবার প্রকৃতির কোলে ফিরে যায় তারা।

এক সকালে হয়তো ডিক প্রশ্ন করে বসল, 'প্যাডি, জীবনে তোমার নাম দেখেছ?' আশ্চর্য হয়ে বাটন বলে, 'মোর নাম? দেখা যায়? ধুস্—কি যে বল তুমি।'

'দাঁড়াও, তোমার নাম দেখাচ্ছি।' বলে ডিক এক টুকরো কাঠ এনে সাদা বালুর উপর বড় বড় হরফে লেখে—'বা-ট-ন।'

একটা নারকেল গাছে রাজকীয় ভঙ্গীতে ঠেস দিয়ে বসে সপ্রসংশক ভাবে সে বলে, 'মাইরি, তুমি খুব পণ্ডিত ছেলে।'

ডিক ওকে নিজের নাম লেখাতে শেখাবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। হতভাগ্য বাটনের তখন আর কোন উপায় থাকে না। কয়েকদিনের কঠিন এবং পরিশ্রমী প্রচেষ্টায় বালুর উপর নিজের নাম লিখে ফেলে সে। তারপর খুশিতে আত্মহারা হয়ে নিজের পুরানো টুপিটা লেখা নামের উপর আন্দোলিত করতে করতে নিজেকেই সম্বর্ধনা জানাতে থাকে বাটন। তার খুশিভরা চীৎকারে বনের প্রতিধ্বনি জাগে। দূরে সী-গালেরা 'হি-হি-হি' শব্দ করে যেন বাটনের প্রশংসা করে।

একদিন এমেলিনের শখ হল যে বাটনকে সে ভূগোল শেখাবে।

'মিঃ বাটন, তুমি আমার কাছে ভূগোল শিখবে?'

'ভূগোলটা আবার কি বটে?'

'যেখানে দেশের খবর থাকে।'

'ভূগোল শিখে মোর হবেটা কি? ওইসব কেতাবের কতা মোরে বলোনি সোনামনি। মোর মাথা ঘোরে।'

এ ভাবেই দিন পার হয়ে মাসে পরিণত হয়। মাসও দ্রুত চলে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোন জাহাজের মাস্তুল পর্যন্ত দেখা যায়নি। অবশ্য জাহাজ না আসাতে বাটনের মনোকষ্ট খুব একটা হয়নি। আর ডিক ও এমেলিনের সম্পর্কেও কোন দুশ্চিন্তা নেই। তারা তাদের পরিবেশ নিয়েই খুশি।

বর্ষাকাল এসে গেল। তবে, মনে রাখা দরকার—বর্ষাকাল বলতে আপনারা যা বোঝেন—এ সেই বর্ষাকাল নয়। এখানে বর্ষাকাল এক প্রাণময় সত্তায় পূর্ণ। প্রবল ধারায় অঝোর বর্ষনের পরেই আকাশ ভরা সূর্যের আলোয় সাতরঙা রামধনু। বাতাসে ভেসে বেড়ায় নতুন অঙ্কুরিত হওয়া উদ্ভিদের আকূলকরা গন্ধ।

এক বর্ষার পর বাটনের মাথায় এল যে একটা বাঁশের তৈরি ঘর বানাতে হবে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। একটা কোকো-পামের গায়ে ঠেস দিয়ে সে পাইপ টানতে লাগল।

অবশ্য ডিকের সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে ঘর বানানো অসম্ভব। মুক্ত পরিবেশ ছেড়ে ঘরের মধ্যে বাস করা ডিকের মনপূতঃ না হলেও তার আগ্রহ জেগে উঠল বাঁশের বাড়িটা বানানোয় সাহায্য করতে। বাড়ি বানানোর কাজ বাটন পিছিয়ে দিতে থাকে নানা অজুহাতে। পেরেক যদি না-ই পাওয়া যায় তবে বাঁশ ও বেতের

জোড়াগুলি বাঁধবে কি দিয়ে? সে পাইপ টানতে টানতে সমস্যার কথা বলতে থাকে আর ডিকের 'শয়তানের মাথা' সেগুলির সামাধান করে দেয়। গায়ে ঠেস দিয়ে পাইপ টানতে টানতে আরও সমস্যার কথা জানাতে থাকে বাটন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিকের তাগাদায় তাকে বাড়ি তৈরি করবার মাল-মশালা জোগাড় করতেই হয়। সমান তালে ডিক তার সঙ্গে খাটতে থাকে। ডিকের তো বিশ্রামও নেই, পাইপ টানাও নেই। পরী আর ক্লারিকুনদের গল্প শোনাতে গিয়েও কোন লাভ হয়নি বাটনের।

দু'জনের মিলিত পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত পনের দিনের মাথায় একটা বাঁশের বাড়ি তৈরি হয়। বনের ধার ঘেঁষে এই বাড়িটার আকৃতি দাঁড়ালো উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কুটিরের মত।

ইতিমধ্যে মাছ মারার জন্য ডিক কোচ্ বানিয়ে নিয়েছিল। ডিঙ্গি বেয়ে ওরা ভাটা পড়া ডুবো পাহাড়ের জলে আটকে থাকা অজস্র মাছ শিকার করত।

আরেকবার ডিকের মাথায় এল আলুর চাষ করবে। বাটনকে প্রথমে আলু কিভাবে চাষ করতে হয় সেই সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দিল ডিক। কিন্তু চাষ করা যাবেনা বলে সে ফতোয়া জারি করল। কারণ, মাটি কোপাবার মত কোদাল নেই। ডিকের মাথায় মাটি কোপাবার যন্ত্রের আবিষ্কার হয় এবং বাটনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোদাল তৈরি হয়ে যায়। রাগ করে সে বলে, 'তুমি আর এমেলিন আলুর চাষ করগে যাও।'

কাছে বসে এমেলিন, একগুচ্ছ লায়ালা ফুল নিয়ে মালা গাঁথছিল। মাসের পর মাস সূর্যের আলো আর বাতাসের স্নিগ্ধতা এই মেয়েটির অনেক পরিবর্তন এনেছে। তার স্বপ্নালু চোখের দৃষ্টি এখন বাস্তবতায় পূর্ণ। সেদিনের সেই তাবু চাপা পড়বার ফলে তার ঘুমের মধ্যে হাঁটা রোগ চিরতরে চলে গেছে। মুক্ত বাতাস, সমুদ্র স্নান তার জীবনে স্বাস্থ্য এনে দিয়েছে। এমেলিনের দেহের বর্ণ হয়েছে জিপসি মেয়েদের মত রোদে পোড়া ধূসর! লম্বায় খুব একটা বাড়েনি সে। কিন্তু পরিপুষ্ট গোলগাল হয়েছে শরীর।

কয়েক মাসের অর্দ্ধ-বুনো জীবন ডিকেরও আকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ইতিমধ্যে সে দু'ইঞ্চি লম্বা হয়েছে। রোদে পোড়া শরীর আর ফুটকি ফুটকি দাগ নিয়ে তাকে দেখায় বারো বছরের ছেলের মত। ওর দেহ যেন পরিণত মানুষের প্রতিশ্রুতি বহন করছে। ডিক দেখতে ভাল না হলেও তার স্বাস্থ্য দর্শনীয়। সে প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে। মুখে দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্বের ছায়া।

বৃদ্ধ নাবিকের কাছে ওদের পোষাক একটা সমস্যা। দ্বীপের আবহাওয়ায় পোষাক অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু বাটন আর তাদের নগ্ন হয়ে থাকতে দেয় না। কোনোনডোয়া জাহাজে সে কিছু কাপড় পেয়েছিল। কাঁচি আর সূঁচসুতো সহযোগে এমেলিনের জন্য একটা ঘাঘরা বানিয়ে দিয়েছে সে। তার এই অভূতপূর্ব মৌলিক আবিষ্কার

দেখতে হয়েছে যেন দুটো ডুবো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটা খাড়ি চলে গেছে। অবশ্য এই ঘাঘরা এমেলিনের সাঁতার কাটা অথবা প্রচণ্ড বাতাসে হেঁটে যাবার পক্ষে খুবই উপযোগী।

ডিক নিজেই তার নগ্নতা ঢাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। নারকেল গাছের মাথায় যে কাপড়ের আস্তর থাকে— তারই এক টুকরো দিয়ে দুই জঙ্ঘার মধ্যবর্তী জায়গার আবরণ।

এক সকালে ডিককে দেখা গেল চীৎকার করতে করতে পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসছে। বাটন মাছ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সে দেখতে পেল বন পেরিয়ে বালুর উপর দিয়ে ছুটে আসছে ডিক।

'প্যাডি—একটা জাহাজ!'

পাহাড়ের মাথায় উঠতে বেশিক্ষণ সময় নিল না বাটন। সত্যিই একটা জাহাজ দ্বীপে ঢুকছে। বেঁটে খাটো জাহাজটির ব্যবসা কি। মজবুত যান্ত্রিক চালনা-যন্ত্র, নৌকা, মাস্তুলে 'কাকের বাসা'—সব মিলিয়ে কোন সন্দেহ নেই এটা একটা তিমি-শিকারী জাহাজ। এইসব তিমি-শিকারী জাহাজ সম্পর্কে বাটনের প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। শয়তানদের জাহাজ।

একটা বট গাছের আড়ালে ডিক আর এমেলিনকে লুকিয়ে ফেলল সে। বলল— যতক্ষণ সে ফিরে না আসছে একদম নড়াচড়া করবে না দু'জনে। এই শয়তানের জাহাজের লোকগুলি যদি ওদের দেখতে পায় তবে জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া ছাড়িয়ে নেবে।

এরপর দৌড়ে বাটন তাদের বাঁশের কুটিরে আসে। ওখানে যত জিনিষ ছিল সবগুলি নিয়ে ডিঙ্গিতে তোলে। সময় ছিল না, না হলে সে বাড়িটাকে ভেঙ্গে দিয়ে যেত। তারপর ডিঙ্গি চালিয়ে লেগুনের অন্য এক প্রান্তে এসে জল থেকে জেগে ওঠা একটা আওয়া গাছের নিচে দাঁড়ায়। সেখান থেকে হেঁটে সে নারকেল গাছের কুঞ্জের আড়ালে গিয়ে জাহাজটিকে দেখতে থাকে।

ডুবো পাহাড়ের খাড়ির মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাহাজটি অবলীলায় লেগুনে ঢুকে পড়ে। এমনকি জাহাজের সামনে পথপ্রদর্শক অথবা জল মাপবার লোকও ছিল না। এমন ভাবে খাড়ি পার হল যেন কতবার এখানে এসেছে। অবশ্য এই তিমি-শিকারী জাহাজগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের প্রতিটি কোন্, প্রতিটি গর্তের নাড়ি নক্ষত্র জানে।

জাহাজের নোঙ্গর পড়ল। বাটন আর ওখানে অপেক্ষা করল না। ডিক আর এমেলিনকে নিয়ে বাটন জঙ্গলের গভীরে আশ্রয় নিল এবং রাতটা ওখানেই কাটাল।

পরদিন সকালে জাহাজটিকে আর দেখা গেলনা। তার বদলে বিস্তীর্ণ বালুকাবেলায় অসংখ্য পদচিহ্ন, খালি বোতল আর আধখানা পুরানো খবরের কাগজ পড়েছিল। আর দেখা গেল, ওদের বাঁশের কুটিরটি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে।

বাটন সমুদ্রের দিকে মুখ করে জাহাজটা আর তাদের শয়তান নাবিকদের উদ্দেশ্যে গালাগালি আর অভিসম্পাত দিল অনেকক্ষণ ধরে। আসলে ওই শয়তানগুলি তার কাজ বাড়িয়ে দিয়ে গেল, পরিশ্রম করে আবার একটা কুটির তৈরি করতে হবে। প্রতিদিন দুপুরে সে পাহাড়ের মাথায় উঠে তিমি-শিকারী জাহাজ আসছে কি-না দেখতে লাগল। তার স্বপ্নের মধ্যেও হানা দিতে লাগল তিমি-শিকারীরা। দীর্ঘকাল ধরে জাহাজের খোলে বাস করে করে এই দ্বীপের মন্থর জীবন তার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তিমি-শিকারী না হয়ে রাজকীয় ডাকবাহী জাহাজ এলেও তাতে চড়ে এই দ্বীপ ছাড়বার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। যা তামাক আছে বহুদিন চলে যাবে তার। খেলার সাথী দুটি বাচ্চা আছে। হাত বাড়ালেই অফুরন্ত খাদ্য সম্ভার। শুধু একটি জিনিষেরই অভাব এই দ্বীপে আছে। প্রকৃতি দেবী যদি এখানে একটা শুঁড়িখানা খুলে দিতে পারতেন! প্রকৃতির অকৃপণ হাতেব এই খুঁতটুকু অবশ্য অচিরেই সংশোধিত হয়ে গেল।

তিমি-শিকারীদের আগমনের ফলে ক্ষয়ক্ষতি শুধু কুটিরটাতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। আসল শোকবহ ঘটনা হল, এমেলিনের সেই বাক্সটা আর খুঁজে পাওয়া গেলনা। চারিদিক, আনাচে কানাচে খুঁজেও বাক্সটা পাওয়া গেলনা। তবে কি বাটন তাড়াহুড়ো করবার সময় বাক্সটা কোথাও ফেলে দিয়েছে? না কি কোন তিমি-শিকারী ওটা পেয়ে নিয়ে গেছে? কে বলবে, কি হয়েছে? বাক্সটা হারিয়ে গেল, এখানেই ব্যাপারটা শেষ হতে পারত। কিন্তু এটা হারিয়ে এমেলিনের কি মানসিক যন্ত্রণা! এক সপ্তাহ ধরে এমেলিন দুঃখের সাগরে পড়ে রইল।

মালা গাঁথার প্রবণতা ছিল এমেলিনের। বিচিত্র বর্ণের প্রিয় ফুলগুলি নিয়ে সে দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করল। একদিন সকালে বাটনের পাশে বসে সে ঝিনুকের মালা গাঁথছিল, দেখা গেল ডিক বনের প্রান্ত ধরে ছুটে আসছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে কিছু খুঁজল। তারপর একটা বড় কচ্ছপের খোল কুড়িয়ে নিয়ে আবার বনের ভিতর ঢুকে গেল। ওখান থেকেই তার চীৎকার ভেসে এল, 'প্যাডি, একটা জিনিষ পেয়েছি। ভারি মজার জিনিষ।'

তক্ষুনি অবশ্য সে ফিরে এল। কিন্তু এখন আর দৌড়াচ্ছে না। খুব সাবধানে খোলটা হাতে নিয়ে আসছে। ভিতরে কিছু মূল্যবান পদার্থ আছে তা যেন চলকে পড়ে না যায়, এর জন্যই এত সাবধানতা।

'প্যাডি, আমি সেই পুরানো পিপেটা উল্টে দিয়েছি। ওর মধ্যে কর্ক দিয়ে মুখ

বন্ধ অবস্থায় কি আছে—বিদঘুটে গন্ধ। তোমাকে দেখাবার জন্য নিয়ে এলাম।' ডিক কচ্ছপের খোলটা বাটনের হাতে তুলে দেয়।

খোলের ভিতর হলুদ বর্ণ তরল পদার্থ। বাটন গন্ধ শুকলো। জিভে লাগিয়ে স্বাদ নিয়ে লাফিয়ে উঠল চীৎকার করে, 'ভগবান, এ যে রাম।'

'জিনিষটা কি প্যাডি?' এমেলিন জিজ্ঞেস করল।

একথার কোন উত্তর না দিয়ে ডিককে বলতে থাকে বাটন। 'এ জিনিষ কোথায় পেয়েছো? পুরানো পিপেয়?'

'হ্যাঁ। কর্কটা খুলতেই—'

'আবার কর্কটা বন্ধ করে দিয়েছো তো? আহা, ভগবানের কি অসীম করুণা। দিনের পর দিন আমি ওই পিপেটায় বসেছি। এক ফোঁটা মদের জন্যি আমার জিভ শুকিয়ে গেছে আর ওটার মদ্দি রামে ভর্তি?'

চুমুকে চুমুকে তরল পদার্থ শেষ করে সে ঠোঁট চেপে থাকল যাতে এতটুকুও ফেনাও যেন বেরিয়ে না যায়। তারপর এমেলিনের দিকে তাকিয়ে একটা চোখ বন্ধ করল। হেসে উঠল এমেলিন।

এবার বাটন ছুটতে লাগল বনের দিকে। ওরা দু'জন পিছু পিছু ছুটল। ঝর্ণার ধারে গিয়ে বাটন দেখল সত্যিই ডিকের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে পিপেটা মাটির তলা থেকে উঠে এসেছে। তিমি-শিকারী শয়তানগুলি জল ভরতে এসে এটাকে যে দেখতে পায়নি রক্ষা। কচ্ছপের খোলাটা দিয়ে পিপের গায়ে ঠুকে ঠুকে বুঝে নিল বাটন যে এটা প্রায় ভর্তি। পিপেটা এখানে কি করে এল, কে এটাকে ফেলে গেছে কে বলবে? সেই মড়ার মাথার খুলিটা যদি কথা বলতে পারত, তবে জানা যেত সব।

আর একবার স্বাদ গ্রহণ করল বাটন। ডিককে এক চুমুক খেতে দিল। থু থু করে মুখ থেকে তরল পদার্থটা ফেলে দিয়ে মুখ বিকৃত করল ডিক। তারপর ওরা দু'জন মিলে পিপেটাকে গড়িয়ে নিয়ে চলল। ফুলের মালা গলায় দিয়ে এমেলিন চলল ওদের সামনে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে বাটন কচ্ছপের বড় খোলাটায় ভর্তি করে নিল রাম। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে পাইপ ধরায় সে। কলাপাতা মোড়া মাছ সিদ্ধ, টারোর শিকড় আর ডাব, এ দিয়ে খাওয়া জমেছিল ভাল।

পিপের রাম খুবই ভাল জাতের। তার উপর আবার বহু দিনের পুরানো হবার ফলে আরও চমৎকার হয়ে আছে। সানফ্রান্সিসকোর অলি গলিতে যে ভয়ংকর তরল পদার্থ পাওয়া যায় অথবা বন্দরের শুঁড়িখানায় যে মাল দেওয়া হয়, তার তুলনায় এই রাম অমৃত।

রাম-এর প্রভাবে বাটন ফুর্তিবাজ হয়ে ওঠে। ডিক ও এমেলিন বুঝতে পারে কোন মজার ব্যাপার ঘটে গেছে তাদের বন্ধুর শরীর ও মনে। সাধারণতঃ দুপুরের খাবার পর বাটনকে ঝিমুতে দেখা যেত। কিন্তু আজ সে কত গল্প বলতে লাগল। তাবপর শুরু করল গান। বাটনের গাওয়া গান ডিক ও এমেলিন না জানলেও ওরা দু'জনে সমান তালে ধুয়া ধরে।

গাছের উপর বড় বড় উজ্জ্বল চোখ নিয়ে পাখিরা এই সুখী পিকনিক পার্টির দিকে তাকিয়ে থাকে। বাটনের গলা প্রতিধ্বনি তোলে। বাতাস তা বয়ে নিয়ে যায় ডুবো পাহাড়ের উপর সী-গালদের কাছে। সী-গালেরা বোধহয় বাটনের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যই ঘুরে ঘুরে কর্কশ চীৎকার করতে থাকে।

সন্ধ্যেবেলা বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে পিপেটা গড়িয়ে জলের ধারে নিয়ে যায় বাটন। তার ইচ্ছে নয় যে বাচ্চারা তার মাতাল হওয়া দেখুক। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে চাঁদের আলোয় ভরা সৈকত থেকে ভেসে আসা বাটনের গান শুনতে পায় এমেলিন।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে বাটন তাকে পিপের পাশেই আবিষ্কার করে। তার শরীর ঝরঝরে তাজা হয়ে গেছে। ডিককে রান্নায় লাগিয়ে নারকেল গাছের ছায়ায় একটা কোটকে বালিশ করে শুয়ে শুয়ে পুরানো দিনের কথা বলতে থাকে। আরাম করে পাইপ টানাতো আছেই।

সেই রাত আর পরবর্তী এক সপ্তাহ তার কাটল সঙ্গীত মুখরতা নিয়ে। তারপর থেকে তার ক্ষিদে চলে গেল। ঘুমও আর আসত না। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ডিক দেখতে পেল বাটন বালুর উপর কোন জিনিষে স্থির এবং অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ডিক আর এমেলিন তার কাছে দৌড়ে গেল। বাটন তখন তার ডান হাত এমন ভাবে উঁচু করে আছে যেন খপ্ করে কিছু ধরবে। হঠাৎ সে বালুর উপর হাতটা ফেলে মুঠো করে কিছু একটা ধরল। তারপর মুঠো খুলে দেখতে লাগল যা সে ধরেছে।

'কি ধরছ প্যাডি?'

'ক্ল্যারিকুন।' বাটন জবাব দিল, 'সবুজ পোষাক পরা সব—'

ডিক আর এমেলিন হেসে উঠল। বাটনও বোকার মত হাসল। বুঝতে পারল যে সে ভুল দেখছে। বলল, 'ধুস্, ক্ল্যারিকুন ফ্ল্যারিকুন নয়। রাম মোর মাথা খারাপ করে দেছে।—আরে সর্বনাশ! বালুর ভিতরথে কত লাল ইন্দুর উঠে আসতেছে।'

হাত আর পায়ে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে বাটন নারকেল গাছগুলির দিকে এগিয়ে যায়। তার চোখে বিভ্রান্তির দৃষ্টি। এক সময় মনে হল সে বাতাসে উড়বার চেষ্টা

করছে। ডিক আর এমেলিন এক মজার খেলা পেয়ে হাসতে হাসতে বাটনকে ঘিরে নাচতে থাকল।

'প্যাডি, ইঁদুর-ইঁদুর।' ডিক নাচতে নাচতে বলল।

'ওগুলান মোর সামনে এসে গেছে।।' খাবলা দিয়ে একটা কাল্পনিক ইঁদুরের লেজ ধরবার চেষ্টা করে বলে, 'গেল, বেজন্মাগুলান পাইলে গেল।—ঠাকুর, ঠাকুর, ইসব কি করছি আমি। মোরে বোকা বানাচ্ছি কেনে আমি?'

'চালিয়ে যাও প্যাডি—চালিয়ে যাও,' চেঁচিয়ে ডিক বলে, 'থেমনা প্যাডি। ওই দ্যাখো, আরও কত ইঁদুর তোমার পিছন পিছন আসছে।'

'চুপ করবে?' বালুতে বসে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাটন বলল, 'ওরা চলে গেছে।'

খেলা ভঙ্গ হওয়াতে মনক্ষুন্ন ডিক আর এমেলিন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা নতুন খেলার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। লেগুন থেকে হঠাৎ একটা ঘোড়ার মত জলজ প্রাণী লফিয়ে উঠে ডাঙ্গায় পড়ে। এই দৃশ্য দেখে বাটন আর হামাগুড়ি না দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ছুটতে থাকে আর চীৎকার করে বলতে থাকে, 'ডিক, ডিক। ওকে তাড়াও, ওকে তাড়াও। দেখছ না ঘোড়াটা মোরে তাড়া করেছে?'

'কি মজা, কি মজা।' বাটনের পিছনে ছুটতে ছুটতে ডিক বলতে থাকে।

ছুটতে ছুটতে এক সময় বালুর উপর বসে হাঁপাতে থাকে বাটন। বলে, 'থাক, এখন বেশ আছি। এর পর মোরে যদি কেউ তাড়া করে তবে আমি সমুদ্দরে ঝাঁপ দেব।'

গাছের ছায়ায় সে শুয়ে পড়ে বাচ্চাদের চলে যেতে বলে। তার ঘুম পাচ্ছে। ওরা বুঝল এবার খেলা শেষ হয়ে গেছে। ডিক আর এমেলিন ওখান থেকে চলে এলে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ছ'ঘন্টা এক নাগাড়ে ঘুমাল বাটন। অনেক দিন পরে সে সত্যি সত্যি ঘুমাতে পারল। ঘুম যখন ভাঙ্গল, সে সুস্থবোধ করছিল। কিন্তু মানসিক দ্বিধাগ্রস্থতায় আচ্ছন্ন।

রাত্রির দ্বিতীয় ঘুমের পর সকালে বাটন যেন নতুন জীবনের শক্তি লাভ করেছে। চোখের সামনে ভীতিজনক আর কিছু সে দেখছেনা। লেগুনের পাড় ধরে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পূব দিগন্তের সূর্য উঠছিল ডুবো পাহাড়ের খাড়ির ফাঁকে। সেদিকে তাকিয়ে তার মন অনুশোচনায় ভরে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে খিস্তি করল মদ জাতীয় সব জিনিষকে। জীবনে আর মদ স্পর্শ করবেনা বলে প্রতিজ্ঞাও করল। কিন্তু পিপের পদার্থকে লেগুনের জলে বিসর্জন দিতে তার মন সায় দিল না। ডিঙ্গিতে পিপেটা

তুলে নিয়ে ডুবো পাহাড়ের কাছে গিয়ে বড় একটা প্রবাল স্তূপের নিচে ওটাকে রেখে ফিরে এল আবার।

পরবর্তী ছ'মাসের মধ্যে সে ওদিকে তাকাল না পর্যন্ত। ইতিমধ্যে আর একটা তিমি শিকারী জাহাজ জল ভরতে এসে দ্বীপটাকে তছনছ করে গেছে। আবার ওরা তিনজন জঙ্গলের গভীরে আশ্রয় নিয়েছিল। চলে যাবার পর বাটন চিরাচরিত প্রথায় খিস্তি করেছে তাদের।

এরপর থেকেই লুকানো পিপেটা বাটনকে আবার জ্বালাতন শুরু করল। ছোট দিন লম্বা হল প্রাকৃতিক পরিবর্তনে। লম্বা দিনগুলি বড় ক্লান্তিকর। ডিক আর এমেলিনের অবশ্য এতে কোন কষ্ট নেই। আরও বেশি সময় পেলে প্রাণ প্রাচুর্য আর স্বাস্থ্যে ভরপুর এই দু'জনের সুখ ও আনন্দ বেড়ে গেছে। কিন্তু বাটনের কাছে এই দিনগুলি ভিন্ন রূপ নিয়ে এল। লুকানো পিপেটার ফিসফিস করে আহ্বান তার কানে ক্ষণে ক্ষণেই ভেসে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পিপেটার সোচ্চার আমন্ত্রণ স্বীকার পর্যন্ত বাটনের কানে আসে। দু'হাতে কান চেপে ধরে সে আমন্ত্রণ অস্বীকার করবার চেষ্টা করে।

নিজেকে ব্যস্ত রাখবার জন্য ডিক আর এমেলিনের সঙ্গে থাকে বাটন। এমেলিনের জন্য আর একটা পোষাক বানিয়ে দেয়। কাঁচি দিয়ে চুল ছেঁটে দেয় ডিকের। রাত্রিতে, রামের লোভ দূর করবার জন্য ওদের দু'জনকে গল্প বলে। আর এমনই ব্যাপার, গল্পটা হয় জ্যাক ডগার্থি এবং জলপরীদের গল্প। জলপরীরা জ্যাককে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় জলের তলায় ওদের রূপকথার দেশে। নানারকম সুস্বাদু খাদ্যের ভোজ হবার পর জ্যাককে দেওয়া হয় একটা বোতল—আর বোতলটি-রাম-এর।

বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে নিজের বলা গল্প বাটনকেই তাড়া করে। মদের জন্য সে এত ব্যাকুল হয়ে পড়ে যে কোন কিছুই আর তাকে ধরে রাখতে পারেনা। ডিঙ্গি নিয়ে ভেসে পড়ে সে।

কিছুক্ষণ পরে, তাকে দেখা যায় চাঁদের আলোয় ভরা একটা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে। এক হাতে জ্বলন্ত পাইপ আর অন্য হাতে কচ্ছপের খোলে রাম। লেগুনের এই পাড়ে বাতাস বয়ে আনে বাটনের সুখী কণ্ঠস্বর। সে মন খুলে গান গাইছে।

এক সময় সে উঠে দাঁড়াল। নৌকা বেয়ে ফিরে এল আওয়া গাছের নিচে। বাচ্চাদের ঘুম যাতে ভেঙ্গে না যায় তার জন্য যথেষ্ট সাবধান হল সে। গাছে নৌকাটাকে ভাল করে বেঁধে সে জুতো, কোট খুলে ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতার কেটে সে পাহাড়টার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। লেগুনে রাত্রির স্তব্ধতা কে

ভাঙ্গছে—দেখবার জন্য জলে ভেসে উঠল কালো এক ত্রিকোণ ছায়া। তারপর আবার টুপ করে ডুবে গেল। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত বাটন পাথরের গা বেয়ে উঠে পিপেটার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়। পিপেটার গায়ে হাত রেখে সে ভুলে যায় তাকে কি করতে হবে। তারপর ক্লান্তি, শ্রান্তি আর অবসাদে ওটাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

'প্যাডি গেল কোথায়?'

সকাল হলে বাটনকে দেখতে না পেয়ে ডিক নিজেই খাবার দাবারের জোগাড়ে লেগে যায়। আগুন জ্বালাবার জন্য শুকনো গাছের ডাল পা দিয়ে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ডিক বলে, 'বালুতে ওর কোট জুতো, চকমকি সব পড়ে আছে। গেল কোথায়?'

এমেলিন কাছে বসে ডিকের কাজ দেখছিল। এই জগতে এখন তার দু'টি ভগবান আছে। প্যাডি বাটন ও ডিক। বাটন হল পাইপের তামাকের ধোঁয়ার রহস্যে মোড়া দুর্বোধ্য ভগবান। আর ডিক, যদিও সহজবোধ্য কিন্তু সাথী এবং রক্ষাকর্তা হিসাবে প্রশংসনীয় নয়। দ্বীপের এই আড়াই বছরের বসবাসকালে সে কিছুটা লম্বায় বেড়েছে। দেহ হয়েছে শক্তিশালী। বাটনের মতই সে নৌকা বাইতে পারে, আগুন জ্বালতে জানে। বলতে গেলে শেষে কয়েকটা মাস বাটন শুধু রাম' এর পাত্র হাতে নিয়ে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। রান্নাবান্না, মাছধরা, ফলমূল সংগ্রহ প্রায় সবটাই করেছে ডিক।

'এম, এদিকে এস। চকমকির বাক্সটা দাও।' ভাঙ্গা কাঠকুটো জড় করতে করতে ডিক হাঁক দেয়। তারপর আগুন ধরিয়ে রুটি ফল সেঁকতে বসে যায়।

এমেলিনও বসে থাকেনা। বেতের ছড়িতে মাছ গেথে ওগুলি সেঁকতে বসে যায়। এক একদিন এমেলিনের হাতে মাছগুলি আগুনে ঝলসানো থেকে পুড়ে কাঠ হয়ে যায়। ডিক তখন বকাবকি করতে থাকে। সে পাকা রাঁধুনীর মত কাজ করতে চেষ্টা করে। ঘাঘরা পরা অবস্থায় সে যখন কাজ করতে থাকে, অপূর্ব দেখায় তাকে। আগুনের উত্তাপে ঠোঁট কুঞ্চিত করে সে।

'প্যাডি।' কাজ করতে করতেই ডিক হাঁক দেয় বাটনের উদ্দেশ্যে। নারকেল গাছগুলি থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে শুধু। বাটনের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। 'ওর জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। রাত্রিরে নিশ্চয় মাছ ধরবার জন্য লেগুনে বড়শি ফেলে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

এমেলিনের কাছে বাটন ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি হলেও ডিকের কাছে কিন্তু সে একজন কর্মপটু নাবিক বলেই গণ্য হত। তাদের কুটিরটি প্রায়ই মেরামতের প্রয়োজন হত। প্রতিদিনই নানা অজুহাতে বাটন কাজটা পিছিয়ে দিত। জীবন ধারনের দৈনিক কাজে ডিক অনেক পরিশ্রম করত এবং দুঃসাহস দেখাত। কিন্তু বাটনের ধীরে এবং

খেয়ালখুশি মত চলার প্রেরণায় বেশি দূর এগোতে পারত না ডিক।

'প্যাডি! কোথায় তুমি?'

খেতে খেতে এবং খাওয়া শেষ করে অনেক বারই ডিক ডাকতে থাকে বাটনকে। ওরা দু'জন কান পেতে থাকে, যদি বাটনের সাড়া পাওয়া যায়। একটা পাখী উড়ে গেল। দৌড়ে গেল একটা গিরগিটি। ডুবো পাহাড়ে ঢেউ-এর আঘাতে শব্দ ভেসে এল। বাতাস গাছের মাথা নাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু বাটনের কোন সাড়া নেই।

এক দৌড়ে ডিক আওয়া গাছের তলায় ঘুরে এসে এমেলিনকে বলে, 'আশ্চর্য! ডিঙ্গিটা পর্যন্ত আছে ওখানে। কিন্তু গেল কোথায় প্যাডি?'

'জানিনা।' কান্না গলায় এমেলিন বলে। ইতিমধ্যে তার মনে একাকিত্বের অনুভূতি শুরু হয়ে গেছে।

'চল, পাহাড়টার মাথায় যাই।' ডিক বলল, 'ওখানে নিশ্চয় ওকে পাওয়া যাবে।'

পাহাড়ের মাথায় উঠতে উঠতে ওরা বাটনের নাম ধরে ডাকতে থাকে। প্রতিধ্বনিই শুধু সাড়া দেয়। কখনো ওদের চীৎকারে এক ঝাঁক পাখী গাছ ছেড়ে উড়ে যায়।

পাহাড়ের মাথায় বড় পাথরটা ছায়া ফেলে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে সমুদ্রের ঢেউ দেখা যাচ্ছে। গাছের পাতাগুলি বাতাসের ঝাপটায় নাচছে। বাতাসের বেগ বেশি। প্রশান্ত মহাসাগরের বহুদূরের কোন অংশে হয়তো এখন হ্যারিকেন-ঝড় চলছে। তারই রেশ এসে পৌঁছাচ্ছে এই দ্বীপে।

'আরে, ওই যে প্যাডি!'

ডুবো পাহাড়ের খাড়ির দিকে আঙ্গুল তুলে ডিক এমেলিনকে দেখায়। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে পিপের পাশে একটা উঁচু হয়ে ওঠা প্রবাল স্তূপের ছায়ায় আরাম করে শুয়ে আছে বাটন। ডিক নিচে থাকতেই যদি ওদিকে তাকিয়ে দেখত, তবে আর তাকে পাহাড়ের মাথায় উঠতেই হতনা।

'ও ঘুমাচ্ছে।' ডিক বলল।

'ডিকি, ডিঙ্গিটাতো এখানেই রয়েছে। ও গেল কি করে ওখানে।' এমেলিন বলল।

'কি, জানি। যে ভাবেই হোক গেছে। এম, চল আমার নৌকা করে ওখানে যাই। তারপর ওর কানে কু দেব দেখবে লাফিয়ে উঠবে প্যাডি।'

পাহাড় থেকে নেমে এল ওরা। আসতে আসতে অনেক ফুল জোগাড় করে এমেলিন মালা গেঁথে নিল।

'কি সব বানাচ্ছো?' ডিক জিজ্ঞেস করল। আসলে এমেলিনের এই মালা বানানোর শখকে সে করুণা ও বিরক্তি নিয়ে দেখত।

'এই মালাটা মিঃ বাটনের মাথায় পরিয়ে দেব।' এমেলিন বলল, 'তুমি যেই কানে কু দেবে, ও লাফিয়ে উঠবে, তখন মালাটা গলায় ঝুলবে।'

এমেলিনের এই বুদ্ধিতে ডিক মজা পেয়ে হেসে উঠল। ফালতু মালাও যে কখনো কখনো মজা দিতে পারে, একথা ভেবে খুশি হল সে।

ডিঙ্গির কাছে গিয়ে দড়ি ধরে টেনে ডিক ওটাকে পাড়ে এনে এমেলিনকে চড়তে বলল। খুব সাবধানে উঠে গলুইতে বসল এমেলিন। একটা ধাক্কায় ডিঙ্গিটাকে জলে নামিয়ে বৈঠা নিয়ে বসল ডিক।

পৌঁছানোর পর—জায়গাটাতে খুব সাবধানে নৌকাটাকে ভিরিয়ে বেঁধে রাখল। সাবধানতা এই কারণে যে বাটনের যেন ঘুম ভেঙ্গে না যায়। তা'হলে মজাটাই নষ্ট হবে। এমেলিনও নৌকা থেকে নামল। উঁচু নিচু শক্ত উঠে থাকা প্রবাল স্তূপে এমেলিনের খালি পায়ে হাঁটতে কষ্ট হয়। কিন্তু ডিকের পায়ের তলায় চামড়া অনবরত রুক্ষ প্রান্তরে হেঁটে হেঁটে অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে। তবু পা টিপে টিপে ওরা এগিয়ে চলল! এমেলিনের হাতে ফুলের মালা।

ডুবো পাহাড়ে এখন পূর্ণ জোয়ার। ঢেউ-এর আছড়ে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ যেন গীর্জায় গম্ভীর অর্গানের ধ্বনি। বাতাসের সঙ্গে জলের ছাঁট আর অশরীরী পক্ষীর মত সী-গালগুলি হি হি হি করে ডেকে যাচ্ছে।

প্যাডি বাটন ডান কাত হয়ে শুয়ে আছে। ডান হাতের কনুই'এর নিচে তার মাথা। বা হাতের ট্যাটু করা হাতটা পাছার উপর লম্বমান। মাথায় টুপি নেই। ধূসর বর্ণের চুল বাতাসে উড়ছে।

পা টিপে টিপে ডিক আর এমেলিন ওর কাছে এগিয়ে যায়। এমেলিন এক ঝলক হাসি হেসে তার মাথায় ছুঁয়ে দেয়। ডিক হাঁটু গেড়ে বসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফু দিল। কিন্তু ও পক্ষ থেকে নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল না।

'প্যাডি।' ডিক চেঁচায়, 'ওঠো, ওঠো!'

ডিক তার কাঁধ ধরে তুলবার চেষ্টা করলে বাটনের শরীর কাত হয়ে ওদের দিকে ঘুরে গেল চিৎ হয়ে। চোখ দুটো শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হা করে আছে মুখ। হা করা মুখ থেকে একটা কাঁকড়া বেরিয়ে এসে ছুটে পালিয়ে গেল। বাটনের মুখের আধখানা প্রবালের শূককীটেরা খেয়ে ফেলেছে।

এমেলিনের গলা থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকারের পর চীৎকার বেরিয়ে আসতে থাকল। ডিক ওকে ধরে না ফেললে সে হয়ত পড়েই যেত। এমেলিনকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চিৎ হয়ে দু'হাত ছড়িয়ে শুয়ে থাকা বীভৎস মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল ডিক। তারপর প্রচণ্ড ভাবে ভয় পেয়ে এমেলিনকে টানতে টানতে নৌকাটার কাছে নিয়ে আসে। মানসিক যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল এমেলিন। জলে ডোবা লোকের মত সে হাঁপাচ্ছিল।

ডিকের মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা। পালাও—এখান থেকে পালাও। যেখানে

হোক, কোথাও হোক—পালাও। এমেলিনকে কোনরকমে নৌকায় তুলে দিয়ে সে লাফিয়ে উঠে পড়ে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ডিক প্রচণ্ড বেগে বৈঠা বেয়ে.চলল। ওখানে কি হয়েছে, কেন হয়েছে—জানবার মত ক্ষমতা তার নেই। এক অজানা আতঙ্কের হাত থেকে দূরে সরে যাবার জন্য প্রাণপণে নৌকা বেয়ে চলেছে ডিক।

বাক্যহীন এমেলিন নৌকার একপাশে মাথা রেখে নীল আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। জোয়ারের ধাক্কায় বেলাভূমিতে নৌকা উঠে গেলে এমেলিন লুটিয়ে পড়ে। সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

সেই রাতে বাটনের অনুপস্থিতি ওদের কাছে ভয়ংকর হয়ে উঠল। ছোট কুটিরটিতে দু'জনে জড়াজড়ি করে বিনিদ্র রাত কাটায়। ভয়ে, আতংকে ওরা বাক্যহীন। খোলা দরজাটার দিকে বারে বারে চোখ পড়েছে ওদের, এই বুঝি বাটনের বিরাট শরীরটা জুড়ে দাঁড়ায়!

বাটন সম্পর্কে একবারও আলোচনা করবার মত সাহস পায়নি ওরা দু'জন। বৃদ্ধ নাবিকের কি হয়েছে তারা জানে না। কিছু একটা হয়েছে, ভয়ংকর কিছু এটুকু বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতেও ওদের সাহস নেই।

সেই অঘটনের দৃশ্য দেখার পর ডিক দ্রুত নৌকা বেয়ে পাড়ে এসেছে। চেতনাহীন এমেলিনকে নৌকা থেকে বহন করে নিয়ে এসেছে কুটিরে। তারপর দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যে হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে রাত হয়। এখন, অন্ধকার রাতে, সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে ডিক শুধু এমেলিনকে নির্ভয় করবার চেষ্টা করেছে। বোঝাবার চেষ্টা করেছে। বোঝাবার চেষ্টা করেছে সে থাকতে এমেলিনের কোন ভয় নেই। কিন্তু আতংকিত এমেলিন কি ডিকের কথায় সান্ত্বনা পেয়েছে?

এই দুটি শিশু দর্শন শাস্ত্র শেখেনি। জীবনকে দর্শনের বর্মের আড়ালে রেখে ভাবতে পারছে না যে মৃত্যুই হল মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি। জন্মিলে মরিতে হবে। অথবা মৃত্যু হল জীবনের দরজা। কিন্তু যে অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য তারা দেখেছে, তা হল মৃত্যুর বাস্তব কঠিন রূপ। ধর্মের প্রলেপ, মহাপুরুষের বাণী অথবা কবির কাব্য তাদের মন থেকে এই আতংক মুছে ফেলতে পারবে কি? এক বৃদ্ধ নাবিকের পচে ওঠা শবের খোলা স্থির দুটি চোখ, হা করা মুখ থেকে কাঁকড়া বেরিয়ে আসছে—এই দৃশ্য তাদের মন থেকে কে মুছে দেবে? ঈশ্বরের বিশ্বাস কি তাদের ভয় দূর করবে। অথবা তোতা-পাখীর মত প্রার্থনার স্তবক মুখস্থ করালে কি এই তাদের বেদনা, যন্ত্রনা দূর হয়ে যাবে?

এই ভয়ংকর দুঃখের রাতে এই দু'জন নিজেদের ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতে পারে, জানতে পারে। ডিককে নিজেকে আবিষ্কার করে এমেলিনের রক্ষাকর্তা হিসাবে। এই অন্ধকার বিনিদ্র রাতে ডিকের মধ্যে জেগে ওঠে পৌরুষের সুপ্তবীজ। যেন এক বিশেষ পরিবেশে একটা চারাগাছ রাতারাতি বৃক্ষে পরিণত হয়।

রাত্রিশেষে এমেলিন ঘুমিয়ে পড়লে নিঃশব্দে কুটির ছেড়ে বাইরে আসে ডিক। সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকে সে। আকাশে প্রত্যূষের আলো। সকালের হাওয়া ভেসে আসছে সমুদ্র থেকে। জোয়ার আসছে। ডিঙ্গিটা জলে ভাসছে। গতকালের সকাল আর আজকের সকালে কত পার্থক্য।

এই মুহূর্তে ডিক স্থির করে ফেলল—ওদের চলে যেতে হবে এখান থেকে। কিন্তু কোথায় যাবে তারা? কোথায়—ডিক জানে না। তবু যেতেই হবে।

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠছে। নারকেল গাছগুলি সূর্যের আলো মাথায় নিয়ে বড় বড় পাতা আন্দোলন করতে থাকে ভেসে আসা বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে।

ডিক মনস্থির করে নেয়। কুটির থেকে সমস্ত জিনিষপত্র একে একে বয়ে নিয়ে ডিঙ্গিতে জমা করতে থাকে। জলের পাত্র ভরে নেয় ঝর্ণার জল। কিছু কলা আর রুটি-ফল ডিঙ্গিতে তুলে নেয়। গত রাতের অভুক্ত খাদ্য বস্তুগুলিও ফেলে দিল না।

নৌকা বোঝাই করে যখন আবার কুটিরে ফিরে এল, এমেলিন তখনো ঘুমাচ্ছে। ওর ঘুম এত গাঢ় ছিল যে ডিক যখন ওকে দু'হাতে তুলে নিল, এমেলিন টেরও পায়নি। এমেলিনকে নৌকার পাটাতনে সাবধানে শুইয়ে দিল সে। নৌকা ঠেলে লাফিয়ে উঠল ডিক। তারপর লেগুনের পাড় বাঁ হাতে রেখে তীরের কাছাকাছি নৌকা রেখে বৈঠা বাইতে লাগল। ডুবো পাহাড়ের দিকে তাকাবেনা বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু তার চোখ ওদিকে পড়ছিল বারে বারেই। ওখানে অসংখ্য পাখীর ঝাঁক। নিজেদের মধ্যে চীৎকার, ঝগড়া আর মারামারি করছিল পাখীগুলি। সী-গালের হি-হি-হি-শব্দ আর ডানার ঝটপটানি শুনতে পাচ্ছে ডিক। একটা বাঁকে নৌকা ঘুরে যেতে দৃশ্যটা চোখের আড়ালে চলে গেল।

পাড় ধরে ডিক নৌকা বেয়ে চলে। অনেক কাঁঠাল গাছ, রুটি-ফলের গাছ, ফার্ণে ভরা বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, নারকেল গাছের সারি পার হয়ে যায়। আশ্রয় নেবার মত কোন জায়গাই আর পছন্দ হয়না ডিকের। কোথাও বনের ঘনত্ব বেশি, কোথাও তৃণভূমিতে ফার্ণেরা বেশি সংঘবদ্ধ। ডিক খুঁজছে খোলা মেলা জায়গা। সমস্ত দ্বীপটা ঘুরে আসবার পর হঠাৎ পছন্দমত জায়গা দেখতে পেল ডিক।

স্তব্ধ নীল জলের ধারে দুপাশে ঘন বনের সমষ্টির মাঝখানে একটা উদ্যান। পরিস্কার জায়গাটা ধীরে ধীরে উঠে গেছে উঁচু হয়ে। বড় বড় রুটি ফলের গাছ, তাল গাছের পাতা মৃদুভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। লেগুনের জল এখানে অগভীর কিন্তু এত স্বচ্ছ যে নিচে যেন নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বল রং ছড়িয়ে রয়েছে। ডুবো পাহাড়ের দূরত্ব এখান থেকে অনেকটা। বিস্তৃত সমুদ্রের অংশ এখান থেকে দৃশ্যমান।

ডিক নৌকা ভিড়াল পাড়ে। এমেলিন গভীর নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে। উঠে বসে চারিদিকে তাকায়। এক নতুন পৃথিবীতে এসে গেছে তারা।

চতুর্থ খণ্ড

শ্যামল তৃণাবৃত জমির উপর, দু'পাশে দুটো গাছের মাঝখানে কুটিরটা দেখা যাচ্ছে। কুটিরটা ছোট—মুরগি রাখবার ঘরের থেকে বড় নয়, কিন্তু অনন্ত গ্রীষ্মপ্রধান জায়গার জন্য দু'জনের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। বাঁশের তৈরি কুটিরটা আচ্ছাদন হয়েছে ছোট ছোট তালপাতার দ্বিগুণ আস্তরনে। এত সুন্দরভাবে এটা বানানো হয়েছে, দেখলে মনে হয় অনেক ওস্তাদ কারিগরের হাত এতে পড়েছে।

কাঁঠাল গাছের পাশে কিছু অংশ পরিস্কার করে সেখানে টারোমূল ও মিষ্টি আলুর চাষ হয়েছে। কুটিরের ডান দিকে বনের বিস্তৃতি শুরু। তার আগে বৈচি গাছ বেড়ার মত নারকেল গাছের কুঞ্জকে ঘিরে রয়েছে।

কুটিরের দরজা আছে কিন্তু দরজার কোন পাল্লা নেই। প্রায় দোচালার আকারে কুটিরটি তৈরি। ভিতরে প্রচুর খালি জায়গা। মেঝেতে শুকনো সুগন্ধি ফার্ণের গালচে। দরজার দুপাশে নৌকার পাল গুটিয়ে রাখা। দেয়ালে একটা এবরো খেবরো তাক। সেখানে নারকেলের মালার বাসন সাজান আছে। কুটিরের অধিবাসিরা রাত্রি ছাড়া এখানে বাস করেনা।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে একটা রুটি গাছের ছায়ায় বসে থাকা একটা মেয়ের নগ্ন পা দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির বয়স পনের কিংবা ষোল। ঘাঘরা পরনে না থাকলে তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন বলা যেতে পারত। তার কালো লম্বা চুল সামনে থেকে টেনে পিছনে একটা লতা দিয়ে বাঁধা। কানের পাশে একগুচ্ছ টকটকে লাল ফুল গোঁজা। তার মুখশ্রী অপরূপ সুন্দর। রোদে পোড়া ফুটকি ফুটকি দাগে আবৃত। গভীর নীল চোখ। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সে বসে আছে। তার সামনে উজ্বল নীলা প্রবাল রংয়ের ঠোঁট নিয়ে একটা পাখী ঘাসের উপর নেচে বেড়াচ্ছে।

মেয়েটি এমেলিন লেষ্ট্রেঞ্জ।

এমেলিন এখন পাখীটিকে খাওয়াচ্ছে। দু'বছর আগে মা-পরিত্যক্ত, অভুক্ত এই পাখীটিকে বাচ্চা অবস্থায় বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিল ডিক। ওরা দু'জন ওকে খাইয়ে পড়িয়ে পোষ মানিয়ে ফেলেছিল। সেই থেকেই পাখীটি এই ছোট্ট পরিবারের সদস্য।

'কোকো, বলতো ডিক কোথায়?' এমেলিন পাখীটিকে প্রশ্ন করে। পাখীটা তার ঘাড় ঘুরিয়ে ডিকের জন্য এদিক ওদিক তাকাতে থাকলে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে এমেলিন হাসতে থাকে। কে বলবে এই সেই ছোট্ট মেয়ে এমেলিন। বিশ্বাস করা যায় না—এই ছোট মেয়েটির ভিতর থেকেই সুগঠিত, পূর্ণ-বিকশিত, সুন্দরী এক

যুবতীর জন্ম নিয়েছে।

পাঁচটা বর্ষাকাল ইতিমধ্যে এই দ্বীপের উপর দিয়ে চলে গেছে। পুরানো জায়গায় ওরা আর কখনই ফিরে যায়নি। কোন জাহাজ হয়তো সেই আগেকার জায়গায় এসে থাকতে পারে। কিন্তু তারা কখনোই লেগুনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি।

ডিক এক এক সময় নৌকা নিয়ে পুরানো জায়গার আশে পাশে যেত। তার প্রধান কারণ কলা সংগ্রহ। এই জায়গায় কলাগাছ নেই বললেই চলে। সেদিনের সেই ভীতি আর ভয়ংকর দৃশ্য এমেলিনের স্মৃতি থেকে মুছে না গেলেও ডিক কিন্তু ওসব ব্যাপার একেবারেই ভুলে গেছে। গত পাঁচ বছরে ডিককে তিনবার কুটির নতুন করে বানাতে হয়েছে। কুটিরের দু'মাইলের মধ্যে প্রতিটি জায়গা তার চেনা হয়ে গেছে। প্রতিটি পাখী, জীব ও পতঙ্গকে সে চেনে—যদিও তাদের নাম জানেনা। এই পাঁচ বছরে সে অনেক আশ্চর্য জিনিষের মধ্যে একটা তিমির সঙ্গে সমুদ্রের অন্য জীবদের মৃত্যু লড়াই দেখেছে। পিছনের বনে সে অনেক রকম ফল আবিস্কার করেছে, ফলে এখানে খাদ্যাভাব নেই।

এমেলিন যখন কোকোকে ডিকের কথা জিজ্ঞেস করছিল, ডিক তখন বনের ভিতর বেত কাটায় ব্যস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো বেতের বড় টুকরো টানতে টানতে সে হাজির হল। পরনে একটা ছেঁড়া প্যান্ট, স্বাস্থ্যে ভরপুর। শরীরের বাকি অংশ নগ্ন। সোনা-হলুদ চুল মাথা জুড়ে লম্বা—দেখলে মনে হয় ষোল নয় সতের বছর বয়স হয়েছে। নিরলস, নির্ভীক ছাপ চোখে মুখে। ও যেন অর্ধ-শিশু, অর্ধ-মানব। অর্ধ-সভ্য, অর্ধ-বন্য। পাঁচ বছরের বন্য জীবন তার দেহে যেমন প্রগতি এনেছে মনের দিকে হয়েছে তার বিপরীত। ইচ্ছে না হলে কথা বলে না। এমেলিনের প্রশ্নের জবাবে তার বাক্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু আপন মনে কথা বলার এক স্বভাব হয়েছে তার। কথাগুলি শুনলে মনে হবে অতি সাধারণ কথা—যার কোন মানে নেই। বর্তমান-ই তার সম্বল। অতীত তার কাছে হারিয়ে গেছে।

তবু কখনো কখনো তার নিঃসঙ্গতা ভিন্ন রূপ পায়। জলের উপর মুখ রেখে জলের নিচের বিচিত্র জীবন আগ্রহ নিয়ে দেখে। কখনো একটা পাথরের উপর বসে ঘন্টার পর ঘন্টা পাখী অথবা গিরিগিটিদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বন থেকে এসেই ডিক বেত ছুলতে বসে। ছুরি দিয়ে বেতের ডগা তীক্ষ্ণ করে।

'কি বানাচ্ছ তুমি?' এমেলিন প্রশ্ন করে।

'মাছ-মারা কোচ।' ডিকের উত্তর।

ডিকের দিকে তাকিয়ে থাকে এমেলিন। জীবনে সে অনেক কিছুই হারিয়েছে। তার লেস্ট্রেঞ্জ কাকু, নার্স মিসেস ষ্ট্যানার্ড, পরম বন্ধু বুড়ো মিঃ বাটন, তার অতি সাধের বাক্সটা। স্বপ্নের মত সব মিলিয়ে গেছে। এখন ডিক-ই তার একমাত্র সহায়, অবলম্বন। ডিকও যদি হারিয়ে যায়, এই ভয় তার মন অহরহ কাঁপে। এই দ্বীপে সম্পূর্ণ

একাকীত্ব নিয়ে থাকবে কি করে? তার চোখে ডিকের এখন ভিন্ন রূপ। নিজের সত্বা বলে কোন কিছুই আর অবশিষ্ট রাখেনি এমেলিন। ডিককে বাদ দিয়ে কোন কিছুই ধারণায় আনতে পারে না সে!

এসব কথা অবশ্য এমেলিন কখনো মুখ ফুটে বলে না। সেই বাল্যকাল হতেই তার দুঃখ, বেদনা, আনন্দ—সব কিছুই নিজের মনের গোপন কুঠরিতে লুকিয়ে রাখতে সে অভ্যস্থ। অথচ এই দ্বীপে অজস্র প্রস্ফুটিত জীবনের সঙ্গে ভয়ংকর মৃত্যু জড়িত।

বেতের ডগা সরু কবে ডিক উঠে দাঁড়ায়। এমেলিন জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'খাড়িতে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

ডিক কুটিরে গিয়ে ছুরিটা রেখে আর সঙ্গে লায়লা লতা কিছু নিয়ে আসে। বড় মাছ মারা হলে এগুলি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা যায়। ডিঙ্গির কাছে এগিয়ে যায় সে। এমেলিন ডিঙ্গিতে চড়লে সে বৈঠা বাইতে শুরু করে। জোয়ারে জল নেমে যাচ্ছে।

ভাঁটায় লেগুনের জল বিপজ্জনক। এখানে অনেক অজানা গর্ত আছে, বিচিত্র আগাছায় ভর্তি মরণ ফাঁদ আছে। পচা প্রবালের স্তুপে যে কেউ ডুবে গেলে জন্মের মত হারিয়ে যাবে। তা ছাড়াও ক্রান্তিয় দ্বীপগুলিতে পদে পদে কত রকমের যে বিপদ—তার ঠিক নেই। কিন্তু অনেক দিন ধরে এসব অঞ্চলে ডিক ঘুরে বেড়িয়েছে। সমস্ত কিছু তার জানা।

একটা প্রবাল দ্বীপে ডিঙ্গি থামল ডিক। এমেলিনকে নৌকা থেকে নেমে সাহায্য করল। সূর্য এখন পশ্চিমের আকাশে ঝুলে পড়েছে। জোয়ারের জল অর্দ্ধেক বেরিয়ে গেছে। বদ্ধ জলাশয়ে সূর্যের আলো পড়লে ঝলমল করছে যেন একটা চকচকে ঢাল। একটা প্রবাল স্তুপের ধারে বসে ডিক খুলে ফেলল তার পুরানো প্যান্টটা।

এমেলিন ঘাড় ফিরিয়ে অন্য একটা দূরের পাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। এক সময় সে ডিককে দেখতে পেল প্রবালের পাড় ধরে ছুটছে। কোচ হাতে ওকে মনে হচ্ছিল যেন একটা বন্য বর্বর মানুষ। পর মুহূর্তে সমুদ্রের একটা ঢেউ ডিককে ঢেকে ফেলে। ঢেউ-এর উপর সে লাফাচ্ছে। ঢেউ নেমে গেলে তার নগ্ন দেহ চিক চিক করে উঠল। তারপর সে আবার দৌড়ে যাচ্ছে। নিষ্ঠুরভাবে জলের ভিতর কোচ চালাচ্ছে। কোচ তুলে আনলে দেখা গেল উজ্বল মাছ বিদ্ধ হয়ে ছট ফট করছে। সৈকত অথবা বাসস্থানের ডিক, আর এখন এই শিকারী ডিক যেন এক নয়। মাছের পর মাছ মারবার নেশায় সে উন্মত্ত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ ধরতেও তার কোন কষ্ট নেই।

প্রায় একশ গজ দূরে বসে এমেলিন এসব দেখছিল। আর তার অনুভূতিপ্রবণ মন দেখছিল সমুদ্র ও সমুদ্রতলের কত রং-এর খেলা। কত রকম প্রবাল স্তুপ, কত

রং তাদের। হলুদ বরণ সামুদ্রিক ফুল—গাজরের মত। গোলাকার জেলি মাছ, কাটল মাছের খোলা, হাঙ্গরের দাঁত, মৃত স্কারাস মাছ, কাঁকড়া, সামুদ্রিক লংকা। এই এবং এর মত হাজারো সুন্দর অথবা ভয়ংকর জিনিষ লেগুনের এই অংশে আছে।

পরিশ্রান্ত ডিক মাছগুলি ডাঙ্গায় জমিয়ে রাখে পরে নিয়ে যাবার জন্য। কোচটা প্রবালের মেঝেতে রেখে দেয়। এবার তার স্নান করবার পালা। হাঁটু জলে নেমে সে আরও এগিয়ে যায়। আর সেই মুহূর্তে তার মনে হল কে যেন তার পা ধরে টানছে। পায়ের পাতায় ক্রমশ একটা দড়ি পেঁচিয়ে উঠছে। ভয়ে, আতংকে, যন্ত্রণায় সে চীৎকার করে উঠল। তখুনি জলে ছপাৎ শব্দ করে আর একটা শুঁড় জেগে উঠে তার বাঁ হাঁটু জড়িয়ে ধরল শক্ত কবে।

তন্ময় হয়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখছিল এমেলিন। আর তখুনি সে ডিকের চীৎকার শুনতে পেল। ওদিকে তাকিয়ে সে দেখল—নিশ্চল হয়ে জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে ডিক। দুহাত উপরে তুলে সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল এমেলিন। তারপর দৌড়ে গেল ডিকের কাছে।

'আমার কোচ— কোচটা!' ডিক চীৎকার করে বলল।

এমেলিন দেখল কিসের যেন দড়ি ডিকের সর্বাঙ্গে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে। জিনিষটা অতি কুৎসিত, বীভৎস। দ্রুত দৌড়ে সে কোচটা নিয়ে এল। এবার স্পষ্ট দেখতে পেল—দড়িগুলি জীবন্ত। ততক্ষণে একটা শুঁড় ডিকের বাঁ হাত জড়িয়ে ধরেছে। ডান হাত শুধু খোলা।

কোচটা ডিকের দিকে ছুড়ে দিয়ে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল এমেলিন। যদিও ভয়ে আতংকে সে বিবর্ণ, তবু ডিককে বাঁচাবার জন্য নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা ভাবছিল সে। এক মুহূর্তের জন্য ভয়ংকর জীবটিকে দেখতে পেল সে। ভীষণ আকৃতির এক বিষণ্ণ মুখ, চোখ দুটো ঘুরছে। চোখের নিচে পায়রার মত ঠোঁট। কিন্তু বুকের রক্ত হীম করে দেয় জীবটির চোখের দৃষ্টি। পাথরের মত ভাবলেশহীন, নির্বিকার। একটা অক্টোপাস।

জলের উপর আছড়ে অক্টোপাসের আর একটা শুঁড় ডিকের অন্য পা জড়িয়ে ধরল। সেই মুহূর্তে দানবটার চোখ লক্ষ্য করে কোচটা বসিয়ে দিল ডিক। জল কালিবর্ণ করে অক্টোপাস ডিকের বন্ধন মুক্ত করে দিল। প্রচণ্ড রাগে ডিক বারে বারে কোচটা দিয়ে বিদ্ধ করতে লাগল দানবটাকে।

এতক্ষণে নিজেকে ফিরে পেল ডিক। কপালের ঘাম মুছে সে কোচটার দিকে তাকাল। কোচটা ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেছে। এমেলিন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ওকে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে ডিককে চুমোয় ভরিয়ে দেয়।

'শয়তান—শয়তানটার চোখ দেখেছ তুমি! মনে হচ্ছিল যেন একশোটা চোখ আছে ওর।' ডিক বলল।

এমেলিন কোন কথা বলেনা। শক্ত করে ডিককে জড়িয়ে ধরে ও কখনো কাঁদছে কখনো হাসছে।

সূর্য অস্ত গেছে। প্যান্ট কুড়িয়ে নিয়ে পরে নিল ডিক। ধরা মাছগুলিকে নৌকায় তুলল্য। তারপর বাসস্থানের উদ্দেশে নৌকা বাইতে লাগল।

মাছ ধরবার উদ্দেশ্য নিয়ে ডিক নৌকা নিয়ে যাত্রা করে। আজ আর কাছাকাছি নয়। পুরানো জায়গায় সে যাবে। গতকালও এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে তার।

ভোর বেলা উঠেই সে মাছ মারার উদ্দেশ্যে বড়শি, সুতো আর টোপ নিয়ে রওনা হয়েছিল। যতক্ষণ তার নৌকা দৃষ্টির বাইরে গেল, এমেলিন হাত নাড়ছিল পাড়ে দাঁড়িয়ে। ডিকের অনুপস্থিতিতে তার নিঃসঙ্গ জীবন ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই দুঃখ বেদনার কথা কখনো সে প্রকাশ করেনা।

জায়গামত গিয়ে বড়শি ফেলেছিল ডিক। হঠাৎ সে অনুভব করে নৌকাটা ভীষণ ভাবে দুলে উঠল আর সুতোয় টান পড়েছে। একটা অ্যালবিকোর বড়শি গিলেছে। ঘন্টা খানেক যুদ্ধ চলল ডিক আর সামুদ্রিক জীবটির সঙ্গে। তারপরই ডিক হঠাৎ আবিষ্কার করল জলের উপর একটা ছায়া জেগে উঠেছে আর সুতো ঢিল হয়ে গেছে। সুতো টেনে নিয়ে দেখল অ্যালবিকোর মাথাটা শুধু বড়শিতে গাঁথা। বাকি অংশ কে যেন নিপুণ অস্ত্রপোচার করে কেটে নিয়ে গেছে। পরিশ্রান্ত ডিক দু'হাত তুলে তার প্রতিদ্বন্দ্বিকে গালাগালি করল। তারপর অ্যালবিকোরের মাথাটাও বড়শি থেকে খুলে জলে ছুঁড়ে দিল। আবার ভেসে উঠে বেহায়ার মত সেই অংশটুকুও আত্মসাৎ করে গভীর জলে ডুব দিল ছায়ামূর্তিটা।

ক্লান্ত, বিক্ষুব্ধ ডিক যখন ফিরে এসেছিল, দেখতে পেয়েছিল পাড়ে দাঁড়িয়ে এমেলিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

দাঁড় বেয়ে চলেছে ডিক। আরও তিন মাইল তাকে নৌকা বাইতে হবে। দাঁড় বাইতে বাইতে সে নিজের মনেই বক বক করে চলে। কিছুদিন হল নিজের মনে কথা বলা শুরু হয়েছে তার। কারণ অবশ্য এমেলিন।

ছমাস আগে পর্যন্তও ডিক নিজেকে নিয়ে খুশি ছিল। ঘুম, খাওয়া, শিকার, কুটির তৈরি করা, বনে আর খাড়িতে নতুন নতুন আবিষ্কার করা নিয়ে সন্তুষ্টই ছিল সে। কিন্তু এর পর এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে পেয়ে বসেছে তাকে। এই অস্বস্তি যে ঠিক—, এবং কেন, তা সে জানেনা। মধ্যে মধ্যে তার মন হয় এখান থেকে কোথাও চলে যায়।

গত কয়েক মাসে এমেলিনের এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করছে সে। যাকে

সে বাল্যকাল থেকে চিনতো, তার বদলে এ যেন অন্য এক মেয়ে। তাকে দেখায়ও অন্য রকম। ওর সৌন্দর্য সম্পর্কে ডিক যতটা সচেতন, তার থেকে বেশি সচেতন এমেলিনের দৈহিক পরিবর্তনে। এমেলিন এমন কতগুলি নতুন কাজ করছে যা ডিককে ভয়ংকর অসন্তুষ্ট করে! যেমন, সে চান করতে যাবে একা।

ডিঙ্গি বেয়ে সে খাড়ির কাছাকাছি এসে যায়। খাঁড়ির একটা অংশে আটকে যায় তার দৃষ্টি। যতবার সে এখানে এসেছে, একাবারও এদিকে না তাকিয়ে পারেনি ডিক। পাঁচ বছর আগের সেই আতংক তার মন থেকে মুছে গেছে। আজও সে ওদিকেই তাকিয়ে রইল। তারপর সৈকতে নৌকা ভিড়াল।

সৈকতে কিছু একটা হয়ে গেছে। বালুকা বেলা তছনছ। রক্তের ছাপ ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে কারা বুঝি আগুন জ্বেলেছিল। এখনো ধোঁয়া উঠছে সেখান থেকে। সৈকতে দুটো বড় গভীর দাগ। বড় ওজনদার ক্যানো সেখানে ভিড়েছিল।

গতকাল বিকেলে সম্ভবতঃ দূরের দ্বীপ থেকে দুটি ক্যানোতে চেপে অনেক লোক এখানে এসেছিল। এরপর এখানে কি হয়েছে তা রহস্যে আবৃত। সারারাত দামামা বেজেছে। কোন বিজয় উৎসবের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে এখানে। ডিকের মনে পড়ছে, এক সময় এমেলিন তাকে বলেছিল যে সে একটা ডুম ডুম শব্দ শুনতে পেয়েছে। বাতাস আর সমুদ্রের গর্জনে তা এতই স্পষ্ট ছিল যে ডিক মনোযোগ দিয়েও দেয়নি। আজ এই সব চিহ্ন দেখে ডিক বুঝতে পারল দ্বীপে আগন্তুক এসেছিল...এবং সারারাত উৎসব করে আজ ভোরে চলে গেছে। পাড়ে.লম্বা একটা দাগ কাটা—যা এখনো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এই দাগের ওপারে কোন পদচিহ্ন নেই। এর মানে হল, ক্যানোয় চেপে আসা আগন্তুকদের কাছে এই দ্বীপ ট্যাবু বা নিষিদ্ধ।

পাড়ে নেমে ডিক চারিদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। সে একটা তীবের ভাঙ্গা অংশ কুড়িয়ে পেল। কাঠের তৈরি বাটে লোহার অগ্রভাগ। একটু এগিয়ে নারকেল গাছের নিচে পড়ে আছে মৃত প্রাণীর কিছু বর্জিত অংশ। এগুলি যে উৎসর্গীকৃত কোন পশুর নয় বলাই বাহুল্য। কেননা, দ্বীপে ভেড়া বা ছাগল নেই এবং আদিবাসিদের নিয়মে ওই জাতীয় পশু ক্যানোতে বহন নিষিদ্ধ।

সৈকতের বালু সেই কথাই যেন বলতে চায়। একজন মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার পতনের ছাপ বালুর উপর সুস্পষ্ট ভাবে আঁকা। পিটিয়ে তাকে শুইয়ে ফেলে তার শরীরের ভিতর দিয়ে কোন অস্ত্র প্রবেশ করানো হয়েছে। তারপর তার কাটা মুণ্ডু টেনে নিয়ে গেছে কেউ। গত রাতের যুদ্ধের সাক্ষর আজও ছড়িয়ে আছে। চীৎকার, হুংকার, কুঠারের সংঘর্ষের শব্দ, তীরে শনশনানির অস্তিত্ব আজ আর নেই কিন্তু যুদ্ধের অশরীরী রূপ এখনো দেখা যাচ্ছে।

ডিক চারিদিকে তাকিয়ে ভাবল একটা বিপদ কেটে গেল! কিন্তু ওরা গেল কোন

দিকে? সমুদ্রের দিকে, না লেগুনের ভিতর? নিশ্চিত হবার জন্য ডিক পাহাড়ের মাথায় চড়ল। দক্ষিণ পশ্চিমে চোখ রেখে সে স্পষ্ট দেখতে পেল দুটি ক্যানোর ধূসর পাল। কাজ শেষ করে নিষিদ্ধ দ্বীপের আওতা থেকে দ্রুত পালাচ্ছে।

পাহাড়ের মাথায় উঁচু পাথরটার পাশে হাঁটু মুড়ে হাতে হাত রেখে বসল ডিক। এই দিকে যতবার সে এসেছে, প্রত্যেকবারই মৃত্যুজনিত অঘটন ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেবারে সে নৌকাটাতো হারিয়েছিল প্রায়। কি করে দড়ি খুলে সেটা জলে ভেসে গিয়েছিল। কোন রকমে সে ধরে ফেলেছিল ওটা। আর একবার একটা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু অলৌকিক ভাবে অক্ষত অবস্থায় সে বেঁচে যায়। আরেকবার হ্যারিকেন-ঝড়ের দাপটে ওরা মরেই যেত। কিন্তু কি ভাবে বেঁচে যায় তা তার কাছে দুর্বোধ্য হয়েই আছে। ডিকের মনে হচ্ছে কোন অশরীরী আত্মা তাকে সাবধান করে দিচ্ছে ঃ 'এখানে এসোনা।'

পাহাড় থেকে নেমে চার ছড়া কলা কেটে নিয়ে নৌকায় তুলে চলতে শুরু করল ডিক। খানিকটা বেয়ে গিয়ে সে নৌকার মুখ খাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দেয়। পাঁচ বছর আগে শেষ বার সে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। সঙ্গে ছিল এমেলিন। মনে হয় যেন গতকালের ব্যাপার। খাড়িতে এখনো গর্জন করা সমুদ্রের ঢেউ, উড়ন্ত সী-গাল, প্রখর সূর্যের আলো, লবণাক্ত বাতাস। কোরালের যে অংশটা থেকে দড়ি ছিঁড়ে সে নৌকা ভাসিয়েছিল, সেই ছেঁড়া দড়ি আজও ঝুলছে। গত পাঁচ বছরে হয়তো আরও কত জাহাজ এখানে এসেছে। একটা জাহাজের ভাঙ্গা অংশ সমুদ্রের ঢেউ-এ বিতাড়িত হতে হতে এই খাড়ির পাহাড়েই এসে পড়েছে।

নৌকা ভিড়িয়ে ডিক পাহাড়ে উঠল। জোয়ারের সময় এখন। একটা বড় কালো পাখী তার রক্তরাঙ্গা চঞ্চু নিয়ে ডিকের মাথার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে সমুদ্রের দিকে চলে গেল।

চেনা জায়গাটায় এগিয়ে যায় ডিক। পিপেটা তখনো পড়ে আছে তবে ওর কাঠগুলি সব খুলে গেছে। ভিতরের তরল পদার্থ কবেই গড়িয়ে পড়ে গেছে।

ভাঙ্গা পিপেটার পাশে একটা কঙ্কাল। কঙ্কালটার শরীরে তখনো কয়েক টুকরো কাপড় ন্যাকড়ার মত ঝুলছে। করোটি এক পাশে খুলে পড়ে আছে। নিচের চোয়াল বিচ্ছিন্ন। হাত, পা ও পাঁজরের হাড় তখনো জোড়ায় জোড়ায় লেগে আছে। সূর্যের আলোয় সেগুলি সাদা ধপ ধপে। সব কিছু মিলিয়ে এখানে যে একটি মানুষের শরীর ছিল—তা জানান দিচ্ছে। ডিকের কাছে এই অবয়ব ভীতিকর মনে হলনা। মৃত্যু কি, কোনদিনই জানতে পারেনি ডিক।

অনেকক্ষন ধরে নিশ্চলভাবে ওই দিকে তাকিয়ে রইল ডিক। তারপর গভীর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নৌকায় বসল। নৌকা বাইতে লাগল সে। আর ওই দিকে ফিরেও

তাকাল না। লেগুন পার হয়ে সে ঘরের দিকে চলল।

কুটিরের কাছে এসে মাথা তুলে ডিক দেখতে পেল পাড়ে কে একজন অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে।

অধীর আগ্রহে ডিকের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে এমেলিন।

সেই সন্ধ্যায় রাত্রির আহার প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিল ডিক। এমেলিন বসে সেলাই করছিল। তাব পরনে ঘাঘরা ছাড়াও ওড়নার মত করে একটুকরো লম্বা কাপড়ে জড়ানো। সেলাই করতে করতে তার চোখে পড়ল তীরের ভাঙ্গা টুকরোটার দিকে। অনেকটা বল্লমের আকৃতি। ওর বাটের আগায় লোহার ফলাটা কালো হয়ে আছে।

'এটা কোথায় পেলে?' এমেলিনের প্রশ্ন। জিনিষটাকে কিভাবে জোড়া লাগানো যায়, একথা ভাবতে ভাবতে ডিকের সংক্ষিপ্ত জবাব, 'সেই সমুদ্র পাড়ে।'

জিনিসটায় কালো শুকিয়ে যাওয়া দানা আর বন্য আকৃতি দেখে ওটার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছিলনা এমেলিনের।

'ওখানে লোক এসেছিল।' ভাঙ্গা অংশটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ডিক বলে, 'এটা ওখানে পড়েছিল। বালুতে অনেক পায়ের দাগ।'

'ওরা কারা?'

'জানি না। পাহাড়ে চড়ে দেখলাম ওদের নৌকা চলে যাচ্ছে।'

এমেলিন বলল, 'ডিক, কাল রাত্তিরে শব্দ শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক রাত্তিরেও আমি পেয়েছি।'

'কখন?'

'চাঁদ ডুবে যাবার আগে।'

'ওরাই শব্দ করেছে।'

'ডিক, ওরা কারা?'

'জানি না।'

'জান, অনেক রাত্তিরে আমি বাজনার শব্দ শুনেছি। তুমি ঘুমিয়েছিলে; আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তোমাকে কত ডাকলাম, ঠেললাম কিন্তু তোমার ঘুম ভাঙ্গল না। শব্দ, অনেক শব্দ ভেসে আসছিল। বাজনার আর লোকের চেঁচামেচির শব্দ। 'কি করে শব্দ করে ওরা?'

'জানিনা।' ডিক বলে, 'শব্দগুলি ওদেরই। বালুতে অনেক পায়ের চিহ্ন। পাহাড় থেকে ওদের চলে যেতে দেখেছি।'

ডিক ভাঙ্গা বল্লমটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভাঙ্গা অংশ নারকেলের পর্ণ দিয়ে জোড়া বাঁধে সে। এমেলিন ভাবে, এটা কোন লোক কাল রাতে ছুঁড়ে মেরেছে কোন

লোককে।

নিখুঁতভাবে ভাঙ্গা অংশ জোড়া লাগিয়ে ডিক ওটা পরিস্কার করতে বসে। মাটি ও কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে বল্লমের ফলাটা চকচকে করে ফেলে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে ওটাকে। মাছ ধরার কোচ হিসাবে এই জিনিষটা অচল কেননা ওটাতে কোন কাঁটা নেই। কিন্তু এটা একটা অস্ত্র। কিন্তু এই অস্ত্র দিয়ে সে কি করবে? এখানেতো কোন শত্রু নেই।

বল্লমটা আরও চকচকে করে সে ঘরের ভিতর গিয়ে মাছ মারা কোচটা নিয়ে আসে। দুটো জিনিষই হাতে করে সে নৌকার দিকে যেতে যেতে চেঁচিয়ে এমেলিনকে আসতে বলে। ডুবো পাহাড়ের কাছে গিয়ে স্বভাব অনুযায়ী প্যান্ট খুলে নগ্ন হয়ে যায় ডিক৷ তারপর এক হাতে বল্লম ও অন্য হাতে কোচ নিয়ে জলে নেমে যায়।

প্রবালের একটা স্তুপের উপর এমেলিন বসে থাকে। জলের দিকে তাকিয়ে সে তার স্বপ্নের দরজা খুলে দেয়। ডিকের চীৎকারে সে বাস্তবে ফিরে আসে। আঙ্গুল দেখিয়ে ডিক কি যেন বলছে। সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় এমেলিন।

ডুবো পাহাড়ের বাঁকে, মাইল খানেক দূরে, পূব দিক থেকে এক দ্বিমাস্তুল বড় জাহাজ এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকটি পালের বাতাসে ফুলে ওঠা ভাঁজগুলি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জাহাজের তলদেশ ফেনার মত জল কেটে কেটে এগিয়ে আসছে।

জাহাজের দিকে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত বল্লমটা হাতে নিয়ে ডিক দাঁড়িয়ে থাকে। দৌড়ে এমেলিন তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। জাহাজ এগিয়ে আসতে থাকে। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা দু'জন।

এবার জাহাজের রেলিং পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। অনেক লোক রেলিং-এ ঝুঁকে দ্বীপের এই দু'জন অধিবাসীর দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাসে এমেলিনের চুল উড়ছে। ডিকের বল্লমের ফলাটা চক চক করছে পড়ন্ত রদ্দুরের ঝলসানো আলোতে। জাহাজের ডেক থেকে ওরা দেখতে পেল একজোড়া দ্বীপবাসিকে। তারপর জাহাজ হঠাৎ মোড় ঘুড়িয়ে নিল।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এমেলিন বলল, 'ওরা চলে গেল।'

ডিক একথার কোন উত্তর না দিয়ে নিশ্চল হয়ে তখনো জাহাজটার চলে যাওয়া দেখছিল। তারপর হঠাৎ তার খেয়াল হল, সত্যিই তো জাহাজটা চলে গেল! পাড় ধরে সে পাগলের মত দু'হাত তুলে ছুটতে ছুটতে ডাকতে লাগল জাহাজের আরোহীদের। ওদের ফিরে আসবার জন্য আকুল আবেদন জানাতে লাগল।

মনে হল দূরে চলে যাওয়া জাহাজ থেকে ক্ষীণ একটা উত্তর যেন ভেসে এল। কিন্তু ওই পর্যন্ত-ই, জাহাজ তার নিজের পথে চলে গেল এদিকে না ফিরে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, জাহাজের ক্যাপ্টেন এই দ্বীপবাসিদের সম্পর্কে মনস্থির

করতে পারেনি। ডুবো পাহাড়ের উপর দুটি মনুষ্য আকৃতির জীব কারা? বুনো অধিবাসি না শাস্তি পাওয়া নির্বাসিত দুই ব্যক্তি? কিন্তু ডিকের হাতে বল্লম দেখে তারা স্থির নিশ্চয় হয়েছিল—এরা বুনো বর্বর দ্বীপবাসি।

এমেলিনের পোষাপাখী কোকোর সঙ্গী জুটেছে। বসন্ত এসে গেছে। বনের গাছ, অর্কিড এসেছে। সব কিছুর পরিবর্তন। নব সাজে সেজেছে সবাই। কোকো আর তার পুরুষ সঙ্গীর বাসা বাধা শেষ।

সেই জাহাজ চলে যাবার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। একদিন বন থেকে পেয়ারা সংগ্রহ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ডিক। সকাল থেকে এর জন্য একটা বাস্কেট তৈরি করেছে সে। সভ্য জগতে তার যান্ত্রিক কুশলতার প্রতিভা হয়তো কোনদিন ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারত।

দুপুরের গরমের তীব্রতা কমে গেলে বাস্কেটটা একটা বেতের বন্ধনীর সাহায্যে পিঠে ঝুলিয়ে ডিক বনের দিকে চলতে শুরু করে। এমেলিন সঙ্গী হয় তার। খেয়াল খুশি মত ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গা আবিষ্কার করে ফেলেছে ডিক। জায়গাটা এমেলিনের মনে অজানা আতংকের সৃষ্টি করে। একা সে কখনোই ওখানে যায়নি।

বনের গভীরে প্রবেশ করে ওরা একটা কুয়ো পার হয়। ওটার নিচে শুকনো সাদা বালু। কুয়োটাকে ডানে রেখে ওরা আরও এগিয়ে যায় একটা পায়ে চলার পথ ধরে। গাছের নিচে নিচে জনমানবশূন্য এই দ্বীপে পথ কোথা থেকে এল—এ ব্যাপারটাও আশ্চর্যজনক। অনেক অতীতকালে এই পথে হয়তো মানুষের যাতায়াত ছিল।

ওরা অগ্রসর হয়, বনের ঘনত্ব বাড়ে। হঠাৎ বাঁক নিয়ে একটা ফার্ণ বিছানো উপত্যকায় শেষ হয়ে গেল পথটা। এই সেই জায়গা—যা এমেলিনের মনে অবুঝ ভীতি জাগায়। এর এক পাশে বড় বড় পাথরের চাঙ্গরে তৈরি একটা চত্তর। পাথরের চাঙ্গরগুলি এত বড় যে ভাবতে অবাক লাগে—পৌরানিক মানুষেরা কি করে এগুলি জোড়া লাগাল।

চত্তর ভেদ করে বড় বড় গাছ উঠে গেছে। চত্তর থেকে একটু ঝুঁকে এক বিরাট পাথরের কর্কশ মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তিরিশ ফুট উঁচু এই মূর্তিটা রহস্যময়। এই মূর্তি, চত্তর, উপত্যকা, গাছগুলি এমেলিনের মনে যেমন প্রগাঢ় কৌতূহল, তেমনি অজানা ভীতি জাগায়।

কোনদিন এখানে লোকের বসতি ছিল। এমেলিনের কল্পনা প্রবল দৃষ্টিতে সে যেন দেখে, আজও তারা আছে। গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে কালো কালো ছায়া। গাছের পাতার ফিসফিসানি তাকে কখনো চমকে দেয়। দিনের আলোতেও এই জায়গায় এলে এমেলিনের গা ছমছম করে।

সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে এমন অজস্র দ্বীপ আছে যেখানে অতীতের অসংখ্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই মন্দিরময় জায়গাগুলি সব দ্বীপে একই রকম। বড় বড় পাথরের চত্তর, বিরাট আকারের নিঃসঙ্গ ঈশ্বর-সদৃশ মূর্তি একই ধর্মের বা বিশ্বাসের ইঙ্গিত বহন করে। কোনদিন প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রাঞ্চল ছিল একটি মহাদেশ। হাজার হাজার বছর আগে এর ভূ-ত্বক বসে গিয়ে সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে। উঁচু অংশগুলি দ্বীপ হয়ে রয়ে গেছে। এই সব দ্বীপের বনসম্পদ অন্য জায়গার থেকে ঘনসম্বন্ধ। মূর্তিগুলি দুর্জ্ঞেয়, অপরিমেয়। বর্ণনাতীত তাদের মুখের গড়ন। হাজার বছর ধরে সূর্য, বাতাস এবং সময় তাদের মুখ আবরণে ঢেকে দিয়েছে। এই সব ঈশ্বর সদৃশ মূর্তিগুলি রহস্যের আবরণে মোড়া। মানুষের দৃষ্টির আড়ালে বহুকাল হল তারা হারিয়ে গেছে।

এমেলিন এই মূর্তির নাম দিয়েছে 'শিলা-মানব।' কখনো কোন চন্দ্রালোকিত বা নক্ষত্রালোকিত রাতে এমেলিনের কল্পনায় এসে ধরা দেয় বিশাল মূর্তি। যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এমেলিন।

আজ, এই মুহূর্তে, ভীত এমেলিন পাথরের চত্তরে বসে পড়ে নির্জীবের মত। ডিকও বিশ্রাম নেবার জন্য চত্তরে শুয়ে পড়ে। বন থেকে প্রচুর পেয়ারা সংগ্রহ করে এনেছে। কয়েকটা পেয়ারা এমেলিনকে দিয়ে নিজেও খেতে থাকে। খাওয়া শেষ করে এমেলিন বাস্কেটের সঙ্গে বাঁধা বেতটা বের করে খেলতে থাকে। ধনুকের মত সেটা বাঁকাতে গিয়ে হঠাৎ সেটা ছিটকে ডিকের মুখে গিয়ে আঘাত করে। সেই মুহূর্তে ডিক ঘুরে ওর কাঁধে এক চড় কষিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে এমেলিন তাকিয়ে থাকে ডিকের দিকে। তারপর তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে কান্নায়।

তখন, হঠাৎ যেন কোন কিছুর আবরণ হল উন্মোচিত। কোন স্পর্শ পাওয়া গেল জাদুকরের জাদুদণ্ডের। রহস্যময় ভাবে ডিকের রাগ পড়ে গেল। এমেলিনের বোবা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওকে সজোরে জড়িয়ে ধরল ডিক। ওই ভাবে দু'হাতের মধ্যে এমেলিনকে জড়িয়ে ধরে হতবুদ্ধি, হতচেতন ডিক কি করবে বুঝতে পারছেনা। তারপর ও তার ঠোঁট এমেলিনের দিকে এগিয়ে দিল। অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিতে লাগল এমেলিনকে।

অনেক অনেক পরে, পাঁচ হাজার অথবা আরও বেশি পুরানো রহস্যে ঘেরা মূর্তিটার উপর চাঁদ উঠল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল—চত্তরে, যেন মূর্তিটার সস্নেহে আশ্রয়ে, দুটি নগ্ন শরীর পরস্পরকে জড়িয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন। বিশাল মূর্তিটা যেন এই ঘুমন্ত প্রাণীকে পাহারা দিচ্ছে। তার চোখের সামনে যা হয়ে গেছে, এ নিয়ে ধর্মপ্রাণেরা প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু যে দেহ-মিলন হয়ে গেছে এই দুটি নর-নারীর মধ্যে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, নির্দোষ এবং নিষ্পাপ।

দিন কেটে যায়। ডিকের আর অস্বস্তি, অস্থিরতা নেই। বনে বনে, সমুদ্রের পাড়ে, ডুবো পাহাড়ের খাড়িতে অকারণ ঘুরে বেড়ান বন্ধ হয়েছে তার। সে যা পেয়েছে, এই বিরাট পৃথিবীতে এই পাওনার আর অন্য কোন মূল্য তার কাছে কিছু নেই। তার কাছে সব প্রাপ্যই যেন পাওয়া হয়ে গেছে।

এখন আর এই দৃশ্য দেখা যায়না যে এক অর্ধনগ্ন বন্য-মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে আর পোষা জীবের মত তাকে অনুসরণ করছে এক নারী। তার বদলে দেখা যায় এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা খাড়ির কাছে সন্ধ্যার নরম আলোয় ঘুরে বেড়াতে।

এতকাল রান্নার কাজ করেছে এমেলিন। ডিক সাহায্য করত। ডিক কথা বলত যেন একটা পোষমানা জীবকে যে ভাবে কথা বলে সে ভাবে। আর বাল্যকাল থেকে এমেলিনের সেই নীরব থাকার দোষ দূর হয়ে গেছে। সে তার স্বপ্নের কথা কবিতার মত বলে ডিককে। তার স্বপ্নে এখনো পরীরা রয়েছে।

ডিক তার কথা শোনে যেন কোন নির্ঝরের গান শুনছে। এমেলিনের কবিতার মত স্বপ্নময় জগতের অংশীদার হবার মত মানসিক গঠন তার নেই। তবু তার কথা শুনতে ভাল লাগে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে এমেলিনের দিকে। এমেলিনের উজ্জ্বল কালো চুলে মুখ ডুবিয়ে ঘ্রান নিতে ভাল লাগে তার। এমেলিনের স্তন, কাঁধ, পা—তার প্রতি অঙ্গ নিয়ে খেলা করে ডিক। শুয়ে শুয়ে এমেলিন ডিকের এই আনন্দের সাথে নিজেকে সামিল করে এক সময় তার দু'বাহু দিয়ে ডিককে জড়িয়ে ধরে।

প্রতিদিন ডিক কাজ করে। মাছ ধরা, চাষ করা, ঘর মেরামত করা। তারপরই হঠাৎ দেহমিলনের জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

কখনো কখনো দু'জনে মিলে শিলা-মূর্তির উপত্যকায় যায়। সমস্ত দিন, দুপুর, বিকেল কাটিয়ে, বনে বনে ঘুরে, নতুন নতুন ফুল আবিস্কার করে। কোনদিন তারা বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে। আবার বাড়ি ফেরার পথ আবিষ্কার করে উজ্জ্বল হয়।

কখনো ডিক হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার প্রেম নিবেদন কুড়ি মিনিট পর্যন্ত চলে। কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটে।

একদিন গাছের উপর শব্দ শুনে কৌতুহলী ডিক গাছে চড়ে। শব্দ আসছিল পাখীর বাসা থেকে। বাসাতে মা-পাখী নেই। চারটি পক্ষী শাবকের ক্ষুধার্ত ঠোঁট থেকে বিচিত্র শব্দ আসছিল। এমেলিনের পোষা কোকোর সন্তান। কয়েকদিন আগে ধূসর রংয়ের ডিমের মধ্যে এরা লুকিয়ে ছিল।

গালে কার আঘাতের স্পর্শ পেয়ে ডিক সচেতন হয়। কোকো তার বাচ্চাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। ডিক তার মাথা সরিয়ে নিল। নিঃশব্দে কোকো এগিয়ে গেল তার সন্তানদের দিকে।

পঞ্চম খণ্ড

প্রশান্ত মহাসাগরের এই উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাকে সবাই 'পাগল লেস্ট্রেঞ্জ' বলেই জানত।

কিন্তু লেস্ট্রেঞ্জ সত্যিই পাগল হয়ে যাননি। তিনি সব বিসর্জন দিয়ে শুধু একটি মাত্র চিন্তার আশ্রয় নিয়েছেন। একটা ছবি তার চোখের সামনে সব সময় ফুটে থাকত—দুটি শিশু, এক বৃদ্ধ নাবিক বিস্তীর্ণ বিশাল নীল সমুদ্রে ছোট্ট একটা নৌকায় ভাসছে।

'প্যাপিটি' বন্দরের দিকে যেতে থাকা 'আরাগো' জাহাজ নর্থামবারল্যাণ্ডের যাত্রীও নাবিকদের উদ্ধার করে। সে সময় একমাত্র বড় নৌকাটির আরোহিরাই জীবিত ছিল। ক্যাপ্টেন লা ফার্জ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালেও সে সম্পূর্ণ মানসিক ভারসাম্য ফিরে পায়নি। লেস্ট্রেঞ্জ যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। সে দিনের সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা, দুটি শিশুকে হারানো, তাকে অসহায় এক ভগ্নস্তূপে পরিণত করেছে। চারদিন পরে আরাগো জাহাজটি সানফ্রানসিসকোগামী 'নিউক্যাসল' জাহাজে এই লোকেদের তুলে দেয়।

সানফ্রানসিসকোর এক হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে লেস্ট্রেঞ্জ বেঁচে উঠলেন। তার পুনর্জন্ম যেন এক অলৌকিক ঘটনা। দুর্ঘটনার দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত হলেন লেস্ট্রেঞ্জ। কিন্তু তার মস্তিষ্কে স্মৃতির সাহায্যে অনেক রঙীন স্বপ্ন জন্ম নিল। লেস্ট্রেঞ্জের স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু তার স্মৃতিতে আজও তিনি সমুজ্জ্বল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অমলিনভাবে স্ত্রীর স্মৃতি বয়ে বেড়াবেন তিনি। আর এই কারণে, শিশু দুটি মরে গেছে একথা তিনি ভাবতেই পারেন না। চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় সেই একই দৃশ্য—দুটি শিশু, একটি নাবিক, ছোট্ট নৌকা, অপার অসীম নীল সমুদ্র।

হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছেন শুধু এই দৃশ্যটি চোখের সামনে রেখে। জীবনকে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছেন তার প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে। না, তিনি মরবেন না। এখুনি মবতে তিনি রাজী নন। শিশুদের উদ্ধারের আগে নয়। কখনো নয়।

তার ক্রমবর্ধমান জীবনীশক্তির দাপটে এক সময় নিষ্ঠুর ছায়া তাকে ত্যাগ করল। হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলে স্থানীয় 'প্যালেস হোটেলে' আশ্রয় নিলেন। আর তারপর সেনাবাহিনীর প্রধানের মত তিনি ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবার ছক কষতে বসে গেলেন।

নর্দামবারল্যাণ্ড জাহাজের সমুদ্রের নক্সা, কাগজপত্র, লগবুক সমস্ত কিছুই হারিয়ে গিয়েছিল কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিল। এইগুলি দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ প্রভৃতি দেখিয়ে

বুঝিতে দিতে পারত জাহাজটি কোথায় দুর্ঘটনায় পড়েছিল। জাহাজের প্রথম ও দ্বিতীয় অফিসার মাঝারি নৌকাটায় ছিল এবং এই নৌকার সমস্ত নাবিকদের মত তাদেরও মৃত্যু হয়েছে! এমন একজনও বেঁচে নেই যে সামান্যতম বর্ণনা করতে পারে, জাহাজটি কোথায় ডুবে গিয়েছিল। কোন লগবুক না পাওয়ায় লোকে ধরেই নিয়েছিল দুর্ঘটনা ঘটেছিল সমুদ্রের দক্ষিণ কোন এক অংশে।

একমাত্র 'আরোগা' জাহাজটি, যে হতভাগ্যদের উদ্ধার করেছিল, তার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল কোথায় কোন অক্ষাংশে কোন দ্রাঘিমায় নাবিকদের জাহাজে তুলে নিয়েছিল। 'আরাগো'র যাবার কথা ছিল প্যাপেটি বন্দরে। লেস্ট্রেঞ্জ অনেকদিন ধরে আরাগোর জন্য অপেক্ষা করল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অপেক্ষা করেও কোন ফল হলনা। কেউই বলতে পারলনা জাহাজটির কি হয়েছে। আরাগো জাহাজ আর কোন দিনই বন্দরে ফিরে আসেনি।

নিজের সন্তানকে হারানোর মত দুঃখজনক ঘটনা একজন মানুষের জীবনে কত বড় আঘাত। এতো শহরের রাস্তায় ছেলে হারানোর ঘটনা নয় যে খোঁজাখুঁজি করে পুলিশ তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তার মৃতদেহটাও খুঁজে পাওয়া যায়, তবে হতভাগ্য পিতা মাতা সান্ত্বনা পেতে পারে, তাদের সন্তান আর নেই। কিন্তু লেস্ট্রেঞ্জের অবস্থায় পড়লে মানুষের কি হয়? আপনি হয়তো পাগল হয়ে যাবেন বেঁচে থাকবেন ঠিকই। বছরের পর বছর পার হবে। আপনি বৃদ্ধ হবেন। একদিন নিজের মনেই বলবেন, 'আজ ওর বয়স কুড়ি বছর হতো গো।'

লেস্ট্রেঞ্জের মনে আশা থেকেই যায়, নিশ্চয় ওদের কোন জাহাজ তুলে নিয়েছে।

অর্থের অভাব ছিলনা লেস্ট্রেঞ্জের। এটা শহরে ছেলে হারানোর ব্যাপার নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল বুকে এই হারিয়ে যাওয়া শিশু দুটির খোঁজ করতে গেলে সমস্ত পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। তাই করলেন লেস্ট্রেঞ্জ। শুধুমাত্র ওদের সঠিক সংবাদ দিতে পারলে দশ হাজার ডলার আর পৌঁছে দিয়ে গেলে কুড়ি হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা যাতে পৃথিবীর সমস্ত নাবিকের চোখে পড়ে সেভাবেই প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রেই বিজ্ঞাপন দিলেন তিনি।

বছরের পর বছর কেটে গেল, কিন্তু বিজ্ঞাপনের সঠিক জবাব আসেনা। একবার খবর এসেছিল যে গিলবার্টের কাছে দুটি শিশুকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সংবাদটি মিথ্যে নয়, কিন্তু এরা দু'জন লেস্ট্রেঞ্জের ডিক ও এমেলিন নয়। ব্যাপারটা কিন্তু লেস্ট্রেঞ্জকে যেমন বিমর্ষ করে দিল, তেমনি উজ্জীবিতও করলো। 'যদি এদের উদ্ধার করা হয়ে থাকে তবে আমার প্রিয় দুটি শিশুকেই কেন উদ্ধার করা যাবে না?'

লেস্ট্রেঞ্জ নিজের মনে গভীর ভাবে বিশ্বাস করত ওরা দু'জন বেঁচে আছে। তাদের মৃত্যু হয়ে গেছে ভাবতে গিয়েও তার কানে যেন নীল সমুদ্র থেকে ফিসফিসানি ভেসে এসেছে, ওরা বেঁচে আছে, বেঁচে আছে। অপেক্ষায় রয়েছে তার জন্য।

দুঃখ, হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেও লেস্টেঞ্জ ওদের খোঁজ করা থেকে বিরত হলেন না। উপরন্তু পাঁচ বছরের মাথায় তিনি একটি দ্বিমাস্তুল দ্রুতগামী জাহাজ ভাড়া করে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলেন। আঠারো মাস ব্যর্থ অনুসন্ধানের সময় অনেক জানা-অজানা দ্বীপে পাড়ি দিয়েছিলেন। একবার তো সেই দ্বীপটির পাশ দিয়েও ঘুরে এলেন সম্পূর্ণ অজানিত ভাবে। এই প্রশান্ত মহাসাগরের অথৈ জলে হাজার হাজার দ্বীপ, ডুবো পাহাড়, প্রবাল প্রাচীর আছে। নৌবাহিনীর মানচিত্রে এই দ্বীপের অবশ্য উল্লেখ আছে। কিন্তু পরিকল্পনাহীন ভ্রমণ ও সুযোগ্য পথ প্রদর্শকের অভাবে লেস্ট্রেঞ্জের আঠারো মাসের অনুসন্ধান ব্যর্থ হল। এই দেড় বছর তিনি দিনের বেলায় জাহাজের রেলিং ধরে জলের উপর ঝুঁকে থাকতেন। যেন সমুদ্রের নীল আর লবণাক্ত জলকে জিজ্ঞেস করছেন হারানো দুটি শিশুর কোন খবর সে দিতে পারে কিনা।

ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর সানফ্রানসিসকো ফিরে এসে তিনি তার বিজ্ঞাপনের এজেন্ট ওয়ানমেকারের অফিসে গেলেন। না, সেখানেও কোন খবর নেই।

এক মে মাসের দ্বিতীয় দিনে, নর্দামবারল্যাণ্ডের ঘটনার আট বছর পাঁচ মাস পরে প্যালেস হোটেলের লেস্ট্রেঞ্জের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন তুলে নিলেন লেস্ট্রেঞ্জ।

'লেস্ট্রেঞ্জ আছেন?' এক মার্কিনী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'ও, লেস্ট্রেঞ্জ বলছেন? আমি ওয়ানমেকার বলছি। আমার এখানে চলে আসুন। খবর আছে।'

কয়েক মুহূর্ত রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন লেস্ট্রেঞ্জ। তারপর ওটা রেখে দিয়ে চেয়ারে বসে দুহাতের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে রাখেন। আবার উঠে গিয়ে টেলিফোনের কাছে যান। কিন্তু তার সাহস হয় না ওয়ানমেকারকে ফোন করবার। যে ক্ষীণ একটা আশা তার মনে জাগছে, সেটা যদি নষ্ট হয়ে যায়!

'খবর!' এই ছোট্ট সংবাদটির মধ্যে কত কিছু না লুকিয়ে আছে।

একটু পরেই দেখা গেল লেস্ট্রেঞ্জ কেয়ারনে স্ট্রীটের ওয়ানমেকারের অফিসের দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের মনে সাহস এনে তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যান। একটা সুইংডোর ঠেলে বড় একটা ঘরে প্রবেশ করেন। ডজনখানেক টাইপরাইটারের খটাখট শব্দ আর কর্মব্যস্ততার লক্ষণ অফিস ঘরে ছড়িয়ে আছে। কাগজ হাতে কেরানীরা এ-টেবিল ও-টেবিল করছে। ওয়ানমেকারকে দেখা গেল একজন টাইপিস্টের কাছে কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে তাকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে। লেস্ট্রেঞ্জকে দেখে ওয়ানমেকার এগিয়ে এল। তারপর তাকে নিয়ে বসল খাস কামরায়।

'বলুন, কি বলবেন।' লেস্ট্রেঞ্জ বলল।

একটুকরো কাগজ হাতে নিয়ে ওয়ানমেকার বলে, 'এই একটা ঠিকানা—সাইমন জেঃ ফাউন্টেন, ৪৫ র‍্যাথরে স্ট্রীট, পশ্চিম—। জাহাজঘাটের কাছে। বলছে যে, পুরনো

কোন কাগজের এক সংখ্যায় আপনার বিজ্ঞাপনটি সে দেখেছে। সে আপনাকে কিছু বলতে চায়। অবশ্য আমার কাছে খবরের কিছুই বলেনি সে, তবু আপনি একবার গেলে লাভবান হবেন বলে মনে হচ্ছে।'

'র‍্যাথ্‌রে ষ্ট্রীট কোথায় জানেন? ও, জানেন না।'

ওয়ানমেকার একজন বেয়ারা ডেকে তাকে রাস্তার হদিস বলে দিয়ে লেষ্ট্রেঞ্জকে ওর সঙ্গে যেতে বলল।

ওয়ানমেকারের অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার লেষ্ট্রেঞ্জ তাকে একটা ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেল। ওয়ানমেকার এর জন্য অবশ্য কিছু মনে করল না। এই খদ্দেরের মতি গতি তার জানা আছে।

র‍্যাথরে ষ্ট্রীটের ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন বাড়িগুলি সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে। বন্দরের বিচিত্র গন্ধ আর ষ্টিম-ক্রেনের মাল তোলা নামানোর শব্দে রাস্তাটা ভরপুর। ৪৫ নম্বর বাড়িটার দরজা খুলে দিল বেঁটে খাটো কর্কশ চেহারার এক বয়স্ক মহিলা।

'মিঃ ফাউন্টেন কি বাড়িতে আছেন?' লেষ্ট্রেঞ্জ বললেন, 'বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা নিয়ে আমি এসেছি?'

'ওঃ, আপনি?' মহিলাটি বলল। তারপর লেষ্ট্রেঞ্জকে নিয়ে সরুপথ ধরে গিয়ে একটা বসবার ঘরে বসতে বলে আবার বলল, মহিলাটি, 'ক্যাপ্টেন শয্যাগত। পঙ্গু হয়ে গেছে। কেউ আসবে বলে বলছিল। এখনি আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আপনি যদি দয়া করে একটু অপেক্ষা করেন।'

'ধন্যবাদ। আমি অপেক্ষা করছি।'

আট বছর যে অপেক্ষা করছে তার কাছে কয়েক মিনিটের অপেক্ষা এমন কি আর। কিন্তু আট বছরে আজকের এই অপেক্ষা করবার মুহূর্তের মত উৎকণ্ঠা কখনো আসেনি। সেই লোক, হয়তো এই সাধারণ মহিলাটির স্বামীই হবে, তার মুখ থেকে লেষ্ট্রেঞ্জ জানতে পারবেন তার আশার আনন্দ অথবা নিরাশার বেদনা।

ঘরের ভিতর চোখ বুলান লেষ্ট্রেঞ্জ। ছোট্ট ঘরটি এত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন—যেন মনেই হয়না এটা ব্যবহার হয়ে থাকে। ম্যান্টেলপিসের উপর বোতল-বন্দী একটা জাহাজ। কত জায়গার ঝিনুক আর শঙ্খ সাজান রয়েছে। জাহাজের কতগুলি ছবি দেয়ালে টাঙ্গান। সব মিলিয়ে প্রমাণ করছে এটা একটা প্রবীন নাবিকের বাড়ি।

মহিলাটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'আপনি এদিকে আসুন স্যার।'

ওর সঙ্গে একটা শোবার ঘরে প্রবেশ করেন লেষ্ট্রেঞ্জ। দ্রুত হাতে ঘরটাকে পরিস্কারও সাজান হয়েছে বোঝা যায়। ঘরটা যে একজন বিছানায় শয্যাশায়ী ব্যক্তির শোবার ঘর, তার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে আছে। একটা গুজনির উপর পর্বত প্রমাণ ভুঁড়ি নিয়ে শুয়ে আছে একটি লোক। গালে কালো দাড়ি। দুটো অক্ষম হাত ছড়িয়ে আছে বিছানায়। ঘাড় ঘুরিয়ে লেষ্ট্রেঞ্জকে দেখল সে।

'সাইমন, ইনিই সেই ভদ্রলোক।' এ কথা বলে মহিলাটি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

'একটা চেয়ার টেনে বসুন স্যার। নিজের অশক্ত হাত দুটি নাড়াতে নাড়াতে অসহায়ের মত লোকটি বলল, 'আপনার নাম আমি জানিনা। আমার স্ত্রী বলল যে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি এসেছেন।'

ভাজ-করা একটা খবরের কাগজ সে লেস্ট্রেঞ্জের দিকে এগিয়ে দিল। এটি তিন বছরের' পুরানো 'সিডনি বুলেটিন।'

কাজটা দেখে লেস্ট্রেঞ্জ বললেন, 'হ্যাঁ, আমারই দেওয়া বিজ্ঞাপন।'

'কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন।' ক্যাপ্টেন বলল, কালমাত্র কাগজটা পেলাম। এই তিন বছর কাগজটা আলমারির মধ্যে রাখা ছিল। আমার গিন্নী পুরানো জিনিষপত্র বের করে ফেলে দেবার সময় আমি তার হাত থেকে ওটা নিয়ে নিই। আট মাস বিছানায় শুয়ে লোক কাগজ পড়তে চায় বইকি। শোথ রোগ হয়েছে আমার। আমি তিমি শিকারী ছিলাম। জাহাজটার নাম ছিল 'সি-হর্স'। সাত বছর আগে, মার্কুইসাস্'এর পূর্ব দিকে এক দ্বীপের সৈকতে আমার এক অনুচর একটা জিনিষ কুড়িয়ে পায়।'

'বলুন, বলুন, 'লেস্ট্রেঞ্জ আগ্রহভরে বলে, 'কি সেই জিনিষ?'

'গিন্নী!' ক্যাপ্টেন চীৎকার করে তার স্ত্রীকে ডাকল। মহিলাটি ঘরে এলে সাইমন বলে, 'চাবিটা নিয়ে এস।'

দরজার পিছন দিকে একটা ট্রাউজার ঝুলছিল। ওটার পকেট থেকে সে একটা চাবি বের করে আনে। সাইমনের নির্দেশে মহিলাটি টেবিলেব দেরাজ খুলে একটা বাক্স বের করে এনে দেয়। একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স—দড়ি দিয়ে বাঁধা। দড়ি খুলে সাইমন বাক্সটার ঢাকনা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা ছোট্ট টি-সেট। চায়ের পট, দুধের পাত্র, ছটি কাপ প্লেট বেরিয়ে এল বাক্সটা থেকে। প্রত্যেকটার উপর নীল ফুল আঁকা।

লেস্ট্রেঞ্জ দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। জিনিষগুলি তার কতকালের চেনা। এত বছরের ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর এগুলি তার কাছে যেন এক বার্তা বহন করে আনছে। জিনিষগুলি তার কাছে ভীতিকর, রহস্যময়। লেস্ট্রেঞ্জ এমনভাবে ঝুঁকে পড়লেন যেন বেদনায় তিনি গুঁড়িয়ে যাচ্ছেন।

দু'হাতে মুখ ঢাকা অবস্থাতেই লেস্ট্রেঞ্জ প্রশ্ন করলেন, 'কবে এগুলি পেয়েছেন?'

'সাত বছর আগে।' ক্যাপ্টেন বলল, 'দক্ষিণের এক দ্বীপে আমরা একবার পাণীয় জল ভরতে গিয়েছিলাম। লেগুনের খাড়িতে তালগাছ থাকার জন্য একটা যেমন তেমন বানানো কুটিরের কাছে পেয়ে আমার একজন লোক বাক্সটাকে জাহাজে নিয়ে আসে।'

'ঈশ্বর! এই বাক্সটা ছাড়া সেখানে অন্য কেউ ছিল না?'

'কেউনা। এমনকি শব্দ পর্যন্ত না। কুটিরটা মনে হচ্ছিল পরিত্যক্ত। আমার অবশ্য

জাহাজ থেকে নেমে নির্বাসিত লোকগুলির খোঁজ করবার সময় হয়নি। তিমি শিকার করাই আমার মাথায় ছিল।'

'দ্বীপটা কত বড়?'

'ছিম ছাম ছোট্ট দ্বীপ—কোন আদিবাসি নেই। শুনেছি ওটা নিষিদ্ধ দ্বীপ। এগুলি ওখানে পাওয়া গেছে। আপনি কি চিনতে পারছেন জিনিষগুলি কার?'

'হ্যাঁ, চিনতে পারছি।'

'আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন', ক্যাপ্টেন বলে, 'আমি এগুলি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, আপনার বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়েছিল। এই ভাবেই কত-না ঘটনা ঘটে!'

'সত্যই আশ্চর্য ব্যাপার।' লেস্ট্রেঞ্জ বলেন।

'অবশ্যই। এগুলিতো দ্বীপেই পড়ে থাকতে পাবত। অথচ দেখুন, এগুলি এখন আপনার সামনে।'

খেলনার বাক্সটার দিকে তাকিয়ে যেন কোন গোপন বার্তা শুনতে পাচ্ছেন—এমন ভাবে লেস্ট্রেঞ্জ বললেন, 'দ্বীপটার অবস্থান জানা আছে আপনার?'

'জানা আছে। গিন্নী আমার নিজস্ব লগবুকটা দাওতো।'

মহিলাটি দেরাজ খুলে মোটা, ময়লা, কালো রংয়ের একটা নোট বই সাইমনের হাতে তুলে দেয়। বইটির নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুলে সে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ পড়তে থাকে। 'যেদিন ওখানে গিয়েছিলাম—তার বিবরণ এই যে—' অ্যাডাম একটা বাচ্চাদের খেলনার বাক্স কুটিরের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছে। কুটিরটা আমার লোকেরা ভেঙ্গে দিয়েছে। এক বোতল মদের বিনিময়ে আমি ওটা ওর কাছ থেকে নিই। 'আমাদের অভিযান এরপর তিন বছর আট মাস পর্যন্ত চলে। বাক্সটার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এরপর হনলুলুতে আমাদের জাহাজের কিছু মেরামতের কাজ হয়েছিল। সেখানেই শোথরোগে আমাকে আক্রমণ করে। আমি বাড়ি ফিরে আসি। এই হলো কাহিনী। তারপর আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখে আমি ভাবলাম সাড়া দেওয়া উচিত।'

ফাউন্টেনের হাত নিজের হাতের মধ্যে নেয় লেস্ট্রেঞ্জ। বলে, 'আমার পুরস্কারের কথাটা জানেন নিশ্চয়। আমার চেক বইটা সঙ্গে আনিনি। কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যেই আপনার কাছে চেক পৌঁছে যাবে।'

'আজ্ঞে না স্যার।' ক্যাপ্টেন বলে, 'আগে খুঁজে দেখা হোক। ওদের পাওয়া গেলে কিছু গ্রহণ করতে আমি আপত্তি করব না। কিন্তু একটা পাঁচ সেন্টের বাক্সের জন্য দশ হাজার ডলার? আমি তো এভাবে ব্যবসা করি না।'

'আমি এখন আপনাকে ধন্যবাদ পর্যন্ত জানাতে পারছিনা। মনে হচ্ছে আমার জ্বর আসছে। সব ঠিক হয়ে গেলে আপনার দেনা আমি শোধ করব।' আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে লেস্ট্রেঞ্জ বললেন।

'আমার কৌতূহল দেখানো অবশ্য উচিত নয়।' ক্যাপ্টেন বাক্সটা গুছাতে গুছাতে বলে, 'জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কিভাবে আপনি এখন কাজ করবেন?'

'এই মুহূর্তে আমি একটা জাহাজ ভাড়া করে আবার খোঁজ শুরু করব।'

'হ্যাঁ', কিছু চিন্তা করতে করতে সাইমন বলল, 'তাই ভাল।'

'এখন বলুন, কিভাবে আমি তাড়তাড়ি ওখানে পৌছাতে পারি।'

'এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।' ফাউন্টেন বাক্সটা দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'আপনার দরকার একটা দ্রুতগামী দ্বি-মাস্তুল জাহাজ। আর এই মুহূর্তে ও'সুলিভান ডকে ওই রকমের একটা জাহাজ মাল খালাস করছে।—গিন্নী।' মহিলাটি সামনে এসে দাঁড়ালে ফাউন্টেন বলে, 'দেখতো ক্যাপ্টেন স্ট্যানিস্ট্রীট বাড়িতে আছে কি-না? থাকলে এখুনি ডেকে নিয়ে এস।'

মহিলাটি চলে গেলে লেস্ট্রেঞ্জকে বলে, 'মাত্র ক'টা বাড়ি পরেই ও থাকে। আপনার পক্ষে উপযুক্ত লোক। সানফ্রানসিসকোতে দোচালা পালের যত জাহাজ আছে তাদের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন। জাহাজটির নাম 'রারাটোঙ্গা। সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজ। ওর পাল মাত্র এই বছরের শুরুতে কেনা হয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমি আমার মাথা খাটাতে পারব। খাদ্য, পানীয় আর সস্তার মাল্লা জোগাড় হয়ে যাবে।'

বারান্দার পদশব্দ শুনে সাইমন চুপ করল। ক্যাপ্টেন স্ট্যানিস্ট্রীট ঘরে আসে। তিরিশ বছর বয়স হবে। চটপটে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, মুখশ্রীতে একটা স্নিগ্ধতা। সাইমন তাকে লেস্ট্রেঞ্জের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথম দর্শনেই লেস্ট্রেঞ্জ লোকটিকে ভালবেসে ফেলেন। অভিযানের কথা শুনে আগ্রহ ভরে রাজি হয়ে যায় স্ট্যানিস্ট্রীট।

বিস্তারিত কথাবার্তার পর লেস্ট্রেঞ্জকে সঙ্গে করে ক্যাপ্টেন স্ট্যানিস্ট্রীট বন্দরে নিয়ে যায় তার জাহাজটি দেখাবার জন্য। যাবার আগে লেস্ট্রেঞ্জ তার নতুন বন্ধু সাইমনের হাত জড়িয়ে ধরেন। তিনি যখন স্ট্র্যানিস্ট্রীটের সঙ্গে রাস্তায় বের হলেন—তার হাতে তখন এমেলিনের বাক্সটি।

ও'সুলিভান বন্দরে 'রারাটোঙ্গা' জাহাজটির থেকে নারকেলের শাঁস খালাস করা হচ্ছিল। এ যেন নর্দামবারল্যাণ্ডেরই যমজ বোন। পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, মজবুত।

'এই সেই জাহাজ।' স্ট্যানিস্ট্রীট জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পছন্দ হয়েছেতো?'

'যতই খরচ লাগুক। এই জাহাজ আমার চাই।' লেস্ট্রেঞ্জ বললেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

কয়েক মাস কেটে গেছে।

প্রকৃতির অকৃপণ সুহৃদ হাতের স্পর্শে বনে, লেগুনের জলে রংয়ের ফোয়ারা। শুকনো রুটি-ফলের গাছে সবুজ কচি পাতারা রং বদল করে ফিকে সোনালী—ফিকে

সোনালী থেকে পীত-স্ফটিকের রং ধারণ করেছে। কোকোর বাচ্চাবা সব বড় হয়ে উড়ে গেছে। বিদায় নিয়েছে কোকোর সঙ্গী-ও। শুধু কোকো থেকে গেছে।

এক সকালে মাছ শিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ডিক। সমস্ত লেগুন আর প্রতিটা কোন—ডিকের নখদর্পনে। কোথায় গেলে অপর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায়, তার খুব ভাল করেই জানা আছে। যেখানে যাবার জন্য আজ সে তৈরি হচ্ছে—সে জায়গাটা দ্বীপ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। যাবার পথও দুর্গম বলে আজ সে একা যাবে।

এমেলিন সুতোয় কিছু মুক্তোর গাঁথছিল। তৈরি হচ্ছিল একটা নেকলেশ। একদা সে ফুলের মালা গাঁথতো। একটা শামুকের মাথাও তৈরি করেছিল সে। কিন্তু এই মুক্তোর মালার কিছু ইতিহাস আছে। লেগুনের অগভীর কোন এক অংশে ডিক আবিষ্কার করেছিল ঝিনুকের গোষ্ঠিবদ্ধভাবে থাকবার এক জায়গা। একটা ভাঁটার সময় সে ওগুলি কিছু তুলে এনেছিল কৌতুহলী হয়ে। প্রথম যে ঝিনুকটা সে খুলল, তার ভিতরকার থল থলে পদার্থ দেখে এত ঘৃণা হয়েছিল তার যে, সে হয়তো আর ঝিনুকে কখনোই হাত দিত না। কিন্তু ভিতরে একটা চকচকে জিনিষ তাকে আকৃষ্ট করল। একটা বড় মটরদানার দ্বিগুন আকৃতির মুক্তো। যদিও তার রুদ্ধ এবং বাস্তববাদী মনে এর সৌন্দর্য ও মূল্য সম্পর্কে কোন ধারনাই ছিল না। তবু, মুক্তোটির উজ্জ্বলতা তাকে আকৃষ্ট করল।

মুক্তোটি নিয়ে সে এমেলিনকে উপহার দিল। পরের দিন, হঠাৎ কোন কারণে ওই একই জায়গায় গিয়ে দেখল, জল থেকে তুলে রাখার ফলে ঝিনুকগুলি সূর্যের আলো লেগে মরে গেছে। ঝিনুকগুলি খুলে ফেলল সে। আরও একটা বড় মুক্তো পাওয়া গেল। তার সঙ্গিনীকে একটা নতুন ধরণের মালা পরাবার শখ জেগে উঠল তার মনে। এতে উৎসাহী হয়ে সে জল থেকে প্রায় আটটি বুশেল ঝিনুক তুলে এনে রোদ্দুরে ফেলে রেখে দিল।

একটা বড় এবং লম্বা মুক্তোর মালার জন্য তার অবশ্য সময় লাগল প্রচুর। বেছে বেছে বড় মুক্তোগুলিই সে রাখল আর ছোটগুলি ফেলে দিল। এই বড় মুক্তোগুলির এক একটার রংয়ের কি বাহার। কোনটা একদম সাদা, কোনোটা কালো কিংবা গোলাপী। আকৃতিতে কেউ গোল, কেউ অশ্রুর বিন্দুর মত। কেউ আবার ট্যারাবেঁকা। বড় ছুঁচ দিয়ে অক্লান্ত ভাবে প্রচুর একাগ্রতা ও পরিশ্রম করে মুক্তোগুলির মাঝখানে সুতো পরাবার জন্য ছ্যাঁদা করল। সমস্ত ব্যাপারটাতে তার সময় লাগল চারমাস। কিন্তু এটা তার পক্ষে একটা কাজ, যেমন অন্যান্য কাজের জন্য সে নিখুঁত ও আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করে, তেমনি ভাবে পরিশ্রম করল সে।

কিন্তু ডিক কোনদিনই জানতে পারবে না, যে রত্ন সে খেলার ছলে সঙ্গিনীকে খুশি করবার জন্য সংগ্রহ ও পরিশ্রম করল সভ্য জগতে তার দাম পনের হাজার—তাই বা কেন—পঁচিশ হাজার পাউণ্ড!

আজ সকালেই মুক্তোর মালা গাঁথা শেষ করল এমেলিন। তাকে বড় নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। শরীরটা যেন ভাল লাগছে না। কাল সমস্ত রাত কি এক নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে কাটিয়েছে সে। এতটুকু ঘুমাতে পারেনি।

মাছধরা কোচ আর মাছ ধরার বড়শি, সুতো ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে ডিক বনের দিকে রওয়ানা হয়। সাধারণতঃ এমেলিন কিছুটা এগিয়ে দেয় ডিককে। আজ সে কুটিরের দরজায় মুক্তোর মালা কোলে নিয়ে বসে রইল। আস্তে আস্তে ডিকের দিকে হাত নাড়ল। যতক্ষণ না চোখের আড়ালে হল ডিক, ওদিকে তাকিয়ে রইল সে।

বন অথবা লেগুনে ডিকের পথ নির্দেশের জন্যে কম্পাস বা পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয় না। বনের, লেগুনের প্রতিটি কোন, প্রতিটি অংশ তার মুখস্থ। লেগুনের পাড়ে উপস্থিত হয় ডিক। আজকের জায়গাটা সুবিধের নয়। বিপদ সংকুল। এখানে সামুর্দ্রিক ফার্ণ হাঁটু পর্যন্ত বড় হয়। আজ এ-উদ্ভিদগুলির উপব যেন যুদ্ধ হয়ে গেছে, এমন ভাবে ওগুলি দলিত মথিত হয়ে আছে। কতকগুলি অজানা অচেনা উদ্ভিদ রাস্তা জুড়ে দাড়িয়ে। চলতে গিয়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে এমন পাঁক আছে যে সেখানে পা দিলে মানুষ যে কোন মুহূর্তে অসহায় ভাবে অতলে তলিয়ে যাবে। দলিত মথিত উদ্ভিদগুলি আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেখলে মনে হয়, ডিক যেন ওদের মাঝখানে বন্দী হয়ে গেছে।

দুপুরের রোদ্দুরে গরম জলের জোয়ারের রেশ এখনো এখানে আছে। বাতাসে ভ্যাপসা গরম ভাব। করুণ সুরে একঘেয়ে ডেকে ডেকে জায়গাটার নৈশব্দ ভাঙ্গছে ঝিঁঝিঁ ও অন্যান্য কীটেরা। এখানকার উদ্ভিদগুলিকে যেন একশ লোক এসে কাস্তে দিয়ে মুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সেগুলি আবার জাগছে। দাঁড়িয়ে পড়ছে। এগুলি 'জগ অর্কিড' অথবা ঘটের আকারে বিচিত্র অর্কিড। ভিতরে অর্দ্ধেক জল ভরা। কোন পাখীকে এই অর্কিড আকর্ষণ করতে পারে। পাখীরা এদের কাছে এলেই তাদের মরণ ঘনিয়ে আসে। উষ্ণ ভ্যাপসা অঞ্চলেই ঘট অর্কিডের জন্ম হয়। এই ইন্দ্রিয়যুক্ত উদ্ভিদগুলির জন্য এখানকার গাছগুলিও বাড়তে পারে না। জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে গাছগুলি অর্দ্ধ মৃতের মত দাড়িয়ে থাকে।

এই অঞ্চলটুকু পার হতে অতি সাহসী ব্যক্তিও ভয় পাবে। যে কোন মুহূর্তে ভয়ংকর অর্কিডগুলি কারো কনুই কামড়ে ধরতে পারে। ডিকের মত দুঃসাহসী এবং কল্পনাহীন মানুষও খুব সাবধানে এই জায়গা পার হয়। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে তার জায়গাটা পার হতে! তারপর সে লেগুনের নিরাপদ ও মুক্ত বাতাসের অঞ্চলে পৌছে যায়। অবশ্য এই পথটুকু সে ঘুরপথে যেতে পারত। কিন্তু তার জন্য তাকে অন্ততঃ ছ'মাইল নৌকা বাইতে হত আরও। নির্দিষ্ট জায়গায় যখন সে পৌছাল, তখন সূর্য দুপুরের প্রখর তেজ দিতে শুরু করেছে। জোয়ারের জলে লেগুন পূর্ণ।

এখানে লেগুন যেন একটা গামলার মত। খাঁড়ির দূরত্ব বেশি নয়। জলও নিস্তর। পঞ্চাশ ফ্যাদমের মত জলের গভীরতা। পাড় থেকে মাছ ধরা যায় সহজেই। নিজের জন্য আনা খাদ্যের ঝোলাটা একটা গাছের নিচে রেখে মাছ ধরবার সরঞ্জাম বের করতে থাকল। একটা প্রবালকে ফাৎনা করে বড়শিতে টোপ গেঁথে সুতোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকটা দূরে ফেলল। কাছেই গজিয়ে ওঠা একটা শিশু নারকেল গাছের সঙ্গে সুতোর অপর প্রান্ত বাঁধল। তারপর সুতো ধরে বসে রইল ডিক।

এ সময় তার মনে পড়ল, আজ তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। এমেলিনকে কথা দিয়েছে, সন্ধ্যের আগেই সে ফিরবে।

কিন্তু ডিক সত্যি একজন খাঁটি মাছ-শিকারি। বিড়ালের মত তার ধৈর্য, ঝিনুকের মত অক্লান্ত পরিশ্রমী ও সময় সম্পর্কে উদাসীন। মাছ ধরা থেকে শিকারের আনন্দটাই তার বেশি। লেগুনে বিচিত্র বিচিত্র প্রাণী থাকে। গত বারে সে এক ভয়াল জীব বড়শিতে গেঁথেছিল। একটা 'ক্যাট ফিস' যদিও খাদ্য হিসাবে উপযোগী নয় কিন্তু শিকারের পক্ষে চমৎকার এবং অভিনব।

জোয়ারের জল এবার কমতে শুরু করেছে। মাছ ধরার পক্ষে এটাই আদর্শ সময়। হাওয়া নেই। একটা কাঁচের চাদরের মত স্থির হয়ে আছে লেগুন। কোথাও জলে একটু টোল নেই, কোথাও নেই ছোট্ট একটু ঘুর্ণি।

ফাৎনার দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে ডিক বসে থাকে। এই মুহূর্তে সে এমেলিনের কথা ভাবছে—অবশ্য তার এই ভাবনাকে যদি ভাবনা বলে আখ্যা দেওয়া যায়। কতকগুলি ছবি ওর মনে ছাপ ফেলছে—দ্রুত চলে যাচ্ছে। সুন্দর আনন্দপূর্ণ ছবি। সূর্যের অলোয়, চাঁদের আলোয় নক্ষত্রের আলোয় অনেক ছবি।

তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। নির্বিকার ভাবে জলে ভাসছে ফাৎনাটা। জল ছাড়া লেগুনে কিছু আছে বলে মনে হয় না ডিকের। কিন্তু কোন অসন্তুষ্টি বা আপশোষ নেই তার। সে হল সত্যিকারের মাছ শিকারি।

এবার খেতে বসল সে। খাওয়া শেষ করবার আগেই কিন্তু নারকেল গাছটি হঠাৎ কেঁপে উঠল। গাছটা ঝুঁকে পড়ল জলের দিকে। স্থির হয়ে বসে থাকে ডিক। সে জানে এই মুহূর্তে তার করণীয় কিছু নেই। সূতো, বঁড়শি, শিকার—যে যার কাজ করবে। শান্ত অবিচল ভাবে সে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ সুতো ঢিল হয়ে যায়। শিশু নারকেল গাছ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সুতো ধরে টান দিল ডিক। সুতোর শেষ প্রান্তে বঁড়শি ছাড়া আর কিছু নেই। এতেও সে অসন্তুষ্ট হল না। কোন আপশোষ নেই মনে। বঁড়শিতে আবার টোপ গাঁথল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জলে ছুঁড়ে দিল সুতো আর বঁড়শি। আবার নিশ্চয় টোপ গিলবে জলের প্রাণীটি।

এমনি ভাবে সময় বয়ে যেতে লাগল আবার। সূর্য পশ্চিমে পাড়ি দিয়েছে। সন্ধ্যের আগেই ফিরে যাবার কথা তার আর মনেই নেই।

হঠাৎ বনের ভিতর থেকে, গাছ-গাছালির মাঝ থেকে এমেলিনের চীৎকার ভেসে এল।

'ডিক'!

হাতের সুতো ফেলে দিয়ে চমকে পিছন ফিরে তাকাল ডিক। কই কাউকেই দেখা যাচ্ছেনা। দৌড়ে বনের ভিতর প্রবেশ করল। এমেলিনের নাম ধরে চীৎকার করে ডাকতে ডাকতে ছুটল গাছের ফাঁকে ফাঁকে। কেউ সাড়া দিল না। ডিকের চীৎকারের প্রতিধ্বনি শুধু শোনা গেল। সে আবার ফিরে এল আগের জায়গায়।

এবার তার মনে হল, এমেলিনের ডাক হয়তো সে ভুলে শুনেছে। সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। অনকে আগেই তার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। জল থেকে সুতো টেনে নিল ডিক। তারপব মাছধরার সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে, কোচ হাতে করে ফেরবার পথ ধরল।

সেই বিপদ সংকুল জায়গাটা পার হবার সময় একটা দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। যদি সত্যি সত্যি এমেলিনের কোন বিপদ ঘটে থাকে? সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ডিকেব মনে হল আগাছাগুলি যে বেশি ঘন হয়ে জেগে উঠেছে ইতিমধ্যে। লতাগুলি যেন সাপের মত জড়িয়ে ধরছে। আর তারপরই সে পথ হারালো। এতদিনের চেনা পথ যেন মনে হলো ভীষণ অচেনা। তার শিকারীর তীক্ষ্ণ অনুভূতি যেন লোপ পেতে বসেছে। কিছুক্ষণের জন্য সে উদভ্রান্তের মত পথ খুঁজে বেড়াল। শেষ পর্যন্ত সে পথ খুঁজে পেল। কিন্তু ভুল করে সে অনেক ডানদিকে চলে এসেছে। পথ খুঁজে পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হল। যেন একটা বন্য পশু ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রায় অন্ধকাবে, সমুদ্র তরঙ্গের শব্দকে অবলম্বন করে দ্রুত কুটিরের দিকে ছুটল।

লেগুনের তীরবর্তী তৃণ অঞ্চলে যখন ডিক পৌঁছাল, সূর্য তখন সমুদ্রের সীমারেখায় ডুবে গেছে। প্রদোষের আলোয় আকাশে কিছু লাল মেঘ পাখীর পালকের মত ভাসছে। গাছের নিচে তাদের কুটিরটা তার নজরে পড়তে তৃণভূমির মাঝখান দিয়ে ছুটতে লাগল।

এতদিন ধরে, প্রায় একটা প্রথার মতই, এমেলিন কুটিরে দরজায় দাঁড়িয়ে ডিকের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকত। কিন্তু আজ এমেলিন দরজায় দাঁড়িয়ে নেই। কুটিরে ঢুকেও এমেলিনকে দেখতে পেলনা ডিক। কুটিরের প্রতিটি জায়গা, আশা পাশ তন্ন তন্ন কবে খুঁজেও এমেলিনকে পাওয়া গেল না। বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডিক। একটা অজানা আশংকায় তার মন ছেয়ে গেল। এই মুহূর্তে সে যেন কিছু ভাবতে পারছে না।

বাটনের সেই ভয়ংকর মৃত্যুর পর এমেলিনের একটা নুতন উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। কখনো কখনো তার ভীষণ কষ্ট হতো মাথার ভিতর। যন্ত্রনা যেদিন খুব বাড়তো, সে বনের ভিতর চলে যেত। নিজেকে লুকিয়ে রাখত গাছের আড়ালে। এই অবস্থায় ডিক তাকে বনের মধ্যে খুঁজে বেড়াত। নাম ধরে ডাকত চীৎকার করে।

খুব ক্ষীণভাবে হলেও এমেলিন সাড়া দিত। ডিক তাকে আবিস্কার করত কোন গাছের নিচে বা ঝোপের আড়ালে। অসহ্য যন্ত্রণায় দু'হাত মাথা চেপে বসে আছে এমেলিন।

এই মুহূর্তে একথা মনে পড়াতে ডিক আবার বনের ধারে দিয়েএমেঝিভ্রের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে চলল। এক একবার দাঁড়িয়ে উত্তর শোনবার অপেক্ষা করল। না, কোন সাড়া নেই।

অন্ধকারের ভিতর বনের ভিতর ঢুকে এমেলিনকে খুঁজতে লাগল ডিক। শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রের আলোয় ক্লান্তভাবে কুটিরে ফিরে এল। অন্ধকারে কুটিরের দরজায় বসে পড়ল। প্রচণ্ড ভাবে হাঁপাচ্ছে সে। তার ক্লান্তি, অবসাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমেলিনের জন্য গভীর দুঃখ। হাঁটুর উপর মাথা রেখে অসহায় ভাবে বসে থাকে সে। কি বিপদে পড়েছে এমেলিন—সে জানে না। বিপদে পড়ে ডিককে ডেকেছে সে। আর সে কি-না নিশ্চিন্ত মনে মাছধরা নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

নিজের এই দোষের কথা ভেবে পাগল হয়ে গেল ডিক। সোজা হয়ে বসে, নিজের উপর আক্রোশ নিয়ে দু'হাতে মাটির উপর আঘাত করতে থাকে। তারপরই সে এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। দৌড়ে যায় ডিঙ্গিটার কাছে। ক্ষিপ্র হাতে প্রবল শক্তিতে সে দাঁড় বেয়ে ডিঙ্গিটা খাড়ির কাছে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা তার পাগলামিরই নামান্তর। কেননা, এমেলিন কখনোই একা ওখানে যেতে পারে না।

সে রাতে আকাশে চাঁদ ছিল না। আকাশে শুধু নক্ষত্রের ওড়না। সমুদ্রের ঢেউ'এর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ডিঙ্গির উপর দাঁড়িয়ে আছে ডিক। রাত্রির বাতাস তার চোখে মুখে লাগছে। খাড়িতে ঢেউ'এর সাদা ফেনা। অগস্ত্য নক্ষত্র মাথার উপর নিঃশব্দে জ্বলছে। এমন একটা ভয়ংকর অপার্থিব নির্বিকার জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডিকের মন বেদনায় মুচড়ে উঠল।

ঘরে ফিরে এল ডিক। না, এমেলিন এখনো ফেরেনি। দরজার কাছে একটা নারকেলের মালা পড়ে আছে। আজ সকালে একা এমেলিনের হাতে দেখেছিল ডিক। তুলে নিয়ে অনেক্ষণ ধরে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর কুটিরের দরজার কাছে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল দু'হাতের উপর মাথা রেখে।

সেই রাতে এমেলিনকে খুঁজতে সে আবার বেরিয়েছিল নিশ্চয়। এবং এই কাজটি সে নিশি পাওয়ার মতই করেছিল। কেননা, প্রত্যুষের আলোয় সে নিজেকে আবিস্কার করল সেই মূর্তি নিত্যকার। তারপর সূর্য উঠল। সূর্যের আলোয় বনের নানা রং ধরা দিল। কুটিরে ফিরে এসে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মানুষের মত মাথা নিচু করে ডিক বসে রইল দরজার কাছে।

এরপর সে যখন মাথা তুলল, দেখতে পেল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে তৃণভূমির মাঝখান দিয়ে এমেলিন আসছে।

কয়েক মুহূর্তে নিশ্চলভাবে ওদিকে তাকিয়ে থেকে লাফিয়ে উঠল ডিক, ছুটল

এমেলিনের দিকে।

এমেলেনিকে দেখাচ্ছিল রক্তহীন ফ্যাকাশে। চোখে মুখে একটা বিভ্রান্ত, হতবুদ্ধিব ভাব। তার হাতে কিছু একটা আছে। শরীরে যে একটুকরো কাপড় স্কার্ফের মত জড়াতো, তাতে কিছু জড়িয়ে নিয়ে সে আসছে। ডিক কাছে গেলে স্কার্ফে জড়ানো বস্তুটি ওর হাতে তুলে দিল এমেলিন। বস্তুটি ডিকের বুকের কাছে চাপ লেগে নড়ে চড়ে উঠল। তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিল। চীৎকারটা যেন একটা বেড়াল ছানার মিউ মিউ ডাকের মত। তাড়াতাড়ি ডিক বস্তুটিকে এমেলিনের কাছে ফিরিয়ে দেয়।

এমেলিন খুব স্নেহভাবে স্কার্ফটা একটু সরিয়ে দিতে ইঁটের মত লাল রং আর কুঞ্চিত চামড়ার ক্ষুদে একটা মুখ দেখা গেল। মুখে দুটো উজ্জ্বল ডাগর চোখ। মাথায় থোকা থোকা কালো চুল। তারপর সেই বস্তুটি দুচোখ বন্ধ করে মুখ তুলে দু'বার হাঁচলো।

খুব আলতো করে ওর মুখ আবার ঢেকে দিল এমেলিন। আর ভীষণ আশ্চর্য হয়ে ডিক বলল, 'কোথায় পেলে এটা?'

'বনের মধ্যে পেয়েছি।' এমেলিন বলল।

বিস্ময়ে বোবা ডিক এমেলিনকে ধরে ধরে কুটিরে নিয়ে এল। বাঁশের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে। ক্লান্ত এমেলিন বলল, 'একসময় আমার শরীর খুব খারাপ লাগছিল। আমি বনে চলে গেলাম। তারপর আমার কিছু মনে নেই। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি এটা আমার কাছে।'

'এটাতো একটা বাচ্চা!' ডিকের বিস্ময় তখনো কাটেনি।

'হ্যাঁ।' এমেলিন বলে।

'মিসেস জেমসের শিশুর কথা ওদের বিস্মৃত স্মৃতিতে আবার ভেসে ওঠে। জিনিষটাকে কি এটা বোঝাবার জন্যই হয়তো পুরানো দিনের বাল্যকালের স্মৃতি তাদের সাহায্য করে। অবাক বিস্ময়ে ওরা জীবনের এই কাব্যিক রহস্যময় ও অপূর্ব সুন্দর জিনিষটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

'এটার সঙ্গে একটা মজার জিনিষে দড়ির মত জড়ানো ছিল।' এমেলিন কথাটা এমন ভাবে বলল যেন একটা পার্শেল সম্পর্কে কথা বলছে।

'ওকে দাওতো। দেখি একটু।'

'না, না।' এমেলিন বলে, 'ও একাই থাকুক।'

খুব আস্তে আস্তে শিশুটিকে দোলা দিতে লাগল এমেলিন ভুলে গিয়ে। সম্পূর্ণ; আত্মহারা হয়ে দু'জনেই তাকিয়ে রইল শিশুটির দিকে। এই অবস্থায় কোন চিকিৎসক এমেলিনের সন্তান প্রসবের কথা চিন্তা করলে ভয়ে কেঁপে উঠবেন। কিন্তু দ্বীপে কোন চিকিৎসক নেই। তাই প্রকৃতিদেবী নিজের হাতে সময়, কাল ঠিক রেখে সব কিছু করেছেন।

অনেকক্ষণ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে থাকবার পর ডিক উঠে দাঁড়ায়। সে গতকাল থেকে কিছুই খায়নি। বিধ্বস্থ এমেলিনেরও সেই অবস্থা। দু'জনেই ক্লান্ত, অবসন্ন, নিঃশেষিত। আগুন জ্বালায় ডিক। কিছু রুটি ফল সেঁকে নেয়। গতকালের কিছু বাসি মাছও ছিল। কুটিরে কলাও ছিল। বড় বড় দুটো পাতায় খাবার জিনিষ সাজায় ডিক। আগে খেতে দেয় এমেলিনকে।

ওদের খাওয়া শেষ হবার আগেই পুঁটলির মধ্যে রাখা বাচ্চাটি চীৎকার জুড়ে দিল যেন খাবারের গন্ধ পেয়েছে। এমেলিন স্কার্ফ খুলে ওকে বের করল। বাচ্চাটাকে ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে। এ একবার মুখ খুলছে, আবার বন্ধ করছে। একবার চোখ মেলে তাকাচ্ছে, আবার চোখ বন্ধ করে চীৎকার জুড়ছে। তার একটা আঙ্গুল বাচ্চাটির মুখে কাছে ধরতে বাচ্চাটি এমেলিনের আঙ্গুল চুষতে লাগল। অসহায় ভাবে এমেলিন কান্না ভরা চোখ নিয়ে ডিকের দিকে তাকায়। হাঁটুতে ভর দিয়ে ডিক উঠে বসে। একটা কলার খোসা খুলে তার থেকে এক টুকরো ভেঙ্গে এমেলিনের হাতে দিল। এমেলিন কলার টুকরোটা বাচ্চার মুখের কাছে ধরে। বাচ্চাটি ওটা চুষবার চেষ্টা করে। তারপর মুখে বুড়বুড়ি তুলে আবার তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিল।

'দাঁড়াও, দেখছি কি করা যায়।' একথা বলে ঘরে রাখা একটা ডাব কাটতে থাকে ডিক। একটু ফুটো করে ডাবের জল বাচ্চাটির মুখে দেয়। বাচ্চাটি কিছুটা ডাবের জল খেয়ে ফেলে। তারপর ভীষণ ভাবে বমি করতে থাকে আর চীৎকার করে। প্রচণ্ড ভয়ে এমেলিন তার নগ্ন বুকে জড়িয়ে ধরে ওকে।

এমেলিনের নগ্ন উন্মুক্ত স্তনে বাচ্চাটির ঠোঁট স্পর্শ করল। আর সে জোঁকের মত এমেলিনের বুকে ঝুলতে থাকে।

দুপুরে, সূর্যের প্রখর উত্তাপে, খাঁড়ির জল উষ্ণ হয়ে থাকে। ওরা শিশুটিকে ওখানে নিয়ে যায়। একটুকরো কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে ওকে স্নান করায় এমেলিন। প্রথম প্রথম বাচ্চাটি চিৎকার করত। তারপর থেকে আর স্নানের জন্য কান্নাকাটি করত না। এমেলিনের গায়ে শুয়ে সে আকাশের দিকে চিৎ হয়ে দুর্দান্তভাবে হাত পা ছুঁড়ত জলে। এখন স্নান করা খুব মজার তার পক্ষে। এমেলিন যখন তাকে জলের মধ্যে উল্টে দিত, সে জলে মাথা ডুবিয়ে বুড়বুড়ি কাটত আর হাসত। আর জলের নিচের প্রবালের বিচিত্র বর্ণ ও আকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকত গভীর দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে।

জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে এই মজা দেখত ডিক। সে নিজেকে ভাবত এই বাচ্চাটির মালিকানা-সত্ত্বের একজন অংশীদার। অবশ্য তাই সে ছিল। এই শিশুটির আগমনের রহস্য আজও তাদের দু'জনের কাছে অজনা বিস্ময়ে ভরা। এক সপ্তাহ আগেও সে আর এমেলিন ছিল একা। আর হঠাৎ কোথা থেকে এই নতুন সৃষ্টি এসে হাজির হয়েছে।

শিশুটির শরীর মানুষের মতই পূর্ণাঙ্গ। ওর মাথা ভর্তি চুল। ক্ষুদে ক্ষুদে আঙ্গুলে ক্ষুদে ক্ষুদে নখ। ছোট্ট হাতে ওদের জড়িয়ে ধরে প্রতিদিন একটু একটু করে বড় হচ্ছে সে। আর ফুটে উঠেছে তার কত-না পরিবর্তন।

এক সপ্তাহের মধ্যে শিশুটির বিশ্রী রূপ মিলিয়ে গেল। ওর মুখটা ছিল যেন ইটে খোদাই করা একটা বানরের মত। ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল এক সুখী স্বাস্থ্যবান মুখশ্রী। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে দেখতে থাকে। সব জিনিষে তার কৌতুহল। কখনো সে এমন সুন্দর ভাবে হেসে উঠত যেন কোন মজার কথা কেউ তকে বলেছে। তার কালো চুল বিদায় নিল। এখনো দাঁত ওঠেনি। চিৎ হয়ে শুয়ে লাথি ছুঁড়ে বিচিত্র শব্দ করত। দু'হাতের আঙ্গুলগুলি মুখে পুরে চুষতে কত আনন্দ তার। পা তুলে হাত দিয়ে পায়ের পাতা ধরে থাকত। সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে যে সব সন্তানের জন্ম হচ্ছে, তাদেরই একজন সে।

'ওর নাম কি রাখবে?'

একদিন ঘাসের উপর গাছের ছায়ায় হামাগুড়ি দিয়ে থাকা অবস্থায় বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে এমেলিনকে প্রশ্ন করল ডিক।

'হান্না!' উত্তর দিতে এমেলিনের একটুও সময় লাগে না। তার অতীত স্মৃতিতে এই একটি নামই ভেসে আসছে। বাল্যে একটি শিশুর নাম ছিল হান্না—যাকে এমেলিন চিনত। নামটা অবশ্য খারাপ নয়। কিন্তু এই নির্জন দ্বীপে এই নাম ছাড়া সে আর কি রাখতে পাবে? অবশ্য এমেলিনের স্মৃতির এই 'হান্না' নামধারী শিশুটিও পুত্র-সন্তান।

ডিক আর এমেলিনের সংসারের স্থায়ী আরেকজন সদস্য কোকো'র কিন্তু এই নবজাতকের উপর গভীর আগ্রহ। বাচ্চাটির পাশে সে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এবং ঘাড বেঁকিয়ে ওকে দেখে। হান্না হামাগুড়ি দিয়ে কোকোর পিছনে ছোটে। উদ্দেশ্য কোকোর লেজ ধরে টানা।

কয়েক মাসের মধ্যেই হান্নার শরীর এত মজবুত আর শক্ত সামর্থ হয়ে উঠল যে সে তার বাবাকে খেলার সাথী করত জোর করে। এক সময় দেখা যেত হান্না, তার বাবা ডিক আর মা এমেলিন—তিনটি মানব মানবী শিশুর মত খেলছে। আর কোকো—তাদের খেলার বাহাবা দেবার জন্য ওদের তিনজনের মাথার উপর চক্কর কাটছে। কিন্তু এক এক সময় এমেলিন যেন কেমন হয়ে যায়। বসে বসে সে তার সন্তানের কথা ভাবতে থাকে। এ সময় চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা অস্বস্তিকর ভাবনার ছায়া। দৃষ্টি চলে যায় যেন দূরে বহু দূরে। পুরানো দিনের দুর্ঘটনার দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে প্রকৃতির উজ্জ্বল সুখী হাসিমুখের আড়ালে দুঃস্বপ্নের দিনগুলির উঁকি দেয় না, এ সুখ এ আনন্দ কিছুতেই হারাতে চায় না এমেলিন।

একটি মানব শিশুর জন্মের মত অপূর্ব-সুন্দর জিনিষ আর কি হতে পারে। এখানে,

সমুদ্রের হৃদয়ের ভিতর, সূর্যের আলো, বাতাসে আন্দোলিত গাছ, বিরাট নীল আকাশের তোরণের নিচে এই দ্বীপে নিষ্কলঙ্ক চিন্তা নিয়ে ওরা দু'জন এতটুকু লজ্জিত না হয়ে একজনের কথা আলোচনা করে। আর আলোচ্য বস্তুটি তখন ঘাসের উপর হামাগুড়ি দিয়ে কোকোর লেজ ধরবার চেষ্টা করে!

দ্বীপের এই অসীম একাকীত্বে, তাদের জীবনের অজ্ঞতা, সরলতা, ছ'বছর আগেকার মৃত্যুর অলৌকিক ভয়ংকর ঘটনা, এই নতুন সৌন্দর্যের আগমনের সাথে সাথে বিস্মৃত হয়। মৃত মানুষের কথা ওদের মন থেকে মুছে গিয়ে নবজাতকের লীলায় মুগ্ধ রাখে।

হান্না খুব দুষ্টু, সারাদিন ছটফট করে। তারা মাথায় কালো চুল ঝরে গিয়ে প্রথমে পাকা গমের মত হলুদ পরে সোনা হলুদে রংয়ের চুলে মাথা ভরে যায়। একদিন, সে যখন খুব অস্বস্তি নিয়ে তার ছোট্ট বুড়ো আঙ্গুল চিবোচ্ছিল, এমেলিন ওর ঠোঁট ফাঁক করে মাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে সাদা চালের মত একটু অংশ। হান্নার প্রথম দাঁত। সে এখন কলা, রুটিফল খেতে পারে। ওর বাবা-মা ওকে মাছ পর্যন্ত খাওয়ায়। এই দৃশ্য দেখলে একজন ডাক্তার শিউরে উঠতেন। তবু এ সব খাদ্য খেয়ে সতেজ হয়ে উঠছিল সে এবং প্রতিদিন তার শরীরে ক্রম-বর্ধমান বলিষ্ঠতার ছাপ পড়ছিল।

তার স্বাভাবিক এবং গভীর স্নান নিয়ে ওকে সম্পূর্ণ নগ্ন রাখত এমেলিন যাতে সে অক্সিজেনের পরিপূর্ণ স্নিগ্ধতা ও সূর্যের আলো গায়ে মাখতে পারে। খাড়ির অগভীর জলে ওর বগলে দু'হাত রেখে জলে ছেড়ে দিত। দু'পায়ে হান্না জলের ভিতর দাপাদাপি করত। হীরের মত উজ্জ্বল লেগুনের জল ওব পায়ের আঘাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। হান্না আনন্দে চীৎকার করত। হাসত খিল খিল করে।

এরপর ডিক ও এমেলিন এক নতুন উপস্থিতি অনুভব করল হান্নার ভিতর। ওর ভিতরে বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে। ছোট্ট মানুষেব ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। নিজের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ, তার ভাল লাগা মন্দ লাগা সম্পর্কে জানান দিচ্ছে হান্না।

মায়ের থেকে বাপকেই তার পছন্দ বেশি। মায়ের কাছে বিশেষ প্রয়োজনটুকু কেড়ে নিয়ে ডিকের কাছে গিয়ে হাজির হবে। কোকোকে বন্ধু করে নিয়েছিল হান্না। কিন্তু কোকোর এক বন্ধু যখন তার তিনটি লাল পালকের সোনালী লেজ নিয়ে কৌতুহল নিয়ে হান্নার দিকে বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে গেল, হান্নার তাকে পছন্দ হল না। সে এমন ভাবে চীৎকার করে উঠল যে পাখীটা সুরুৎ করে উড়ে পালাতে পথ পায়না।

হান্নার আরেক পছন্দ ফুল। অবশ্য যে কোন উজ্জ্বল জিনিসেই তার প্রবল আকর্ষণ। ডিঙ্গিতে লেগুনে যেতে যেতে সে চীৎকার করবে, হাসবে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে জলে যেখানে অজস্র উজ্জ্বল রঙীন প্রবাল উঁকি দিচ্ছে।

বাচ্চাদের আশ্চর্য আশ্চর্য অলৌকিক-প্রায় কাজ, বুদ্ধির কথা মায়েরা যখন আমাদের বলে, আমরা তখন হাসি। কিন্তু মায়েরা যা দেখতে পায় তাদের সন্তানের মধ্যে—আমরা তা দেখতে পাইনা। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোঁটাব রহস্যে মোড়া। আভাস মায়েরাই শুধু দেখতে পায়।

একদিন ওরা লেগুনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নৌকা বাইতে বাইতে এক সময় ডিক থেমে যায়। এমেলিন তার কোলে হান্নাকে নাচাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ডিকের হাত ধরে বলে ওঠে, 'ডিক!'

হান্নার জীবনের প্রথম কথা বলা।

ডিক যেন এক আশ্চর্য সঙ্গীত, তার নাম ডাকা শুনলে এমন একজনের কাছ থেকে, যাকে সেই সৃষ্টি করেছে। ডিক ওকে কোলে তুলে নেয়। তার মনে হয় পৃথিবীতে যদি সত্যি কিছু প্রিয় থাকে—তবে সে হান্না—শুধু হান্না। এমনকি এমেলিনও নয়।

ঝড়— সে শুধু ঝড় বলেই তার পরিচয়। এই দ্বীপে ঝড় আগেও ঝাপটা মেরেছে বার কয়েক। কিন্তু সে ঝড় অন্য জিনিষ। হয়তো সকালটা ছিল উজ্জ্বল। সূর্য হয়তো এমন আলোর তেজ কখনো আগে এই ভাবে দেয়নি। বাতাস সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। লেগুন শান্ত। আর তারপরই ভয়ংকর দ্রুততায় নিজের পাগলামি দেখাবার জন্য কে যেন সূর্যকে কালো চাদরে ঢেকে দিল। সমুদ্র থেকে একটা ক্রুদ্ধ হাত গর্জন করতে করতে দ্বীপকে তছনছ করে, লেগুনের জল ফেনায়িত করে, নারকেল গাছগুলিকে শুইয়ে দিয়ে, কিছু পাখী হত্যা করে—তার ভয়ংকরী রূপ শান্ত হয়।

এক রাতে ডিক কুটিরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর হান্না ঘুমাচ্ছে। আকাশে তারা, চাঁদ এখনো ওঠেনি। ডিক এতক্ষণ জলের ধারে ছিল। এমেলিনকে ডাকল ইশারা করে। হান্নাকে ভাল করে শুইয়ে রেখে এমেলিন কুটিরের বাইরে এল।

'আমার সঙ্গে এস। একটা জিনিষ দেখবে।' ডিক বলল।

ডিকের সঙ্গে এমেলিন জলের ধারে পৌঁছে লেগুনের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। দূর থেকে লেগুনের জলকে মনে হচ্ছে যেন বিবর্ণ, ঘনীভূত একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কাছে গিয়ে সে বুঝতে পারল—এটা তার চোখের ভুল। লেগুনে যেন আলোর মালা। লেগুন জ্বলছে।

লেগুনের উপর নিচে ফসফরাসের আগুন। প্রবালের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা যেন মশালের মত জ্বলছে। প্রত্যেকটি মাছ যেন চলমান লণ্ঠন। জোয়ার আসছে। তারই অগ্রগামী জলে মেঝের মত লেগুনের জ্বলন্ত তলা নড়ছে, কাঁপছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি পাড়ে উঠে উজ্জ্বল আলোর রেখা ফেলা রেখে আবার ফিরে যাচ্ছে।

'দ্যাখো, দ্যাখো।' ডিক পাড়ে হাঁটু মুড়ে বসে তার হাত জলের ভিতর ঢুকিয়ে দিলে ডুবে থাকা হাতের অংশটুকু শিখাহীন ভাবে জ্বলতে থাকে। জল থেকে হাত

তুলে নেয় ডিক। হাত যতটুকু পর্যন্ত ভিজে ছিল, সেই অংশটুকু জ্বলন্ত দস্তানার মত দেখাচ্ছে।

লেগুনে এই ফসফরাসের অনুপ্রভা তারা আগেও দেখেছে। আকাশে চাঁদ না থাকলে রাতে লেগুনের চলমান মাছগুলিকে দেখায় যেন রূপোর পাতের মত। কিন্তু আজকের দৃশ্য আগে কখনো ওরা দেখেনি। লেগুনের আজকের রূপ যেন স্বপ্নের মত মোহ ছড়াচ্ছে।

এমেলিনও পাড়ে হাঁটু ঠেকিয়ে নিজের দু'হাত জলে ডুবিয়ে হাত দুটোকে একজোড়া ফসফরাসের দস্তানা বানিয়ে নেয়। হাতের দিকে তাকিয়ে খুশিতে চীৎকার করে ওঠে। হাসতে থাকে সে। এ যেন আগুন নিয়ে ওরা দুজন খেলছে– এমন আগুন, যে আগুনে দাহ নেই। তারপর ডিক আঁজলা করে জল তুলে নিজের মুখে মাখতে থাকল যতক্ষণে তার মুখ ফসফরাসের আলোয় জ্বল জ্বল করতে থাকে।

এই মজার ভাগ থেকে হান্না-ই বা কেন বঞ্চিত হয়। এমেলিনকে দাঁড় করিয়ে রেখে ডিক এক ছুটে কুটিয়ে গিয়ে হান্নাকে নিয়ে এল। তারপর হান্নাকে এমেলিনের কাছে দিয়ে জলে ভাসাল নৌকাটাকে। দু'জনকে নৌকায় তুলে পাড় ছেড়ে জলে ভেসে পড়ল ডিক।

নৌকার বৈঠা দু'টো যতটুকু জলের তলায়, ততটুকু অংশ যেন রূপোর লম্বা চওড়া খণ্ডের মত দেখাচ্ছে। নৌকার পাড় দিয়ে মাছেরা যাচ্ছে ধুমকেতুর লেজের মত আলো ছড়াতে ছড়াতে। প্রতিটি প্রবালের টুকরো যেন এক একটি ঝাড়লণ্ঠনের বাতির মত জ্বলছে। সমস্ত লেগুনটাই যেন দেখাচ্ছে আলোকোজ্জ্বল নাচের আসরের মত। এই অদ্ভুত আলোর খেলা দেখে এমেলিনের কোলে বসা হান্না তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিল।

ডুবো পাহাড়ে নৌকা ভিড়াল ডিক। ওরা ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াে নাগল সমতল অংশটুকুতে। এখানে থেকে সমুদ্রকে দেখাচ্ছে যেন উজ্জ্বল শ্বেত-শু: বরফের স্তূপ। ফেনাগুলিকে দেখাচ্ছে যেন আগুনের বেড়া।

এই অভূতপূর্ব দৃশ্য ওরা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল—তখন হঠাৎ বাতি নিভিয়ে দিলে যেমন হয়—ফসফরাসের অনুপ্রভা মুছে গেল।

চাঁদ উঠেছে। পাখির ঝুঁটির মত জল ছেড়ে ওঠার প্রথম দৃশ্য। দিগন্তে তাকে দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কিন্তু এ চাঁদের রং লাল। ভীতিপ্রদ চেহারা। একটা ধোঁয়ার আবরণে চাঁদ ঢাকা আছে।

পরদিন সকালে ওরা ঘুম থেকে উঠে দেখল দিনটা অন্ধকার। দিগন্ত বিস্তৃত করে সিসে রংয়ের নিশ্চিদ্র ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। এক ফোঁটা বাতাস নেই। পাখীগুলি পাগলের মত উড়ছে যেন কোন অজানা শত্রু তাদের তাড়া করছে।

ডিক সকালের খাবার বানাবার জন্য কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালায়। এমেলিন ইতস্ততঃ পায়চারি করে বেড়াচ্ছে হান্নাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে। এক অস্বাচ্ছন্দ্য অস্থিরতায় ভুগছে সে।

সকালে যেটুকু আলো ছিল—তা আরও কমে গেল। একটা হাওয়া উঠল। গাছের পাতারা শব্দ করে উঠল বৃষ্টির মত। একটা ঝড় আসছে। কিন্তু ওরা যে ঝড়গুলি আজ পর্যন্ত দেখেছে—আজকের ঝড়ের আভাস যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। অচেনা, অজানা।

বাতাসের গতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ দূরের দিগন্ত থেকে ভেসে আসতে লাগল। এ যেন হাজার হাজার লোক দূরে কোথাও চীৎকার করছে। এক সময় শব্দটা থেমে গেল। শুধু বাতাসের সঙ্গে গাছের ডালপালা আর পাতার আছড়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাতাস হঠাৎ ভীষণ জোরে বইতে শুরু করল। লেগুনের জলে অজস্র ফেনা। ডুবো পাহাড়ের মাথায় মেঘের সারি। যে আকাশ এতক্ষণ সিসে বর্ণ ধারণ করে শক্ত ছাদের মত শান্ত ছিল—সেই আকাশ দ্রুত ভাবে পূর্বদিকে ধেয়ে গেল যেন কোন নদীতে বন্যা আসছে। এক অপার্থিব স্বপ্নের দেশের মত দূরাগত বজ্রের শব্দ ক্ষীণভাবে হলেও এই দ্বীপে ভেসে আসছে লাগল।

এমেলিন কুটিরের মেঝেতে ঝুঁকে পড়ে নির্বাক হয়ে হান্নাকে তার বুকে চেপে ধরে আছে। হান্না এখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। দরজার কাছে ডিক দাঁড়িয়ে। যদিও তার মনে অস্বস্থি জাগছে, কিন্তু তা সে প্রকাশ করছে না।

এই সৌন্দর্যে ভরা দ্বীপটি এখন ছাই ও সিসে রংয়ে ছেয়ে গেছে। দ্বীপের সব সৌন্দর্য মুছে গিয়ে একটা বিষাদ ও নিদারুণ বেদনা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

কোকো-পাম গাছগুলি হ্যারিকেন-ঝড়ের দাপটে দুলতে শুরু করল। তারপর বাতাসের তীব্রতায় উৎপাটিত হয়ে পড়তে লাগল। সৌভাগ্যবশতঃ কুটিরটার অবস্থান ছিল গাছের আড়ালে ও লেগুনের মধ্যবর্তী জায়গায়। ফলে এই ধরণের ঝড়ের আক্রমণ কিছুটা রোধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সমস্ত আকাশের মেঘ চিরে খান খান করে দিয়ে প্রচণ্ড এক বজ্র আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বৃষ্টি পড়তে লাগল অঝোরে

ডিক দরজা থেকে সরে ঘরে এসে এমেলিনের পাশে বসে পড়ে। বজ্রের ভয়ংকর শব্দে হান্না জেগে উঠেছে। ওকে বুকে জড়িয়ে এমেলিন থর থর করে কাঁপতে শুরু করল।

এ ভাবে ওরা অনেকক্ষর বসে থাকল। কখনো বৃষ্টি থামছে আবার জোরে নামছে। বজ্রের শব্দ পৃথিবী ও সমুদ্রকে কাঁপিয়ে দিতে লাগল। কুটিরের মাথার উপর একঘেয়ে কান্নার মত চীৎকার করতে করতে বাতাস ছুটে চলেছে।

তারপরই বাতাস পড়ে গেল হঠাৎ। বৃষ্টিও থেমে গেল। দেখা দিল ভোরের আলোর মত একটা বিবর্ণ আলো।

ওঠবার জন্য তৈরি হতে হতে ডিক বলল, 'যাক, শেষ হল এবার।'

'না, না। ওই শোন!' হান্নাকে এক হাতে বুকে জড়িয়ে অন্য হাতে ডিককে ধরে রেখে এমেলিন বলল। ওর মন বলছে, যা হয়ে গেল—এর থেকেও ভীষণ কিছু আসছে।

অখণ্ড নৈশব্দের মধ্যে ওরা কান পেতে শুনল একটা শব্দ। হাজার হাজার মৌমাছি যেন গুঞ্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে। এবার ধেয়ে আসবে সাইক্লোনের বা ঘূর্ণি-ঝড়ের কেন্দ্র।

সাইক্লোন চলে ঘুরতে ঘুরতে। ঠিক যেন একটা আংটির আকার তার। সমুদ্রের উপর দিয়ে ছুটে চলে অস্বাভাবিক দ্রুততা ও ধ্বংসের ক্ষমতা নিয়ে। যদিও এর কেন্দ্র বা বা সাইক্লোনের 'চোখ' বলে যে অংশ তা খুবই শান্ত।

ওরা সাইক্লোনের শব্দ শোনে। শব্দটা বাড়ছে। তীক্ষ্নতা নিয়ে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এ যেন বধির করে দেওয়া ধনুকের টংকার। এই টংকার শব্দের সাথে ভেসে আসছে মড়মড় করে গাছ ভেঙ্গে পড়বার শব্দ। এই শব্দ যেন মস্তিষ্কে মুগুর পেটার মত আঘাত করে সব কিছু স্তব্ধ করে দিতে চায়। এক মুহূর্তের মধ্যে কুটিবটা খড়কুটোর মত বাতাসে উড়ে যায়। ওরা তিনজন একটা গাছের গুড়ি আকড়ে ধরে বোবা হয়ে যায়। চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে। অর্ধ-মৃতের মত ওরা পড়ে থাকে।

কতক্ষণ ওরা ওভাবে পড়েছিল জানেনা। শেষে পাগলামিতে ক্ষান্তি দিয়ে বাতাসের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। ঘূর্ণি-ঝড়ের 'চোখ' এবার দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়িয়ে ওরা এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখে। বাতাসে অসংখ্য পাখী, প্রজাপতি, কীট-পতঙ্গ সুসংবদ্ধভাবে ভাসতে ভাসতে ঝড়ের সাথে ভেসে চলেছে। যদিও দ্বীপের বাতাসের গতি মন্থর, কিন্তু পূর্ব. পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ-সব দিক থেকে ঝড়ের হুংকার ভেসে আসছে। ঘুর্ণি-ঝড়ের বাতাসের মার খেলে যে কেউ হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। কিন্তু ঘুর্ণি-ঝড়ের ঠিক মাঝখানে প্রগাঢ় শক্তি বিরাজ করে। এই কেন্দ্রের বাইরের বাতাসই ক্ষতি করে ভীষণ ভাবে।

ঘূর্ণি-ঝড় যখন পাখী, সী-গাল, প্রজাপতি, কীটপতঙ্গদের টেনে চলে যাচ্ছিল, প্রচণ্ড গর্জন করে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ থেকে শেষ-ঝড় দ্বীপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার শুরু হল সেই তাণ্ডব।

কয়েক ঘণ্টা ধরে এই তাণ্ডব স্থায়ী হল। শেষে মধ্যরাত্রিতে বাতাস পড়ে গেল। পরদিন সকালে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য যখন দেখা দিল তখন কিন্তু এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করল না যে তার অনুচর বাতাস কি ধ্বংসই না করে গেছে। সূর্যের আলোয় এবার পরিস্কার ভাবে দেখা গেল ধ্বংসের রূপ। অসংখ্য গাছ ভূপতিত। অজস্র পাখীর মৃতদেহ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি বেতের অংশ ছাড়া কুটিরটা যে

কোনদিন ওখানে ছিল—বোঝাই যায়না। লেগুনের জল বিবর্ণ। আর ধূসর কাঁচের মত ফেনা মাথায় করে সমুদ্র আছড়ে পড়ছে ডুবো পাহাড়ের উপর।

সূর্যের অকৃপণ আলোয় চারিদিক দেখে শুনে ওদের মনে হয়েছিল যে ওরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বসে থাকল না। খুঁজতে থাকল ওদের ছোট সংসারের টুকিটাকি জিনিষগুলি। সভ্য সমাজে এগুলির হয়তো কোন মূল্য নেই। কিন্তু এখানে, এই সভ্যতার সংস্পর্শ বিরহিত একটা জনহীন দ্বীপে ওদের অতি সামান্য জিনিষও তাদের কাছে অসামান্য।

প্রথমে ডিক আবিস্কার করল করাতটা। একটা গাছের নিচে চাপা পড়ে আছে। তারপর পাওয়া গেল ছুরিটা। ওদের অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে—ঝড় ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। প্রতি ইঞ্চি খুঁজে খুঁজে ডিক বের করতে লাগল তাদের ছত্রাখান সম্পত্তিগুলি। যে কয়েক টুকরো কাপড় ওদের ছিল, তার সবটুকুই সাইক্লোন নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। না পেরে, ওগুলি একটা কৃশ নারকেল গাছের সঙ্গে এমন ভাবে পেঁচিয়ে রেখে গেছে যেন, দেখলে মনে হয়, কারো একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা। মাছ ধরার বঁড়শিগুলি একটা রুটি গাছের শরীরে বিদ্ধ হয়ে আছে। 'কোনানডোয়া' জাহাজ থেকে যে পাল জোগাড় করে একদিন এখানে আনা হয়েছিল, সেই পাল উঠে গিয়ে ডুবো পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিয়েছে। একটা বড় প্রবালের টুকরো পালটাকে আরও দূরে উড়ে যাবার পথ বন্ধ করেছে। নৌকার চৌকো পালটিকে আর শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল না।

যদি কেউ বুঝতে পারে, তবে সে ঘূর্ণি-ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যে অনেক মজার জিনিষ আবিস্কার করতে পারে। এই বিরাট ঘূর্ণির পাশাপাশি আরও যে ছোট খাট ঘূর্ণি ওঠে, এরা হলো বড় ঘূর্ণির বাচ্চা দুষ্টু ছেলেরা। এদের দুষ্টুমির বৈশিষ্ট্য আছে।

গত রাতে এই ঝড় চলাকালীন, অন্ততঃ দু'বার এমেলিন অনুভব করেছে যে প্রচণ্ড বাতাস তার কাছ থেকে হান্নাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। এমেলিনের সন্দেহ হয়েছিল—এই ঝড়ের মতলবই ছিল তার শিশু পুত্রকে তার বুক থেকে টেনে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া। এটা শুধু তার সন্দেহই ছিলনা—সেই মুহূর্তগুলিতে মনে প্রাণে একথা বিশ্বাসও করত এমেলিন।

ঘুরে ফিরে ডিক একটা ব্যাপারে সন্তুষ্ট হল যে, ডিঙ্গিটা জলে ডুবে আছে। যার ফলে ঝড়ের তাণ্ডব নৌকাটির ক্ষতি করতে পারেনি। এমনকি নৌকাটাতে কোন আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি। পরবর্তী ভাঁটার সময় ডিঙ্গিটা জল থেকে তুলতে কোনই কষ্ট হলনা ডিকের। জল থেকে তোলবার পরে আগেকার মতই ডিঙ্গিটা জলে ভাসতে থাকে।

কিন্তু বনের গাছ-গাছালির ক্ষতির দৃশ্য বড় করুণ। কোথাও গাছগুলি তালগোল

পাকিয়ে আছে, কোথাও বা এমনভাবে উড়ে গেছে যে ফাঁকা হয়ে আছে জায়গার জায়গায়। বড় বড় নারকেল গাছগুলি মুমূর্ষের মত ধুঁকছে। এমন ভাবে কোমর ভেঙ্গে পড়ে আছে যেন বিরাট কোন পদাঘাতে তারা মাটিতে শুয়ে আছে। দলে মুচড়ে মোটা তারের আকার নিয়েছে অসংখ্য লায়লা লতা। তাল গাছের নিচে তো হাঁটাই যায়না। লাথি মেরে পরে থাকা ফলগুলি সরালে তবে পথ করা যায়। একটা গাছও সোজা নেই। ঝুঁকে পড়েছে। কাঁঠাল গাছগুলি ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে।

এই ধ্বংস স্তূপের মাঝখানে কিন্তু আশ্চর্যভাবে একটা পথ হয়ে রয়েছে। যেন বিরাট এক সৈন্যবাহিনী, তাদের কামান, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চেপে অথবা মার্চ করে লেগুনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত কিছু দলিত মথিত করে গেছে। এই রাস্তা অবশ্য ঝড়ের প্রথম পদক্ষেপের চিহ্ন। শুধু এই বনেই নয়, খোঁজ করলে দেখা যাবে এভাবে অন্য বনে জঙ্গলেও ঝড়ের সৈন্যরা পথ করে এগিয়ে গেছে। এমন কি ঝড়ের দুষ্টু ছেলেরাও যে পথে গেছে, তারাও এ ব্যাপারে ক্ষমতার কমতি দেখায়নি।

এই হাঁড়-পাঁজর বের করা বন থেকে আশ্চর্য সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এ যেন স্বর্গের সুবাস। অসংখ্য নষ্ট ফুল, লায়লা, ভাঙ্গা গাছের গুড়ি, বট গাছের ডাল, কাঁঠাল গাছের ভাঙ্গা অংশ থেকে এক অদ্ভুত মিলিত সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

অসংখ্য মৃত প্রজাপতি ও পাখি ইতস্ততঃ পড়ে আছে। ঝড়ের পথে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রজাপতির পাখনা, পাখীর লেজ, কলমি লতার কুটি কুটি করে ছেঁড়া অংশ। মনে হচ্ছে কেউ আঙ্গুল দিয়ে ওগুলি মজা করবার জন্যই টুকরো টুকরো করেছে।

সাইক্লোন হল সেই শক্তিমান হাওয়া যে একটা জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে, গুঁড়ি শুদ্ধ গাছ উপড়ে দিতে পারে। ধ্বংস করে দিতে পারে একটা শহরকে। সাইক্লোনের সুফলতার দিক আছে। প্রজাপতির পাখনাও ছিঁড়তে পারে। সাইক্লোনের ক্ষমতা এমনই।

বনের ভিতর ধ্বংসলীলার রূপ দেখতে দেখতে এমেলিন হান্নাকে কোলে করে ডিকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গত কালের সেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, কীট পতঙ্গের যুথবদ্ধ ভাবে সাইক্লোনের টানে উড়ে যাবার দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কি অশুভ অমঙ্গলে ঝড়ই না এসেছিল। কিন্তু তাদের ও হান্নাকে বোধহয় দয়া করে গেছে। নইলে সমুদ্রের নীল জলে উড়িয়ে ফেলতে ঝড়ের কতটুকু কষ্টই বা হতো!

সভ্য দেশের যাকে বলা হয় 'ভাগ্য'—ঝড়ের অবিরাম ভয়ংকর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এমেলিনও এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনা। ঘুর্ণিঝড় তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করেছে বলতে হবে। তাদের কুটিরটা উড়ে গেছে। যাক্। ওটা কিছু বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু তাদের, অতি প্রয়োজনীয় 'ও'

মহামূল্যবান জিনিষগুলি রয়ে গেছে। চকমকি পাথর, করাত, ছুঁরি চলে গেলে দশটা কুটির থাকলেও তাদের কোন লাভই হতো না। বিশেষ করে চকমকি পাথর, ওটা না হলে আগুনই জ্বালানো যাবেনা।

যাই হোক, সাইক্লোন তাদের দয়া দেখিয়ে গেছে বলতেই হবে। সাইক্লোনের এই রহস্যময় বদান্যতার জন্য তারা তাদের ঈশ্বরের কাছেই ঋণী রইল।

পরদিন থেকেই ঘর বানবার কাজে হাত লাগাল ডিক। সে ডুবো পাহাড় থেকে পালটা তুলে এনেছিল। ওই দিয়ে একটা তাবু করে আপাততঃ বাস করতে লাগল তারা।

বন থেকে বেত কেটে আনা এক কঠিন কাজ। এমেলিনও তাকে এই কাজে সাহায্য করল। ওরা দু'জন যখন কাজ করে, হান্না তখন ঘাসের উপর বসে কোকোর সঙ্গে খেলা করে। ঝড়ের সময় কোকো কোথাও চলে গিয়েছিল। কিন্তু গত সন্ধ্যায় সে তার অজানা বাসস্থান থেকে আবার এখানেই চলে এসেছে। প্রথম থেকেই কোকো ছিল হান্নার বন্ধু। কিন্তু এখন এই বন্ধুত্ব আরও ঘন হয়েছে। হান্না তার ছোট দুটো হাতে পাখীটাকে জড়িয়ে ধরতে পারে।

একটা পাখীকে জড়িয়ে ধরা মানুষের এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। একটা পোষমানা পাখী, যে ভীত নয়, ধরলেও ছটফট করেনা, এমন পাখীকে জড়িয়ে ধরলে রমনীর দেহের নরম সুখ পাওয়া যায়।

হান্না একটি বুদ্ধিমন্ত উজ্জ্বল শিশু। কিন্তু সেই যে একবার 'ডিক' বলে ডাক দিয়েছিল, তারপর তাকে ভাষার জটিলতায় আসতে সময় নিয়েছে অনেক। যদিও জিহ্বাকে সে খাটায় না কথা বলার জন্য, কিন্তু তার প্রকাশ করবার নিজস্ব ভঙ্গি অনেক আছে। তার চোখ দুটো কোকোর মতই উজ্জ্বল আর দুষ্টুমিতে ভরা। হাত, পা, শরীরের সমস্ত রকম অঙ্গভঙ্গি দিয়েই সে তার মনের কথা প্রকাশে পটু হয়ে উঠেছে। খুব ফূর্তি হলে সে হাত দুটো ঝাঁকাতে থাকে। যদিও তার রাগ-টাগের বালাই নেই, কিন্তু রেগে গেলে ভিন্ন চেহারা ধরে।

এখন হান্নার যা বয়স, তাতে তার খেলনা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা। সভ্য জগতে তার জন্ম হলে এতদিনে সে নিশ্চয় একটা রবারের কুকুর অথবা উলের তৈরি ভেড়ার মালিক হত। কিন্তু এখানে খেলনার, অন্ততঃ সভ্য জগতের খেলনার কোন অস্তিত্ব নেই। ওরা যখন দ্বীপের এই অঞ্চলে চলে আসে, এমেলিনের সেই অদ্ভুত পুতুলটা ফেলে এসেছিল। বছর খানেক আগে, একবার তার 'অভিযান'এর সময় পুরানো জায়গায় বালুর মধ্যে আধখানা পোঁতা অবস্থায় পুতুলটা পায়। কৌতূহলের বশেই ডিক ওটা এই কুটিরে নিয়ে এসে একটা গাছের ডালে উঠে আটকে ছিল। ঝড় বুঝি পুতুলটার সঙ্গে রসিকতা করেই এই কাজ করে। নামিয়ে এনে ডিক যখন হান্নাকে

ওটা উপহার দিয়েছিল, ভীষণ বিরক্তিতে পুতুলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল হান্না। তার অবশ্যই খেলনা ছিল এবং তা বিচিত্র ধরণের। ফুল, নানা রংয়ের শঙ্খ, ঝিনুক, প্রবালের টুকরো। এই দিয়ে ঘাসের উপর হান্না সাজিয়ে সাজিয়ে তার কল্পনার পরিকল্পনায় বিভিন্ন জিনিষ বানাত। গুহাবাসি প্রস্তর যুগের শিশুদেরও হয়তো এই খেলনাই আনন্দ দিত। একটা ঝিনুকের দুটো শক্ত খোলা দিয়ে বাদ্য বাজালে যে খটখট শব্দ হয়, এই শব্দ থেকে হান্নার কাছে আর কি আনন্দদায়ক হতে পারে?

এক বিকেলে, ও নতুন করে তৈরি করা বাড়িটা যখন প্রায় একটা আকৃতি নিয়েছে, ওরা কাজ বন্ধ করে বনের ভিতরে ঢুকে গেল। এমেলিনের কোলে হান্না। কখনো কখনো ডিকও তাকে কোলে নিচ্ছে। ওরা চলেছে 'মূর্তি উপত্যকা'র দিকে।

ওদের ছোট্ট সংসারে হান্নার আগমন পর্যন্ত রহস্যময়, ভয় মেশানো শ্রদ্ধেয় মূর্তিগুলিকে আর ভয় পায়না এমেলিন। এই মূর্তি তার কাছে আশির্বাদস্বরূপ। এরই ছত্রছায়ায় তাদের জীবনে প্রেম এসেছে। একটি শিশুর আত্মা তার শরীরে প্রবেশ করেছে এই মূর্তির দয়াতে।

একদা যে মূর্তিটি অজানা অধিবাসীদের দেবতা ছিল, সেই দেবতা এমেলিনের মনে ধর্মের চেতনা এনেছে। এমেলিনই হয়তো এই পাথরের দেবতার শেষ পূজারিনী।

ডিক আর এমেলিন, হান্নাকে নিয়ে যখন এই উপত্যকায় এল, ওরা দেখতে পেল সেই পাথরের বিশাল দেবতা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে বড় বড় পাথরের টুকরো।

এখানে নিশ্চয় একটা ধ্বস নেমেছিল। বহুদিন ধরেই এই ধ্বংসলীলার বীজ সুপ্ত থাকে। আর ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত শেষ কাজটুকু করে। প্রশান্ত মহাসাগরের পোনাপে, হুয়াহাইন, ঈষ্টার আইল্যাণ্ডদ্বীপগুলিতেও একই দৃশ্য দেখা যায়। বিরাট বিরাট পাথরের দেবতারা ভেঙ্গে চুর চুর হয়ে পড়ে আছে। মন্দিরগুলি ক্ষয় হতে হতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এক একটা চত্বর, যা পাহাড়ের মতই কঠিন ছিল, কালের কবলে পড়ে পাথরের বিকৃত স্তূপের মত হয়ে আছে।

পরদিন সকালে তাবুর ভিতর সূর্যের আলো উঁকি দিলে এমেলিনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। নতুন করা কুটিরটা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পালের উদ্ধার করা অংশগুলি দিয়েই তৈরি হয়েছে তাবুটা।

এ অঞ্চলে সকাল হয় একটু দেরিতে। সমুদ্রের কাছে যেমন সূর্যের প্রথম আলোর সঙ্গেই দেখা হয় এখানে কিন্তু গাছ-গাছালির উচ্চতা ও ঘনত্বের জন্য আলো ফোটে দেরিতে। সমুদ্র পাড়ে ডুবো পাহাড়ের ফাঁকে পুব দিগন্তে সমুদ্রের সীমারেখায় গভীর নীল আকাশে প্রথম সূর্যের লাল আভা দেখা দেয়। তারপর সূর্যালোকে প্লাবিত করে লেগুনকে! লেগুনের ছোট ছোট ঢেউগুলিকে যেন ধরবার জন্য হাত বাড়ায় সূর্য।

কিন্তু দ্বীপের অপর দিকের দৃশ্য তখন ভিন্ন রকম। তখনো হয়তো ভোরের আলো ফোটেনি। আকাশে তারা। গাছ-গাছালিগুলি মখমলের ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে। তারপর গাছেরা যেন ঘুম ভেঙ্গে আড়মোড়া দেয়। পাতাদের নড়াচড়ার খসখস, পটপট শব্দ শোনা যায়। ডুবো পাহাড়ে সমুদ্রে ঢেউ আছড়ে পড়ার দূরাগত ধ্বনিও ক্ষীণ হয়ে আসে। ভোরের বাতাস দ্বীপের উপর বইতে থাকে। নক্ষত্ররা ততক্ষণে উধাও। আকাশের রং বিবর্ণ নীল। এখানে প্রত্যুষে যেন অনির্বচনীয় এক রহস্যে মোড়া।

এমেলিন ঘুম থেকে উঠবার পরেই অবশ্য ডিকের ওঠার অভ্যাস। এরপর ওরা দু'জন আর হান্না—তৃণভূমি পেরিয়ে জলের ধারে চলে যায়। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডিক। পাড়ে দাঁড়িয়ে হান্নাকে কোলে নিয়ে এমেলিন ডিকের স্নান করা দেখে।

এক একটা বড় ঝড়ের পর দ্বীপের আবহাওয়া পাল্টে যায়। প্রকৃতি যেন উল্লাসে মেতে ওঠে। আজকের সকালে যেন বসন্তের ডাক। এমেলিন প্রকৃতির এই স্পর্শ অনুভব করে। সাঁতারে রত ডিককে দেখে সে উজ্জ্বল ভাবে হাসে। হান্নাকে উঁচু করে তুলে ধরে ডিকের কসরৎ দেখাতে থাকে। বাতাসে বনের সুগন্ধ ভেসে আসছে। তার কালো চুল উড়ছে। তাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো এমেলিন ও হান্নার উপর এসে পড়েছে। প্রকৃতি যেন সোহাগে ভরিয়ে দিচ্ছে ওদের।

স্নান শেষ করে ডিক পাড়ে এসে ওঠে। জল শুকোবার জন্য কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করে হাওয়ায়। তারপর সে ডিঙ্গিটার কাছে গিয়ে ওটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখে নেয় সব কিছু ঠিক-ঠাক আছে কিনা। আজ তার ইচ্ছে, আধবেলা ঘর বানানোর কাজে কামাই করে পুরানো জায়গাগুলিতে যাবে। ঝড়ের পরে কলাগাছগুলির কি অবস্থা—দেখাটা খুবই দরকার। কলার প্রতি তার দুর্বলতা নিয়ে কেউ যেন অবাক না হয়। এই দ্বীপ তার খাদ্যের ভাণ্ডার এবং কলা একটি প্রিয় মূল্যবান খাদ্য। ওই গাছগুলির প্রতি তার গৃহিনীসুলভ মনোভাব আছে। কলাগাছগুলির কি অবস্থা হয়েছে—না দেখে সে শান্তি পাচ্ছিল না।

এরপর ওরা ফিরে গিয়ে সকালের খাবার বানাতে বসে গেল। ভিজে কাঠকুটোগুলি রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়েছিল ডিক। তা ছাড়া নারকেলের ছোবড়া আগুন জ্বালাবার পক্ষে অপূর্ব—এটা ডিক আগেই আবিস্কার করেছিল।

খাবার বানানো ও খাওয়া শেষ হলে ডিক তার ছুরিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বল্লমটাও সঙ্গে নিল। তারপর নৌকার দিকে চলতে থাকে। হান্নাকে নিয়ে এমেলিন পিছন পিছন যায়।

নৌকা জলে ভাসিয়ে ডিক তাতে চড়ে বসলে এমেলিন হঠাৎ বলে, 'ডিক!'

'বল।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

অবাক হয়ে ডিক বলে, 'তুমি যাবে?'

'হ্যাঁ, যাব। আমি—আমি আর ভয় পাই না।'

হান্নার জন্মের পর সত্যি সত্যি এমেলিন দ্বীপের অন্য অংশটার সেই ভয়াল স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেছে। মৃত্যু অন্ধকারে ভরা। কিন্তু জন্ম—ভরা আলোয়। এই মৃত্যুর স্মৃতি ও নবজাতকের আনন্দ—দুটোই তার মনে থাকলেও মৃত্যুর অন্ধকার তার কাছে আর ভয়াবহ নয়। জন্মের আলো তাকে মুছে দিতে পেরেছে। এই দুই-এর সংমিশ্রণে প্রত্যুষে অথবা প্রদোষের বিষণ্ণতা তার মনকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু বিষণ্ণতা সৌন্দর্যে মোড়া—যাতে ভয় নেই।

কত বছর আগে পৃথিবী থেকে একটি জীবন মুছে গেছে। এক রহস্যময় দুয়ার তার মনে বন্ধ হয়েছিল এই কারণে। সেই বৃদ্ধ, প্রিয় বন্ধু বাটনের চিত হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহটা তার মনে অকল্পনীয় ভয় জাগিয়েছে। এই ভয় প্রকাশের কোন ভাষা সে খুঁজে পায়নি। কোন ধর্ম অথবা দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়ে এই আতঙ্ক দূর করতে পারেনি সে। কিন্তু তার মনের বন্ধ দুয়ার খুলে গেছে আর এক রহস্যময় আগন্তুকের আগমনের সাথে সাথে। তার মনের গভীর অন্তঃস্থলে এর ব্যাখ্যা সে পেয়ে গেছে। এক জীবন শূন্যে মিলিয়ে গেছে কিন্তু এসেছে আরেক জীবন। এই শূন্যে হয়ত তার প্রিয় খেলার সাথী আজও লুকিয়ে আছে। কিন্তু তার জন্য আর ভয় করেনা এমেলিন।

হান্নাকে নিয়ে এমেলিন নৌকায় উঠে পড়ে। ওরা গলুইতে বসলে ডিক নৌকা জলে ভাসায়। বৈঠা হাতে নিয়ে বাইতে যাবে, এমন সময় আর এক যাত্রীর আগমন হল। নতুন যাত্রীটি হল কোকো। ডিকের সঙ্গে কোকো অনেকবার ওই সব অঞ্চলে গেছে। কিন্তু কোকো একা কখনও ওদিকে যায় না। কয়েকবার চক্কর কেটে সে নৌকার বৈঠায় বসে পড়ল। তার লম্বা রঙীন লেজ জলের দিকে ঝুলে থাকে।

পাড় ঘেঁষে নৌকা বাইতে থাকে ডিক। ছোট্ট অন্তরীপটা ঘুরে যেতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে দ্বীপের রঙ্গীন দৃশ্য। তীরের কাছে ঘেঁষা নারকেল গাছ আর ঝোপগুলিকে ধাক্কা দিতে দিতে নৌকা চলতে থাকে। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে হান্না বারে বারে হাত বাড়িয়ে গাছগুলি ধরবার চেষ্টা করে। এমেলিন একবার হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ভেঙ্গে নেয়।

'এক্ষুনি ফেলে দাও।' ডিক হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে। এমেলিন যে ডালটা ভেঙ্গে নিয়েছিল তাতে থোকা থোকা কুঁচ ফল। এই সেই ফল—যা খেলে সেই যে ঘুম আসবে যা আর কোন দিনই ভাঙ্গবে না।

এমেলিন গাছের ডালটা নিয়ে হান্নার সঙ্গে খেলছিল। হান্না ওটাকে ধরবার জন্য লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল আর খিল খিল করে হাসছিল। ডিকের চীৎকারে ভয় পেয়ে সে তাড়াতাড়ি ওগুলি ফেলতে গেল। সেই মুহূর্তে নৌকার তলায় কিসের আঘাত লাগল। নৌকার চারপাশের জল যেন উন্মত্ত হয়ে গেছে। এমেলিনের হাত থেকে ওই ফলশুদ্ধু ডালটা নৌকার খোলের মধ্যেই পড়ে যায়।

জলের নিচে তখন ভয়ংকর এক লড়াই চলছে। সঙ্গম ঋতুর সময় লেগুনের জলে এমনি প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। মানুষদের মতই মাছেদেরও প্রেম, ভালবাসা, ঈর্ষা আছে। এমনি এক লড়াই'এর সময় নৌকার তলায় আঘাত লাগে। ভয় পেয়ে এমেলিন আরও জোরে নৌকা বাইতে বলে ডিককে।

এরপর ডিক নৌকা চালিয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এল, যে জায়গা কখনো এমেলিন দেখেনি। অবশ্য দেখেনি বললে ভুল হবে। কেননা, এক বাল্যকালে, বাটন যখন এখান দিয়ে নৌকা নিয়ে যাচ্ছিল, এমেলিন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল তখন।

নৌকা থেকে দেখতে পেল কাঁঠাল গাছের নিচে ভাঙ্গা সেই পুরানো কুটির, বন আর বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গাগুলি। খুব অস্পষ্ট ভাবে হলেও এমেলিনের স্মৃতিতে পুরানো দিনেব কথা জেগে ওঠে। কুটিরটা ছোট্ট, তবু একটা গৃহ। এই ভাঙ্গা ঘরটার জন্যও এমেলিনের মন কেমন করে ওঠে। নৌকার গতির জন্য কুটিরের দৃশ্য দ্রুত সরে যায়। চারিদিকের দৃশ্য দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। আঙ্গুল তুলে তুলে ওর ভাল লাগা দৃশ্যগুলি হান্নাকে দেখাতে থাকে।

যেখানে একদিন একটা অ্যালবিকোর বঁড়শি দিয়ে গাঁথতে চেষ্টা করেছিল, সেখানে এসে দাঁড়টানা বন্ধ করল ডিক। সেদিনের সেই ঘটনা এমেলিনকে বলল। এই ঘটনার কথা এমেলিন এই প্রথম শুনলো ডিকের কাছে। বুঝলো, ডিক কত বন্য হয়ে গেছে। বল্লমটা পাবার ব্যাপারে আদিবাসি আর ক্যানো নৌকাগুলির কথা আগেই শুনেছিল সে। কিন্তু হাঙ্গরের ব্যাপার শুনে শিউরে উঠল এমেলিন।

'সে সময় একটা বড় বঁড়শি থাকলে ব্যাটাকে গেঁথে ফেলতাম।' জলের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে কথাটা বলল ডিক যেন তার সেই শত্রুকে খুঁজছে সে।

হান্নাকে বুকের ভিতর আরও আঁকড়ে ধরে এমেলিন বলল, 'ও সব ভুলে যাও।'

ডিক আবার দাঁড় তুলে নেয় হাতে। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় ওই কথা এখনো সে ভাবছে।

শেষ শৈলান্তরীপ, সৈকতের উঁচু পাড় পার হয়ে যায় ডিক। আর তারপরই ডুবো পাহাড়ের খাড়ির অংশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এমেলিন স্তব্ধ হয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখে। জায়গাটার সব কিছুই ঠিক আছে, তবু যেন কোন এক দুর্বোধ্য পরিবর্তন হয়েছে। এখান থেকে সংকীর্ণ দেখাচ্ছে লেগুনকে। খাড়ি অনেক কাছে। কোকো-পাম গাছগুলি যেন বেঁটে হয়ে গেছে। বাল্যের স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল এমেলিন। ডুবো পাহাড়ের উপর কালো দাগ অদৃশ্য হয়ে গেছে। জায়াগাটাকে যেন ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে গেছে ঝড়।

বালুর একটা ঢালু অংশে ডিক্ নৌকা তুলে রাখল। এমেলিন ও হান্নাকে নৌকাতেই বসে থাকতে বলে কলা গাছগুলির অনুসন্ধানে গেল সে। এমেলিনেরও ইচ্ছে ছিল ডিকের সঙ্গে যায়। কিন্তু হান্না ঘুমিয়ে পড়াতে তা আর হলো না। ইতিমধ্যে

আরেকবার এসে ডিক বড় একটা রুটিফলের পাতা দিয়ে গেছে যাতে ওরা দুজন রদ্দুরের হাত থেকে রক্ষা পায়। পাতাটা হাতে ধরে এমেলিন ডুবো পাহাড়ের সাদা বালুর দিকে তাকিয়ে রইল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে এমেলিনের মন উধাও হয়ে গেল অতীতে। কত রঙ্গীন ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। সবুজ জল জাহাজের কিছুটা অংশ...অস্পষ্ট অক্ষরে 'কোনানডোয়া' লেখার এক টুকরো....ওদের এই দ্বীপে নামা...বালুকাবেলায় ছোট্ট চায়ের সেট' এর কাপ প্লেটগুলি বিছানো...কাপ প্লেটের গায়ে নীল ফুল আঁকা...সিসের চামচগুলি....খাড়ির আকাশে রাত্রিবেলার বড় বড় ঝুলে থাকা নক্ষত্রগুলি...ক্ল্যারিকুন আর পরীরা...ঝর্ণার পাশে সেই পিপেটা....কলমি ফুল ফুটে রয়েছে.. পাহাড়ের উপর থেকে দেখা গাছগুলির ডালপালার আন্দোলন...। একটার পর একটা ছবি আসে আর যায়। আর তন্ময় হয়ে বসে থাকে এমেলিন।

এই সব ছবি তার মন ভারাক্রান্ত করলেও কম আনন্দও দেয় না। পৃথিবী তাকে সুখ দিয়েছে। শান্তি দিয়েছে। সমস্ত দুঃখ কষ্ট সে পিছনে ফেলে এসেছে। এ যেন সেই ভয়ংকর ঝড় ঈশ্বরের আশির্বাদে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। ভগবান তাদের অসীম দৈন্যতায় মধ্যেও রক্ষা করা ও তাদের প্রেমানন্দ ক্ষুণ্ণ রাখবার আশ্বাস দিয়েছেন।

হঠাৎ এমেলিনের সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। বিস্মিত ও আতংকিত হয়ে সে তাকিয়ে দেখল—নৌকা আর পাড়ের মাঝে নীল জল। নৌকা জলে ভাসছে।

বনের এই অংশে ঝড়ের হলেও ক্ষতি কিন্তু কম হয়নি। সেখানে ডিক যেতে চেয়েছিল, সেখানে যাবার পক্ষে বিস্তর বাধা। ভূপতিত গাছ আর লতাগুলির জটপাকানো অংশগুলি টপকে টপকে যেতে হচ্ছে তাকে।

ভগবানের বিশেষ বিধানে কলাগাছগুলির তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। কলার কাঁদি গুলি পর্যন্ত গাছে অক্ষত অবস্থায় ঝুলছে। দুটো কাঁদি কেটে নিল সে। একটা কাঁদি কাঁধে নিয়ে সে পড়ে থাকা গাছগুলি টপকে টপকে নৌকার দিকে এগোতে লাগল। একটা কাঁদির ভারেই তার মাথা ঝুঁকে পড়েছে।

অর্দ্ধেক পথ মাত্র অতিক্রম করেছে ডিক, দূর থেকে একটা ভয়ার্ত ডাক শুনতে পেল। মাথা তুলে সে দেখল নৌকাটা লেগুনের মাঝে ভাসছে আর এমেলিন প্রবল ভাবে হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। সে আরও দেখতে পেল—দুটো বৈঠার মধ্যে একটি ভাঙ্গা ও নৌকার মধ্যবর্তী জলে ভাসছে। নিশ্চয় এমেলিন দাঁড় টেনে ফিরে আসবার চেষ্টা করবার জন্য একটি দাঁড় জলে পড়ে গেছে। আর সেই মুহূর্তে ডিকের মনে পড়ল জোয়ারের জল সমুদ্রে ফিরে যাচ্ছে।

মুহূর্তে কলার কাঁদি ঘাড় থেকে ফেলে ডিক সৈকতের দিকে ছুটতে লাগল। এমেলিন নৌকার উপর দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

নৌকাকে জলের মাঝে আবিষ্কার করে এমেলিন দাঁড় বেয়ে ডাঙ্গায় ফিরবার চেষ্টা করেছিল। ভয়ে আতংকে তাড়াহুড়ো করে দাঁড় টানতে গিয়ে একটা দাঁড় জলে পড়ে যায়। একটা দাঁড় নিয়ে সে অসহায় বোধ করে। তা ছাড়া গলুইতে বসে একটা দাঁড় দিয়ে নৌকা চালানোর কায়দা সে জানেও না। প্রথম দিকে সে ভয় কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে। ভেবেছিল, ডিক এখুনি এসে পড়বে। কিন্তু ডাঙ্গা আর নৌকার দূরত্ব যত বাড়তে লাগল, তার সমস্ত শরীর আতংকে হীম হয়ে গেল। নৌকা থেকে ডাঙ্গার দূরত্ব বাড়ছেই। খাড়ির ভয়ংকর দৃশ্য ক্রমেই এগিয়ে আসছে উন্মুক্ত মুখের হা যেন বড় হয়ে আসছে। খাড়ির ফাঁকে নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দুরন্ত সমুদ্র।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডিক। সাঁতার কেটে এগিয়ে গিয়ে তাকে জলে ভাসতে থাকা দাঁড়টা ধরে ফেলতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এমেলিন। একহাতে দাঁড় নিয়ে অন্য হাতে সাঁতার কেটে ডিক দ্রুত নৌকার দিকে আসছে। আর মাত্র কিছুটা সাঁতার কাটলেই নৌকাটা ধরে ফেলবে ডিক। গভীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে এমেলিন। ডিক এখন নৌকাটা থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য একটা দৃশ্য দেখে এমেলিন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডিকের পিছনে, জলকে যেন দু'টুকরো করে কেটে একটা ত্রিকোণ কালো ছায়া জলের উপর ভেসে উঠল। তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মত সেই ছায়া জলে ঢেউ তুলে তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে।

ছায়ামূর্তিটা হলো লেগুনের রাজা। চল্লিশ বছর আগে সমুদ্রের ঢেউ-এ ভাসতে ভাসতে এই শিশু ত্রিকোন জীবটি যখন এখানে আসে, তখন তার অনেক শত্রু। ডগ ফিসদের তীক্ষ্ণ ধারালো চোয়াল থেকে সে নিজেকে রক্ষা করেছে। অ্যালবিকোর আর স্কুইডদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পেরেছে নিজেকে। জীবটির জীবনে মৃত্যু বার বার এসেছে আর প্রত্যেকবারই অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়েছে। এদের মত প্রাণী সুমদ্রে অসংখ্য জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বেঁচে থাকে আর ক'টি।

এর পরের তিরিশ বছর ধরে সে লেগুনের ভয়ংকর হীংস্র রাজা। লেগুনের অনেক উত্থান, অনেক পতন, অনেক পরিবর্তন তার চোখের সামনেই হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই প্রাণীটির পেটে যা গেছে, পরপর সাজিয়ে দিলে সেই জিনিষগুলি একটা পাহাড়ের আকার ধারণ করবে। তার শত্রুতা তলোয়ারের তীক্ষ্ণ আঘাতের মত। সে ভীষণ নিষ্ঠুর। হৃদয়হীন। লেগুনের আত্মা সে।

ভয়ে আতংকে এমেলিন চীৎকার করে ওঠে। ডিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে পিছনে কি ভয়ংকর দানব ছুটে আসছে। ওদিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডিক। বৈঠা ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে সাঁতার কেটে চলল নৌকার দিকে।

একটি মাত্র বৈঠা হাতে করে এবার এমেলিন নৌকার উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বৈঠার চ্যাপ্টা তীক্ষ্ণ দিকটা জলের দিকে উদ্ধত করে স্থির হয়ে দাঁড়াল সে। এবার সে স্পষ্টভাবে দেখতে পায় হিংস্র আর ভয়ংকর হাঙ্গারটাকে। ডিকের খুব কাছে, ঠিক

পিছনেই ছুটে আসছে শয়তানটা।

জীবনে লক্ষ্য স্থির রেখে কোনদিন একটা ঢিলও ছুঁড়তে পারেনি এমেলিন। কিন্তু এই মুহূর্তে তার হাত থেকে তীব্র বেগে ছুটে যাওয়া বৈঠা আঘাত করল হাঙ্গরটাকে। হিংস্র প্রাণীটি থমকে দাঁড়াল। আর এইটুকু সময়ে ডিক নৌকায় লাফিয়ে উঠল।

কিন্তু দ্বিতীয় বৈঠাটিও হারালো ওরা।

নৌকায় এমন কিছুই ছিলনা যা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়। মাত্র পাচ ছ'গজ দূরে বৈঠা ভাসছে। ওটাকে উদ্ধার করতে গেলে জলে নামতে হবে আবার। আর জলে নামা মানেই মৃত্যু।

এমেলিন, ডিক আর হান্নাকে নিয়ে ভেসেই চলল নৌকা। ডিক একবার ভাবল বৈঠাটাকে উদ্ধার করতে জলে নেমে যায়। কিন্তু দানব হাঙ্গরটার ছায়া নৌকার ডান দিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সমান দূরত্ব রেখে ভাসমান নৌকাটার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল শয়তনটা। তার শরীরে জলের একটা শব্দ আবরণ মাত্র ছিল। ধীর, স্থির, অথচ নির্দিষ্ট সুন্দর গতিতে শিকারের অনুসরণ করে চলেছে।

নৌকার বৈঠার উপর, যেন পাখীদের দাঁড়ে বসে থাকা কোকো তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে এই তিনটি প্রাণীর বিপদ বুঝতে পারল। সে হঠাৎ শূন্যে উঠে পড়ল। একটা চক্কর দিয়ে আবার বৈঠার উপর বসে ঝাপটাতে লাগল তার ডানার পালকগুলি। হতাশ, অসহায় ডিক নৌকার উপর দাঁড়িয়ে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। সমুদ্রের গর্জন কানে ভেসে আসছে আরও সুষ্ঠভাবে। কিন্তু তার করবার মত কিছুই নেই। সমুদ্রের বিরাট হাত ওদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দ্বীপ থেকে।

তারপর, হঠাৎ ছোট নৌকাটা যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামল। লেগুনের দু'পাশের জোয়ারের জল মিলিত হয়ে এবার ছুটে চলেছে সাগর সঙ্গমে, বন্ধ দুয়ার খুলে গেলে যেমন ভাবে শব্দ তীব্রভাবে ছুটে আসে, সমুদ্রের ঢেউ-এর গর্জনধ্বনি ওদের কানে বাজতে লাগল প্রচণ্ডতা নিয়ে। দুরন্ত বেগে ঢেউ এসে পাথরে আঘাত করছে, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। সী-গালগুলি নৌকার চারপাশে ওদের মাথার উপর কর্কশ চীৎকার করে উড়তে থাকে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, সমুদ্র যেন ইতস্ততঃ করছে। ওদের কি আছড়ে ফেলবে প্রবল স্তূপে, না টেনে নিয়ে যাবে তার অসীমতায়।

সমুদ্রের এই দো-টানা মনোভাব ক্ষণিকের জন্যই স্থায়ী হল। তারপরই জোয়ারের শক্তি হার মানল সমুদ্রের প্রসারিত হাতের কাছে। স্রোত এসে এদের টেনে নিয়ে ফেলে দিল সমুদ্রে।

নৌকার মাঝখানে এমেলিন তার বুকের ভিতর আঁকড়ে ধরে বসেছিল ছোট্ট হান্নাকে নিয়ে। ডিক ধপ করে বসে পড়ল তার পাশে। আর পাখীটা, তার অনুভূতি নিয়ে বুঝল কি বিপদ এগিয়ে আছে। বাতাসে ভেসে উঠল কোকো। ভাসমান

নৌকাটার চারপাশে তিনবার চক্কর কাটল। আর তারপরেই সব বিশ্বস্ততা ঝেড়ে ফেলে কোকো ডাঙ্গার দিকে উড়ে গেল।

ওদের চোখের সামনে আস্তে আস্তে দ্বীপটা মিলিয়ে গেল।

এই সেই দ্বীপ, যে দ্বীপ তৈরী করেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রবালের মৃতদেহ। উপকথার সঙ্গে জড়িত এই 'কীট' গুলি তাদের আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে কত না দ্বীপ গড়েছে বিক্ষুব্ধ, তরঙ্গায়িত সমুদ্রের বুকের উপর। এদের নিরলস পরিশ্রম সকলের প্রশংসা পাবার যোগ্য। এদের দেখে আমাদের শেখা উচিত। কত ধীর গতিতে বছরের পর বছর ধরে এই অবহেলিত সামুদ্রিক প্রাণীগুলি দ্বীপ ও দ্বীপের খাঁড়িগুলি গড়েছে। এই ভবঘুরেদের যেন বেঁচে থাকারও কোন সাধ নেই। এই মন্থর আঁঠালো প্রাণীরা সমুদ্রের ক্যালসিয়াম অংশের সঙ্গে দানা বেঁধে ঘর বাঁধে। এমনি ভাবে জমতে থাকে তারা মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে।

এই প্রাণীগুলি—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'পলিপাইফার'—তাদের দেহকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে যুগ যুগ ধরে তৈরি করে প্রবালের দ্বীপ। দ্বীপগুলিকে দেখলে মনে হবে শক্ত পাথরের তৈরী। কিন্তু তা নয়। এখানেই বিস্ময় লুকিয়ে আছে। সমুদ্র গর্ভ থেকে জেগে ওঠা প্রবালের প্রাচীরগুলি সম্পূর্ণ মৃত নয়। বলা চলে অর্ধমৃত। যদি তাই না হত তবে সমুদ্রের প্রবল আক্ষেপে দশ বছরও টিকে থাকতে পারত না। জীবন্ত কীটগুলি থাকে ভিতরে। এই পাথরগড়া কারিগরেরা অবশ্য জলের সংস্পর্শ ত্যাগ করলে আর সূর্যের আলো লাগলেই মরে যায়। ভাঁটার সময় যদি কেউ সাহস করে এখানে আসতে পারে, তবে দেখতে পাওয়া যাবে বিশাল স্তূপাকৃতি পাথরেরর আকারের কীটগুলিকে। মৌচাকের মত তাদের আকার আর ভিতরে জীবন্ত প্রবাল-কীট গিজ গিজ করছে। মাছেদের চমৎকার খাদ্য, সমুদ্রের প্রবল ঝাঁকুনি নিয়েই এদের জন্ম, এদের মৃত্যু। ওরা মরে, সমুদ্রের ঝড় ওদের কখনো টুকুরো টুকরো করে দেয়। আবার ওরা নিজেদের মৃতদেহ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে নেয়! একটি প্রাণীর অবলুপ্তি হলে আর একটি প্রাণী এসে তার জায়গা ভরিয়ে দেয়।

পৃথিবীর বহু সামুদ্রিক অঞ্চলে বহু বছর ধরে গড়ে উঠেছে প্রবাল-প্রাচীর বেষ্টিত দ্বীপ। রিমস্কি কোরসাকোফ এমন একটি প্রবাল দ্বীপ যা লম্বায় চুয়ান্ন মাইল আর চওড়ায় কুড়ি মাইল, এই দ্বীপটি জীবন্ত। ভাঙ্গছে, গড়ছে। এইসব প্রবাল দ্বীপগুলিতে ধীরে ধীরে উদ্ভিদ জন্মায়, শান্ত লেগুনের নিচে তৈরি হয় আশ্চর্য 'জলের বাগান।' প্রাকৃতিক কারণে আসে আরও অনেক সামুদ্রিক প্রাণী। গাছে গাছে পাখীরা বাসা বাঁধে। রহস্যময়ী প্রকৃতির হাতে গড়া বিচিত্র জীবন্ত দ্বীপের থেকে আর কি আশ্চর্য বিস্ময়কর সৃষ্টি হতে পারে।

এই দ্বীপ ছেড়ে ডিক, এমেলিন আর হান্না চলে যাচ্ছে—যে দ্বীপ একদিন দুটি

শিশুকে পরম নির্ভয়ে আশ্রয় দিয়েছিল, গড়ে উঠতে দিয়েছিল প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্যের ভিতর। এই দ্বীপে তারা দুজন বড় হয়েছিল, ওদের জীবনে প্রেম, সুখ, শান্তি—এনে দিয়েছিল সব কিছু। সেই দ্বীপ ছেড়ে ওদের চলে যেতে হচ্ছে। স্বেচ্ছায় নয়। এক ভয়ংকর অঘটনের মধ্যে ওরা ছুটে চলেছে, গভীর, বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের অসীমতার মধ্যে।

সূর্য ডুবে গেল। দিগন্তে দ্বীপটির ঝাপসা সবুজ আভাস দেখা যাচ্ছে। এখনো চাঁদ ওঠেনি। নৌকা ভাসতে ভাসতে চলেছে। প্রদোষের আলোয় আকাশে নক্ষত্ররা দেখা দিচ্ছে একে একে। নৌকা ভেসে চলেছে।

হান্নাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ডিকের কাঁধে মাথা রেখে এমেলিন শুয়ে আছে। দুজনেই নীরব। বাক্যহারা দ্বীপের সমস্ত সুখ শান্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে কোথায় পাড়ি দিচ্ছে ওরা?

ওদের মন শান্ত হয়ে গেছে। কোন দুঃখ, কোন ভয় নেই। ওরাতো এক সঙ্গেই আছে। যাই আসুক, পৃথিবীর কোন শক্তি আর ওদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। ওরা আরও ঘনিষ্ঠ হয়। দুই ঠোঁটের গভীর মিলন হল। আকাশে নক্ষত্রের আলো। অগস্ত্য নক্ষত্র দেখা দিল।

নৌকা ভেসে চলেছে। গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে ওরা। এমেলিনের মুঠোর মধ্যে তখনো পৃথিবীর সেই রহস্যময় জিনিষ ধরা আছে গাঢ় লাল রংয়ের কুঁচ ফলের ডাল। ওর থোকা থোকা ফলগুলি এখনো ডালের সঙ্গে লেগে আছে। যে ফল খেলে ঘুম আসবে। আর সে ঘুম কখনোই ভাঙ্গবে না।

সপ্তম খণ্ড

ক্যাপ্টেন সাইমন জেঃ ফাউন্টেন বিছানায় শুয়ে শুয়েই এই অনুসন্ধান যাত্রার এমন নিখুঁত ও সুন্দর ব্যবস্থা করে দিল যে অন্যান্য নাবিক, প্রয়োজনীয় রসদপত্র-সহ ক্যাপ্টেন ষ্ট্যানিষ্ট্রীটের পরিচালনায় 'রারাটোঙ্গা' স্কুনার জাহাজটি মে মাসের দশ তারিখে গোল্ডেন গেট পার হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে পাড়ি দিল। বলাই বাহুল্য, লেষ্ট্রেঞ্জ ছিলেন এই জাহাজের প্রধান যাত্রী।

যদি কেউ স্কুনার জাহাজে চড়ে থাকে, তবে তার জানাই আছে যে এই জাহাজটির সঙ্গে অন্য জলযানের কত পার্থক্য। স্কুনারের বিশাল চওড়া আর আকাশ ছোঁয়া পাল বাতাসের সমস্ত সুবিধা আদায় করে নেয়। অন্য দ্রুতগামী জলযানের তুলনায় স্কুনার হল জাহাজের রাণী। চৌকো জাহাজের সঙ্গে এর সমুদ্রের ঢেউ-এর তালে তালে লাফিয়ে চলার কোন তুলনাই হয় না। আর 'রারাটোঙ্গা'র সমুদ্র যাত্রার সুখ্যাতি ও

প্রাধান্য প্রশান্ত মহাসাগরের যত স্কুনার জাহাজ—সবাই স্বীকার করে নিয়েছে।

প্রথম কয়েকদিন 'রারাটোঙ্গা'র দক্ষিণ-যাত্রা খুবই মসৃণ। তরতর গতিতে ছুটে চলল সে। আর তারপরই বাতাস যেন প্রাচীর তুলে ওদের অগ্রগতি রোধ করতে চাইল।

স্কুনারের ভিতর লেস্ট্রেঞ্জের অস্থির, উত্তেজিত মনে এবার আরও বেশি অস্বস্তি ও উদ্বেগ জেগে উঠল। তার কানের কাছে কে যেন আধো স্বরে বলতে লাগল—যে শিশুদের খোঁজে তিনি যাচ্ছেন, তারা খুব বিপদে পড়েছে।

বাতাসের প্রাচীর যেন লেস্ট্রেঞ্জের মনের ভেতর অঙ্গারের মত জ্বালা ধরিয়ে দিল। এই অঙ্গারে জ্বালা আছে দাহ নেই। বাতাসের এই অদ্ভুত আচরণ বেশ কিছুদিন ধরে চলল। তারপর ভাগ্য যেন ফিরিয়ে নিল বিরূপতা। বাতাসে ফিরে এল স্বচ্ছন্দ গতি। স্কুনারের পাল, দড়িদড়াগুলি যেন আনন্দে গান গাইতে লাগল আবার। দ্রুত চলার গতিতে রারাটোঙ্গার নিচে জলের পিছলে যাওয়ার শব্দ ভেসে আসতে লাগল। পিছনের ফেনারাশির স্কুনারের সঙ্গে অনুরক্তের মত চলতে লাগল।

এভাবে রারাটোঙ্গা পাঁচশ মাইল স্বপ্নের মত অতিক্রম করল। তারপর আবার স্তব্ধ হয়ে গেল তার গতি। সমুদ্র আর বাতাস নিথর হয়ে গেল। বিবর্ণ নীল আকাশ গম্বুজের মত ঝুলে রইল স্কুনারের মাথার উপর। শুধু দূরে দিগন্তে, যেখানে জলের সীমারেখা শেষ হয়ে গেছে, সেখানে নক্সার মত কয়েকখণ্ড মেঘ আকাশ ঘিরে রয়েছে।

বাতাস ও সমুদ্রের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া আচরণের ফলে মনে হচ্ছে একটা চত্তরে স্কুনার দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের সামান্য যা ঢেউ, তা যেন সবগুলিই ওঠানামা করছে। কখনো একটা বুড়বুড়ি জলের উপর উঠে চত্তরের মত জলকে সামান্য ভেঙ্গে দিচ্ছে। কখনো সামুদ্রিক আগাছা স্কুনারের পাশে ভাসছে। ওদের উপরের সবুজটুকুই ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে ডুবে যাচ্ছে আবার। এ যেন, মানুষ দেখে আগাছাগুলি আর জলের উপর ভাসতে চাইছে না।

দুটো অমূল্য দিন এভাবে নষ্ট হল। সমুদ্র শান্তরূপ ধারণে অবিচলিতই রইল। অবশেষে, তৃতীয় দিনে বইল দক্ষিণ পশ্চিম বাতাস। রারাটোঙ্গার প্রতিটি পাল আকাশে উড়ল। স্কুনারের তলায় পিছলে যাওয়া জলের সঙ্গীত নিয়ে আবার এগিয়ে চলল ওরা।

নিজের কাজে ক্যাপ্টেন ষ্ট্যানিষ্ট্রীট একটি প্রতিভাধর মানুষ। ইচ্ছে করলে জলে ভাসমান সে। যে কোন জাহাজের থেকেও বেশি গতি আনতে পারে রারাটোঙ্গা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাল খাটানো যেতে পারে এই স্কুনারে। আর, লেস্ট্রেঞ্জের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, এই ক্যাপ্টেনটি শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি সম্মত ব্যক্তি। ষ্ট্যানিষ্ট্রীট সদ্‌বংশজাতও বটে।

এক বিকেলে লেস্ট্রেঞ্জ ও স্ট্যানিষ্ট্রীট ডেকের উপর পায়চারি করছিল। পিছনে দু'হাত রেখে ডেকের পাটাতনের কাঠগুলির দিকে চোখ রেখে পায়চারি করতে করতেই লেস্ট্রেঞ্জ বললেন, 'আপনি বোধহয় স্বপ্ন অথবা ভবিষ্য-দর্শনের অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন না।'

'আপনি জানলেন কি করে?' স্ট্যানিষ্ট্রিট বলল।

'এমনি-ই একটা প্রশ্ন করলাম আপনাকে। অধিকাংশ লোকইতো এসবে বিশ্বাস করে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু বহুলোক আবার এসবে বিশ্বাসও করে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন লেস্ট্রেঞ্জ। তারপর আবার বলেন, 'আপনি আমার সমস্ত কথাই জেনেছেন। আমার দুঃখ কষ্টগুলির কথা বলে আবার আপনাকে বিব্রত করতে চাইনা। কিন্তু কয়েকদিন ধরেই আমি একটা জিনিষ গভীরভাবে অনুভব করছি। মনে হচ্ছে যেন আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি।'

'তাই নাকি?'

'আমি ঠিক ব্যাখা করতে পারছিনা। এমন কিছু আমি দেখি যা আমার বুদ্ধির বাইরে। ধারণার অতীত।'

'বুঝেছি আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি।'

'না, আপনি বুঝতে পারেননি।' লেস্ট্রেঞ্জ বললেন, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমার বয়স এখন পঞ্চাশ। পঞ্চাশ বছরে আমি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। একজন মানুষের পক্ষে সাধারণ অসাধারণ সংবেদন. ইন্দ্রিয়গত চেতনা যতটুকু পাবার, আমি তা পেয়েছি। এই চৈতন্য যে সব সময় আসে তা নয়। কখনো কখনো, বা সময় অনুকূল হলে তা আসে। আপনি কল্পনা করুন, একটি শিশুর মত দৃশ্য আমি দেখি যা আমি আগে কখনো ভাবিনি বা চিন্তা করিনি। এই দৃশ্যগুলি আমার দেহগত, চোখের মাধ্যমে আমি দেখিনা। এ যেন মনের কোন জানলার পর্দা হঠাৎ সরে যায় আর আমার সংবেদনশীল মুহূর্তগুলি ভাসতে থাকে। আমি দেখতে থাকি।'

'সত্যিই, ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক।' স্ট্যানিষ্ট্রীট এ-প্রসঙ্গে আর এগোতে চায়না। যদিও সে একজন পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিমান এবং সহানুভূতিশীল মানুষ, তবুও সে তো একজন জাহাজের পরিচালক মাত্র।

লেস্ট্রেঞ্জ কিন্তু থামতে চায়না। বলতে থাকেন, 'এই সব অনুভূতিগুলি আমাকে জানাচ্ছে, একটা বিপদ, একটা বিপদ ওদের ঘিরে ধরেছে।'

হঠাৎ চুপ করে গেলেন লেস্ট্রেঞ্জ। এমন ভাবে চুপ করে যাওয়াতে স্ট্যানিষ্ট্রীট একটু অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু একটু পরে লেস্ট্রেঞ্জ আবার কথা বলতে শুরু করলে স্ট্যানিষ্ট্রীট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

'আমি এভাবে কথা বলছি দেখে আপনি হয়তো আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ করতে পারেন। যাক, এসব কথা এখন বন্ধ থাকুক। স্বপ্ন, অশুভ সংকেত, এসব কথা ভুলে গিয়ে বাস্তবে আসা যাক। আপনি জানেন কি ভাবে আমি শিশু দু'টিকে হারিয়েছি। এবং একথাও জানেন ক্যাপ্টেন ফাউন্টেনের চিহ্নিত স্থানে ওদের ফিরে পাবার কত আশা রাখি। ক্যাপ্টেন ফাউন্টেন একটা কথা বলেছিলেন, দ্বীপটায় জনবসতি নেই। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে খুব নিশ্চিত নন।'

ষ্ট্যানিষ্ট্রীট বলল, 'উনি কিন্তু দ্বীপে জনবসতি নেই একথা বলেননি। উনি শুধু সৈকতের কথাই বলেছিলেন।'

'তা ঠিক। কিন্তু মনে করুন দ্বীপের অন্য অংশে অধিবাসিরা থাকতে পারে। তারা শিশু দুটিকে নিয়েও যেতে পারে।'

'তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আদিবাসীদের মধ্যেই মানুষ হবে।'

'কিন্তু তাতে ওরা বুনো হয়ে যাবে যে।'

'কথাটা মিথ্যে বলেননি।' ষ্ট্যানিষ্ট্রীট বলে, 'কিন্তু সত্যি বলতে কি পলিনেসিয়ানরা বন্য বর্বর নয়। বহুবার আমি তাদের মধ্যে গিয়েছি। আর কানাকারা আমাদের মতই সাদা চামড়ার লোক। এখন প্রায় সব দ্বীপগুলি সভ্য দেশেরই মত। অবশ্য কিছু দ্বীপ যে আদিম স্তরেই পড়ে আছে একথাও ঠিক। তবু, ধরা যাক তথাকথিত বর্বরেরা যদি শিশুদের নিয়ে গিয়েই থাকে—'

ষ্ট্যানিষ্ট্রীটের কথা শুনে লেস্ট্রেঞ্জের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তার অন্তরে এই ভয়, এই চিন্তাই ছিল সব সময়ে, যদিও কাউকে প্রকাশ করেননি তিনি।

নিঃশ্বাস চেপে লেস্ট্রেঞ্জ বললেন, 'তা হলে?'

'তা হলে আর কি! ওরা ভাল ব্যবহারই পাবে আদিবাসিদের কাছে।'

'আর গড়ে উঠবে বুনোদের মত?'

'মনে হয়ে তাই হবে।'

এটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন লেস্ট্রেঞ্জ।

'দেখুন, এসব কথার কথা।' ক্যাপ্টেন ষ্ট্র্যানিষ্ট্রীট বলে, 'আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবি। আমরা, সভ্য লোকেরা, নিজেদের সভ্য বলে গর্ব করি, শ্রেষ্ঠত্বের ভান করি আর করুণা করি এই সব বন্যদের।'

'তার মানে?'

'একজন মানুষ সুখী হওয়া ছাড়া আর কি চায়?'

'ঠিক কথা।'

'বেশ, তবে উষ্ণ আবহাওয়ায় একজন নগ্ন বর্বরের থেকে কে বেশি সুখী? ওহ, যথেষ্ট সুখী সে। সব সময় তাকে সত্যের মুখোশ পরে থাকতে হয়না তবু তার ভদ্রতা,

সৌজন্যতা অতুলনীয়। তার স্বাস্থ্যে কোন খুঁত নেই। সে সেই মানুষের জীবন যাপন করে যে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে বাস করবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে। আদিবাসিরা অফিসের জানলার কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্য দেখেনা। কারখানার চিমনির ধোঁয়ার আড়ালে চাঁদ দেখেনা। ওর সুখী। সভ্যতা নিশ্চয়। তবে, ক্ষমা করবেন, আমরা কোথায় তাদের ফেলে রেখেছি? আমরা, শ্বেতকায় লোকেরা তাদের তাড়িয়ে নিতে নিতে কোথায় নিয়ে ফেলেছি তাদের? দু'একটা ছোট দ্বীপে তাদের হয়তো এখনো দেখতে পাবেন আপনি। টুকরো টুকরো, বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তারা।'

'তাই যদি হয়, 'লেস্ট্রেঞ্জ বললেন, 'ধরেই নিলাম তারা প্রকৃতির কোলে মানুষ হচ্ছে—'

'বেশ তো—।'

'ওই মুক্ত জীবন যাপন করছে—'

'ভালই তো।'

লেস্ট্রেঞ্জের দৃষ্টি যেন কোথায় কোন দূরে ভেসে গেল। আচ্ছন্নের মত বলতে থাকেন তিনি, 'সূর্য ওঠার আগে নক্ষত্রের আলোয় ওরা জেগে ওঠে। অস্ত গেলে ঘুমাতে যায়। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে মুক্ত বাতাস। ওরা-ওরা যদি ওই ভাবেই গড়ে ওঠে, তবে সেখান থেকে ওদের ছিনিয়ে নিয়ে থাকে যাকে আমরা বলি সভ্যতা, সেই সভ্যতায় নিয়ে এলে ওদের প্রতি কি নিষ্ঠুরতা করা হবে না?'

'আমরাও তাই মনে হয়।' স্ট্যানিষ্ট্রীট বলল।

লেস্ট্রেঞ্জ আর একটি কথাও বললেন না। পিছনে হাত রেখে আবার ডেকে পায়চারি করতে শুরু করলেন। তার মাথা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে।

একদিন সূর্যাস্তের সময় ডেকে দাঁড়িয়ে লেস্ট্রেঞ্জকে বলল ক্যাপ্টেন, 'নির্দিষ্ট দ্বীপটি থেকে আমরা এখনো দু'শ চল্লিশ মাইল দূরে আছি। হিসেব অনুযায়ী কাল দুপুর নাগাদ পৌছে যাবে যদি সব কিছু ঠিক থাকে। এই বাতাসেও আমাদের স্কুনার ঘন্টায় দশ নট হিসাবে ছুটছে।'

'আমার মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছে।' লেস্ট্রেঞ্জ বললেন।

ডেক থেকে নিচে নেমে গেলেন লেস্ট্রেঞ্জ। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিতে মাথা নাড়ল স্ট্যানিষ্ট্রীট। তারপর সুন্দর পরিস্কার আবহাওয়ায় অপরূপ দৃশ্য দেখতে থাকে সে।

গত রাতে রারাটোঙ্গা অনুকুল বাতাস পেয়ে অনেক দূর চলে এলেও পরদিন সকালে কিন্তু বাতাসের আচরণ একটু ভিন্ন রকমের হল। বেলা এগারোটা নাগাদ একেবারেই পড়ে গেল বাতাস। স্কুনারের চলমানতা অক্ষুণ্ণ রইল শুধু। হঠাৎ, লেস্ট্রেঞ্জের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্ট্যানিষ্ট্রীট স্কুনারের শেষ অংশের মাস্তুলের কাছে

গিয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলো থেকে চোখ বাঁচাবার জন্য চোখের উপর হাত রেখে কি যেন দেখতে লাগল।

'কি দেখছেন?' লেস্ট্রেঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন!

'একটা নৌকা।' স্ট্যানিষ্ট্রীট বলল, 'ওই যে ঝোলানো দূরবীনটা আমাকে একটু দিন তো?'

দূরবীন চোখে লাগিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওদিকে তাকিয়ে রইল স্ট্যানিষ্ট্রীট। তারপর বলল, 'একটা নৌকা—ছোট্ট একটা নৌকা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওটার ভিতরে কি আছে দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়ান! কিছু সাদা সাদা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছিনা ওগুলি কি।' তারপর ষ্টীয়ারিং হুইলের লোকটিকে বলল, 'এই—শুনছ? জাহাজটাকে ডান দিকে রেখে চল।'

লেস্ট্রেঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন, 'নৌকাটাতে কোন লোক আছে কি?'

'ঠিক বলতে পারছিনা। তবে শিকারের নৌকাটা নামিয়ে একবার ওটার কাছে যেতে হবে।'

ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকাটা বিশাল সমুদ্রে যেন একটা বাদামের খোলার মত ভাসছে। নৌকাটা যেন এক বিষাদের প্রতিমূর্তি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিমি শিকারি নৌকাটি এই ছোট্ট ডিঙ্গির গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। স্ট্যানিষ্ট্রীট নৌকাটার পাশ চেপে ধরে হাত বাড়িয়ে দেয়।

ডিঙ্গির খোলের ভিতর একটি মেয়ে শুয়ে আছে। কয়েক টুকরো রঙ্গীন কাপড়ের টুকরো না থাকলে তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন-ই বলা যায়। তার আর তার পুরুষসাথীর হাতের মাঝে জড়িয়ে শুয়ে আছে একটি শিশু। দেখলে মনে হয় এরা আদিবাসি। জাহাজডুবি বা অন্য কোন স্কুনারের জন্য অথবা কোন অঘটনের ফলে ওরা জলে ভাসছে। ওদের বুকের ওঠা-নামা থেকে বোঝা যাচ্ছে ওরা গভীর ঘুমে অচেতন। মেয়েটির হাতের মুঠোয় একটা গাছের শুকনো ডাল। আর শুকনো ডালে তখনো শুকনো কুঁচফলগুলি ঝুলছে।

তিমি-শিকারি নৌকার বৈঠা থেকে ঝুঁকে লেস্ট্রেঞ্জ এই তিনটি প্রাণীকে দেখছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কি মরে গেছে?'

'না।, স্ট্যানিষ্ট্রীট বলল, 'ওরা ঘুমিয়ে আছে!'